মাওলানা আবু মুসআব

অতি জযবাতি তরুণ ১-২ এর পরিমার্জিত সংস্করণ

মুসলিমবিশ্ব
ও
সমকালীন মাসায়েল

(মানবরচিত আইনের শাসন, ধর্মনিরপেক্ষতা,
গণতন্ত্র, দারুল ইসলাম ও দারুল হারব)

মাওলানা আবু মুসআব

মুসলিমবিশ্ব ও সমকালীন মাসায়েল

লেখক	মাওলানা আবু মুসআব
প্রথম সংস্করণ	প্রথম প্রকাশ মুহাররম ১৪৪০ হি./সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঈ.
প্রথম সংস্করণ	শেষ প্রকাশ মুহাররম ১৪৪১ হি./সেপ্টেম্বর ২০১৯ ঈ.
পরিমার্জিত সংস্করণ	প্রথম প্রকাশ জুমাদাল উলা ১৪৪৪ হি./ডিসেম্বর ২০২২ ঈ.
প্রকাশক	দারুল ফিকহিল আম
স্বত্ব	সংরক্ষিত
বই পেতে	dfambd@gmail.com www.facebook.com/দারুল ফিকহিল আম
অনলাইন পরিবেশক	রকমারি.কম, মোল্লার বই.কম, আমাদের বই.কম, পথিকশপ.কম, সিজদা.কম
মূল্য	৬০০ (ছয় শত টাকা মাত্র)

পরিমার্জিত সংস্করণের ভূমিকা

পরিমার্জিত সংস্করণে ভূমিকাস্বরূপ কয়েকটি বিক্ষিপ্ত কথা:

এক.

'অতি জযবাতি তরুণ' দলিলভিত্তিক কোনো ইলমি গ্রন্থের নাম হতে পারে না এবং তা গ্রন্থের নাম হিসেবে দেখানো উদ্দেশ্যও ছিলো না। সেটি ছিলো পরিপূর্ণই একটি 'ডিফেন্ড' শিরোনাম অথবা প্রস্তাবনা শিরোনাম। অর্থাৎ সমকালীন বহুল আলোচিত নির্দিষ্ট কিছু মাসআলার ব্যাপারে কথা বলাকে 'অতি জযবা' এবং যারা কথা বলছেন তাদেরকে 'অতি জযবাতি তরুণ' আখ্যা দেয়া হয়েছে, সে মাসআলাগুলোর আলোচনা কি বাস্তবেই শুধু জযবানির্ভর নাকি দলিলভিত্তিক? আমার উদ্দেশ্য ছিলো, পাঠক যখন পুরো আলোচনা পড়ে বুঝতে পারবেন, এগুলো শুধুই জযবানির্ভর কথা নয় বরং দলিলভিত্তিক আলোচনা -চাই দাবি, দলিল বা দলিলপদ্ধতির সঙ্গে তিনি একমত পোষণ করুন বা না করুন-, তখন হয়তো তারাই সিদ্ধান্ত দেবেন, এটিকে 'অতি জযবা' আখ্যা দেয়া উচিত নয়। সে হিসেবে 'অতি জযবাতি তরুণ' একটি 'ডিফেন্ড' শিরোনাম। অথবা পাঠক সিদ্ধান্ত দেবেন, এ ধরনের দলিলভিত্তিক 'অতি জযবা' দোষের কিছু নয়। তাহলে 'অতি জযবাতি তরুণ' একটি প্রস্তাবনা শিরোনাম। মোটকথা, আমিও বুঝাতে চেয়েছি এটি একটি 'ডিফেন্ড' শিরোনাম বা প্রস্তাবনা শিরোনাম এবং পাঠকদের থেকেও এমন বুঝই আমি পেয়েছি। আমার বুঝ দেয়া ও বুঝ পাওয়া দুটিই যেহেতু হয়ে গেছে, তাই এখন মূল নামেই গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়েছে।

এই গ্রন্থে মৌলিকভাবে চারটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে: মানবরচিত আইনের শাসন, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, দারুল ইসলাম ও দারুল হারব। প্রাসঙ্গিক আরো কিছু বিষয় এসেছে। আর পরিমার্জিত সংস্করণে প্রথম পর্বের শেষে 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামি রাজনীতি: ইতিহাস, বাস্তবতা ও ফলাফল' নামে মাওলানা ইসহাক উবাইদি রহ. এর একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সংযোজন করা হয়েছে।

দুই.

প্রথম সংস্করণ 'নকদ' তথা দলিলভিত্তিক পর্যালোচনার 'উসলুব' পদ্ধতিতে 'তারতিব' দেয়া হয়েছিলো। সে বিবেচনায় সালাফের 'নকদ'র উসলুবের আলোকে প্রথম সংস্করণের উসলুবে আপত্তির কিছু ছিলো না -যদিও কারো কারো দৃষ্টিতে তা অপছন্দনীয় হওয়া স্বাভাবিক-। কিন্তু উম্মাহ দরদি 'আহলে ফযল'র এক জামাআত আলোচনাকে 'নকদ'র পরিবর্তে 'দাওয়াহ'র উসলুবে পেশ করার অনুরোধ করেছেন। তাদের অনুরোধকে আমি নির্দেশ হিসেবে গণ্য করে এই সংস্করণে উসলুব পরিবর্তনের চেষ্টা করেছি। আমি দাবি করছি না যে, এই সংস্করণে পরিপূর্ণ 'নকদ'র উসলুব থেকে বের হয়ে আসা সম্ভব হয়েছে এবং তা একটু জটিলও বটে; বিশেষকরে বিভিন্ন পুস্তিকা ও ফাতওয়ার পর্যালোচনায়, তবে আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। এরপরও যদি কোনো উসলুব কারো দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় হয়ে থাকে সেটির জন্য আমি অগ্রিম 'আফওয়ান' বলে নিচ্ছি। আর প্রথম সংস্করণ 'নকদ'র উসলুবে রচিত হওয়ায় কারো কারো নিকট অপছন্দনীয় হওয়া স্বাভাবিক। তবুও সেটির জন্য আমি 'আফওয়ান' বলছি।

তিন.

প্রথম সংস্করণে কিছু ক্ষেত্রে সংক্ষেপণ ও অস্পষ্টতার কারণে কারো কারো আপত্তি তৈরি হয়েছে। পরিমার্জিত সংস্করণে মূলপাঠে বা টীকা সংযোজন করে সেগুলোর অস্পষ্টতা দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত, আমার গ্রন্থের পর্যালোচনায় মুদ্রিত কোনো গ্রন্থ আমার হাতে পৌঁছেনি। মুখে মুখে শোনা সুনির্দিষ্ট আপত্তিগুলোর আলোকে অস্পষ্টতা দূর করার চেষ্ট করেছি। সুতরাং পর্যালোচক কারো এমনটি মনে করার কোনো কারণ নেই যে, আমার সব পর্যালোচনার ব্যাপারে অবস্থান স্পষ্ট না করে কিছু কিছু এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

সুনির্দিষ্ট আপত্তির ক্ষেত্রে আমার ভুল সাব্যস্ত হলে অবশ্যই তা ঠিক করে নেয়ার মানসিকতা আমার আছে এবং ঠিক করাও হয়েছে, আর ভুল বুঝাবুঝি হলে তা স্পষ্ট করা হয়েছে। যেমনটি উস্তাযে মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক -হাফিযাহুল্লাহ- প্রথম পর্বের প্রথম প্রকাশে একটি শব্দের অর্থের ভুল নির্ণয় করেছিলেন যা বেখেয়ালে হয়েছিলো; পরবর্তী প্রকাশে তা ঠিক

করে দেয়া হয়েছে। তেমনিভাবে দ্বিতীয় পর্বের প্রথম প্রকাশে 'সাড়ে তিন হাত দেহ'র স্থানে বেখেয়ালে 'আড়াই হাত দেহ' মুদ্রিত হওয়ায় মুহতারাম মুফতি দিলাওয়ার হুসাইন -হাফিযাহুল্লাহ- বড়ো ধরনের ভুল বুঝাবুঝির শিকার হয়েছিলেন। পরবর্তী প্রকাশে তা ঠিক করে দেয়া হয়েছে।

তেমনিভাবে যদিও শরয়ি দায়িত্ববোধ থেকে এ জটিল বিষয়গুলোর ইলমি সমাধানের চেষ্টা করেছি, তবে আমার ইলমি দৈন্যতার উপলব্ধি অবশ্যই আমার আছে। সুতরাং মানুষ হিসেবে আমার 'ফাহম' বুঝের স্বল্পতা, মুতালাআর অপ্রতুলতা ও 'তাতবিক' প্রয়োগে অপরিপক্কতার কারণে ভুল হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে আল্লাহ তাআলাকে সাক্ষ্য রেখে কসম করে বলতে পারি, কোনো ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় 'খিয়ানত' করিনি ও 'তাজাহুল'র পরিচয় দেইনি। আর 'খিয়ানত' করে ও 'তাজাহুল'র পরিচয় দিয়ে এ সকল জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ মাসআলা নিয়ে কথা বলায় বিশেষ কী ফায়দা রয়েছে; তা বোধগম্য নয়। কোথায় বুঝের ভুল ও স্বল্পতা প্রকাশ পেয়েছে, কোন ক্ষেত্রে মুতালাআর ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে এবং কোন প্রয়োগে অপরিপক্কতা সাব্যস্ত হয়েছে; শরয়ি দায়িত্ববোধ থেকে এগুলো নির্ণয় করলে আমিও উপকৃত হবো এবং পাঠকও ভুল থেকে বেঁচে যাবে। অযথা আমার দিকে 'খিয়ানত' ও 'তাজাহুল'র নিসবত করে এবং আমার ব্যাপারে অনর্থক মন্তব্য করে 'বদ যবানি-বদ গুমানি'র পাল্লা ভারি করার প্রয়োজন কী!!!

তো সুনির্দিষ্ট আপত্তির ক্ষেত্রে ভুল সাব্যস্ত হলে ঠিক করে নেয়া এবং ভুল বুঝাবুঝি হলে স্পষ্ট করার মানসিকতা অবশ্যই আছে; তবে আপত্তি অবশ্যই সুনির্দিষ্ট এবং যৌক্তিক হতে হবে। অন্তঃসারশূন্য ভারি ভারি শব্দ, ভারি ভারি কথা, ভারি ভারি উসুল ও বায়বীয় সামগ্রিক কথায় আপত্তির স্থানও নির্ধারণ হয় না এবং ঠিক করারও কিছু থাকে না।

চার.

এই গ্রন্থে আলোচ্য চারটি মাসআলার মূল ফাতওয়া আমার দৃষ্টিতে 'মুজতাহাদ ফিহ' নয়, অর্থাৎ তাতে মতানৈক্যের সুযোগ নেই। আনুষঙ্গিক বিষয়াদিতে 'মুজতাহাদ ফিহ' অংশ থাকতে পারে। এর অর্থ এটি নয় যে, কারো দৃষ্টিতে তা 'মুজতাহাদ ফিহ' নয়। এমন অগণিত মাসআলা আছে যেগুলো কারো দৃষ্টিতে 'মুজতাহাদ ফিহ' হয়, আবার অন্যের মতে তাতে মতানৈক্যের সুযোগ থাকে না।

যাই হোক না কেনো; যেহেতু এই গ্রন্থ নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট গিয়ে পৌঁছানো বা বুঝানোর জন্য লেখা হয়নি এবং লেখক কর্তৃক এমনটি করাও হয়নি, বরং ব্যাপকভাবে প্রকাশ হয়েছে। সুতরাং যার দৃষ্টিতে মাসআলাগুলো 'মুজতাহাদ ফিহ' মনে হবে এবং ভিন্ন কোনো মত 'তারজিহ' পাবে অথবা মূল থেকে কথাগুলো সহিহই মনে হবে না, তিনি দলিলভিত্তিক পর্যালোচনা গ্রন্থ রচনা করে ব্যাপকভাবে প্রকাশ করলে সকলেই উপকৃত হবে। আকাবিরে আসলাফের কর্মপন্থা সাধারণত এমনই ছিলো। এগুলো নিয়ে দলাদলি সৃষ্টি করা, বিভিন্ন সভা-সেমিনারে মাসআলাগুলোকে 'মুজতাহাদ ফিহ' মেনে নিয়েও দালিলিক আলোচনা ছাড়াই নিজের মতকে চাপিয়ে দেয়া, বিপরীত মতের বিরোধিতাকে মিশন বানানো, বিপরীত মত পোষণকারীদের ভিন্ন নাম দিয়ে পৃথক শ্রেণি হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা এবং বিস্তারিত দলিলনির্ভর আলোচনা না করে সংক্ষিপ্ত ভাষ্যে 'গুযারিশাত' ও 'ওযাহাত' প্রকাশ করা ইত্যাদি সালাফে সালেহিনের কর্মপন্থাও নয় এবং এতে ফায়দার পরিবর্তে ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও ইলমি সম্পর্কই বেশি নষ্ট হয়।

এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় জেনে রাখা উচিত। এই গ্রন্থ আসাতিযায়ে কেরাম ও আকাবিরের কাছে যাওয়ার পূর্বেও রচনা করা হয়নি এবং 'মুযাকারা' ব্যতীতও লেখা হয়নি। 'বাসিরত'সম্পন্ন ও 'আমানত'দার উলামায়ে কেরামের সঙ্গে 'মুযাকারা' করে কোনো গ্রন্থ রচনা করা একটি উত্তম পদ্ধতি, তবে তা শর্ত নয়; অন্যথায় সালাফের বহু রচনার ব্যাপারে আপত্তি তৈরি হবে। তবুও আমি ও আমরা এ মাসআলাগুলো নিয়ে 'মুযাকারা' করতে অনেকের দরবারে ধর্ণা দিয়েছি। কারো কারো সঙ্গে 'মুযাকারা' হয়েছে, কেউ কেউ সময়ের অভাবে 'মুযাকারা' করতে সম্মত হননি, কারো কারো পক্ষ থেকে দাবির উপর শুধু কিছু সংশয় পেশ করা হয়েছে, তবে দলিলনির্ভর ভিন্ন কিছু প্রমাণ করা হয়নি, কেউ কেউ এ সকল বিষয়ে কথা বলতে 'নাশাত' পাননি এবং কেউ কেউ কোনো পাত্তাই দেননি।

এভাবে দু'তিন বছর পার করার পর যখন কুরআন-সুন্নাহ, ফিকহে ইসলামি এবং আকাবিরে আসলাফের বক্তব্য ও অবস্থানের আলোকে বিষয়গুলোর সমাধানে পূর্ণ "اطمئنان" ও "وثوق" তথা আস্থা ও নির্ভরতার সহিত "شرح الصدر" চিত্ত প্রশান্ত হয়েছে, তখন যুগের চাহিদা, সময়ের দাবি ও শরয়ি দায়িত্ববোধ থেকে

মাসআলাগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়েছে। اللهم! هذه ما اهتديت إليها، وما أردت إلا نصح المسلمين، فإن أصبت فتقبل مني، وإن أخطأت فتجاوز عني।

সুতরাং বড়োদের সঙ্গে কেনো 'মুযাকারা' করা হয়নি; এই প্রশ্ন তোলার সুযোগও নেই এবং প্রয়োজনও নেই। কোনো বিষয়ে আপত্তি হলে সালাফের কর্মপন্থা অনুযায়ী আপত্তিকর বিষয়ে পর্যালোচনা গ্রন্থ বা প্রবন্ধ সামনে আসলে আমিও উপকৃত হবো এবং উম্মাহও সঠিক বিষয় জানতে পারবে। টুকরো টুকরো কথা দিয়ে 'ফেসবুক' বা 'অনলাইন' অঙ্গন সরগরম না করে পর্যালোচনাগুলো গ্রন্থ বা প্রবন্ধাকারে সামনে নিয়ে আসলে ফায়দা ব্যাপক হবে। কারণ, 'ফেসবুক' বা 'অনলাইন' অঙ্গনের কথাগুলোর স্থায়িত্ব থাকে না বা সেগুলোর উপর ততোটা নির্ভরতা তৈরি হয় না।

পাঁচ.

কেউ কেউ এ সকল মাসআলার 'সামারা' বা নগদ 'সামারা' ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এ প্রশ্নের কোনো জটিল বা বাস্তব উত্তরের দিকে আপতত যাচ্ছি না, সময় তা বলে দেবে। শুধু সরল ভাষায় এতোটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করছি- প্রথমত: তাৎক্ষণিক বা নগদ 'সামারা' বিদ্যমান না থাকা সত্ত্বেও আকাবিরে আসলাফ বহু মাসআলার বিবরণ দিয়ে গেছেন এবং হানাফি ফুকাহায়ে কেরাম তা সবচেয়ে বেশি করেছেন।

দ্বিতীয়ত: 'সামারা' যখন সামনে আসবে তখন আর মাসআলা 'তাহকিক' করার সুযোগ পাওয়া যাবে না বা প্রয়োজন হবে না। তাই মাসআলার 'তাহকিক' ও আলোচনার মাধ্যমে মূলত 'সামারা'র পথ সুগম করা হচ্ছে।

কারো কারো মুখে এক্ষেত্রে "أين الناس عنه" এর ব্যবহারও শোনা যায়। এটি খুবই অপ্রাসঙ্গিক ও অনাকাঙ্খিত। এ বিষয়ে লিখতে গেলে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব। তবে এখানেও অল্প শব্দে শুধু এতোটুকু বলছি- প্রথমত: আকাবিরে আসলাফের বিশাল জামাআতের বক্তব্য ও অবস্থানের আলোকে সমাধান পেশ করা মাসআলার ক্ষেত্রে এ বাক্যের উচ্চারণ স্পষ্ট অপাত্রে প্রয়োগ ও পরিপূর্ণ অপব্যবহার। যারা এ মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করেছেন তারাই ভালো করে জানেন, এটি কারা, কেনো, কোন যমানায়, কোন প্রেক্ষিতে, কোন ধরনের মাসআলার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন।

দ্বিতীয়ত: "أين الناس عنه" এর 'তালকিন' চললেও "والناس عنه غافلون" এর 'তালকিন' যথাযথভাবে করা হচ্ছে না। অথচ দুটি বিষয়ই সালাফের যবাননিঃসৃত। প্রত্যেকটিকে যথাস্থানে রাখলে আমাদের কথাবার্তায় বৈপরীত্যগুলো সৃষ্টি হতো না। আপতত এরচেয়ে বেশি কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করছি না।

ছয়.

এই গ্রন্থ জনসাধারণের জন্য রচনা করা হয়নি এবং জনসাধারণ এ সকল জটিল মাসআলা বুঝবেও না, বরং তারা এ ধরনের গ্রন্থ অধ্যয়ন করারও কথা নয়। এই গ্রন্থ রচনা করাই হয়েছে আলেম-তালেবের জন্য এবং তারাই এ গ্রন্থ থেকে উপকৃত হবেন। এ গ্রন্থে সালাফ-খালাফ থেকে উলামায়ে কেরামের; বিশেষকরে উলামায়ে হিন্দ ও উলামায়ে দেওবন্দের যে পরিমাণ উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে, তা থেকে যেকোনো পাঠকের -যদি সাধারণ পাঠকও হয়- উলামায়ে কেরাম, উলামায়ে হিন্দ ও উলামায়ে দেওবন্দের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধাই বৃদ্ধি পাবে। উলামায়ে কেরামের উদ্ধৃতি ব্যতীত কোনো মাসআলার সমাধান পেশ করা হয়নি।

এরপরও কেউ যদি দাবি করেন, এ ধরনের গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য উলামায়ে কেরাম থেকে জনসাধারণকে দূরে সরানো, তাহলে এর চেয়ে দুঃখজনক বিষয় ও বদ যবানি-বদ গুমানি আর কী হতে পারে!!!

এ গ্রন্থের কারণে উলামায়ে কেরাম থেকে জনসাধারণ দূরে সরে যাওয়ার কারণও স্পষ্ট নয় এবং উলামায়ে কেরাম থেকে জনসাধারণকে দূরে সরানোর জন্য গ্রন্থ লেখার ক্ষেত্রে আমার স্বার্থও বুঝতে পারছি না। এর ক্ষতি তো আমাকেও ভোগ করতে হবে। কারণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, অবয়ব, পরিবার এবং ছাত্রজীবনের প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকজীবনের প্রতিষ্ঠান; সবকিছুর বিবেচনায় আমার নিসবতও সেদিকেই। এছাড়াও আত্মসমালোচনা ও সংশোধনের ক্ষেত্রে এ পর্যায়ের দাবি একেবারেই অনুচিত। সুতরাং এ ধরনের অনর্থক মন্তব্য থেকে বিরত থাকাই সবার নিকট কাম্য।

সাত.

এই গ্রন্থে কোন শ্রেণিকে 'তাকফিরে উমুম' করা হয়েছে তা স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে। এরপরও কেউ যদি আমার কথার অপব্যাখ্যা করে, আমার

আলোচনাকে অপাত্রে প্রয়োগ করে এবং তিনে তিনে নয় (?) মিলিয়ে আমার দিকে ভিন্ন কোনো শ্রেণি বা নির্দিষ্ট কাউকে 'তাকফির' করার নিসবত করেন, তা স্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ।

আকাবিরের এক জামাআত কর্তৃক খিলাফত পুনরুদ্ধারের বিশেষ কোনো পদ্ধতিকে যদিও অন্যান্য আকাবিরের বক্তব্য-অবস্থান ও বাস্তবতার আলোকে সহিহ নয় সাব্যস্ত করা হয়েছে, কিন্তু -মাআযাল্লাহ- তাদের কাজকে কুফর আখ্যা দেয়া হয়নি। আর হাজারবার -মাআযাল্লাহ- তাদেরকে 'তাকফির' করার মতো হঠকারিতার তো প্রশ্নই আসে না। বরং 'আমাদের বুযুর্গদের মানহাজের মূল্যায়ন' শিরোনামের অধীনে স্পষ্ট বলা হয়েছে- 'এ ব্যাপারে আমাদের স্বল্প জ্ঞানের সাধারণ মূল্যায়ন হচ্ছে, সে সকল বুযুর্গের ইখলাস ও দ্বীনের প্রতি দরদের ব্যাপারে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। "ولا أزكي على الله أحداً"।' এতো স্পষ্ট কথার পরও যদি কেউ আমার দিকে ভিন্ন কিছুর নিসবত করে, তাহলে সেটির ফয়সালা কিয়ামতের ময়দানে হবে, ইনশাআল্লাহ।

আট.

একটি বিষয় স্পষ্ট করে দেয়া খুবই জরুরি মনে করছি। আমার এই গ্রন্থে আলোচ্য কথাগুলো কোনো বিশেষ পক্ষের তরজুমানি নয় এবং আমিও কোনো বিশেষ পক্ষের তরজুমানি করতে তা রচনা করিনি। সুতরাং শুধু আমার আলোচনায় আসার কারণে এখানের কথাগুলো যেমনিভাবে বিশেষ কোনো পক্ষের দিকে নিসবত করা যথাযথ হবে না, তেমনিভাবে শুধু কোনো কোনো কথায় মিল থাকার কারণে আমাকেও বিশেষ কোনো পক্ষের দিকে নিসবত করা অনুচিত হবে।

আমার ছাত্র এবং যারা আমাকে মুহাব্বত করেন তাদের পক্ষ হতে যখন বারবার এ সকল বিষয়ের শরয়ি সমাধান জানতে চাওয়া হচ্ছিলো, তখন দীর্ঘ 'মুতালাআ' ও 'মুযাকারা'র পর আমার নিকট যা স্পষ্ট হয়েছে তা আমি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছি। আমার সঠিক-ভুল আমার দিকেই নিসবত হবে। আমার দোষে কাউকে দোষারোপ করা যাবে না এবং অন্যের দোষে আমাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না। আমি এই রচনায় কোনো ব্যক্তি, শ্রেণি বা পক্ষের মুখপাত্র নই। আমি ও আমার গ্রন্থের আলোচনাকে এভাবেই বিবেচনা করা সকলের নিকট কাম্য।

নয়.

'ইলমি মুনাকাশা', 'ইলমি নকদ' তথা দলিলনির্ভর পর্যালোচনা এবং দলিলের আলোকে 'ইখতিলাফ' মতানৈক্য নতুন কোনো বিষয় নয়। সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই তা চলে আসছে এবং সর্বযুগেই তা চলমান। পরবর্তী কর্তৃক পূর্ববর্তীর, উস্তায কর্তৃক ছাত্র ও ছাত্র কর্তৃক উস্তাযের, সহপাঠী কর্তৃক অন্য সহপাঠীর, সমসাময়িক কর্তৃক অন্য সমসাময়িকের 'নকদ' পর্যালোচনা এবং একের সঙ্গে অপরের মতানৈক্য; সবই সর্বযুগে চলমান। শরয়ি বিবেচনায় এতে আপত্তির কিছু নেই, বরং দলিলনির্ভর 'ইখতিলাফ'কে রহমত আখ্যা দেয়া হয়েছে। তেমনিভাবে শরিআতের দৃষ্টিতে এগুলো 'আদব' পরিপন্থী কিছু নয়, বরং ক্ষেত্রবিশেষ চুপ করে থাকা 'জুবন' সাহসহীনতা; যা শরিআতে কাম্য নয়।

যাহোক, যে আলেম দলিলের আলোকে কোনো বিষয়কে সাব্যস্ত বা প্রাধান্য দেয়ার যোগ্যতা ও অধিকার রাখেন তার জন্য উচিত শরয়ি যেকোনো বিষয় "على وجه البصيرة" গ্রহণ করা। দলিলের আলোকে যে সমাধান তিনি গ্রহণ করবেন সেটির উপর পূর্ণ "اطمئنان" ও "وثوق" তথা আস্থা ও নির্ভরতার সহিত "شرح الصدر" চিত্ত প্রশান্ত হওয়া প্রশংসনীয় একটি দিক। আর "مشكِّك" সংশয় সৃষ্টিকারীর "تشكيك" সন্দিহান করার কারণে সংশয়ে পড়ে যাওয়া একটি নিন্দনীয় দিক। এসব কথা আপনস্থানে স্বীকৃত। কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে, সেই 'ইতমিনান', 'উসুক' ও 'শারহে সাদর'র জন্য নির্বাচন করা হয়েছে "غرور الاهتداء" নামক এক 'আজিব-গারিব' পরিভাষা। হিদায়াতের উপর অবিচলতা সর্বদা অবশ্যই কাম্য, কিন্তু যেটি কাম্য নয় সেটি হচ্ছে, "بطر الحق وغمط الناس"।

দশ.

'বন্ধ হোক সমালোচনার সকল দরজা'; এমন একটি ভুল, অনর্থক, অবাস্তব ও অযৌক্তিক দাবির প্রবক্তা আমি নই। এটি বন্ধ হওয়ার বিষয় নয়। হাঁ! দাবি হওয়া জরুরি, 'বন্ধ হোক আহলুস সুন্নাহ ওয়ালজামাআতের পারস্পরিক মত, রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতাকে শত্রুতার মাপকাঠি বানানোর সকল দরজা'। থাকুক না হাজারো মত, রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা, কিন্তু

"الأخوة الإسلامية" ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও "الرابطة العلمية" ইলমি সম্পর্ক কিছুতেই নষ্ট হতে দেয়া যাবে না।

কিছু মাসআলায় হয়তো আমাদের পারস্পরিক মতভিন্নতা রয়েছে, কিন্তু হাজারো-লাখো মাসআলায় আমরা এক ও অভিন্ন। আনুষঙ্গিক কিছু মতভিন্নতাকে শত্রুতার মাপকাঠি না বানিয়ে সম্মিলিত শত্রু চিহ্নিত করা সময়ের দাবি। সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফের যুগে মতের ভিন্নতা ও পারস্পরিক মনোদুঃখ সম্মিলিত শত্রুর বিপক্ষে ঐক্যের ক্ষেত্রে সাধারণত বাধা হয়নি। খুবই বেদনাদায়ক হবে, যদি বিপরীত মত, রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গিকে দমন করতে আমরা সম্মিলিত শত্রুর সাহায্য কামনা করি। যে সম্মিলিত শত্রুর সাহায্য নিয়ে আজ আমি বিপরীত মত দমন করছি, সে শত্রুই আগামীকাল একই শিরোনামে আমাকে দমন করবে। মাঝখানে আমাদের অসতর্ক পদক্ষেপে তারা কিছু সুযোগ হাতে পেয়ে যাবে।

ভারত উপমহাদেশে বসবাস করে হিন্দুত্ববাদ ও হিন্দুত্ববাদী ভারতের আগ্রাসনের ব্যাপারে আমরা আর কতোকাল বেখবর হয়ে বসে থাকতে পারবো। তাদের 'মুসলিম নিধন' মিশন এখন ঘোষণা দিয়ে প্রকাশ্য ও ব্যাপকভাবেই চলছে। আমাদের সম্মিলিত শত্রু চিহ্নিত করার সময় কি এখনো হয়নি? নাকি এখনো আমরা বিপরীত মত দমন করতে সম্মিলিত শত্রু ও তাদের দালালদের সহযোগিতা করবো ও সাহায্য কামনা করবো!!!!!!

জেগে উঠুক আমাদের মুসলিম জাতিসত্তাবোধ। নিক্ষেপ করি আমাদের মন-মনন থেকে বস্তা-পচা জাহেলি দেশীয় জাতীয়তাবাদ-সাম্প্রদায়িকতা। আমরা শুধু অখণ্ড ভারত নয়; আমরা চাই অখণ্ড বিশ্ব। তবে তা হবে মুসলিমবিশ্ব, ইনশাআল্লাহ।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.

আবু মুসআব
০২-০৪-১৪৪৪ হি.

১

মানবরচিত আইনের শাসন
ধর্মনিরপেক্ষতা
গণতন্ত্র

মাওলানা আবু মুসআব

অ । র্প । ণ

মাওলানা যুবায়ের হোসাইন -হাফিযাহুল্লাহ-
সত্যকথন ও সাহসী উচ্চারণে ইমাম আযম আবু হানিফা রহ.
ও আকাবিরে দেওবন্দের প্রোজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি

قال الله تعالى: وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً. (سورة النساء، الأية: ١٠٤)

قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخْوَفَ ما أخاف عليكم الأئمة المضلون. (مسند الإمام أحمد، رقم الحديث: ٢٧٤٨٥، سنن أبي داود، رقم الحديث: ٤٢٥٢، جامع الترمذي، رقم الحديث: ٢٢٢٩)

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الحق لا يُعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. (الكشاف للزمخشري، ٥/٥٩٤، تفسير القرطبي، ١/٣٤٠، تفسير البحر المحيط، ٨/١٢٣)

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك. (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، ١/١٢١، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، ٢/٤٠٤، تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، ٤٦/٤٠٩-٤١٠)

قال الحافظ الذهبي (في ترجمة ابن ناجية): بل لو نطق العالم بصدق وإخلاص لعارضه عدة من علماء الوقت، ولمقتوه وجهّلوه. (سير أعلام النبلاء، ١٤/١٦٦)

وقال أيضاً (في ترجمة ابن قتيبة): قلت: هذا لم يصح، وإن صح عنه فسُحقاً له، فما في الدين محاباة. (سير أعلام النبلاء، ١٣/٢٩٨)

وقال أيضاً (في ترجمة ابن سبعين): وينبغي للمرء أن يكون غضبه لربه إذا انتهكت حرماته أكثر من غضبه لفقير غير معصوم من الزلل. (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ٤٩/٢٠٦)

قال الشيخ زاهد الكوثري: ثم إن كل واحد من الأمة فيه ما يؤخذ أو يرد، فمحك الحق هو الحجاج في كل موقف، ومنزلة كل عالم إنما تتبين بقرع الحجة بالحجة، لا بذكر أسماء رجال غير معصومين من الزلل، ولا عصمة لغير الأنبياء عند أهل الحق. (تأنيب الخطيب، ص ٣٨٦)

قال الشيخ أحمد شاكر: ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه، غير موانين ولا مقصرين.

سيقول عني عبيد هذا "الياسق العصري" وناصروه: أني جامد، وأني رجعي، وما إلى ذلك من الأقاويل. فليقولوا ما شاؤوا، فما عبأت يوماً ما بما يقال عني، ولكني قلت ما يجب أن أقول. (عمدة التفسير، ٦٩٧/١)

قال الأستاذ محمد عبد المالك: واعلم أن شرع الله أحق بالغيرة من الغيرة على آحاد الأمة، الذين لم تكتب لهم العصمة. (تقدمة الأحاديث الموضوعة الرائجة، ٦٥/١، الطبعة الأولى)

٢٨١٨- لأجاهدن عداك ما أبقيتني .... ولأجعلن قتالهم دَيداني

٢٨١٩- ولأفضحنهم على رأس الملا .... ولأفرين أديمهم بلساني

٢٨٢٠- ولأكشفن سرائر خفيثٌ على ... ضعفاء خلقك منهم ببيان

٢٦٣٩- موتوا بغيظكم فربي عالم .... بسرائرٍ منكم وخُبث جنان

٢٦٤٠- فالله ناصر دينه وكتابه .... ورسوله بالعلم والسلطان

٢٦٤١- والحق ركن لا يقوم لهَده .... أحد ولو جُمعت له الثقلان

(من نونية الحافظ ابن القيم)

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ..... ويأتيك بالأخبار من لم تُزود

(طرفة بن العبد البكري)

সূচিপত্র

{এক}

الحكم بغير ما أنزل الله

মানবরচিত আইনের শাসন

কিছু সংশয় ও সংশয়গুলোর পর্যালোচনা

প্রথম সংশয়: "جحود" অস্বীকার করার শর্তে শর্তযুক্ত

দ্বিতীয় সংশয়: "كفر دون كفر" তথা কুফরে আসগর

তৃতীয় সংশয়: গ্রহণ করেছে প্রাধান্য দেয়নি

চতুর্থ সংশয়: 'তাকদিমে ই'তিকাদি' প্রয়োজন

পঞ্চম সংশয়: অজ্ঞতার 'ওযর'

ষষ্ঠ সংশয়: 'ইকরাহ'-জবরদস্তির 'ওযর'

সপ্তম সংশয়: ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

অষ্টম সংশয়: জিয়াউর রহমানের ব্যাপারে কী বলা হবে?

নবম সংশয়: এটি একটি 'শায' রায়

{দুই}

العلمانية—ধর্মনিরপেক্ষতা

{তিন}

الديمقراطية-গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের ব্যাপারে একটি পরামর্শ

ভোট প্রদানের ব্যাপারে একটি ফাতওয়া

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামি আইনের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়

কয়েকটি মৌলিক নিবেদন

رب عقوبة أورثت صلاحاً، وقصاص ردع ظلماً، وموت أحيا نفوساً،

وتكفير جدّد إيماناً.

পথিক! একটু দাঁড়াও

বেড়ীর যখন বাঁধ ভেঙ্গে যায় তখন পানির স্রোত ঠেকাতে মুষ্টি মুষ্টি মাটি কোনো কাজে আসে না। তখন প্রয়োজন হয় স্রোতের মুখে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষের সৌধ তৈরি করা। কালক্ষেপণ না করেই তা করতে হয়। তুচ্ছ তুচ্ছ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করেই তা করতে হয়। স্রোতের মুখে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারলে ছোটোখাটো দিকগুলো মেরামত করতে খুব বেশি বেগ পেতে হয় না। কিন্তু তুচ্ছ তুচ্ছ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে কার্যকরী পদক্ষেপগুলো গ্রহণ না করলে সে স্রোত আর কখনো বন্ধ করা যায় না।

চতুর্দিকে ফিতনার জোয়ার। কুফরের কালোসর্প ছোবল মেরে চলছে সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে। 'ইলহাদ' 'যানদাকা' ও 'ইরতিদাদে খফি ও জলি'র ভয়াল থাবায় ক্ষতবিক্ষত সমগ্র বিশ্ব। ইমানচোর ঢুকে পড়েছে ইমানের সুরক্ষিত দুর্গে। ফিতনার বাঁধভাঙ্গা স্রোতে একে একে ভেঙ্গে পড়ছে ইসলামের সুদৃঢ় প্রাচীর। মিথ্যার বজ্রাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে দ্বীনের সুউচ্চ প্রাসাদ। বাতিলের এই স্রোত প্রতিহত করতে প্রয়োজন বাস্তবমুখী পদক্ষেপের। কঠিন কথা, শক্ত হাতের আঘাতে ফিতনার মূল উপড়ে ফেলার চেষ্টাই হবে বর্তমান সময়ে 'হিকমত' ও 'মাসলাহাত'র দাবি। এটিই হবে 'ফিকহে আম', 'আকলে আম' ও 'তাফাক্কুহ'র পরিচায়ক। 'হিকমত', 'মাসলাহাত' ও 'ফিকহে আম'র নামে অন্তঃসারশূন্য কোনো আবদার কখনো এই ফিতনার স্রোতের মুখে

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। বরং তা 'মুদাহানাত' দ্বীনি বিষয়ে শিথিলতা প্রদর্শন করা হবে।

পাঠকের নিকট আমি প্রথমেই দুঃখ প্রকাশ করছি যে, সাহসিকতার অভাবে আমি আকাবিরে আসলাফের যথাযথ অনুসরণ করতে পারিনি। আকাবিরে আসলাফ ফিতনার প্রতিরোধে, বাতিলের মূলোৎপাটনে যে কঠিন কথা বলে, কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করে 'হিকমত' ও মাসলাহাত'র দাবি পূরণ করেছেন, 'তাফাক্কুহ', 'ফিকহে আম' ও 'আকলে আম'র পরিচয় দিয়েছেন, তার আংশিকও আমরা করতে পারছি না। ভুল আকিদা-বিশ্বাস প্রত্যাখ্যানে, ফিতনার প্রতিরোধে আকাবিরে আসলাফের বজ্রকণ্ঠের গর্জন, কলমতীরের আঘাত, কঠিন কর্মপন্থার কিছু নমুনা ভিন্ন শিরোনামে অন্য গ্রন্থে আলোচনা হতে পারে। পাঠক তখন মিলিয়ে দেখবেন আমরা কঠোরতার দৌড়ে আকাবিরে আসলাফ থেকে কতোটা পিছিয়ে রয়েছি।

আমি আমার এই রচনা কোনো জ্ঞানপাপী বা আলেমরূপী জাহেলের কথার প্রত্যুত্তরে রচনা করিনি। দেশ-বিদেশের কোনো কুতবে আলাম (?), কুতবে বাঙ্গাল (?) এবং আমিরুল উমারাদের উদ্দেশ্যে আমি আমার গ্রন্থ রচনা করিনি, যারা নিজেদেরকে ইতোমধ্যে "من دعاة الإلحاد والزندقة" হিসেবে সাব্যস্ত করতে সক্ষম হয়েছে। যাদের 'ইলহাদ' ও 'যানদাকা' একজন সাধারণ আলেমের নিকটও স্পষ্ট হওয়ার মতো। এরপরও কোনো কোনো আলেম বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে তাদের শরিআতের অপব্যাখ্যা ও ইলহাদের বিষয়গুলো কুরআন-সুন্নাহর আলোকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আল্লাহ তাআলা সে সকল আলেমকে 'জাযায়ে খায়র' দান করুন!

আমি আমার এই রচনা ওই সকল 'মুলহিদ'র জবাবে রচনা করিনি, যাদের মতে বর্তমানে সশস্ত্র জিহাদ করা মানে আত্মহত্যা করা। সুতরাং নির্বাচনই হচ্ছে জিহাদ এবং যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে তারা হচ্ছে মুজাহিদ।[১] এছাড়াও যাদের বক্তব্য হচ্ছে, দলিল আর জযবা যখন মুখোমুখি হয় তখন জযবা হয় 'গালেব' আর দলিল হয় 'মাগলুব'।[২]

---

১. (লিংক) https://www.youtube.com/watch?v=iYJIOY0RQ9s

২. https://www.youtube.com/watch?v=Hwy1lzHKjGU&t=71s

আমি আমার এই রচনা "تکفیر أهل الشهادتین" -এর মতো 'সাতহি' অগভীর আলোচনায় ভরপুর গ্রন্থের প্রত্যুত্তরে রচনা করিনি, যে গ্রন্থ অধ্যয়নের পর একজন পাঠক সহজেই ফলাফল বের করবে যে, আদমশুমারি অনুযায়ী মুসলমান ব্যক্তির মুরতাদ হওয়ার কোনো সুরত নেই। লেখক কাউকে মুরতাদ আখ্যায়িত করার জন্য যে সকল শর্ত আরোপ করেছেন সেগুলোর আলোকে বলা যায়, আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে ওহির মাধ্যমে সম্ভব কাউকে মুরতাদ আখ্যা দেয়া অথবা কেউ যদি সুস্পষ্ট ভাষায় বলে যে, 'ইসলামের অমুক অকাট্য বিধানের বাস্তবতা ও সত্যতার ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ এবং অস্পষ্টতা নেই, তা সত্ত্বেও আমি হটকারিতা করে তা মানছি না।' তবেই সম্ভব তাকে মুরতাদ বলা। কারণ এছাড়া 'ইলমুল ইয়াকিন'র কোনো পদ্ধতি তিনি রাখেননি। দ্বিতীয় পদ্ধতিতেও মুরতাদ বলা মুশকিল। কেননা সেক্ষেত্রে তার 'জাহালত' বা 'ইকরাহ'র ওযরের কথা আসতে পারে। সুতরাং কাউকে মুরতাদ আখ্যা দেয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে ওহি ব্যতীত আর কোনো পদ্ধতিই বাকি থাকছে না।

এছাড়াও আমি আমার এই রচনা দেশ-বিদেশের ওই সকল ব্যক্তিত্বের লেখা ও কথার জবাবে রচনা করিনি, যাঁরা 'পরিবর্তিত পৃথিবী' শ্লোগানের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে 'পরিবর্তিত ইসলাম'র রূপরেখা তৈরি করেন। যাঁরা ভুলে গেছেন যে, পরিবর্তিত পৃথিবীতেও ইসলাম অপরিবর্তিত।

আমার এই রচনা আমি ওই সকল আহলে ইলম ও আহল ফিকরের সামনে পেশ করছি, যাঁরা এ দেশকে সর্বক্ষেত্রে ইলমকে মাপকাঠি বানানোর 'উসুল' শিখিয়েছেন। যাঁদের ইলমি অবদান আমার, আমাদের এবং প্রতিটি ইলমপিপাসু তরুণের রক্তে-মাংসে মিশে আছে। যাঁদের প্রতি আমাদের সীমাহীন ভক্তি-শ্রদ্ধা আজো সমানভাবে বিদ্যমান। যাঁদের প্রতি আমাদের অগাধ মুহাব্বত-ভালোবাসার ধারা প্রবহমান। যাঁদের স্নেহময় হাতের শীতল ছোঁয়ায় আমরা এখনো সিক্ত। আমাদের প্রতি যাঁদের ভালোবাসার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন কখনো অনুভব করিনি। দলিলের আলোকে যেকোনো সত্য নিজেদের জন্য স্পষ্ট করতে যাঁদের দরবারে ধর্ণা দিতে আজো কোনো দ্বিধা হয় না। তবে তাঁরা বর্তমান সময়ে সর্বাধিক আলোচিত মাসআলাগুলোর ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো অবস্থান প্রকাশ করছেন না এবং কোনো পক্ষের রচনা বা কথার প্রতি সুস্পষ্ট সমর্থন জ্ঞাপন করছেন না।

মুহতারাম আহলে ইলমের এই কাফেলা আমাদেরকে 'অতি জযবাতি তরুণ' বলতেই পছন্দ করেন। আমাদেরকে এই উপাধিতে ভূষিত করে মুহতারাম মনীষাগণ যাই বুঝাতে চান না কেনো, আমরা কিন্তু সেটিকে 'নেক ফালি' হিসেবে গ্রহণ করছি।

কারণ, নিজেদের ব্যাপারে তরুণ শব্দ শুনলেই আল্লাহ তাআলার কালামে পাকের একটি অংশ মনে আসে- "إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدىً"। মনে আসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের একটি অংশ- "وشاب نشأ في عبادة الله"।[৩] মনে আসে 'জামেয়ে কুরআন'র প্রেক্ষাপটে যায়েদ ইবনে সাবিত রাযি.কে উদ্দেশ্য করে বলা ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক রাযি. -এর বাক্যটি- "إنك شاب عاقل لا نتهمك"।[৪]

এবং মনে আসে ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত উক্তিটি- "ما بعث الله نبياً إلا وهو شاب ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب"।[৫]

আর জযবাতি তথা ইলম অনুযায়ী আমলের প্রতি জযবা বরং অতি জযবাই তো সকলের কাম্য। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআর একটি অংশ হচ্ছে- "اللهم! إني أعوذ بك من علم لا ينفع"।[৬]

---

৩. সহিহ বুখারি –كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين–, পৃ: ৪৭০, হাদিস নং ১৪২৩, সহিহ মুসলিম –كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة–, পৃ: ৪১৯, হাদিস নং ২৩৮০।

৪. মুসনাদে আহমাদ ১/১৩, হাদিস নং ৭৬, সহিহ বুখারি كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن, পৃ: ১২৬১, হাদিস নং ৪৯৮৬। জামে তিরমিযি –أبواب تفسير القرآن عن رسول الله ﷺ، ومن سورة التوبة–, পৃ: ১০৫৫, হাদিস নং ৩৩৬০।

৫. তাফসিরে ইবনে আবি হাতেম –سورة الكهف، تفسير "إنهم فتية آمنوا بربهم"–, পৃ: ২৩৫০, হাদিস নং ১২৭২৪, তাফসিরে ইবনে কাসির سورة الأنبياء، تفسير "قالوا سمعنا فتىً يذكرهم", ৫/২২২।

আলি ইবনে আবি তালেব রাযি. বলেছেন,

"يا حملة العلم! اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمَه عملُه، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملُهم علمَهم". (٧)

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. বলতেন,

"أجهل الناس من ترك ما يعلم، وأعلم الناس من عمل بما يعلم". (٨)

আর জযবাতির শুরুতে অতি শব্দটি মনোবল আরো বাড়িয়ে দেয়। অন্যায়ের মোকাবেলায় অতি জযবাই আল্লাহ তাআলা তাঁর নেক বান্দাদের মাঝে দেখতে চান। কালামে পাকের কয়েকটি অংশ সবসময় মাথায় ঘুরপাক খায়-

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ.....

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ......

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ......

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً......

وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ......

وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ......

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ......

---

৬. সহিহ মুসলিম -كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل-, পৃ: ১১২০, হাদিস নং ৬৯০৬, মুসনাদে আহমাদ ৪/৩৭১, হাদিস নং ১৯৩০৮।

৭. সুনানে দারেমি -كتاب العلم، باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله تعالى-, পৃ: ১৭০, হাদিস নং ৩৯২। (إسناده ضعيف)।

৮. সুনানে দারেমি -كتاب العلم، باب في فضل العلم والعالم-, পৃ: ১৬০, হাদিস নং ৩৪১।

ইত্যাদি ইত্যাদি 'নুসুস' হৃদয়ে প্রশান্তির মাত্রা বৃদ্ধি করে। 'অতি জযবাতি তরুণ' উপাধিকে নিজেদের অবস্থানের চেয়ে বড়ো মনে হয়।

মুহতারাম আহলে ইলম!

আপনাদের প্রশস্ত মানসিকতার কাছে আমরা এ আশা করতে পারি যে, পৃথিবীর বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে আপনারা আমাদের হৃদয়ের কথাগুলো অনুভব করবেন! আমাদের চোখে পানি দেখে যদি আপনাদের চোখে পানি নাও আসে, আমাদের চোখের পানি মুছে দেয়ার মতো সাহসিকতা যদি নাও দেখাতে পারেন, দয়া করে আমাদেরকে বাম হাতে ধাক্কা দিয়ে পেছনে ফেলে দেবেন না।

কতো মাত্রার সমস্যা ও বাস্তবতাকে উপলব্ধি ও অবলোকন করার পর এবং কী পরিমাণ কুরআন-হাদিসের 'নুসুস' ও আকাবিরে আসলাফের মন্তব্য ও অবস্থানের আলোকে আল্লাহ তাআলার দরবারে জবাবদিহিতার বিষয়টি মাথায় আসার পর, এই ঝুঁকিপূর্ণ মুহূর্তেও ঝুঁকিপূর্ণ কথাগুলো বলা আমরা আমাদের জন্য ওয়াজিব মনে করছি; তা যদি ভেবে দেখা আপনাদের কাছে অনর্থকও মনে হয়, তবুও আমরা আপনাদের কাছে "لا تشمت بنا الأعداء" -এর আশা করতে পারি।

মুহতারাম আহলে ইলম!

চলমান মাসআলাগুলোর ব্যাপারে সুস্পষ্ট কথা বলতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই, কারণ-

আমরা জানি, এ কথাগুলো বললেও আমাদের মৃত্যু তখনই আসবে, না বললে যখন আসবে।

আমরা জানি, আমাদের তাকদিরে যা লেখা আছে তা থেকে এক সুতোও এদিক সেদিক হবে না।

আমরা জানি, আমাদের কবরে আমাদেরকে যেতে হবে এবং প্রত্যেকের কবরে প্রত্যেককে যেতে হবে।

আমরা জানি, আল্লাহ তাআলার দরবারে অন্যের কথা বলে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বের দায় এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

আমরা জানি, আমাদের রক্ত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রক্তের চেয়ে বেশি পবিত্র নয় যে তা মাটিতে পড়তে পারবে না।

আমরা জানি, আমাদের প্রাণ সাহাবায়ে কেরামের প্রাণের চেয়ে বেশি মূল্যবান নয় যে তা অপাত্রে (?) বিলিয়ে দেয়া যাবে না।

আমরা জানি, আমাদের প্রাণহীন দেহ ইমাম আবু হানিফার প্রাণহীন দেহের চেয়ে বেশি দামী নয় যে তা জেলখানা থেকে বের হতে পারবে না।

আমরা জানি, আমাদের পিঠ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের পিঠের চেয়ে বেশি সম্মানিত নয় যে তাতে ছড়ির আঘাত আসতে পারবে না।

আমরা জানি, আমাদের (وقار) 'অকার' আকাবিরে দেওবন্দের অকারের চেয়ে বেশি নয় যে শত্রু থেকে পালিয়ে বেড়ানো যাবে না।

সর্বোপরি আমরা জানি, (আল্লাহ হেফাযত করুন) শত্রু হয়তো আমাদের জীবন বিষিয়ে তুলতে পারবে, ইহলীলা সাঙ্গ করে দিতে পারবে, কিন্তু আমাদের জন্য জান্নাত হারাম করতে পারবে না এবং জাহান্নাম ওয়াজিব করতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ।

মুহতারাম আহলে ইলম কাফেলাকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তাআলার দরবারে একটি দুআ সবসময় মনে আসে-

"اللهم! أيد الطائفة المنصورة بهذه الفئة المعدلة"

হে আল্লাহ! আমাদের সবাইকে আপনি হকের উপর একত্রিত করে দিন এবং সত্যকে সবার সামনে স্পষ্ট করে দিন। আমিন।

اللهم! أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.

فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين.

ربنا! لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين.

اللهم! إنا نجعلك في نحورهم ونعوذبك من شرورهم.

اللهم! ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك ﷺ.

اللهم! انصر المسلمين المظلومين والمجاهدين في كل بلاد.

সবকিছুর পরও কখনো যদি নৈরাশ্য অন্তরকে অস্থির করে তুলে, তখন কুরআনে কারিমে উদ্ধৃত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের অবস্থান স্মরণ করে অস্থিরতা দূর করার চেষ্টা করি-

قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا.

আবু মুসআব
০৮-০৯-১৪৩৯ হি.
ঈষৎ পরিমার্জন
০৫-০৪-১৪৪৪ হি.

قال الإمام علاء الدين البخاري الحنفي: إن الأمة ليست عبارة عن المصلين إلى القبلة بل عن المؤمنين، وهو كافر وإن كان لا يدري أنه كافر. (كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي ٣/٣٥٣)

{এক}

الحكم بغير ما أنزل الله

মানবরচিত আইনের শাসন

মানবরচিত আইনের শাসক, বিচারক ও প্রহরী মুরতাদ

মাসআলা: যে সরকার আল্লাহ প্রদত্ত আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করে না; বরং তার বিপরীতে মানবরচিত আইন গ্রহণ বা প্রণয়ন করে সকল নাগরিকের জন্য সেটির বিরোধিতা অপরাধ হিসেবে বিধিবদ্ধ করে দেয় এবং যে সকল বিচারক মানবরচিত আইন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করে এবং যে সকল বাহিনী এই কুফরি আইনের প্রহরী ও বিরোধীদের জন্য খড়্গহস্ত; তারা জন্মসূত্রে মুসলমান হয়ে থাকলেও তাদের কৃতকর্মের কারণে মুরতাদ হয়ে গেছে। মুসলমান হতে হলে তাদেরকে নতুন করে ইমান আনতে হবে।[৯]

---

৯. ক) এই গ্রন্থে আমার দাবি স্পষ্ট। আমি এখানে এবং সামনে ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের আলোচনায় শুধু তিনশ্রেণির (নির্বাহী শক্তি, প্রশাসন ও বিচারবিভাগ) কুফরের কথা বলেছি। সুতরাং কেউ যদি তিনে তিনে নয় (?) মিলিয়ে আমার দিকে জনসাধারণকে 'তাকফির' করার নিসবত করেন, তা স্পষ্ট অপবাদ ও মিথ্যাচার।

এখানে আরেকটি বিষয় মাথায় রেখে সামনে অগ্রসর হওয়া উচিত। আমার দেয়া শিরোনামেও রয়েছে 'মানবরচিত আইনের...' এবং মাসআলা বর্ণনায় আরো 'তাফসিল' করা হয়েছে। এর বিপরীতে খারেজিরা যাদেরকে 'তাকফির' করেছিলো তাদেরকে কেউ কখনো মানবরচিত আইনের শাসক-বিচারক বলেননি। খিলাফত পতনের পূর্ব তথা যতোদিন পর্যন্ত কুরআন-সুন্নাহ মৌলিকভাবে সংবিধান ছিলো, তখনকার কোনো শাসক-বিচারকের ঘুষ বা স্বজনপ্রীতির কারণে শরিআত অনুযায়ী ফয়সালা না করার প্রেক্ষাপট, আর খিলাফত পতনের পর তথা যখন কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক মানবরচিত আইন সংবিধান হিসেবে স্থান পেয়েছে, তখন শাসক-বিচারকদের আল্লাহ তাআলার আইনের বিপরীতে ফয়সালা করার প্রেক্ষাপট; কেউ যদি উভয় প্রেক্ষাপটের মাঝে পার্থক্য করতে না পারেন, তাহলে তিনি হয়তো

দলিল

সাধারণত এ বিষয়ে সুরা মায়েদার ৪৪ নম্বর আয়াত "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" (যারা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফের) কে দলিল হিসেবে পেশ করা হয়।[১০] "ارتداد الحكام بغير ما أنزل الله" (মানবরচিত আইনের বিচারক ও শাসকের 'ইরতিদাদ') প্রমাণের জন্য 'সরিহ'-সুস্পষ্ট এই একটি আয়াতই যথেষ্ট। যদিও এর সমর্থনে

আমার দাবির বিপরীতে সমস্ত তাফসিরের কিতাব থেকে শত শত উদ্ধৃতি পেশ করে আমাকে জাহেল বা খিয়ানতকারী আখ্যা দিতে পারবেন, তবে দিনশেষে তিনি যে আমার দাবি ও দাবির প্রতিটি শব্দ লক্ষ্য করেননি সেটিই প্রমাণিত হবে। মানবরচিত আইনের শাসক-বিচারকদের সাদৃশ্যতা উমাইয়া-আব্বাসি শাসক-বিচারকদের মাঝে নয়; মুফাসসিরিনে কেরাম খারেজিদের কুফরের হুকুম যাদের থেকে প্রতিহত করেছেন, বরং তাদের সাদৃশ্যতা খুঁজে পাওয়া যাবে ইহুদিদের মাঝে; যাদেরকে কেন্দ্র করে দলিলে উল্লিখিত আয়াতটি নাযেল হয়েছে, এবং আরো খুঁজে পাওয়া যাবে 'তাতারি'দের মাঝে; যারা মুখে 'শাহাদাতাইন' উচ্চারণ করলেও 'ইয়াসাক' নামক মানবরচিত সংবিধানের আলোকেই ফয়সালা করতো। সামনে বিষয়গুলো আরো স্পষ্ট হবে, ইনশাআল্লাহ।

খ) এটি স্পষ্ট 'তাকফিরে উমুম' তথা ব্যক্তি নির্দিষ্ট না করে শুধু কোনো মতবাদ, কথা বা কাজ কুফর হওয়ার বিষয় স্পষ্ট করে বলা যে, যারা এমন মতবাদ লালন করে বা এমনটি বলে বা করে তারা কাফের। এটি 'তাকফিরে মুআইয়ান' তথা ব্যক্তিবিশেষকে কাফের বলা নয়; যেক্ষেত্রে 'তাকফির'র প্রতিবন্ধক বিষয়াদি দেখার প্রয়োজন হয়। এ দুয়ের পার্থক্য মাথায় না রেখে কেউ কেউ অনর্থক কিছু ফলাফল বের করে থাকেন যা দুঃখজনক। এ ছাড়াও 'তাকফির'র প্রতিবন্ধক বিষয়াদি থেকে 'জাহালত' ও 'ইকরাহ'র সীমা কী? সেটির আলোচনা সামনে আসছে।

১০. প্রথম সংস্করণেও বলা হয়েছে, সাধারণত এই আয়াতকে দলিল হিসেবে পেশ করা হয়। এটিকে অন্যতম দলিল, সবচেয়ে বড়ো দলিল বা একমাত্র দলিল বলা হয়নি। হাঁ! উক্ত আয়াতকেন্দ্রিক কিছু সংশয় সামনে আসায় অনেক গবেষক আলেম দাবির পক্ষে উক্ত আয়াতের পরিবর্তে অন্যান্য আয়াতকে দলিল হিসেবে পেশ করে থাকেন। তবে সংশয়গুলোর পর্যালোচনার বিষয় সামনে রেখে আমি উক্ত আয়াতকে দলিল হিসেবে নির্বাচন করেছি। এ ছাড়াও সংশয়বাদী কর্তৃক সংশয় সৃষ্টির কারণে যৌক্তিক কোনো দলিলকে পরিহার করা আমি অযৌক্তিক মনে করি।

আরো বহু আয়াত ও হাদিস বিদ্যমান আছে। উসুলে ফিকহের পরিভাষায় যেগুলো "قطعي الثبوت" হওয়ার পাশাপাশি "قطعي الدلالة" -ও বটে। তাই অর্থ ও ব্যাখ্যা করে 'ওযহে ইসতেদলাল' বুঝানোর প্রয়োজন নেই। যদি কোনো ধরনের অস্পষ্টতা মেনেও নেয়া হয়, তা সামনের আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনা

আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি উল্লেখ করে বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি করার প্রয়োজন ছিলো না। তবে ঘটনা থেকে যেহেতু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় প্রতিভাত হয়, তাই পরবর্তিতে আলোচনার সুবিধার্থে পূর্ণ ঘটনাটি উল্লেখ করছি। বিভিন্ন হাদিস ও তারিখের আলোকে ইমাম বাগাবি ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।

ذكر البغوي هذه القصة: بأَنَّ رجلاً وامرأة من أشراف أهل خيبر زنيا وكانا محصنين، وكان حدهما الرجم في التوراة، فكرهت اليهود رجمهما لشرفهما، فقالوا: إن هذا الرجل الذي بيثرب ليس في كتابه الرجم ولكنه الضرب، فأرسلوا إلى إخوانكم من بني قريظة فإنهم جيرانه وصلح له فليسألوه عن ذلك. فبعثوا رهطا منهم مستخفين وقالوا لهم: سلوا مُحَمَّداً عن الزانيين إذا أحصنا ما حدهما؟ فإن أمركم بالجلد فاقبلوا منه، وإن أمركم بالرجم فاحذروه ولا تقبلوا منه، وأرسلوا معهم الزانيين، فقدم الرهط حتى نزلوا على بني قريظة والنضير فقالوا لهم: إنكم جيران هذا الرجل ومعه في بلده وقد حدث فينا حدث، فلان وفلانة قد فجرا وقد أحصنا، فنحب أن تسألوا لنا مُحَمَّداً عن قضائه فيه، فقالت لهم قريظة والنضير: إذاً والله يأمركم بما تكرهون.

ثم انطلق قوم، منهم كعب بن الأشرف وكعب بن أسد وسعية بن عمرو ومالك بن الصيف وكنانة بن أبي الحقيق وغيرهم إلى رسول الله ﷺ، فقالوا: يا مُحَمَّد أخبرنا عن الزاني والزانية إذا أحصنا ما حدهما في كتابك؟

فقال ﷺ: هل ترضون بقضائي؟ قالوا: نعم، فنزل جبريل عليه السلام بالرجم فأخبرهم بذلك، فأبوا أن يأخذوا به.

فقال له جبريل عليه السلام: اجعل بينك وبينهم ابن صوريا، ووصفه له.

فقال لهم رسول الله ﷺ: "هل تعرفون شاباً أمرد أعور يسكن فدك يقال له ابن صوريا؟ قالوا: نعم، قال: فأي رجل هو فيكم؟ فقالوا: هو أعلم يهودي بقي على وجه الأرض بما أنزل الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام في التوراة.

قال: فأرسلوا إليه، ففعلوا فأتاهم، فقال له النبي ﷺ: "أنت ابن صوريا"؟ قال: نعم، قال: وأنت أعلم اليهود؟ قال: كذلك يزعمون، قال: أتجعلونه بيني وبينكم؟ قالوا: نعم.

فقال له النبي ﷺ: "أنشدك بالله الذي لا إله إلا هو، الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام وأخرجكم من مصر، وفلق لكم البحر وأنجاكم وأغرق آل فرعون، والذي ظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى، وأنزل عليكم كتابه وفيه حلاله وحرامه، هل تجدون في كتابكم الرجم على من أحصن؟"

قال ابن صوريا: نعم! والذي ذكرتني به لولا خشية أن تحرقني التوراة إن كذبت أو غيرت ما اعترفت لك، ولكن كيف هي في كتابك يا مُحَمَّد؟ قال: "إذا شهد أربعة رهط عدول أنه قد أدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة وجب عليه الرجم"، فقال ابن صوريا: والذي أنزل التوراة على موسى هكذا أنزل الله عز وجل في التوراة على موسى عليه السلام، فقال له النبي ﷺ: "فما كان أول ما ترخصتم به أمر الله؟"، قال: كنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فكثر الزنا في أشرافنا حتى زنى ابن عم ملك لنا فلم نرجمه، ثم زنى رجل آخر من الناس فأراد ذلك الملك رجمه فقام دونه قومه، فقالوا: والله لا ترجمه حتى يرجم فلان -لابن عم الملك- فقلنا: تعالوا نجتمع فلنضع شيئاً دون الرجم يكون على الوضيع والشريف، فوضعنا الجلد والتحميم، وهو أن يجلد أربعين جلدة بحبل مطلي بالقار ثم يسود وجوههما، ثم يحملان على حمارين ووجوههما من قبل دبر الحمار ويطاف بهما، فجعلوا هذا مكان الرجم، فقالت اليهود لابن صوريا: ما أسرع ما أخبرته به، وما كنا لما أثنينا عليك بأهل ولكنك كنت غائباً فكرهنا أن نغتابك، فقال لهم: إنه قد أنشدني بالتوراة ولولا خشية التوراة أن تهلكني لما أخبرته، فأمر بهما النبي ﷺ فرجما عند باب مسجده، وقال: اللهم إني أول من أحيى أمرك إذا أماتوه، فأنزل اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿يَا

أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ}. (تفسير البغوي، ٥٥/٣، تفسير المظهري، ١٤٠/٣، معارف القرآن للمفتي محمد شفيع، ١٤١/٣)

"খাইবারের অভিজাত পরিবারের দুই বিবাহিত পুরুষ ও মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। তাওরাত অনুযায়ী তাদের 'রজম' পস্তরাঘাতে হত্যার বিধান ছিলো। তাদের আভিজাত্যের কারণে ইহুদিরা তাদেরকে পস্তরাঘাতে হত্যা করতে অপছন্দ করলো। তখন তারা পারস্পরিক আলোচনা করলো যে, ইয়াসরিব-মদিনার এই লোকটির (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিতাবে 'রজম'র বিধান নেই, বরং তাতে প্রহারের কথা আছে। তাই তোমরা তোমাদের স্বজাতি বনি কুরাইযার নিকট সংবাদ পাঠাও তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে। কেননা বনি কুরাইযা তার প্রতিবেশী এবং তার সঙ্গে তাদের সন্ধি রয়েছে। অতঃপর তারা গোপনে তাদের একটি কাফেলাকে প্রেরণ করলো এবং বলে দিলো, তোমরা মুহাম্মাদকে জিজ্ঞাসা করবে যে, ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া দুই বিবাহিত পুরুষ-মহিলার শাস্তি কী? যদি সে প্রহারের কথা বলে তাহলে গ্রহণ করবে, আর যদি 'রজম'র কথা বলে তাহলে বিরত থাকবে এবং গ্রহণ করবে না। তারা তাদের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া দুই পুরুষ-মহিলাকেও পাঠিয়ে দিয়েছে। অতঃপর ওই কাফেলা আগমন করে বনি কুরাইযা ও নাযিরের নিকট আসলো এবং তাদেরকে বললো, তোমরা এই লোকটির প্রতিবেশী এবং তার সঙ্গে তার এলাকায় অবস্থান করছো। আমাদের এখানে একটি ঘটনা ঘটে গেছে। অমুক পুরুষ ও অমুক মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে অথচ দু'জনই বিবাহিত। এজন্য আমরা চাচ্ছি, তোমরা মুহাম্মাদকে এ বিষয়ের ফয়সালা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো। কুরাইযা ও নাযির তাদেরকে বললো, আল্লাহর কসম করে বলছি, সে যে আদেশ দেবে তা তোমরা পছন্দ করবে না।

অতঃপর কা'ব ইবনুল আশরাফ, কা'ব ইবনে আসাদ, সা'ইয়া ইবনে আমর, মালেক ইবনুস সাইফ এবং কিনানা ইবনে আবিল হুকাইক প্রমুখের এক কাফেলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে মুহাম্মাদ! বিবাহিত কোনো পুরুষ-মহিলা যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমার কিতাবে তার কী শাস্তি রয়েছে?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি আমার ফয়সালায় সন্তুষ্ট হবে? তারা বললো, হাঁ! তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম 'রজম'র বিধান

নিয়ে অবতরণ করলেন, আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তা জানিয়ে দিলেন। তখন তারা সেটি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালো।

জিবরাইল আলাইহিস সালাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইবনে সুরিয়ার আকৃতির বিবরণ দিয়ে বললেন, আপনি আপনার ও তাদের মাঝে ইবনে সুরিয়াকে নিযুক্ত করুন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি কেশবিহীন কানা এক যুবককে চেনো যে 'ফাদাক' এলাকায় বসবাস করে, যার নাম ইবনে সুরিয়া? তারা বললো, হ্যাঁ! তিনি আবার তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা তাকে কেমন জানো? তারা বললো, আল্লাহ তাআলা তাওরাতে মুসা আলাইহিস সালামের উপর যা অবতীর্ণ করেছেন, সেটির ব্যাপারে বর্তমানে পৃথিবীর বুকে ইহুদিদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো আলেম সে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, তাকে ডেকে পাঠাও। তারা সংবাদ পৌঁছালো এবং সে আসলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমিই কি ইবনে সুরিয়া? সে বললো, হ্যাঁ! তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ইহুদিদের সবচেয়ে বড়ো আলেম? সে বললো, লোকেরা এমনই ধারণা করে। তিনি ইহুদিদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা কি আমার ও তোমাদের মাঝে ফয়সালা করার জন্য ইবনে সুরিয়াকে নিযুক্ত করবে? তারা বললো, হ্যাঁ!

তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে সুরিয়ার দিকে ফিরে বললেন, আমি তোমাকে ওই আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি যিনি ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই, যিনি মুসা আলাইহিস সালামের উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন, যিনি তোমাদেরকে মিসর থেকে বের করেছেন এবং সমুদ্রকে তোমাদের জন্য বিদীর্ণ করে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন আর ফেরআউনের বাহিনীকে ডুবিয়ে মেরেছেন, যিনি তোমাদের উপর মেঘমালার ছায়া দিয়েছেন ও মান্না-সালওয়া পাঠিয়েছেন এবং যিনি তোমাদের জন্য তাঁর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তাঁর হালাল ও হারাম বিষয়গুলো রয়েছে; সত্য করে বলোতো, তোমাদের কিতাবে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া বিবাহিত পুরুষ-মহিলাকে প্রস্তরাঘাত করে হত্যার বিধানটি কি নেই?

ইবনে সুরিয়া বললো, হ্যাঁ! আপনি যা উল্লেখ করেছেন; যদি মিথ্যা বললে বা বিকৃত করলে তাওরাত আমাকে জ্বালিয়ে দেয়ার ভয় না করতাম, তাহলে আমি আপনার সামনে স্বীকার করতাম না। কিন্তু, হে মুহাম্মাদ! তোমার কিতাবে এই বিধানের বিবরণ কেমন? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন চারজন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, তারা পুরুষের পুরুষাঙ্গকে মহিলার যৌনাঙ্গে এমনভাবে প্রবিষ্ট করতে দেখেছে, যেমনিভাবে সুরমাদানিতে সুরমাদণ্ড ঢুকানো হয়; তখন তার উপর 'রজম' ওয়াজিব হয়ে যাবে। তখন ইবনে সুরিয়া বললো, ওই আল্লাহর কসম করে বলছি যিনি মুসা আলাইহিস সালামের উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন, তাওরাতেও আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামের উপর বিধানটি এভাবেই অবতীর্ণ করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ তাআলার বিধানের বিপরীতে অন্য বিধানের অনুমতিদানের সূচনা কীভাবে হয়েছিলো? ইবনে সুরিয়া বললো, আমরা অভিজাত পরিবারের কেউ ধরা খেলে তাকে ছেড়ে দিতাম আর দুর্বলদের কেউ ধরা খেলে তার উপর শাস্তি আরোপ করতাম। ফলে অভিজাত পরিবারে ব্যভিচার ব্যাপক হয়ে গেলো। এক পর্যায়ে আমাদের এক বাদশাহর চাচাতো ভাই ব্যভিচারে লিপ্ত হলে আমরা তাকে পস্তরাঘাত করে হত্যা করিনি। পরবর্তীতে সাধারণ এক লোক ব্যভিচারে লিপ্ত হলো। ওই বাদশাহ যখন তাকে 'রজম' করতে চাইলো তখন ওই ব্যক্তির গোত্রের লোকেরা সে ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। তারা বললো, আল্লাহর কসম করে বলছি, আপনার চাচাতো ভাইকে 'রজম' করার পূর্বে আপনি আমাদের এই লোককে 'রজম' করতে পারবেন না। তখন আমরা বললাম, আসুন! আমরা সকলেই একত্রিত হয়ে 'রজম'র পরিবর্তে আরেকটি বিধান রচনা করি, যা আমাদের অভিজাত ও সাধারণ সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অতঃপর আমরা বেত্রাঘাত ও মুখ কালোকরণের বিধানটি রচনা করি। আর সেটির পদ্ধতি হলো, আলকাতরার প্রলেপ দেয়া রশি দিয়ে চল্লিশবার প্রহার করা হবে, অতঃপর উভয়ের মুখমণ্ডলকে কৃষ্ণবর্ণ করে চেহারাকে গাধার পাছার দিকে করে দু'টি গাধায় দু'জনকে চড়ানো হবে এবং ঘুরানো হবে। তারা 'রজম'র পরিবর্তে এটিকেই প্রণয়ন করেছে। এতোটুকুর পর ইহুদিরা ইবনে সুরিয়াকে উদ্দেশ্য করে বললো, এ বিষয়ে তাকে অবগত করার ব্যাপারে তুমি তাড়াহুড়া করে ফেলেছো। আমরা যে তোমার প্রশংসা করেছি, আসলে তুমি প্রশংসার উপযুক্ত ছিলে না, কিন্তু তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার সমালোচনা

করাটা আমরা পছন্দ করিনি। ইবনে সুরিয়া তাদেরকে বললো, তাওরাত আমাকে ধ্বংস করে দেয়ার যদি ভয় না করতাম, তাহলে আমি তাকে এ বিষয়ে অবগত করতাম না। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে উভয়কে মসজিদে নববির দরজায় পস্তরাঘাত করে হত্যা করা হলো। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি; যে আপনার একটি বিধানকে যিন্দা করেছে, তারা সেটিকে নিঃশেষ করে দেয়ার পর। তখন আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করলেন, 'হে রাসুল, তোমাকে যেন তারা চিন্তিত না করে, যারা কুফরে দ্রুত ছুটছে।" (তাফসিরে বাগাবি, ৩/৫৫, তাফসিরে মাযহারি, ৩/১৪০, মাআরিফুল কুরআন, ৩/১৪১)

উল্লিখিত ঘটনায় কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়

ক) তাওরাত সত্য কিতাব হওয়ার ব্যাপারে ইবনে সুরিয়ার বিশ্বাস লক্ষণীয়। অন্যায় কথা বলার ক্ষেত্রে তাওরাত তাকে জ্বালিয়ে দেয়ার ভয় পাচ্ছে এবং আল্লাহর নাম নিয়ে কসম দেয়ায় এমন সত্য বলতে প্রস্তুত হয়েছে, যাতে তার সম্প্রদায়ের জন্য অপমান নিহিত ছিলো।

খ) তারা তাওরাতের 'রজম'র বিধান আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে নাযিল হওয়াকে অস্বীকার করেনি। তাওরাতের হুকুমকে গোপন করে সেটির বিপরীতে নিজেদের পক্ষ থেকে আরেকটি বিধান কার্যকর করেছে।

গ) ইহুদি আলেমরা নিজেদের নির্ধারণ করা শাস্তিকে কোনো বিধিবদ্ধের রূপ দেয়নি বা তাওরাতের বিপরীতে কোনো সংবিধান রচনা করেনি। বরং রজমের বিধান তখনও তাওরাতে বিদ্যমান আছে। তাদের পরিবর্তনটা শুধু মৌখিক ছিলো।

ঘ) এ পর্যায়ের অবস্থানের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'যারা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফের'।

আয়াতের ক্ষেত্র নির্ণয়

আরেকটি কথা আমাদের সকলেরই জানা আছে যে, আয়াতটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হলেও হুকুম সবার জন্য ব্যাপক। কারো সন্দেহ থাকলে

তাফসিরের কিতাবাদি দেখে নিতে পারেন।[১১] তবে এক্ষেত্রে ইমাম শা'বির (মৃ-১০৩ হি.) ব্যাখ্যাটি স্পষ্ট।[১২]

---

১১. একটি দীর্ঘ হাদিসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার কারণে কেউ কেউ সংশয়ের শিকার হয়েছেন। সংক্ষিপ্ত বর্ণনাটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ বলেন,

حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن البراء بن عازب، عن النبي ﷺ قوله: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ"، "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ"، "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ"، قال: هي في الكفار كلها.

(مسند الإمام أحمد، ٣٠/٤٩٤، رقم الحديث: ١٨٥٢٩)

উক্ত বর্ণনার আলোকে কেউ কেউ দাবি করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, উল্লিখিত সকল আয়াত শুধু কাফেরদের জন্য প্রযোজ্য। তাই আয়াতগুলোর ব্যাপকতার দাবি করা ভুল।

অথচ এটি একটি দীর্ঘ হাদিসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। বলা যায় সংক্ষেপণটি ত্রুটিযুক্ত (اختصار مخل) হয়েছে। হুবহু উক্ত সনদে ইমাম আহমাদ কয়েকটি হাদিস পূর্বে (১৮৫২৫ নম্বরে) দীর্ঘ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিমসহ অনেক মুহাদ্দিস তা বর্ণনা করেছেন। দীর্ঘ হাদিসটি সামনে রাখলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা নয়, বরং তা বারা ইবনে আযেবের রাযি. বক্তব্য। স্পষ্টতার বিবেচনায় সহিহ মুসলিম থেকে বর্ণনাটি উল্লেখ করছি। ইমাম মুসলিম বলেন,

حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية، قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال: مر على النبي ﷺ بيهودي محمماً مجلوداً، فدعاهم ﷺ فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم! فدعا رجلاً من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال" لا! ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله ﷺ: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر به فرجم، فأنزل الله عز وجل: "يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنْكَ الَّذِينَ

يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ" إلى قوله "إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ" يقول: ائتوا محمداً، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ"، "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ"، "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ"، فى الكفار كلها. (صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، ص ٧٢٦، رقم الحديث: ٤٤٤٠)

আরবি জানা যেকোনো হাদিসের ছাত্রের কাছে এটি স্পষ্ট হবে যে, উল্লিখিত হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইহুদি আলেমের কথোপকথনের পর এখানে দাগটানা অংশটি পুরোই বারা ইবনে আযেবের রাযি. বক্তব্য। সুতরাং শুধু কাফেরদের জন্য প্রযোজ্য হওয়ার কথাটি বারা ইবনে আযেবের রাযি., রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নয়। ইমাম আবু বকর আলজাসসাস 'আহকামুল কুরআনে এটিকে বারা ইবনে আযেবের রাযি. কথা হিসেবেই উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

وقال البراء بن عازب -وذكر قصة رجم اليهود-: فأنزل الله تعالى: يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ -الآيات إلى قوله- وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ، قال: في اليهود خاصة، وقوله: فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ، في الكفار كلهم. (أحكام القرآن، ٩٣/٤)

হাঁ! বারা ইবনে আযেব রাযি. ও ইবনে আব্বাস রাযি. (এক বর্ণনা অনুযায়ী) এমনটি দাবি করলেও ইবনে মাসউদ রাযি., হাসান বসরি ও ইবরাহিম নাখায়ি ব্যাপকতার দাবি করেছেন। তেমনিভাবে হুযাইফা রাযি. বলেছেন, বনি ইসরাইলের জন্য নাযেল হলেও তোমরাও হুবহু সে পথেই চলবে। (দেখুন: আহকামুল কুরআন, জাসসাস, ৪/৯৩)

এছাড়াও আয়াতকে 'জুহুদ' অস্বীকারের শর্তে শর্তযুক্ত বা 'কুফরে আসগর' দ্বারা কুফরের ব্যাখ্যা করা (এ দুটি ব্যাখ্যাও ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে) থেকেও ব্যাপকতার বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। তাফসিরের কিতাবাদি অধ্যয়ন করলে আয়াতগুলো ব্যাপক হওয়ার প্রাধান্যের বিষয়টি যেকোনো পাঠকের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

عن الشعبي أنه قال: نزلت "الكافرون" في المسلمين، و"الظالمون" في اليهود، و"الفاسقون" في النصارى. (تفسير ابن جرير الطبري، ١٠/٣٥٣)

"ইমাম শা'বি বলেন, 'কাফিরুন' অবতীর্ণ হয়েছে মুসলমানের ক্ষেত্রে, 'যালিমুন' ইহুদিদের ক্ষেত্রে আর 'ফাসিকুন' খৃস্টানদের ক্ষেত্রে।"[১৩] (তাফসিরে ইবনে জারির তাবারি, ১০/৩৫৩)

ইবনে জুযাই আলকালবির তাফসিরে ইমাম শাফেয়ির (মৃ-২০৪ হি.) দিকে নিসবত করে এমন ব্যাখ্যা উল্লেখ হয়েছে। ইবনে জুযাই বলেন,

---

১২. ইমাম শা'বির ব্যাখ্যাকে প্রণিধানযোগ্য বা স্পষ্ট বলা হয়েছে। এটিকে একমাত্র ব্যাখ্যাও বলা হয়নি এবং 'জুহুদ' অস্বীকারের শর্তে শর্তযুক্ত বা 'কুফরে আসগর' দ্বারা কুফরের ব্যাখ্যা করাকেও এড়িয়ে যাওয়া হয়নি। বরং সামনে উভয় ব্যাখ্যার পর্যালোচনা উল্লেখ হয়েছে। সুতরাং পূর্ণ আলোচনা না পড়ে কেউ যদি আমার দিকে 'খিয়ানত' বা 'দেখেও না দেখার ভান করা'র অপবাদ দিয়ে থাকেন, তা স্পষ্ট বদ গুমানি হবে। আল্লাহ তাআলা সব ধরনের 'খিয়ানত', 'তাজাহুল' ও বদ গুমানি থেকে আমাদেরকে হেফাযত করুন, আমিন।

১৩. ইমাম শা'বির ব্যাখ্যার বাস্তবতা অনুধাবন না করেই কেউ কেউ হয়তো তাঁর ব্যাখ্যার উপর আপত্তি করতে পারেন। ইবনে মাসউদ রাযি., হাসান বসরি, ইবরাহিম নাখায়ি ও হুযাইফা রাযি.; জাসসাসের উদ্ধৃতিতে যাদের ব্যাখ্যার দিকে পূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে, ইমাম শা'বি তাদের ব্যাখ্যার ব্যতিক্রম কিছু বলেননি। অর্থাৎ আলোচ্য আয়াত যেহেতু ইহুদি কর্তৃক 'কুফরে আকবর'র প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে, তাই মুসলমান কর্তৃক সে পর্যায়ের অবস্থান তৈরি হলে তাও 'কুফরে আকবর'ই হবে। হাঁ! ইমাম শা'বি অতিরিক্ত যা করেছেন তা হচ্ছে, যদিও কুরআনে কারিমে 'ফাসিক' ও 'যালিম' শব্দদ্বয় সাধারণত কাফেরের জন্য ব্যবহার হয়েছে এবং এখানেও তাই হয়েছে। তবে যেহেতু 'ফাসিক' ও 'যালিম' উভয় শব্দ থেকে ভিন্ন অর্থ বুঝার সুযোগ আছে, আর 'কাফির' শব্দ কুফরের অর্থে অনেকটা অকাট্য। তাই তিনি স্পষ্ট করার জন্য 'কাফিরুন' শব্দকে মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। অন্যথায় মূল মাসআলায় ইবনে মাসউদ রাযি. প্রমুখের সঙ্গে তাঁর দাবির কোনো পার্থক্য নেই।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। ইমাম শা'বিকে কিন্তু উক্ত ব্যাখ্যার কারণে 'খারেজি' আখ্যা দেয়া হয়নি।

قال الشافعي: الكافرون في المسلمين، والظالمون في اليهود، والفاسقون في النصارى.
(تفسير ابن جزي الكلبي، ١/٢٣٨)

“ইমাম শাফেয়ি বলেন, ‘কাফিরূন’ অবতীর্ণ হয়েছে মুসলমানের ক্ষেত্রে, ‘যালিমুন’ ইহুদিদের ক্ষেত্রে আর ‘ফাসিকুন’ খৃস্টানদের ক্ষেত্রে’।” (তাফসিরে ইবনে জুযাই আলকালবি, ১/২৩৮)[১৪]

কিছু সংশয় ও সংশয়গুলোর পর্যালোচনা

আলোচ্য বিষয়ে কিছু সংশয় পেশ করা হয়। আমি পর্যায়ক্রমে সেসব সংশয় ও সংশয়গুলোর ব্যাপারে শরিআতের ‘নুসুস’ ও আকাবিরে আসলাফের মন্তব্যের আলোকে কিছু কথা পেশ করছি।

وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب

---

১৪. তাফসিরে ইবনে জুযাই আলকালবির আমাদের দেখা কপিতে এভাবে উল্লেখ হয়েছে। যদি এখানে ইমাম শাফেয়ির উল্লেখ যথাযথ না হয়ে থাকে, তা আলোচ্য বিষয়ে কোনো প্রভাব ফেলবে না। কারণ, আমরা তা শুধু ইমাম শা‘বির ব্যাখ্যার সমর্থন হিসেবে উল্লেখ করেছি। মৌলিকভাবে আমাদের উদ্দেশ্য ইমাম শা‘বির ব্যাখ্যা।

প্রথম সংশয়: "جحود" অস্বীকার করার শর্তে শর্তযুক্ত

উপর্যুক্ত দাবির উপর কেউ কেউ এ বলে আপত্তি করেন যে, মুফাসসিরিনে কেরাম এক্ষেত্রে "جحود" অস্বীকার করার শর্ত যুক্ত করেছেন। মানবরচিত আইনের শাসক ও বিচারকরা কুরআনের আইন বাস্তবায়ন না করলেও তা অস্বীকার করে না। তাই তারা সর্বোচ্চ ফাসেক সাব্যস্ত হবে।

সংশয়ের পর্যালোচনা

'জুহুদ' কি শুধু আন্তরিক অস্বীকারে সীমাবদ্ধ?

কোনো কোনো মুফাসসির অবশ্যই 'জুহুদ' অস্বীকার করার শর্ত যুক্ত করেছেন এবং ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে এমন একটি বর্ণনাও বর্ণিত আছে। তবে বুঝার বিষয় হচ্ছে, 'জুহুদ' সাব্যস্ত হওয়ার জন্য কি 'কালবি জুহুদ' তথা অন্তর থেকে অস্বীকার করা জরুরি; যা 'মুরজিয়া' সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি বা মুখে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করা আবশ্যক? নাকি কখনো কর্ম ও অবস্থানের মাধ্যমেও 'জুহুদ' সাব্যস্ত হয়!

উলামায়ে কেরামের 'আমলি ময়দান'র আলোকে 'জুহুদ'[১৫]

---

১৫. উলামায়ে কেরামের যে বক্তব্যগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে প্রথম সংস্করণেও দাবি করা হয়নি যে তাঁরা এগুলো আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বা 'জুহুদ'র ব্যাখ্যায় বলেছেন। প্রথম সংস্করণেও তাঁদের 'নুসুস'র আলোকে প্রমাণিত দাবি করা হয়েছে। হাদিস ও উলুমুল হাদিস যাদের 'মাশগালা' (বাস্তবিক অর্থে, গতানুগতিক দু'তিন বছর পড়া বা কোথাও উলুমুল হাদিস বিভাগের মুশরিফ হওয়া নয়) তারা ভালো করে জানেন, উলুমুল হাদিসের; বরং যে কোনো বিষয়ের উসুল, কাওয়ায়েদ ও মাসআলার 'তানকিহ' ও গভীরতায় পৌঁছাতে হলে সে বিষয় অনেক কিতাব থেকে পড়ে নেয়াই যথেষ্ট নয়। বরং শাস্ত্রীয় উলামায়ে কেরামের 'আমলি ময়দান' যথাসম্ভব পর্যবেক্ষণ করা জরুরি। আর জানা কথা যে, 'আমলি ময়দান' সাধারণত আলোচ্য উসুল বা মাসআলার অধীনে উল্লেখ থাকে না বা এক স্থানে সব

সালাফ ও খালাফের উলামায়ে কেরামের 'আমলি ময়দান' পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, 'জুহুদ' যেমনিভাবে আন্তরিক ও ভাষ্যে হতে পারে, তেমনিভাকে কর্ম ও অবস্থানের মাধ্যমেও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ তাআলার কোনো বিধানকে কোনো শাসক বা বিচারক নিজের জন্য আবশ্যকীয় মনে না করা এবং শরিআ মোতাবেক ফয়সালা করার বিষয়টিকে হালকা মনে করে সে অনুযায়ী ফয়সালা না করা। আল্লাহ তাআলা ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াঅসাল্লামের বিধানের বিপরীতে 'জুহুদ'র প্রসঙ্গ উল্লেখ ছাড়াই যে সকল কর্ম ও অবস্থানকে উলামায়ে কেরাম কুফর ও ব্যক্তিকে কাফের আখ্যা দিয়েছেন, সেগুলোর ক্ষেত্রে হয়তো বলতে হবে, এ কর্ম ও অবস্থানই 'জুহুদ' অস্বীকার নির্দেশক -যদি 'জুহুদ'র শর্তকে অকাট্য ও সর্বস্বীকৃত দাবি করা হয়- অথবা বলতে হবে, এ পর্যায়ের কুফরি কর্ম ও অবস্থান প্রকাশ পেলে 'জুহুদ'র প্রসঙ্গ টেনে আনার প্রয়োজন নেই। যাই বলা হোক না কেনো; আমাদের দাবি প্রমাণিত। আমরা এখন আকাবিরে আসলাফের 'নুসুস'গুলো দেখতে পারি-

ইসহাক ইবনে রাহুইয়া (মৃ-২৩৮ হি.), আহমাদ ইবনে হাম্বল (মৃ-২৪১ হি.)

قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه..... وأحمد: قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله ﷺ **أو دفع شيئاً مما أنزل الله**..... أنه كافر بذلك وإن كان مقراً بكل ما أنزل الله. (الصارم المسلول لابن تيمية، ٣/٩٥٥، إكفار الملحدين لأنور شاه الكشميري، ص١١٩)

"সমস্ত উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত, যে আল্লাহ তাআলা বা তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়, অথবা **আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত কোনো বিধানকে রদ করে.....**, সে আল্লাহ তাআলার অবতীর্ণ সবকিছু স্বীকার করলেও কাফের।" (আসসারিমুল মাসলুল, ৩/৯৫৫, ইকফারুল মুলহিদিন, পৃ: ১১৯)

জমা করা থাকে না। বরং তা সংশ্লিষ্ট-অসংশ্লিষ্ট, কাছে-দূরে ও সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য; সব স্থান খুঁজে বের করতে হয়। সুতরাং কেউ যদি বক্তব্যগুলো আলোচ্য আয়াতের অধীনে তালাশ করে এবং তালাশ করে না পেয়ে আমার ব্যাপারে ভিন্ন মন্তব্য করে, তা তার অনুধাবনের ভুল।

আবু বকর আলজাসসাস আলহানাফি (মৃ-৩৭০ হি.)

قال الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي (باب وجوب طاعة الرسول تحت "فلا وربك لا يؤمنون..... "): وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئاً من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلّى الله عليه وسلّم، فهو خارج من الإسلام سواء رده من جهة الشك فيه **أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم**، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم. (أحكام القرآن للجصاص، ٣/١٨١)

"এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান, যে আল্লাহ তাআলা বা তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো হুকুম রদ করে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। চাই তা সন্দেহের ভিত্তিতে হোক অথবা **গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা হিসেবে হোক**। এটি যাকাত আদায় থেকে বিরত থাকা ব্যক্তিদের ব্যাপারে মুরতাদ হওয়ার হুকুম দেয়া, তাদেরকে হত্যা করা এবং তাদের সন্তানদের বন্দি করার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থানের সঠিকতা প্রমাণ করে।" (আহকামুল কুরআন, ৩/১৮১)[১৬]

কাযি বাইযাবি (মৃ-৬৮৫ হি.)

قال العلامة البيضاوي: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مستهيناً به منكراً له. فَأُولَئِكَ هُمُ

---

১৬. ইমাম আবু বকর জাসসাস এখানে কর্ম ও অবস্থানের আলোকে 'কুফরে আকবর'র একটি সুরত উল্লেখ করেছেন, আর পরবর্তীতে সুরা মায়েদার আয়াত তথা আমাদের আলোচ্য দলিলের অধীনে 'কুফরে আকবর'র দুটি সুরত উল্লেখ করেছেন; অর্থাৎ আল্লাহর কোনো বিধানকে অস্বীকার করা অথবা ভিন্ন বিধানে ফয়সালা করে সেটিকে আল্লাহর বিধান আখ্যা দেয়া। (দেখুন: আহকামুল কুরআন, ৪/৯৩)। পরবর্তী দুটি সুরতের ব্যাপারে যেহেতু উল্লেখযোগ্য কোনো সংশয় পেশ করা হয় না, তাই এখানে সে দুটি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। যে সুরতের ব্যাপারে কারো কারো সংশয় তৈরি হয়েছে সেটি উল্লেখ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এছাড়াও এখানে উল্লিখিত সুরত যদি ইমাম জাসসাসের দৃষ্টিতে 'জুহুদ' অস্বীকার নির্দেশক হয়, তাহলে তা পরবর্তীতে উল্লিখিত দুই সুরতের প্রথম সুরতের অন্তর্ভুক্ত। তখন এটিকে ভিন্ন সুরত আখ্যা দেয়ার প্রয়োজন হবে না।

الْكافِرُونَ لاستهانتهم به وتمردهم بأن حكموا بغيره. (تفسير البيضاوي، ٢/١٢٨)

"যারা আল্লাহ তাআলার বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে, বিষয়টিকে হালকা জ্ঞান করে সে অনুযায়ী ফয়সালা করলো না, তারা বিষয়টিকে হালকা মনে করায় এবং এর বিপরীতে ফয়সালা করার মতো ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করায় কাফের হিসেবে সাব্যস্ত হবে।" (তাফসিরে বাইযাবি, ২/১২৮)[১৭]

আবুল বারাকাত আননাসাফি আলহানাফি (মৃ-৭১০ হি.)

قال الإمام النسفي الحنفي: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ} مستهيناً به {فأولئك هم الكافرون}. (تفسير النسفي، ١/٤٤٩)

"যারা আল্লাহ তাআলার বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করার বিষয়টিকে হালকা মনে করে সে অনুযায়ী ফয়সালা করলো না, তারা কাফের।" (তাফসিরে নাসাফি, ১/৪৪৯)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (মৃ-৭২৮ হি.)

"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" قال: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة.

---

১৭. কাযি বায়যাবির "منكراً له" শব্দের অর্থ আল্লাহ তাআলার বিধান অস্বীকার করার পরিবর্তে আল্লাহ তাআলার বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করতে অস্বীকৃতি জানানো দ্বারা করেছি; কারণ, তিনি কাফের হওয়ার কারণ হিসেবে বিধান অস্বীকার করাকে উল্লেখ করেননি, বরং বিধান অনুযায়ী ফয়সালা না করাকে উল্লেখ করেছেন। হ্যাঁ! আল্লাহ তাআলার বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করার বিষয়কে হালকা জ্ঞান করে সে অনুযায়ী ফয়সালা না করার মতো ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করা অস্বীকার করার নামান্তর।

وهذا هو الكفر **فإن كثيراً من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار**، وإلا كانوا جهالاً، كمن تقدم أمرهم. (منهاج السنة لابن تيمية، ٥/١٣٠)

"যে আল্লাহ কর্তৃক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদত্ত বিধান মতে ফয়সালা করাকে আবশ্যকীয় মনে করে না, সে নিঃসন্দেহে কাফের। সুতরাং যে আল্লাহর বিধানের অনুসরণ না করে নিজে যেটিকে ন্যায় মনে করে সে অনুযায়ী ফয়সালা করাকে বৈধ মনে করে সে কাফের। কেননা প্রত্যেক জাতিই ন্যায়সঙ্গত ফয়সালা করে এবং তার ধর্মে সেটিই ন্যায়সঙ্গত যা তাদের বড়োরা ন্যায় মনে করে। বরং বহু মুসলমান নামধারী আল্লাহর আইনের পরিবর্তে নিজেদের রীতি-নীতি অনুযায়ী ফয়সালা করে, যেমন যাযাবরদের পূর্বসূরি এবং তাদের অনুসৃত নেতৃবৃন্দ। কিতাব ও সুন্নাহ'র পরিবর্তে এসবের মাধ্যমে ফয়সালা করাকে তারা মুনাসেব মনে করে।

এটিই হচ্ছে কুফর। **কেননা অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাদের নেতাদের নির্দেশিত প্রচলিত রীতি-নীতি মতে ফয়সালা করে। এরা যদি আল্লাহর বিধানের বিপরীত ফয়সালা দেয়া জায়েয নয় জেনেও আল্লাহর বিধানকে আঁকড়ে না ধরে, বরং আল্লাহর আইনের বিপরীত ফয়সালা করাকে বৈধ মনে করে তারা কাফের।** অন্যথায় তারা জাহেল, যেমনিভাবে পূর্বে তাদের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।" (মিনহাজুস সুন্নাহ, ৫/১৩০)

ইবনে আবিল ইয্য আলহানাফি (মৃ-৭৯২ হি.)

قال القاضي ابن أبي العز الحنفي: وهنا أمر يجب أن يتفطن له وهو: أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً ينقل عن الملة وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة، ويكون كفراً: إما مجازياً، وإما كفراً أصغر، على القولين المذكورين. وذلك بحسب حال الحاكم: **فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر.** (شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، ٢/ ٩٥)

"এখানে একটি বিষয় ভালোভাবে বুঝে নেয়া উচিত, আর তা হচ্ছে- আল্লাহ তাআলার বিধান অনুযায়ী ফয়সালা না করা কখনো এমন কুফরের অন্তর্ভুক্ত হয়, যা তাকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। আর কখনো তা কবিরা বা সগিরা গুনাহ হিসেবে ধর্তব্য হয়। উপর্যুক্ত দুই মতানুযায়ী কখনো তা 'কুফরে মাজাযি' বা 'কুফরে আসগর' হয়। মূলত তা বিচারকের অবস্থা অনুযায়ী বিবেচ্য। **যদি আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা আবশ্যকীয় নয় এবং এ বিষয়ে তার জন্য সুযোগ আছে মনে করে, অথবা তা আল্লাহ তাআলার হুকুম হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও সেটিকে হালকা মনে করে, তাহলে এটি কুফরে আকবর।**" (শরহুল আকিদাতিত তহাবিয়্যাহ, ২/৯৫)

মুফতি মুহাম্মাদ শফি (মৃ-১৩৯৩ হি.)

یعني جو لوگ اللہ کے نازل کئے ہوئے احکام کو واجب نہیں سمجھتے اور ان پر فیصلہ نہیں دیتے، بلکہ ان کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، وہ کافر و منکر، جن کی سزا دائمی جہنم ہے۔ (معارف القرآن، ۳/۱۶۱)

"যারা আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত বিধানকে আবশ্যকীয় মনে করে না এবং সে অনুযায়ী ফয়সালা করে না, বরং তা পরিপন্থী ফয়সালা করে, তারা কাফের ও মুনকির। তাদের শাস্তি চিরস্থায়ী জাহান্নাম।" (মাআরিফুল কুরআন, ৩/১৬১)

(ایمان وارتداد کی تعریف)..........اور ایمان اور کفر کی مذکورہ تعریف سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کفر صرف اسی کانام نہیں کہ کوئی شخص اللہ تعالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرے سے نہ مانے۔ بلکہ یہ بھی اسی درجہ کا کفر اور نہ ماننے کا ایک شعبہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احکام قطعی ویقینی طور پر ثابت ہیں ان میں سے کسی ایک حکم کے تسلیم کرنے سے (یہ سمجھتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے) انکار کر دیا جائے، اگرچہ باقی سب احکام کو تسلیم کرے اور پورے اہتمام سے سب پر عامل ہو۔ (جواہر الفقہ، تکفیر کے اصول، ۱/۲۵)

"(ইমান ও ইরতিদাদের পরিচয়)..... ইমান ও কুফরের পূর্বে উল্লিখিত সংজ্ঞা থেকে এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, কুফর শুধু আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না মানার নাম নয়। **বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে সকল বিধি-বিধান সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত; রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধান হিসেবে জানা সত্ত্বেও তা থেকে কোনো একটিকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত না থাকাও এ পর্যায়ের কুফর এবং**

অস্বীকারের একটি দিক। যদিও অন্যান্য সকল বিধি-বিধানকে মেনে নেয়া হয় এবং পূর্ণ গুরুত্বের সহিত সেগুলো অনুযায়ী আমল করা হয়।" (জাওয়াহিরুল ফিকহ, ১/২৫)

মুফতি আব্দুস সালাম চাটগামি (মৃ-১৪৪৩ হি.)

اگر کوئی قاضی یا فیصلہ طلب کرنے والا قرآن وسنت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے یا کرواتا ہے اور وہ اس پر راضی اور خوش ہے، تو پھر غیر شرعی فیصلہ کرنے والا قاضی اور فیصلہ طلب کرنے والا مدعی مؤمن نہیں رہتا۔ (جواہر الفتاوی، ۳/۱۶۳)

"যদি কোনো বিচারক বা বিচারপ্রার্থী কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী ফয়সালা করে বা করায় এবং তাতে সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে শরিআতবিরোধী ফয়সালাদাতা বিচারক এবং বিচারপ্রার্থী ইমানের দাবিদার হতে পারে না।" (জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া, ৩/১৬৩)

মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ

যে ব্যক্তি ইসলামী নীতিমালা ও আদর্শে বিশ্বাসী তাকে যদি কোনো সেক্যুলার রাষ্ট্রের বিচারক বা কাযী নিযুক্ত করা হয় তার ধর্ম কি তাকে শরীয়তের বাইরে গিয়ে কোনো বিচার করার সুযোগ দিবে? তখন তো তিনি অসংখ্য আয়াত ও হাদীসের জেরার মুখে পড়বেন। তিনি কি বলতে পারবেন যে, এই আয়াত ঐ সন পর্যন্ত, ঐ প্রজন্মের জন্য ছিল? **এ রকম করলে সবই ছেড়ে দিতে হবে।** (মাসিক আলকাউসার, ফেব্রুয়ারী ২০১৪, পৃ: ৯)

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক হাফিযাহুল্লাহ

'যারা শরীয়তের শুধু 'শান্তির বিধান গ্রহণ করেন আর জিহাদের বিধানকে সন্ত্রাস বা উগ্রবাদিতা বলেন; উপদেশের কথাগুলো গ্রহণ করেন আর হদ-তাযীর ও কিসাসের বিধান বর্জনীয় মনে করেন; ইবাদতের বিষয়গুলো গ্রহণ করেন আর লেনদেন ও হালাল-হারামের বিধান মানতে অসম্মত থাকেন; ব্যক্তিগত জীবনের বিধিবিধান গ্রহণ করেন, কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্র-পরিচালনার বিধি-বিধান (প্রশাসন, নির্বাহী ও বিচার-বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট) সম্পর্কে বিরূপ থাকেন; অথবা ইবাদত ও লেনদেনের বিধান মানেন, কিন্তু বেশ-ভূষা, আনন্দ-বিষাদ, পর্ব-উৎসব ও জীবন যাপনের আদব কায়েদার ইসলামী নির্দেশ ও

নির্দেশনার প্রতি বিরূপ থাকেন বা মানাকে জরুরী মনে করেন না, **এরা সবাই ইসলামের কিছু অংশের অস্বীকার বা কিছু অংশের উপর বিরুদ্ধপ্রশ্নের কারণে নিজের ঈমান হারিয়ে বসেছেন।'** (ঈমান সবার আগে, পৃ: ৩১)।

'প্রকৃতপক্ষে কোনো তাগূত ব্যক্তি বা দলের বানানো আইন-কানুন হচ্ছে সত্য দ্বীন ইসলামের বিপরীতে বিভিন্ন 'ধর্ম', যা থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা ছাড়া ঈমান সাব্যস্ত হয় না। আল্লাহর বিরুদ্ধে কিংবা আল্লাহর সাথে তাগূতের উপাসনা বা আনুগত্য করা কিংবা তা বৈধ মনে করা, তদ্রূপ আল্লাহর দ্বীনের মোকাবেলায় বা **তার সাথে তাগূতের আইন-কানুন গ্রহণ করা বা গ্রহণ করাকে বৈধ মনে করা সরাসরি কুফর ও শিরক।** তাগূত ও তার বিধি-বিধান থেকে সম্পর্কচ্ছেদ ছাড়া ঈমানের দাবি নিফাক ও মুনাফিকী।' (ঈমান সবার আগে, ৭৩-৭৪)[১৮]

আরব বিশ্বের কয়েকজন শাইখের বক্তব্য

এবার গত শতাব্দীর আরব বিশ্বের কয়েকজন শাইখের বক্তব্য উল্লেখ করছি।

শাইখ আহমাদ শাকের (মৃ-১৩৭৭ হি.)

إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح، لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عذر لأحد ممن ينتسبون للإسلام -كائناً من كان- في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه، وكل امرئ حسيب نفسه.

---

১৮. উস্তাযে মুহতারাম কর্তৃক প্রদত্ত তাগুতের পরিচয় মাথায় রেখে উস্তাযে মুহতারাম বা বা বলে সরাসরি কুফর ও শিরকের যে সুরতগুলো উল্লেখ করেছেন; তা থেকে **'আল্লাহর দ্বীনের সাথে তাগুতের আইন-কানুন গ্রহণ করা সরাসরি কুফর ও শিরক'** সুরতটি সামনে এনে যে কেউ মানবরচিত আইনের শাসকদের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারি এবং ফলাফল বের করার চেষ্টা করতে পারি।

উস্তাযে মুহতারামের বক্তব্যের ব্যাপারে আমি হাজারবার কসম করে বলতে পারবো যে, এটি লেখার সময় 'জুহুদ' অস্বীকার করার শর্তের কথা উস্তাযে মুহতারামের চিন্তার ত্রিসীমানাতেও ছিলো না। যে গ্রন্থটি সাধারণ থেকে সাধারণ পাঠকের হাতে যাবে; এমন একটি গ্রন্থে এমন একটি জটিল হুকুমের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূণ একটি শর্ত (মুখে বা অন্তরে 'জুহুদ' অস্বীকার করার শর্ত) উহ্য রাখা হবে; বিবেক কি এটিকে সমর্থন করবে? এখন যদি এমনটি দাবি করা হয়, তাহলে গ্রন্থ রচনার সমকালীন প্রেক্ষাপট, বাস্তবতা ও বক্তব্যের পূর্বাপর সেটিকে সত্যায়ন করবে না।

ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه، غير موانين ولا مقصرين.

سيقول عني عبيد هذ "الياسق العصري" وناصروه: أني جامد، وأني رجعي، وما إلى ذلك من الأقاويل. فليقولوا ما شاؤوا، فما عبأت يوماً ما بما يقال عني، ولكني قلت ما يجب أن أقول. (عمدة التفسير لأحمد شاكر، ٦٩٧/١)

“এ সকল মানবরচিত আইনের বিষয়টি সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট, আর তা হচ্ছে ‘কুফরে বাওয়াহ’-প্রকাশ্য কুফর। যার ব্যাপারে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা নেই, তার সঙ্গে চলার কোনো সুযোগ নেই এবং কোনো মুসলমান দাবিদারের জন্য -সে যেই হোক না কেনো- সেটি বাস্তবায়ন করা, তার সামনে আত্মসমর্পন করা ও তা স্বীকার করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ‘ওযর’ গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং প্রত্যেকে যেনো সতর্ক হয়ে যায়। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের রক্ষক।

উলামায়ে কেরাম যেনো নির্ভয়ে সত্যকে প্রকাশ করে। যে সকল বিষয় পৌঁছানোর ব্যাপারে তারা আদিষ্ট তা যেনো কোনো ধরনের ত্রুটি ও অবহেলাবিহীন পৌঁছিয়ে দেয়। বর্তমান যুগের ‘ইয়াসাক’র অনুসারী ও সাহায্যকারীরা আমাকে গোঁড়া, পশ্চাদমুখী জাতীয় বহু কথা বলবে। তাদের যা ইচ্ছে তাই বলুক। আমার ব্যাপারে কী বলা হলো আমি সেটির তোয়াক্কা কোনোদিন করিনি। যা বলা আমার জন্য অপরিহার্য তা আমি বলেই দিয়েছি।” (উমদাতুত তাফসির, ১/৬৯৭)

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহিম আলে শাইখ (মৃ-১৩৮৯ হি.)

قال الشيخ مُحَمَّد بن إبراهيم آل الشيخ في رسالته "تحكيم القوانين" -وهو يعد الأحوال التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أكبر-: "الخامس": وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعداداً وإمداداً وإرصاداً وتأصيلاً وتفريعاً وتشكيلاً وتنويعاً وحكماً وإلزاماً ومراجع مستمدات.

فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستمدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ فلهذه المحاكم مراجع، هي: القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة، كالقانون

الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك، فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحتمه عليهم، **فأي كفر فوق هذا الكفر وأي مناقضة لشهادة أن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة.** (فتاوى ورسائل لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ، ١٢/٢٨٩)

"আল্লাহ প্রদত্ত আইনের বিপরীতে বিচার করা যে সকল অবস্থায় 'কুফরে আকবার' হিসেবে সাব্যস্ত হয়, সেগুলো নির্ধারণ করতে গিয়ে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহিম আলে শাইখ তাঁর 'তাহকিমুল কাওয়ানিন' নামক রিসালায় বলেন-

পাঁচ. আর তা প্রস্তুতি, উপকরণ ও পরিকল্পনা, মূল ও শাখা, রূপায়ণ ও শ্রেণিবিন্যাস, কর্তৃত্ব ও বাধ্যকরণ এবং গৃহীত সূত্রের দিক থেকে শরিআতের অবাধ্যতা, ইসলামি বিধি-বিধানের সঙ্গে হটকারিতা, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরোধিতা এবং শরয়ি আদালতের সমকক্ষতা স্থাপনের ক্ষেত্রে (কুফরে আকবরের) সবচেয়ে বৃহৎ, ব্যাপক ও স্পষ্ট প্রকার।

যেমনিভাবে শরয়ি আদালতের বিভিন্ন গৃহীত বিষয় ও উদ্ধৃতিসূত্র আছে, যার সবকটিই আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ থেকে আহরিত, তেমনিভাবে এ সকল আদালতেরও উদ্ধৃতিসূত্র রয়েছে। আর তা হচ্ছে, বিভিন্ন রহিত শরিআত, ফরাসি, মার্কিন ও বৃটিশ ইত্যাদি আইনসহ অন্যান্য বহু বিধি-বিধান এবং শরিআতের দিকে সম্বন্ধকরা বিভিন্ন বিদআতির মতবাদ ইত্যাদির সমন্বয়ে রচিত আইন। এ আদালতই বর্তমানে বহু মুসলিম রাষ্ট্রে দ্বার উন্মোচন করে পূর্ণমাত্রায় প্রস্তুত হয়ে আছে, আর মানুষ দলে দলে সেদিকে ছুটে চলছে। এই আদালতের বিচারকরা মানুষদের মাঝে কুরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধানের বিপরীতে ওই আইনের নীতি অনুসারে বিচার করে, সে অনুযায়ী চলতে তাদেরকে বাধ্য করে, সেটির উপর তাদেরকে ধরে রাখে এবং তা তাদের জন্য আবশ্যকীয় করে দেয়। **তো এই কুফরের চেয়ে মারাত্মক কুফর আর কী হতে পারে এবং এই বৈপরীত্যের পর মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদানের সঙ্গে আর কোন বৈপরীত্য অবশিষ্ট থাকে!"** (ফাতাওয়া ওয়ারাসায়েল, ১২/২৮৯)

শাইখ মুহাম্মাদ আলআমিন আশশানকিতি (মৃ-১৩৯৩ হি.)

وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم، **أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم**. (أضواء البيان لمحمد الأمين الشنقيطي، ٤/١٠٩)

"উপর্যুক্ত 'নুসুস'র আলোকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, যারা শয়তান কর্তৃক তার চেলা-চামুণ্ডাদের মাধ্যমে প্রণীত 'মানবরচিত আইন'র অনুসরণ করে, তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাঁর বান্দা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মাধ্যমে প্রদত্ত শরিআতের সম্পূর্ণ বিপরীত। **মানবরচিত আইনের অনুসারীদের কুফর ও শিরকের ব্যাপারে একমাত্র সে ব্যক্তিই সংশয় প্রকাশ করে, তাদের ন্যায় আল্লাহ তাআলা যার অন্তর্দৃষ্টি বিলুপ্ত করেছেন এবং নুরে ওহির ব্যাপারে দৃষ্টিহীন করে দিয়েছেন।**" (আযওয়াউল বায়ান, ৪/১০৯)

বিচারকদের কুফর

এ ধরনের আরো বহু উদ্ধৃতি রয়েছে যা উল্লেখ করে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করতে চাচ্ছি না। আকাবিরে আসলাফের সবগুলো বক্তব্যের আলোকে একটু ইনসাফের সহিত বিবেচনা করুন; আল্লাহর আইন অনুযায়ী বিচার করাকে নিজেদের জন্য আবশ্যকীয় মনে না করলে যেখানে কাফের হিসেবে সাব্যস্ত করা হচ্ছে, সেখানে মানবরচিত আইনের বিচারকরা শুধু আল্লাহর আইন অনুযায়ী বিচার করাকে নিজেদের জন্য আবশ্যকীয় মনে করছে না; এমন নয়। বরং তার বিপরীত আইনে বিচার করাকে নিজেদের জন্য আবশ্যকীয় মনে করছে। জয়ে খুশি এবং পরাজয়ে হতাশা প্রকাশ করছে।

নির্বাহী শক্তি ও প্রশাসনের কুফর

এতো গেলো বিচারকদের কথা। আর যারা নিজেদেরকে আল্লাহর আসনে বসিয়ে আল্লাহর আইনের বিপরীতে আইন রচনা করে বা অন্যের রচনা করা আইন নিজেদের জন্য পছন্দ করে সে অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করে তথা নির্বাহী শক্তি এবং যারা সে কুফরি সংবিধানের প্রহরী তথা প্রশাসন, তাদের কুফর বুঝানোর জন্য মনে হয় আর বাড়তি কথা বলার প্রয়োজন হবে না।

হাফেয ইবনে কাসিরের (মৃ-৭৭৪ হি.) আলোচনা

পূর্বোল্লিখিত ‘নুসুস’র সাথে হাফেয ইবনে কাসিরের আলোচনাটি আমরা দেখে নিতে পারি-

وقوله تعالى: "أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون" ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى: من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله ﷺ، **فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله،** فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. (تفسير ابن كثير، ٣/٨٦)

“তারা কি তবে জাহেলিয়াতের বিধান চায়? আর বিশ্বাসী কওমের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম?’ আল্লাহ তাআলা এই আয়াতের মাধ্যমে তাঁর প্রত্যেক কল্যাণসমৃদ্ধ ও অকল্যাণবর্জিত অকাট্য বিধান থেকে যে বের হয়ে যায় এবং শরয়ি দলিল ব্যতীত মানবরচিত বিভিন্ন মতবাদ, প্রবৃত্তি ও পরিভাষাসমূহ গ্রহণ করে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। যেমনিভাবে জাহেলি যুগের লোকেরা তাদের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী রচিত বিভিন্ন ভ্রষ্টতা ও মূর্খতা দ্বারা ফয়সালা করতো। এবং যেমনিভাবে তাতারিরা তাদের বাদশাহ চেঙ্গিস খান থেকে সংগৃহীত রাষ্ট্রীয় নীতি অনুসারে বিচার করছে, যে তাদের জন্য ‘ইয়াসাক’ নামক সংবিধান রচনা করেছে। আর তা হচ্ছে, ইহুদিবাদ, খৃস্টবাদ ও ইসলাম ইত্যাদি বিভিন্ন শরিআত থেকে নির্বাচিত অনেকগুলো বিধি-বিধানের সমষ্টিগ্রন্থ। এবং তাতে অনেকগুলো বিধান এমন আছে যা সে শুধু ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি ও খেয়াল-খুশি অনুযায়ী চয়ন করেছে। ফলে তা তার সন্তানদের মাঝে একটি অনুসৃত শরিআত হিসেবে অনুমোদিত হয়ে গেছে, যাকে তারা কিতাবুল্লাহ ও

সুন্নাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করার উপর প্রাধান্য দিচ্ছে। **তাদের থেকে যেই এমনটি করবে সে কাফের, তার সঙ্গে কিতাল ওয়াজিব যতোক্ষণ না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধানের দিকে ফিরে আসে।** কিছু-অনেক কোনো ক্ষেত্রেই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধানের বিপরীত ফয়সালা করা যাবে না।" (তাফসিরে ইবনে কাসির, ৩/৮৬)

ومن توفي فيها من الأعيان: جنكيزخان... وهو الذي وضع لهم الياساق التي يتحاكمون إليها، ويحكمون بها، وأكثرها مخالف لشرائع الله تعالى وكتبه، وهو شيء اقترحه من عند نفسه، وتبعوه في ذلك.

(ثم بعد سطور ذكر بعض الأحكام فيها، ثم قال:) وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، **فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياساق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين.** (البداية والنهاية، ١٣/١٠٧، ١٠٨)

"এবং ৬২৪ হিজরিতে যে সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে চেঙ্গিস খান।... সে তাতারিদের জন্য 'ইয়াসাক' নামক সংবিধান রচনা করেছে যার কাছে তারা বিচারপ্রার্থী হয় এবং সে অনুসারে ফয়সালা করে। যে 'ইয়াসাক'র অধিকাংশ বিধান আল্লাহ প্রদত্ত শরিআত ও প্রেরিত কিতাবাদির বিপরীত। চেঙ্গিস খান নিজ থেকে তা প্রণয়ন করেছে আর তাতারিরা সেটির অনুসরণ করেছে।

(এর কয়েক লাইন পর হাফেয ইবনে কাসির 'ইয়াসাক'র কিছু বিধান উল্লেখ করে বলেন) এ সবকটি বিধানই আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাঁর বান্দা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের নিকট প্রেরিত শরিআতের বিপরীত। তো যেখানে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রেরিত অকাট্য শরিআতকে বাদ দিয়ে কেউ যদি কোনো রহিত শরিআতের কাছে বিচারপ্রার্থী হয় তাকে কাফের আখ্যায়িত করা হয়, তাহলে যে 'ইয়াসাক'র নিকট বিচারপ্রার্থী হয় এবং সেটিকে প্রাধান্য দেয় তার কী হুকুম হবে? যে এমনটি

করবে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমত্যে তাকে কাফের আখ্যায়িত করা হবে।” (আলবিদায়া ওয়াননিহায়া -৬২৪ হিজরির আলোচনা-, ১৩/১০৭, ১০৮)

বাংলাদেশের সংবিধানের কয়েকটি সুস্পষ্ট কুফরি ধারা ও মূলনীতি

উপরিউক্ত আলোচনার পর বাংলাদেশের সংবিধানের কয়েকটি সুস্পষ্ট কুফরি ধারা ও মূলনীতি পড়ে দেখা আবশ্যকীয় মনে করছি। এটা তো জানা কথা যে, বাংলাদেশের আদালত বৃটিশ আইনে পরিচালিত হয়ে আসছে। রাষ্ট্রকর্তৃক যিনা[১৯], রিবা[২০] ও মদের[২১] বৈধতা, অপরদিকে ফাতওয়াকে শুধুমাত্র তাদের দৃষ্টিতে ধর্মীয় বিষয়াদির সঙ্গে সীমাবদ্ধ করে দেয়া; তাও আবার স্বেচ্ছায় গ্রহণ

---

১৯. যৌনকর্মী: স্বাধীনভাবে জীবিকা বেছে নেয়ার সুযোগে বাংলাদেশে যারা আভিধানিক অর্থে গণিকা তারা আনুষ্ঠানিকভাবে পতিতা বা নটি নামে অভিহিত না হয়ে পেশাজীবী যৌনকর্মী (পেযৌক) হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে।.......... রাষ্ট্র গণিকালয়ে পেযৌকদের যৌনকর্ম নিয়ন্ত্রণ-লক্ষ্যে তাদের নাম নিবন্ধন করে এবং তাদেরকে সুনির্দিষ্ট (নিষিদ্ধ) এলাকায় বসবাসে সীমাবদ্ধ রাখে। এসব বসতিস্থল, সাধারণত নটি পাড়া বা বেশ্যা পাড়া নামে পরিচিত। যৌনকর্মীকে নিবন্ধিত হবার আগে গণ লেখ্য-প্রমাণিকের (নোটারি পাবলিক) মাধ্যমে প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হলফনামা (এফিডেবিট) দিয়ে **অনুমতিপত্র নিতে হয়**। (বাংলাপিডিয়া, যৌনকর্মী)

২০. ধারা-১৫৭: **কতিপয় ক্ষেত্রে কোম্পানী কর্তৃক মূলধন হতে সুদের টাকা পরিশোধের ক্ষমতা:** যে ক্ষেত্রে কোন ইমারত বা অন্যবিধ নির্মাণকার্য অথবা দীর্ঘায়িত সময়ের জন্য লাভজনক করা যায় না এমন কোন স্থাপনার (plant) ব্যয় নির্বাহের জন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কোন কোম্পানী শেয়ার ইস্যু করে, সে ক্ষেত্রে কোম্পানী, উক্ত শেয়ার ইস্যুর সময় পর্যন্ত পরিশোধিত মূলধনের উপর এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, **সুদ পরিশোধ করিতে পারিবে; এবং উক্ত সুদকে নির্মাণকার্য বা স্থাপনার ব্যয়ের অংশ ধরিয়া মূলধনের উপর চার্জ সৃষ্টি করিতে পারিবে**।..... (কোম্পানী আইন, ১৯৯৪, ১৮ নং আইন)

২১. মাদক (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৯০: এ আইনে এ্যালকোহল ব্যতীত যেকোন ধরনের মাদকদ্রব্যের চাষ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বহন, স্থানান্তর, আমদানি, রপ্তানি, সরবরাহ, ক্রয়, বিক্রয়, হস্তগতকরণ, সংরক্ষণ, মজুতকরণ, প্রদর্শন এবং ব্যবহারকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।..... **অবশ্য যেকোন ধরনের মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবহার, বহন এবং স্থানান্তরের জন্য লাইসেন্স, অনুমতিপত্র, বা ছাড়পত্রধারী ব্যক্তিদের বেলায় এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে না। তবে বৈধ লাইসেন্স, অনুমতিপত্র বা পাশ ছাড়া এ নিষেধাজ্ঞাসমূহ ভঙ্গ করা দণ্ডনীয় অপরাধ.....**। (বাংলাপিডিয়া, ফৌজদারি দণ্ডবিধি)

করার অধিকার[২২] প্রদানসহ মৌলিক ও শাখাগত হাজারো বিষয়ে শরিআতের বিপরীতে সুস্পষ্ট অবস্থান বিধিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। যে সকল আইনকে বাহ্যত শরিআতবিরোধী মনে হয় না; সেগুলোকে এজন্য গ্রহণ করা হয়নি যে তা শরিআতসম্মত, বরং সেগুলোকে এজন্য গ্রহণ করা হয়েছে যে তা গণতন্ত্র ধর্মের বিপরীত নয়। তো ওই সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য আরেকটি রচনার প্রয়োজন। আমি এখানে শুধুমাত্র সংবিধানের সুস্পষ্ট কয়েকটি মৌলিক কুফরি ধারা উল্লেখ করছি; যেনো উপর্যুক্ত আলোচনার সঙ্গে কুফরি ধারাগুলো মিলিয়ে পাঠকের জন্য ফলাফল বের করা সহজ হয়।

ক) আইন প্রণয়নের অধিকার মানবের হাতেঃ

ধারাঃ ৭। (১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে। (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান -পঞ্চদশ সংশোধন আইন ২০১১- প্রথম ভাগ, প্রজাতন্ত্র, পৃঃ ৩)

খ) চারটি কুফরি মতবাদ রাষ্ট্র পরিচালনার মহান আদর্শ ও মুলনীতিঃ

'আমরা অঙ্গিকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলো-**জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।'** (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান -পঞ্চদশ সংশোধন আইন ২০১১- প্রস্তাবনা, পৃঃ ১)

ধারাঃ ৮। (১) **জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা-এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।** (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান -পঞ্চদশ সংশোধন আইন ২০১১- দ্বিতীয় ভাগ, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, পৃঃ ৪)

গ) রাষ্ট্র থেকে ধর্ম বিয়োজিতঃ

---

২২. ..... ধর্মীয় বিষয়াদিতে শুধু সঠিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ফতোয়া দিতে পারবেন, **যা শুধু স্বেচ্ছায় গ্রহণযোগ্য।** কোনো ধরনের শক্তি প্রয়োগ বা **অনুচিত প্রভাব প্রয়োগ করা যাবে না।** (দৈনিক ইনকিলাব, ২৮ জানুয়ারি, বুধবার ২০১৫ ইং)

ধারাঃ ১২। ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য

(ক) সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা,

(খ) **রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান,**

(গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার,

(ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন, বিলোপ করা হইবে।

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান -পঞ্চদশ সংশোধন আইন ২০১১- দ্বিতীয় ভাগ, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, পৃঃ ৪)

ঘ) ঐক্য ও একক সত্তার ভিত্তি ইসলাম নয়, বরং ভাষা ও সংস্কৃতিঃ

ধারাঃ ৯। ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, **সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি**। (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান -পঞ্চদশ সংশোধন আইন ২০১১- দ্বিতীয় ভাগ, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, পৃঃ ৪)

ঙ) ইসলাম ও সকল কুফরি ধর্ম সমমর্যাদারঃ

ধারাঃ ২ক। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, **তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন**। (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান -পঞ্চদশ সংশোধন আইন ২০১১- প্রথম ভাগ, প্রজাতন্ত্র, পৃঃ ২)

চ) মুরতাদ হওয়া ও কুফর প্রচার অনুমোদিতঃ

ধারাঃ ৪১। (১) (ক) **প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে**। (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান -পঞ্চদশ সংশোধন আইন ২০১১- তৃতীয় ভাগ, মৌলিক অধিকার, পৃঃ ১২)

উপরোল্লিখিত কুফরি ধারাগুলো প্রস্তাবনা, প্রথমভাগ, দ্বিতীয়ভাগ ও তৃতীয়ভাগের বিধানাবলী; যেগুলো সবসময়ের জন্য অপরিবর্তিত। আমরা নিচের ধারাটি দেখতে পারি-

ধারাঃ ৭খ। সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হইবে। (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান -পঞ্চদশ সংশোধন আইন ২০১১- প্রথম ভাগ, প্রজাতন্ত্র, পৃঃ ৩)

এই কুফরি সংবিধান সংরক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতি-মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, প্রধান বিচারপতি বা বিচারক, প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা নির্বাচন কমিশনার, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য - প্রত্যেকের শপথ বাক্যে আছেঃ '**.......আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব।**' (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান -পঞ্চদশ সংশোধন আইন ২০১১- তৃতীয় তফসিল, ১৪৮ অনুচ্ছেদ, শপথ ও ঘোষণা, পৃঃ ৬৫-৬৮)

দ্বিতীয় সংশয়: "كفر دون كفر" তথা কুফরে আসগর

আলোচ্য দাবির উপর কেউ কেউ এ বলে আপত্তি করেন যে, উল্লিখিত আয়াতে 'কুফরে আকবর' উদ্দেশ্য নয়, বরং কুফর দ্বারা "كفر دون كفر" তথা 'কুফরে আসগর' উদ্দেশ্য। যেমনটি ইবনে আব্বাস রাযি.সহ অনেকেই বলেছেন।

সংশয়ের পর্যালোচনা

"كفر دون كفر" এর ক্ষেত্র

বিষয়টি একটু ভালোভাবে বুঝা উচিত। পূর্বেও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত 'কুফরে আকবর'র প্রেক্ষাপটেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহর বিধানের বিপরীতে ইহুদিদের অবস্থান 'কুফরে আকবর'ই ছিলো। আয়াতকে ইহুদিদের জন্য নির্দিষ্ট বলা বা 'জুহুদ'র শর্তের কথা বলা এটির প্রমাণই বহন করে। ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে এ দুটি তাফসিরও বর্ণিত আছে। হ্যাঁ! একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে তিনি আয়াতের মূল 'মাহমাল' ক্ষেত্রের পাশাপাশি আরেকটি আনুষঙ্গিক 'মাহমাল' ক্ষেত্র দেখিয়েছেন।

ইবনে আব্বাস রাযি. এর বক্তব্যের প্রেক্ষাপট

"كفر دون كفر" তথা 'কুফরে আসগর' দ্বারা আয়াতের তাফসির ইবনে আব্বাস রাযি. কোন প্রেক্ষাপটে করেছেন এবং কাদের মোকাবেলায় বলেছেন? তা আমরা দেখতে পারি।

قال ابن أبي حاتم: حدثنا مُحَمَّد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، ثنا سفيان عن هشام بن جحير عن طاووس عن ابن عباس في قوله: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" قال: ليس هو

بالكفر الذي يذهبون إليه. (تفسير ابن أبي حاتم ١١٤٣/٤، رقم الحديث: ٦٤٣٤، المستدرك للحاكم، كتاب التفسير، تفسير سورة المائدة، ٤٢٧/٢، رقم الحديث: ٣٢٦٩)

"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, এটি ওই কুফর নয় যা তারা ব্যক্ত করে।" (তাফসিরে ইবনে আবি হাতেম ৪/১১৪৩, হাদিস নং: ৬৪৩৪, মুসতাদরাকে হাকেম, ২/৪২৭, হাদিস নং: ৩২৬৯)

ইবনে আব্বাস রাযি. يذهبون বলে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এবং তাদের অবস্থানকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। উমাবি খিলাফতকালে সর্বত্র যখন আল্লাহর আইনই প্রতিষ্ঠিত, শরিআত কর্তৃক নির্ধারিত হুদুদ-কিসাসই যখন কার্যকর হচ্ছিলো, তখন কোনো কোনো গভর্নর বা কাযি নিজেদের নফসের বা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আল্লাহর আইন অনুযায়ী হুকুম দেয়া তার জন্য আবশ্যকীয় জেনেই কখনো খেলাফে শরিআত ফয়সালা করে বসতো। এতেই খাওয়ারেজ সম্প্রদায় উল্লিখিত আয়াতটির অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে তাদেরকে কাফের আখ্যা দিতে লাগলো। তাদের এই অবস্থানকে প্রত্যাখ্যান করতে গিয়েই ইবনে আব্বাস রাযি. আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন-এটি কুফরে আসগর তথা ওই গভর্নর বা কাযি ফাসেক হবে কাফের নয়।[২৩]

---

২৩. এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় মনে রাখা উচিত; সামনে উদ্ধৃত শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সায়িদ আলকাহতানির আলোচনা থেকেও বিষয়টি স্পষ্ট হবে। তা হচ্ছে, ইবনে আব্বাস রাযি.সহ যাঁরা 'কুফরে আসগর' দ্বারা আয়াতের তাফসির করেছেন, তাঁদের সামনে শুধু কোনো কোনো মুসলিম শাসক বা কাযির ঘুষ, স্বজনপ্রীতি বা সুপারিশ ইত্যাদির কারণে শরিআত পরিপন্থী ফয়সালা করার চিত্র ছিলো। তাঁদের কল্পনাতেও ছিলো না যে, একসময় নামধারী মুসলিম শাসক ও বিচারকদের অবস্থা ইহুদিদের অবস্থানকেও অতিক্রম করে যাবে। অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী সংবিধান অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা কায়েম হবে; শুধু তাই নয় বরং কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী শাসন করার উপর নিষেধাজ্ঞা থাকবে এবং তা অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হবে। সুতরাং পরবর্তী অবস্থা যেটির ধারণা পূর্ববর্তীদের ছিলো না; সে অবস্থাকে তাঁদের তাফসিরের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া খুবই দুঃখজনক। ফিকহ ও ইফতা যাদের 'মাশগালা', তাদের একটি 'উসুল' জানা আছে। 'উসুল'টি হচ্ছে,

কুফরে আকবর ও কুফরে আসগরের ক্ষেত্র

বুঝা গেলো, যে কারো ক্ষেত্রে ইবনে আব্বাস রাযি. এর তাফসির পেশ করে দেয়া সহিহ নয়। সহিহ কথা হচ্ছে, আয়াতটি মৌলিকভাবে 'কুফরে আকবর'র জন্য অবতীর্ণ হলেও সেটির একটি আনুষঙ্গিক ক্ষেত্র 'কুফরে আসগর'ও। অর্থাৎ আয়াতটি উভয় কুফরকে শামিল করে। সেটি বিবেচনা হবে রাষ্ট্রীয় আইনের ব্যবস্থাপনা ও বিচারকের অবস্থানুযায়ী। পূর্বোল্লিখিত আকাবিরে আসলাফের 'নুসুস' থেকেও তা স্পষ্ট। ইবনে আবিল ইয্য আলহানাফি তা ব্যাখ্যা করেই বলেছেন। হাফেয ইবনুল কাইয়িম (মৃ-৭৫১ হি.) এ মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين، الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مخير فيه، مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. (مدارج السالكين لابن القيم، الكفر الأكبر، ٢٥٩/١)

"সহিহ কথা হচ্ছে, আল্লাহ প্রদত্ত বিধান পরিপন্থী ফয়সালা করা বিচারকের অবস্থাভেদে 'কুফরে আকবর' ও 'কুফরে আসগর' উভয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

عبارات الفقهاء في كتبهم مبنية على ما أمكن تصوره في زمانهم، فقد يذكرون ألفاظاً عامة تشتمل بظاهرها أحوالاً استجدت بعدهم، ولم تكن متصورة في عهدهم، فلا يمكن أن نقول: إنهم حكموا على هذا الوضع الجديد بالألفاظ العامة التي استخدموها عند بيان الحكم، فإن عبارات الفقهاء محدودة في إمكانياتهم ومقتضى استقصاءهم واستقراءهم في عهدهم، فمن الممكن أن يكون الفقهاء قد استعملوا كلمة حسب استقراءهم أحوال زمانهم، ولم يتخيلوا ما سيحدث في الأزمنة الآتية، بحيث لم تستوعب عباراتهم هذه الحوادث المستقبلة، فربما يتوهم من عموم ألفاظهم حكم للحوادث المستقبلة، ولكنهم لم يقصدوها لكونها غير متصورة في عهدهم. (أصول الإفتاء للمفتي تقي العثماني، ص ٣٠٨)

উল্লিখিত 'উসুল' ও উদাহরণসহ 'উসুল'র ব্যাখ্যা আমরা মুফতি তাকি উসমানি -হাফিযাহুল্লাহ- এর কিতাব 'উসুলুল ইফতা' (পৃ: ৩০৮-৩১০) থেকে দেখে নিতে পারি।

বিচারক যদি কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী বিচার করার অপরিহার্যতার বিশ্বাস রেখেই অবাধ্যতা করে তা থেকে সরে যায়, অথচ সে স্বীকার করে যে সে এ কারণে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে, এটি হবে কুফরে আসগর। আর যদি সে মনে করে যে, এটি তার জন্য আবশ্যকীয় নয় এবং তার ইচ্ছার অধিকার আছে, অথচ সে নিশ্চিত যে তা আল্লাহর বিধান, তাহলে এটি হবে কুফরে আকবর।” (মাদারিজুস সালেকিন, ১/২৫৯)

ইতিহাসের সাক্ষ্য

আমরা একটু পেছনে ফিরে যাই। ১৯২৪ খৃস্টাব্দে উসমানি খিলাফত পতনের আগ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে হাজারো যুলুম-অত্যাচার, অন্যায়-অবিচার হওয়া এবং শেষদিকে এসে খিলাফতের ব্যবস্থাপনা ভঙ্গুর হয়ে পড়া সত্ত্বেও খিলাফতের পক্ষ হতে হুদুদ-কিসাস ইত্যাদির ক্ষেত্রে শরয়ি আইন বলবৎ ছিলো, জিহাদি কাফেলা ছিলো, ছিলো 'রিবাত'র ব্যবস্থাও। শরয়ি আইনের বিপরীত কোনো মানবরচিত আইন বিধিবদ্ধ হয়নি। সে সময়ে কোনো কাযি নিজে গোনাহে লিপ্ত হচ্ছে জেনেই ধোঁকায় পড়ে কখনো শরিআতের বিপরীত ফয়সালা করলে উলামায়ে কেরাম তাকে ফাসেক হওয়ার ফাতওয়া দিয়েছেন। এর বিপরীতে শাসক কর্তৃক 'ইয়াসাক'র মতো যখনই কোনো মানবরচিত সংবিধান তৈরি হয়েছে, তখনই উলামায়ে কেরাম তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব হওয়ার ফাতওয়া দিয়েছেন। যেমনটি ইতোপূর্বে ইবনে কাসিরের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ হয়েছে।

এখন একটু বিবেচনা করি; আমাদের দেশসহ কথিত মুসলিম বিশ্বের সরকার ও বিচার ব্যবস্থাপনা কোন প্রকারে পড়বে! যেখানে কুরআন-সুন্নাহর বিপরীতে মানবরচিত আইন গ্রহণ বা প্রণয়ন করা হয়েছে, আল্লাহর দেয়া শরিআতের সঙ্গে বিদ্রোহ করে তাগুতের আইনে সংবিধান তৈরি করা হয়েছে, শরয়ি বিধান মতে ফয়সালা দেয়ার কোনো সুযোগ রাখা হয়নি, আল্লাহর আইন অনুযায়ী বিচার করা আবশ্যকীয় মনে করা তো দূরের কথা; বরং তার বিপরীতে মানবরচিত আইনে ফয়সালা করাকে বিচারকরা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করছে, তখন এটি কোন প্রকারে পড়বে? কথিত মুসলিম বিশ্বের সংবিধান ও তাতারিদের 'ইয়াসাক'র মাঝে পার্থক্য কোথায়?

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সায়িদ আলকাহতানির একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

এ সংক্রান্ত মক্কা মুকাররমার প্রসিদ্ধ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সায়িদ আলকাহতানির আলোচনাটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ-

قال مُحَمَّد بن سعيد القحطاني: **(تعليق لا بد منه)** في النص المتقدم بعض العبارات التي قد توهم بعض الناس في قضية (الحاكمية) حيث ذكر ابن القيم أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر. وهنا لا بد من إيضاح هذه القضية حتى يزول ما قد يحصل من إشكال.

إن المجتمع الإسلامي منذ قيامه على يد رسول الله ﷺ قد قام على الحكم بشريعة الله، ومضى على ذلك خلفاؤه الراشدون، ثم الخلفاء الأمويون مضوا على ذلك وإن كان بدر منهم بعض الانحرافات، إلا أن الحكم الذي يتحاكمون إليه الناس هو شرع الله، يظلهم برايته ويرعاهم بحكمته وعدالته. ثم جاءت الدولة العباسية وكان الشرع أيضاً هو نظام الحكم مع وجود ثغرات قوية بعض الشيء. ثم جاء التتار، وأتى (هولاكو) بـ (الياسق) –وسيرد كلام العلماء بخصوصه في مكانه المناسب إن شاء الله–

ولما كان الأمر كذلك فإن كلام السلف ومنهم ابن القيم كلام لا غبار عليه، فإذا حكم الحاكم برشوة أو لقرابة، أو شفاعة أو ما أشبه ذلك فلا شك أن ذلك كفر دون كفر.

وأما ما جد في حياة المسلمين –ولأول مرة في تاريخهم– وهو تنحية شريعة الله عن الحكم ورميها بالرجعية والتخلف وأنها لم تعد تواكب التقدم الحضاري، والعصر المتطور. **فهذه ردة جديدة في حياة المسلمين. إذ الأمر لم يقتصر على تلك الدعاوى التافهة، بل تعداه إلى إقصائها فعلاً عن واقع الحياة واستبدال الذي هو أدنى بها، فحل محلها القانون الفرنسي أو الإنجليزي أو الأمريكي أو الاشتراكية الإلحادية وما أشبه ذلك من تلك النظم الجاهلية الكافرة.** (الولاء والبراء في الإسلام لمحمد بن سعيد القحطاني، ص٦٨)

“(অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যালোচনা) উপর্যুক্ত বক্তব্যের কিছু বাক্য ‘হাকেমিয়্যাত’ বিষয়ে কারো মনে সংশয় সৃষ্টি করতে পারে। কেননা হাফেয ইবনুল কাইয়িম বলেছেন যে, আল্লাহ প্রদত্ত বিধান পরিপন্থী ফয়সালা করা কুফরে আসগার। এখানে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা প্রয়োজন, যেনো সৃষ্ট সন্দেহ দূর হয়ে যায়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠালাভের পর থেকে তা আল্লাহর শরিআতের উপরই অবিচল ছিলো। এ অবস্থার উপরই খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগ অতিবাহিত হয়েছে। অতঃপর উমাবি খুলাফারাও এভাবে চলেছে, যদিও তাদের থেকে বিভিন্ন বিচ্যুতি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু যে সংবিধানের কাছে তারা বিচারপ্রার্থী হতো তা আল্লাহর বিধি-বিধানই ছিলো। আল্লাহর শরিআতের পতাকাতলে তাদেরকে আশ্রয় দিতো এবং শরিআতের হিকমত ও ইনসাফের মাধ্যমে তাদেরকে পরিচর্যা করতো। অতঃপর আব্বাসি খিলাফতের সূচনা হলো। তখনো কোনো কোনো ক্ষেত্রে বড়ো ধরনের ফাঁক-ফোকরের উপস্থিতি সত্ত্বেও বিচারব্যবস্থা শরিআতে ইসলামিই ছিলো। অতঃপর তাতারিদের উত্থান হলো এবং হালাকু খান 'ইয়াসাক' নামক সংবিধান নিয়ে আসলো। 'ইয়াসাক' সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের মন্তব্য বিশেষভাবে তার সঙ্গত স্থানে উল্লেখ করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

বিষয়টি যখন এমনই, তাহলে ইবনুল কাইয়িমসহ অন্যান্য সালাফের বক্তব্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই। কেননা বিচারক যদি ঘুষ, স্বজনপ্রীতি, সুপারিশ বা এ জাতীয় কোনো কারণে বিপরীত ফয়সালা করে, তাহলে নিঃসন্দেহে তা কুফরে আসগর।

কিন্তু মুসলমানদের জীবনে যা নতুনভাবে এসে পড়েছে -বরং তাদের ইতিহাসে সর্বপ্রথম- আর তা হচ্ছে, বিচারকার্য থেকে আল্লাহর শরিআতকে দূরে সরিয়ে দেয়া, সেটিকে পশ্চাদমুখী ও সেকেলে এবং সভ্যতার উন্নতি ও বিবর্তিত কালের সহযাত্রী হতে পারছে না বলে আখ্যা দেয়া। **এটি মুসলিম জীবনে 'ইরতিদাদ'র নতুনরূপ। কেননা তা শুধু এ সকল অসার দাবিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং শরিআতকে কার্যকরীভাবে বাস্তব জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া এবং শরিআতের পরিবর্তে নিকৃষ্টতর ব্যবস্থা গ্রহণ করা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ইসলামি আইনের পরিবর্তে সেখানে স্থান করে নিয়েছে ফরাসি, ইংরেজি, মার্কিন, কমিউনিস্ট সমাজতন্ত্র এবং এ জাতীয় বিভিন্ন জাহেলি কুফরি ব্যবস্থার আইন-কানুন।**" (আলওয়ালা ওয়ালবারা ফিল ইসলাম, পৃ: ৬৮)

অতঃপর তিনি তাঁর দাবির পক্ষে দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। সচেতন পাঠক মূল কিতাব থেকে পুরো আলোচনাটি দেখে নিতে পারেন। বরং পুরো কিতাবটি বুঝে-শুনে অধ্যয়ন করলে গ্রহণ করার মতো বহু উপাদান পাওয়া যাবে।

'ই'তিদাল' কোনটি?

এখন সুস্থ বিবেক সিদ্ধান্ত দেবে এক্ষেত্রে 'ই'তিদাল' কোনটি? খাওয়ারেজ সম্প্রদায়ের 'ইফরাত'র গোমরাহি যদি ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে, তাহলে বর্তমানে যারা 'ইয়াসাক'র উত্তরসূরিদের কাফের মানতে প্রস্তুত নয়; তাদের এই 'তাফরিত'র গোমরাহি কি ভয়ঙ্কর নয়? এটি কি 'ইজমায়ে উম্মাহ'র খেলাফ অবস্থান নয়? যেমনটি পূর্বে ইবনে কাসিরের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ হয়েছে- **"من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين"**। তেমনিভাবে ইবনে তাইমিয়াও বলেছেন-

فإن التتار يتكلمون بالشهادتين، ومع هذا فقتالهم واجب بإجماع المسلمين. (الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ٢/٣٢)

"তাতারিরা 'শাহাদাতাইন' মুখে উচ্চারণ করে, তবুও মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমত্যে তাদের মোকাবেলায় কিতাল ওয়াজিব। (আলফাতাওয়াল কুবরা, ২/৩২)[২৪]

---

২৪. এখানে আমার মৌলিকভাবে উদ্দেশ্য হাফেয ইবনে কাসিরের বক্তব্য। হাঁ! দাবির 'সামারা' ফলাফলের দিকে ইঙ্গিত করতেই শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য উল্লেখ করেছি। তাতারিরা 'শাহাদাতাইন' উচ্চারণ করা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে 'কিতাল'র ব্যাপারে যেমনিভাবে তিনি 'ইজমা' দাবি করেছেন, তেমনিভাবে তিনি তাদেরকে মুসলমানও মনে করতেন না। তাতারিদের ব্যাপারে করা স্বতন্ত্র প্রশ্নের জবাব আমরা তার 'মাজমুউল ফাতাওয়া' (২৮/৫০৯) ও 'আলফাতাওয়াল কুবরা' (৩/৫৩৪) থেকে দেখে নিতে পারি। এছাড়াও 'মাজমুউল ফাতাওয়া'র ১০/৬৭৪, ২২/৫১, ২৮/৩৯৯ থেকে তাতারিদের ব্যাপারে করা তাঁর মন্তব্যগুলো দেখে নিতে পারি। তবে যেহেতু তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিলো জনসাধারণকে তাতারিদের বিরুদ্ধে 'কিতালে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করা, তাই তিনি কখনো কখনো তাতারিদের কুফরের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে শুধু 'খারেজি'দের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলতেন, যেহেতু হাদিসে খারেজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে এবং সাহাবায়ে কেরাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, তাহলে এদের অবস্থা তো আরো শোচনীয়; সুতরাং এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আরো বেশি জরুরি। কখনো আবু বকর রাযি. কর্তৃক যারা যাকাত আদায় করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তাদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতেন। এ থেকে এমনটি মনে করার সুযোগ নেই যে, তিনি

ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে কাসির সেই শতকের দুই মনীষা যে শতকে তাতারিরা তাদের পূর্ব কুফর থেকে ফিরে আসলেও আল্লাহর আইনের পরিবর্তে 'ইয়াসাক' নামক মানবরচিত সংবিধান থেকে ফিরে আসেনি। তাদের 'ইজমা'র দাবির উপর আমাদের জানা মতে আজ পর্যন্ত কেউ আপত্তি করেননি বা তা প্রত্যাখ্যান করেননি।

তাতারিদের মুসলমান মনে করতেন। তাতার সংক্রান্ত তাঁর সবগুলো বক্তব্য সামনে রাখলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

এক্ষেত্রে কেউ এ আপত্তি করতে পারেন যে, তাতারিদেরকে তিনি শুধু 'ইয়াসাক'র কারণে ইসলাম থেকে খারেজ মনে করতেন; বিষয়টি এমন নয়, বরং ইমান পরিপন্থী তাদের আরো অনেক দিক তিনি উল্লেখ করেছেন। আমরাও বলি, তিনি যে সকল দিক উল্লেখ করেছেন তা শতভাগ বর্তমান মানবরচিত আইনের শাসকদের মাঝে বিদ্যমান থাকার দাবি করলে ভুল হবে না।

তৃতীয় সংশয়: গ্রহণ করেছে প্রাধান্য দেয়নি

কেউ কেউ দাবি করেছেন, আমাদের সরকার মানবরচিত আইন গ্রহণ করেছে, কিন্তু সেটিকে আল্লাহর আইনের উপর প্রাধান্য দেয়নি। কাফের-মুরতাদ আখ্যা দিতে হলে প্রাধান্য দেয়া প্রমাণিত হতে হবে।

সংশয়ের পর্যালোচনা

প্রথম কথা: এক হিন্দু আপনার সামনে এক পেয়ালা শূকরের গোস্ত পেশ করেছে এবং এক মুসলমান আপনার সামনে এক পেয়ালা গরুর গোস্ত রেখে দিয়েছে। আপনি শূকরের গোস্তের পেয়ালা গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হননি বরং গরুর গোস্ত গ্রহণের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে দিয়েছেন; এটি কি শুধু গ্রহণ করা না কি গরুর গোস্তের উপর শূকরের গোস্তকে প্রাধান্য দেয়া?

সংবিধানের প্রাধান্য

দ্বিতীয়ত: বাংলাদেশের সংবিধান সামনে রাখলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এটি কি শুধু গ্রহণ করা নাকি প্রাধান্য দেয়া! আমরা নিম্নোল্লিখিত ধারার শিরোনাম ও ধারাটি একটু লক্ষ্য করি-

সংবিধানের প্রাধান্য ৭। (২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং **অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।** (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান - পঞ্চদশ সংশোধন আইন ২০১১- প্রথম ভাগ, প্রজাতন্ত্র, পৃ: ৩)

ফাতওয়া বিষয়ক সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের দেয়া পূর্ণাঙ্গ রায়টিও লক্ষণীয়-

"..... তবে ফতোয়ার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে শারীরিক বা মানসিকভাবে নির্যাতন করা যাবে না।..... **দেশের প্রচলিত আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় এমন কোনো ফতোয়া দেয়া যাবে না**। কোনো ব্যক্তির অধিকার, মর্যাদা বা সম্মান বিনষ্ট করে ফতোয়া দেয়া যাবে না। ফতোয়া নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের দেয়া পূর্ণাঙ্গ রায়ে এসব কথা বলা হয়েছে।" (দৈনিক ইনকিলাব, ২৮ জানুয়ারি, বুধবার ২০১৫ ইং)

এটি কি শুধু গ্রহণ নাকি প্রাধান্য? এতেই শেষ নয়; যারা এই মানবরচিত আইনের বিরোধিতা করবে তারা রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে সাব্যস্ত হবে এবং তাকে সর্বোচ্চ দণ্ডে (ফাঁসি) দণ্ডিত করা হবে। এগুলো কি শুধুই গ্রহণ করা নাকি প্রাধান্য? নিচের ধারাটি লক্ষণীয়-

ধারাঃ ৭ক।

(১) কোন ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোন অসাংবিধানিক পন্থায়-

(ক) এই সংবিধান বা ইহার কোন অনুচ্ছেদ রদ, রহিত বা বাতিল বা স্থগিত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে; কিংবা

(খ) এই সংবিধানের বা ইহার কোন বিধানের প্রতি নাগরিকদের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করিলে কিংবা উহা করিবারজন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে-

তাহার এই কার্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা হইবে এবং ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দোষী হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি (১) দফায় বর্ণিত-

(ক) কোন কার্য করিতে সহযোগিতা বা উস্কানি প্রদান করিলে; কিংবা

(খ) কার্য অনুমোদন, মার্জনা, সমর্থন বা অনুসমর্থন করিলে-

তাহার এইরূপ কার্যও একই অপরাধ হইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধে দোষী ব্যক্তি প্রচলিত আইনে অন্যান্য অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান -পঞ্চদশ সংশোধন আইন ২০১১- প্রথম ভাগ, প্রজাতন্ত্র, পৃঃ ৩)

এবং এ ধারাটি এমন যা সবসময়ের জন্য অপরিবর্তিত। দেখুন-

ধারা: ৭খ। সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হইবে।

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান -পঞ্চদশ সংশোধন আইন ২০১১- প্রথম ভাগ, প্রজাতন্ত্র, পৃ: ৩)

চতুর্থ সংশয়: ‘তাকদিমে ই‘তিকাদি’ প্রয়োজন

কেউ কেউ বলতে চান, আমাদের সরকার আল্লাহর আইনের উপর মানবরচিত আইনকে প্রাধান্য দিয়েছে; এটি মেনে নিলেও তাদেরকে মুরতাদ বলার জন্য ‘তাকদিমে ই‘তিকাদি’ তথা ই‘তিকাদেও তারা সেটিকে প্রাধান্য দিয়েছে তা সাব্যস্ত হতে হবে।

সংশয়ের পর্যালোচনা

দাবিটি ফুকাহায়ে কেরামের ফাতওয়া পরিপন্থী

সুস্পষ্ট কুফরি কথা-কাজের ক্ষেত্রেও ‘ই‘তিকাদ’ তালাশ করার কথা বলা ‘ইরতিদাদ’র সংজ্ঞা ও ফুকাহায়ে কেরামের ফাতওয়া পরিপন্থী।

ইরতিদাদের সংজ্ঞা-

وشرعاً: هي كفر المسلم البالغ العاقل المختار الذي ثبت إسلامه ولو ببنوته لمسلم، وإن لم ينطق بالشهادتين. أو كفر من نطق بهما عالماً بأركان الإسلام ملتزماً بها، ويكون ذلك بالإتيان بصريح الكفر **بلفظ يقتضيه، أو فعل يتضمنه ونحو ذلك.** (١) وهذا التعريف هو أجمع التعاريف في الردة.

(١) المصباح (ردة)، وجواهر الإكليل ٢/٢٧٧، والمغني ٨/١٢٣، وابن عابدين ٣/ ٢٨٣.

(الموسوعة الفقهية الكويتية، المادة: الردة، ٦/١٧٨)

“শরিআতের পরিভাষায় ইরতিদাদ বলা হয়, কোনো আকেল, বালেগ, ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মুসলমানের কুফরি করা; যার ইসলাম সাব্যস্ত হয়েছে,

চাই তা মুসলমানের সন্তান হওয়া হিসেবে হোক না কেনো, যদিও সে 'শাহাদাতাইন' উচ্চারণ না করে। অথবা যে ইসলামের 'রুকন' সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে, তা আঁকড়ে ধরে 'শাহাদাতাইন' উচ্চারণ করেছে, তার কুফরি করাকে ইরতিদাদ বলে। আর তা প্রমাণিত হয় কুফর আবশ্যকীয় করে এমন কথা-কাজ ইত্যাদি দ্বারা সুস্পষ্ট কুফর প্রকাশ করার মাধ্যমে। এটিই ইরতিদাদের সর্বব্যাপী সংজ্ঞা।" (আলমাউসুআতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যাহ, ৬/১৭৮)

قال البهوتي الحنبلي (المتوفى ١٠٥١هـ): و(المرتد) شرعاً الذي يكفر بعد إسلامه **نطقاً أو اعتقاداً أو شكاً أو فعلاً**. (كشاف القناع عن الإقناع للبهوتي، ٢٢٥/١٤)

"শরিআতের পরিভাষায় মুরতাদ বলা হয়, যে ইসলামের পর কুফরি করে, চাই সে কুফরিটা কথা, বিশ্বাস, সন্দেহপোষণ বা কাজের মাধ্যমে হোক।" (কাশশাফুল কিনা', ১৪/২২৫)

কয়েকজন হানাফি ফকিহের ফাতওয়া-

আবু আলি আসসামারকান্দি আলহানাফি (মৃ-৪৫০ হিজরির পর)

قال أبو علي محمد بن الوليد السمرقندي الحنفي في كتابه "الجامع الأصغر": إذا قال الرجل كلمة الكفر عمداً **لكنه لم يعتقد الكفر**، قال بعض أصحابنا: لا يكفر، لأن الكفر متعلق بالضمير ولم يعقد ضميره على الكفر، وقال بعضهم: يكفر، هو الصحيح عندنا، لأنه استخف بدينه. (الفتاوى الصغرى، -المخطوطة ص٢٣٧- ليوسف بن أحمد الخوارزمي الخاصي، المتوفى ٦٣٤هـ، البحر الرائق، ٢١٠/٥، الهندية، ٢٧٦/٢، رد المحتار، ٢٧٢/٦)

"কেউ যদি **কুফরের ই'তিকাদ না রেখে** ইচ্ছাকৃত কুফরি কথা উচ্চারণ করে; হানাফিদের কেউ কেউ বলেছেন, তাকে কাফের বলা হবে না। কেননা কুফরের সম্পর্ক হলো অন্তরের সঙ্গে, এখানে তার অন্তর কুফরের উপর স্থির হয়নি। আর কেউ কেউ বলেছেন, তাকে কাফের আখ্যায়িত করা হবে। আমাদের মতে এটাই সহিহ কথা। কেননা সে তার দ্বীনকে হেয়জ্ঞান করেছে।" (আলফাতাওয়াস সুগরা, -পাণ্ডুলিপি পৃ: ২৩৭, আলবাহরুর রায়েক, ৫/২১০, হিন্দিয়া, ২/২৭৬, রদ্দুল মুহতার, ৬/২৭২)

হাসান ইবনে মানসুর কাযি খান (মৃ-৫৯২ হি.)

رجل كفر بلسانه طائعاً **وقلبه على الإيمان**، يكون كافراً ولا يكون عند الله تعالى مؤمناً. (فتاوى قاضي خان، كتاب السير، باب ما يكون كفراً من المسلم وما لا يكون، ٤٢٥/٣، الهندية، ٢٨٣/٢)

"কেউ যদি স্বেচ্ছায় মুখে কুফরি করে, **অথচ তার অন্তর ইমানের উপর স্থির;** সে কাফের হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তাআলার নিকটও মুমিন হিসেবে ধর্তব্য হবে না।" (খানিয়া, ৩/৪২৫, হিন্দিয়া, ২/২৮৩)

وأما الهازل والمستهزئ إذا تكلم بالكفر استخفافاً ومزاحاً واستهزاءً يكون كفراً عند الكل، **وإن كان اعتقاده خلاف ذلك**. (فتاوى قاضي خان، ٤٢٩/٣، جامع الفصولين -لابن قاضي سماونة المتوفى ٨٢٣هـ-، ٢٩٧/٢، الهندية، ٢٧٦/٢)

"কোনো রসিক ও উপহাসকারী যদি হেয়জ্ঞান, রসিকতা ও পরিহাস করে কুফরি কথা বলে; সকলের মতে এটি কুফর হিসেবে সাব্যস্ত হবে, **যদিও তার ই'তিকাদ কথার বিপরীত হয়।**" (খানিয়া, ৩/৪২৯, জামেউল ফুসুলাইন, ২/২৯৭, হিন্দিয়া, ২/২৭৬)

ইবনুল হুমাম (মৃ-৮৬১ হি.)

ومن هزل بلفظ كفر ارتد **وإن لم يعتقده** للاستخفاف، فهو ككفر العناد، والألفاظ التي يكفر بها تعرف في الفتاوى. (فتح القدير لابن الهمام، ٩١/٦)

"যে হেয়জ্ঞান করে কুফরি শব্দ দিয়ে রসিকতা করলো; সে মুরতাদ হয়ে যাবে, যদিও সে তার ই'তিকাদ না রাখে। তা হটকারিতা করে কুফরি করার মতই। যে সকল শব্দের কারণে কাফের আখ্যায়িত করা হয় তা ফাতাওয়ার কিতাবে জানা যাবে।" (ফাতহুল কাদির, ৬/৯১)

ইবনে নুজাইম আলহানাফি (মৃ-৯৭০ হি.)

والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلاً أو لاعباً كفر عند الكل، **ولا اعتبار باعتقاده**. كما صرح به قاضي خان في فتاواه. (البحر الرائق لابن نجيم، ٢١٠/٥، رد المحتار، ٢٧٢/٦)

“মোটকথা, যে রসিকতা বা কৌতুকচ্ছলে কুফরি কথা বললো; সকলের মতে তাকে কাফের হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে এবং তার ই‘তিকাদকে আমলে আনা হবে না। যেমনিভাবে কাযি খান তাঁর ফাতাওয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন।” (আলবাহরুর রায়েক, ৫/২১০, রদ্দুল মুহতার, ৬/২৭২)

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি (মৃ-১৩৫২ হি.)

اتفقوا في بعض الأفعال على أنها كفر، مع أنه يمكن فيها أن لا ينسلخ من التصديق، لأنها أفعال الجوارح لا القلب، وذلك كالهزل بلفظ كفر وإن لم يعتقده، وكالسجود لصنم، وكقتل نبي، والاستخفاف به، وبالمصحف، والكعبة، واختلفوا في وجه الكفر بها بعد الاتفاق على التكفير، فقيل: إن الشارع لم يعتبر ذلك التصديق حكماً، وإن كان موجوداً حقيقة. حكاه الحافظ ابن تيمية في "كتاب الإيمان" من لفظ الأشعري، وقيل: إن ما كان دليل الاستخفاف يكفر به، وإن لم يقصد الاستخفاف، ذكره في "رد المحتار"، وقيل زيد على التصديق المجرد أشياء في الإيمان المعتبر شرعاً، وقيل التصديق المعتبر لا تجامع هذه الأفعال. ذكره العلامة قاسم في حاشية "المسايرة"، والحافظ ابن تيمية رحمه الله. **وبالجملة يكفر ببعض الأفعال أيضاً اتفاقاً، وإن لم ينسلخ من التصديق اللغوي القلبي.** (إكفار الملحدين، صـ٦٨)

“কিছু কিছু কাজের ব্যাপারে সমস্ত উলামায়ে কেরাম একমত যে তা কুফর, অথচ সেক্ষেত্রেও ‘তাসদিক’ শরিআতকে সত্যায়ন করা থেকে বের না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কেননা সেগুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিষয়, অন্তরের নয়। আর তা কুফরি শব্দ দিয়ে রসিকতা করার ন্যায়, যদিও সে তার ই‘তিকাদ না রাখে। তেমনিভাবে মূর্তিকে সিজদা করা, নবীকে হত্যা করা এবং নবী, মুসহাফ ও কা‘বাকে হেয়জ্ঞান করার ন্যায়। সমস্ত উলামায়ে কেরাম কাফের আখ্যা দেয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করার পর তাঁদের মাঝে কুফরের কারণ নিয়ে মতানৈক্য হয়েছে। কেউ বলেন, বাস্তবে ‘তাসদিক’র উপস্থিতি থাকলেও শরিআত প্রণেতা কার্যত তা গ্রহণ করেননি। হাফেয ইবনে তাইমিয়া ‘কিতাবুল ইমান’ -এ আশআরির শব্দে তা বর্ণনা করেছেন। আর কেউ বলেন, যদি হেয়জ্ঞান করার প্রমাণ পাওয়া

যায়; তাহলে কাফের সাব্যস্ত করা হবে, যদিও হেয়জ্ঞান করা তার উদ্দেশ্যে না থাকে। রদ্দুল মুহতারে তা উল্লেখ করা হয়েছে। আর কেউ বলেন, শরিআত ইমান গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে 'তাসদিক'র সঙ্গে আরো কিছু বিষয় বৃদ্ধি করেছে। আর কেউ বলেন, গ্রহণযোগ্য 'তাসদিক'র সঙ্গে এ সকল কুফরি কাজ একত্রিত হতে পারে না। আল্লামা কাসেম 'আলমুসায়ারা' নামক কিতাবের টীকায় এবং হাফেয ইবনে তাইমিয়া তা উল্লেখ করেছেন। **মোটকথা, উম্মাহর ঐক্যমত্যে কিছু কিছু কাজের কারণে কাফের আখ্যায়িত করা হবে, যদিও সে শাব্দিক আন্তরিক 'তাসদিক' থেকে বের হয়ে যায় না।**" (ইকফারুল মুলহিদিন, পৃ: ৬৮)

وفي "مجمع الأنهر" مستدركاً على "البحر": لكن في "الدرر": وإن لم يعتقد، أو لم يعلم أنها لفظة الكفر، ولكن أتى بها عن اختيار، فقد كفر عند عامة العلماء، ولا يعذر بالجهل إلخ. وعزاه في "الدرر" من الكراهية، والاستحسان "للمحيط". **وهذا الخلاف في غير الضروريات، وأما هي فليس فيها إلا الاستتابة.** (إكفار الملحدين، ص١٢٩)

"আলবাহরুর রায়েক'র বক্তব্যের সঙ্গে সংযুক্ত করে 'মাজমাউল আনহুর' কিতাবে বলা হয়েছে, কিন্তু 'আদদুরার' -এ বলা হয়েছে, যদিও ই'তিকাদ না রাখে অথবা সে জানে না যে তা কুফরি কথা, কিন্তু সে স্বেচ্ছায় তা উচ্চারণ করেছে, তাহলে অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে তাকে কাফের আখ্যায়িত করা হবে এবং অজ্ঞতা 'ওযর' হিসেবে ধর্তব্য হবে না। 'আদদুরার' -এ তা 'আলমুহিত'র 'আলকারাহিয়্যাহ ওয়ালইসতিহসান'র উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। **এ মতানৈক্য শরিআতের অকাট্য বিধানের ক্ষেত্রে নয়। অকাট্য বিধানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র তাওবা করতে বলা হবে।**" (ইকফারুল মুলহিদিন, পৃ: ১২৯)

এখন একটু ইনসাফের সহিত বিবেচনা করুন। ব্যক্তিবিশেষের কখনো কৌতুকচ্ছলে কুফরি কথা বলা বেশি মারাত্মক নাকি এক বৃহৎ শ্রেণীর কুফরি সংবিধানের উপর অবিচল থাকা, উত্তরোত্তর তা যুগোপযোগী করার জন্য নিজেদের পুরো মেধা ও সময় ব্যয় করা এবং সফলতার উপর গর্ববোধ ও জনসম্মুখে বুক ফুলিয়ে তা ব্যক্ত করা বেশি ভয়ঙ্কর? প্রথমটির ক্ষেত্রে যদি 'ই'তিকাদ' বিবেচ্য না হয়, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে কেনো তা তালাশ করতে হবে?

'ই'তিকাদ' বুঝার ব্যবস্থা কী?

দ্বিতীয়ত: 'ই'তিকাদ' বুঝার ব্যবস্থা কী? 'শাক্কুল কালব'-অন্তর বিদীর্ণ করার দায়িত্ব তো বান্দাকে দেয়া হয়নি। বাহ্যিক কথা-কাজের ভিত্তিতেই একজন আলেমকে ফাতওয়া দিতে হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস, সাহাবায়ে কেরামের 'আসার' থেকে উলামায়ে কেরাম এমনটিই বুঝেছেন।

হাদিস

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، قال: قال مُحَمَّد يعني ابن إسحاق، حدثني من سمع عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان الذي أسر العباس بن عبد المطلب أبو اليسر بن عمرو، وهو كعب بن عمرو، أحد بني سلمة، فقال له رسول الله ﷺ: "كيف أسرته يا أبا اليسر؟" قال: لقد أعانني عليه رجل ما رأيته بعد ولا قبل، هيئته كذا، هيئته كذا، قال: فقال رسول الله ﷺ: "لقد أعانك عليه ملك كريم"، وقال للعباس: "يا عباس، افد نفسك، وابن أخيك عقيل بن أبي طالب، ونوفل بن الحارث، وحليفك عتبة بن جحدم" أحد بني الحارث بن فهر، قال: فأبى، وقال: **إني قد كنت مسلماً قبل ذلك، وإنما استكرهوني، قال: "الله أعلم بشأنك، إن يك ما تدعي حقا، فالله يجزيك بذلك، وأما ظاهر أمرك، فقد كان علينا، فافد نفسك.** (مسند الإمام أحمد، ٣٥٣/١، رقم الحديث: ٣٣١٠، المستدرك للحاكم عن عائشة، كتاب معرفة الصحابة، ذكر إسلام العباس، ٤٠/٤، رقم الحديث: ٥٤٩٠)

صححه الحاكم على شرط مسلم، وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم، وحسنه الشيخ شعيب الأرنؤوط، وله متابعات.

"ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকে যিনি বন্দি করেছিলেন তিনি ছিলেন আবুল উসর ইবনে আমর রাযি.। তিনি হলেন বনি সালামা গোত্রের কা'ব ইবনে আমর। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আবুল উসর! তুমি তাঁকে কীভাবে বন্দি করলে? তিনি বললেন, তাঁকে বন্দি করার ক্ষেত্রে আমাকে এমন একজন লোক সাহায্য করেছে যাকে আমি পূর্বে-পরে কখনো দেখিনি। তার

আকৃতি এমন এমন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাকে এক সম্মানিত ফেরেশতা সাহায্য করেছেন। এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস রাযি.কে লক্ষ্য করে বললেন, হে আব্বাস! তুমি তোমার, তোমার ভাতিজা আকিল ইবনে আবি তালেব, নাওফাল ইবনুল হারেস এবং তোমার মিত্র আলহারেস ইবনে ফিহর গোত্রের উতবা ইবনে জাহদামের মুক্তিপণ আদায় করো। তিনি অস্বীকৃতি জানালেন এবং বললেন, **আমি বন্দি হওয়ার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু তারা আমাকে বাধ্য করেছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই অধিক জ্ঞাত। তোমার দাবি যদি সত্য হয়ে থাকে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে তার প্রতিদান দেবেন। কিন্তু তোমার বাহ্যিক অবস্থা আমাদের বিপক্ষে ছিলো, তাই তুমি তোমার মুক্তিপণ আদায় করো।**" (মুসনাদে আহমাদ, ১/৩৫৩, হাদিস নং: ৩৩১০, মুসতাদরাকে হাকেম, ৪/৪০, হাদিস নং: ৫৪৯০)

উমর ইবনুল খাত্তাবের রাযি. বক্তব্য (মৃ-২৩ হি.)

قال الإمام البخاري: حدثنا الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الله بن عتبة، قال: سمعت عمر بن الخطاب ﷺ، يقول: "إن أناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله ﷺ، وإن الوحي قد انقطع، **وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم**، فمن أظهر لنا خيراً، أمناه، وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، **ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه، ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة.** (صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهداء العدول، ص٧١٥، رقم الحديث: ٢٦٤١)

"উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় কিছু লোককে ওহির মাধ্যমে পাকড়াও করা হতো। এখন ওহির ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে গেছে। **তাই আমরা এখন তোমাদেরকে পাকড়াও করবো তোমাদের বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে।** যে আমাদের সামনে কল্যাণকামিতা প্রকাশ করবে, তাকে আমরা বিশ্বস্ত মনে করবো এবং কাছে টেনে নিবো। তার গোপন বিষয় নিয়ে আমাদের কিছু যায়-আসে না। তার গোপন বিষয়ে আল্লাহ তাআলাই তার হিসাব নেবেন। **আর যে আমাদের**

সামনে দুষ্কৃতি প্রকাশ করবে, আমরা তাকে বিশ্বাস করবো না এবং তাকে সত্যায়ন করবো না। যদিও সে তার গোপন সুন্দর হওয়ার দাবি করে।” (সহিহুল বুখারি, পৃ: ৭১৫, হাদিস নং: ২৬৪১)

ইজমায়ে উম্মাহ

ইমাম নববির দাবি (মৃ-৬৭৬ হি.)

وقوله ﷺ "أفلا شققت عن قلبه" فيه دليل **للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول** أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر والله تعالى يتولى السرائر. (شرح صحيح مسلم للنووي، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا الله، ٤٨٨/١)

“তুমি তার অন্তর বিদীর্ণ করে দেখলে না কেনো!’ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাক্যে **ফিকহ ও উসুলে ফিকহের প্রসিদ্ধ মূলনীতির** দলিল বিদ্যমান যে, বিধি-বিধান বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে কার্যকর হবে। অপ্রকাশ্য বিষয়ের দায়-দায়িত্ব আল্লাহর হাতে।” (শরহে সহিহে মুসলিম, ১/৪৮৮)

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানির দাবি (মৃ-৮৫২ হি.)

وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر، والله يتولى السرائر. (فتح الباري للعسقلاني، كتاب استتابة المرتدين، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، ١٩١/٢٢)

“সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, দুনিয়ার বিধি-বিধান কার্যকর হবে বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে। অপ্রকাশ্য বিষয়ের দায়-দায়িত্ব আল্লাহর হাতে।” (ফাতহুল বারি, ২২/১৯১)

বদরুদ্দিন আইনির দাবি (মৃ-৮৫৫ হি.)

قوله: (إنما أنا بشر) أي: لا أعلم الغيب وبواطن الأمور، كما هو مقتضى حال البشرية، وأنه إنما يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، ولو شاء الله لأطلعه على باطن الأمور حتى يحكم باليقين، **لكن أمر الله أمته بالاقتداء به، فأجرى أحكامه على الظاهر لتطيب نفوسهم للانقياد**. (عمدة القاري للعيني، كتاب المظالم والغضب، باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، ٩٩/١٢)

"(আমি একজন মানুষ) অর্থাৎ আমি মানুষ হিসেবে অদৃশ্যের বিষয় ও অপ্রকাশ্য বিষয়ের ব্যাপারে অবগত নই। তিনি বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতেই ফয়সালা করবেন, অপ্রকাশ্য বিষয়ের দায়-দায়িত্ব আল্লাহর হাতে। আল্লাহ তাআলা চাইলে তাঁকে গোপন বিষয়ে অবগত করে দিতে পারতেন, যেনো তিনি নিশ্চিত জেনে ফয়সালা করতে পারেন। **কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর উম্মতদের তাঁর অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিধি-বিধানের ভিত্তি রেখেছেন বাহ্যিক অবস্থার উপর। যেনো আনুগত্যের ক্ষেত্রে তাদের অন্তর আস্থাশীল হয়।**" (উমদাতুল কারি, ১২/৯৯)

আবুল আব্বাস ইবনে হাজার হাইতামির দাবি (মৃ-৯৭৪ হি.)

وما ذكره ظاهر موافق لقواعد مذهبنا، **إذ المدار في الحكم بالكفر على الظواهر، ولا نظر للمقصود والنيات ولا نظر لقرائن حاله.** (الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي، صـ٢٨٢، إكفار الملحدين، صـ٩١)

"তিনি যা উল্লেখ করেছেন তা আমাদের মাযহাবের মূলনীতি অনুযায়ী হয়েছে। কেননা কুফরের হুকুমের মূলভিত্তি হলো বাহ্যিক অবস্থা। উদ্দেশ্য, নিয়ত ও তার অবস্থার লক্ষণকে আমলে আনা হবে না।" (আলই'লাম বি কাওয়াতিয়িল ইসলাম, পৃ: ২৮২ -আলজামে' ফি আলফাযিল কুফর নামক চার কিতাবের সমষ্টির সঙ্গে-, ইকফারুল মুলহিদিন, পৃ: ৯১)

'তাকদিমে ই'তিকাদি' প্রমাণিত হওয়ার ব্যবস্থা কী?

তৃতীয়ত: 'তাকদিমে ই'তিকাদি' প্রমাণিত হওয়ার ব্যবস্থা কী? যুগের পর যুগ কুফরি সংবিধানের উপর অবিচল থাকা, উত্তরোত্তর তা যুগোপযোগী করার জন্য নিজেদের পুরো মেধা ও সময় ব্যয় করা এবং সফলতার উপর গর্ববোধ ও জনসম্মুখে বুক ফুলিয়ে তা ব্যক্ত করা, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ও গণ প্রজাতন্ত্র উভয়ের মাঝে পার্থক্য বুঝে বলেই 'ইসলামি'র স্থলে 'গণ'কে স্থান দেয়া, স্বাধীনতার এক বছরের মাথায় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে ঠাঁই দেয়া, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টানসহ বিধর্মীদের কুফরি উৎসব উপলক্ষে সরকার কর্তৃক শুভেচ্ছা বাণী প্রদান করা এবং বিশেষ কোনো ইস্যুতে ইসলামি আইন বাস্তবায়নের দাবিতে উলামায়ে কেরাম রাজপথে নামলে তাদেরকে অস্ত্র হাতে দমন করা ইত্যাদি ইত্যাদি; এসব কিছু কি 'তাকদিমে ই'তিকাদি'র আলামত বহন করে

না? যদি না করে থাকে তাহলে আশা করি কোনো গবেষক আমাদেরকে 'তাকদিমে ই'তিকাদি' বুঝার কিছু ব্যবস্থাপত্র দেবেন। তবে সঙ্গে আরেকটি কাজ করতে হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানা থেকে শতাব্দীকাল ধরে যতো মুরতাদ ও যিন্দিককে ইরতিদাদ ও যানদাকার কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক রাযি. এর যমানা থেকে যুগে যুগে যতো মুরতাদ ও যিন্দিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে ইরতিদাদ ও যানদাকার কারণে জিহাদ করা হয়েছে; সকল ক্ষেত্রে বা কোনো একটি ক্ষেত্রে 'তাকদিমে ই'তিকাদি' প্রমাণ করার জন্য গবেষকের দেয়া সে সকল ফর্মুলা আমলে নেয়া হয়েছিলো; তাও প্রমাণ করে দেখাতে হবে।

পঞ্চম সংশয়: অজ্ঞতার 'ওযর'

কেউ কেউ মানবরচিত আইনের শাসনকে কুফরি শাসন মেনে নিলেও শাসকদেরকে সামগ্রিকভাকে কাফের-মুরতাদ আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে 'তাকফির' প্রতিবন্ধক বিষয়াদি থেকে 'জাহালত'র প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। অর্থাৎ তারা বলেন, তাদের অজ্ঞতার বিষয়টি যাচাই করতে হবে। অজ্ঞতা দূর করার পূর্বে তাদেরকে মুরতাদ বলা যাবে না। জাহালত-অজ্ঞতাকে শর্তহীনভাবে 'ওযর' নয় বলে দেয়া সহিহ নয়।

সংশয়ের পর্যালোচনা

প্রথম কথা: অবশ্যই! জাহালত-অজ্ঞতাকে শর্তহীনভাবে 'ওযর' নয় বলে দেয়া সহিহ নয়। তবে কারো কারো আলোচনার ভাবে মনে হয়, শর্তহীনভাবে 'ওযর' হিসেবে গ্রহণ করতে কোনো আপত্তি নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, শর্তগুলোর কি কোনো সীমারেখা আছে? এক প্রকারের অজ্ঞতা তো কাফেরদের মাঝেও রয়েছে। স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই তো নবীগণের ভাষ্যে কাফেরদেরকে জাহেল বলেছেন।"إني أراكم قوماً تجهلون"، "قال إنكم قوم تجهلون"، "بل أنتم قوم تجهلون" ইত্যাদি ইত্যাদি। এ অজ্ঞতাকে নিঃসন্দেহে কেউই গ্রহণযোগ্য মনে করেন না।

যেকোনো ক্ষেত্রেই কি অজ্ঞতা 'ওযর'?

দ্বিতীয়ত: যেকোনো ক্ষেত্রেই কি অজ্ঞতা 'ওযর'? ফুকাহায়ে কেরামের ভাষ্যমতে সুস্পষ্ট কুফর ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয়াদির ক্ষেত্রে অজ্ঞতা 'ওযর' নয়। এছাড়াও ফিকহের কিতাবাদির পাতায় পাতায় এমন হাজারো মাসআলা পাওয়া যাবে, যে সকল ক্ষেত্রে অজ্ঞতা 'ওযর' নয় বলা হয়েছে। উসুলে ফিকহের কিতাবাদি থেকে জাহালাতের অধ্যায়টি পড়ে নেয়া সচেতন পাঠকের দায়িত্ব। আমি এখানে শুধু কয়েকটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি-

তাহের ইবনে আব্দুর রশিদ আলবুখারি আলহানাফি (মৃ-৫৪২ হি.)

ومنها أنه من أتى بلفظة الكفر وهو لم يعلم أنها كفر إلا أنه أتى بها عن اختيار يكفر عند عامة العلماء خلافا للبعض، **ولا يعذر بالجهل**. (خلاصة الفتاوى لطاهر بن عبد الرشيد البخاري، كتاب ألفاظ الكفر، ٣٨٢/٤، الأشباه والنظائر لابن نجيم، صـ٣٦٢، الهندية، ٢٧٦/٢)

"কেউ যদি স্বেচ্ছায় কুফরি কথা উচ্চারণ করে, অথচ সে জানে না যে তা কুফর; কিছু সংখ্যক আলেম ব্যতীত অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে তাকে কাফের আখ্যায়িত করা হবে। **এক্ষেত্রে অজ্ঞতা 'ওযর' হিসেবে ধর্তব্য হবে না।**" (খুলাসাতুল ফাতাওয়া, ৪/৩৮২, আল আশবাহ, পৃ: ৩৬২, হিন্দিয়া, ২/২৭৬)

ইবনে আতিয়্যা আলমালেকি (মৃ-৫৪৬ হি.)

والجهالة المشبهة ليست بعذر في الشرع جملة، والجهالة الحقيقية يعذر بها في بعض ما يخف من الذنوب **ولا يعذر بها في كبيرة**. (تفسير ابن عطية، سورة الأنعام -الآية: ٥٤، ٥٥-، ٢٩٧/٢)

"সংশয়ের কারণে সৃষ্ট অজ্ঞতা শরিআতে 'ওযর' হিসেবে ধর্তব্য নয়। আর বাস্তব অজ্ঞতা কিছু সাধারণ গোনাহের ক্ষেত্রে 'ওযর' হিসেবে ধর্তব্য হবে, **কিন্তু কবিরা গোনাহের ক্ষেত্রে 'ওযর' হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।**" (তাফসিরে ইবনে আতিয়্যা, ২/২৯৭, সুরা আনআম, আয়াত: ৫৪-৫৫)

শিহাবুদ্দিন আলহামাবি আলহানাফি (মৃ-১০৯৮ হি.)

والجهل بالضروريات في باب المكفرات لا يكون عذراً. (شرح الأشباه والنظائر للحموي، كتاب السير، باب الردة، ٦٤، ٢٠٧/٢)

"কুফরের ক্ষেত্রে শরিআতের অকাট্য বিষয়ের ব্যাপারে অজ্ঞতা 'ওযর' হিসেবে ধর্তব্য হবে না।" (শরহুল আশবাহ ওয়াননাযায়ের, ২/২০৭)

জাহালত সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পাঠক বিশেষভাবে পড়ে নিতে পারেন- 'কাশফুল আসরার আলা উসুলিল বাযদাবি' باب العوارض المكتسبة- ৪/৪৫৭, 'শারহুত তালবিহ আলাত তাওযিহ' ২/৩৭৭, আলফুরুক লিলকারাফি, الفرق الرابع والتسعون, ২/২৬০।

অজ্ঞতা কাদের ক্ষেত্রে কতোক্ষণ পর্যন্ত 'ওযর'

তৃতীয়ত: জাহালত-অজ্ঞতা কাদের ক্ষেত্রে কতোক্ষণ পর্যন্ত 'ওযর' হিসেবে ধর্তব্য হবে? সকল মাযহাবের প্রায় সকল ফিকহের কিতাবে বলা হয়েছে, কেউ যদি নতুন মুসলমান হয় অথবা উলামায়ে কেরাম বা নাগরিক জীবন থেকে দূরে বহুদূরে অবস্থান করে, তখন তার নিকট কথাটি পৌঁছা পর্যন্ত তার অজ্ঞতা 'ওযর' হিসেবে গণ্য হবে। তবে কথাটি না পৌঁছালেও সে বিষয়টি জেনে নিতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও যদি জেনে না নেয়, তাহলে তা 'ওযর' হিসেবে ধর্তব্য হবে না। আমি প্রত্যেক মাযহাবের ফকিহদের কিছু উদ্ধৃতি উল্লেখ করবো। অন্যান্য উদ্ধৃতি পাঠক নিজেই বের করে নিতে পারবেন।

আবু সুলাইমান আলখাত্তাবি আশশাফেয়ি (মৃ-৩৮৮ হি.)

প্রথম যুগে যে সকল ক্ষেত্রে অজ্ঞতা 'ওযর' হিসেবে ধর্তব্য হয়েছে, পরবর্তীতে কেনো তা ধর্তব্য হবে না; উভয় যুগের পার্থক্য আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন-

منها قرب العهد بزمان الشريعه التي كان يقع فيها تبديل الأحكام. ومنها وقوع الفترة بموت النبي ﷺ وكان القوم جهالاً بأمور الدين وكان عهدهم حديثاً بالإسلام فتداخلتهم الشبهة فعذروا كما عذر بعض من تأول من الصحابة في استباحة شرب الخمر....... **فأما اليوم فقد شاع دين الإسلام** واستفاض علم وجوب الزكاة حتى عرفه الخاص والعام **واشترك فيه العالم والجاهل فلا يعذر أحد** بتأويل يتأوله في إنكارها. وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئاً مما أجمعت عليه الأمة من أمور الدين إذا كان علمه منتشراً كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم في نحوها من الأحكام، إلا أن يكون رجل حديث عهد بالإسلام لا يعرف حدوده، فإذا أنكر شيئاً منه جهلاً به لم يكفر وكان سبيله سبيل أولئك القوم في تبقية اسم الدين عليه. (معالم السنن للخطابي، كتاب الزكاة، ٨/٢، شرح صحيح مسلم للنووي، ٣٠٠/١، إكفار الملحدين، ص٩١)

"তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, শরিআত প্রবর্তনের সময় নিকটবর্তী হওয়া যাতে বিধান পরিবর্তন হতো। আরেকটি হচ্ছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের কারণে অবসন্নতা ছড়িয়ে পড়া। সাধারণ মানুষ দ্বীনি বিষয়

সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলো এবং নতুন মুসলমান ছিলো। তাই তাদের মাঝে বিভিন্ন সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণেই তাদের 'ওযর' গ্রহণযোগ্য হয়েছে, যেমনিভাবে মদ পান করার বৈধতার ব্যাপারে কিছু সংখ্যক সাহাবির 'তাবিল' ব্যাখ্যা 'ওযর' হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ..... **কিন্তু বর্তমানে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছে** এবং যাকাত ফরয হওয়ার বিষয়টি এমনভাবে প্রসিদ্ধ হয়েছে যে সাধারণ ও বিশেষ সকলেই তা জানে। **এক্ষেত্রে আলেম-জাহেল সকলেই সমান**। তাই যাকাত অস্বীকার করতে গিয়ে কোনো ব্যাখ্যার আশ্রয় নিলে তা 'ওযর' হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। যে কেউ দ্বীনি যে সকল বিষয়ের উপর উম্মাহর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে, তার কোনো একটিকে অস্বীকার করবে; তার ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হবে। যখন তা জানা-শুনার বিষয়টি ব্যাপক হবে, যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রমযানের রোযা, 'জানাবাত' শারীরিক অপবিত্রতা থেকে গোসল করা এবং যিনা, মদ ও 'মাহরাম' যাদের সঙ্গে বিবাহ বৈধ নয় তাদেরকে বিবাহ করা হারাম হওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন বিধি-বিধান। হাঁ! কেউ যদি নতুন মুসলমান হয় যে এখনো হালাল হারামের পার্থক্য বুঝেনি; সে যদি অজ্ঞতার কারণে কোনোটিকে অস্বীকার করে, তাকে কাফের বলা হবে না। মুসলমান বলার ক্ষেত্রে তাকে প্রথম শ্রেণির লোকের বিবেচনায় রাখা হবে।" (মাআলিমুস সুনান, ২/৮, শরহে সহিহে মুসলিম, ১/৩০০, ইকফারুল মুলহিদিন, পৃ: ৯১)

বুরহানুদ্দিন আলমারগিনানি আলহানাফি (মৃ-৫৯৩ হি.)

لأنها تتفرغ لمعرفة أحكام الشرع **والدار دار العلم فلم تعذر بالجهل**. (الهداية، كتاب النكاح، باب في الأولياء والأكفاء، ٣١٧/٢)

"কেননা সে শরিআতের আহকাম জানার সুযোগ পায়, **কারণ অঞ্চলটি ইলম ব্যাপক হয়ে থাকা অঞ্চল। সুতরাং অজ্ঞতা 'ওযর' হিসেবে ধর্তব্য হবে না।"** (হিদায়া, ২/৩১৭)

ফখরুদ্দিন রাযি আশশাফেয়ি (মৃ-৬০৬ হি.)

والوجه الثالث: أن يكون المراد منه أن يأتي الإنسان بالمعصية مع أنه لا يعلم كونه معصية **لكن بشرط أن يكون متمكناً من العلم** بكونه معصية، فإنه على هذا التقدير يستحق

العقاب، ولهذا المعنى أجمعنا على أن اليهودي يستحق على يهوديته العقاب، وإن كان لا يعلم كون اليهودية معصية، **إلا أنه لما كان متمكناً من تحصيل العلم** بكون اليهودية ذنباً ومعصية، كفى ذلك في ثبوت استحقاق العقاب. (التفسير الكبير للرازي، سورة النساء - الآية: ١٧-، ٥/١٠)

"তৃতীয় ব্যাখ্যা. তা দ্বারা উদ্দেশ্য কেউ গোনাহকে গোনাহ না জেনে তাতে লিপ্ত হওয়া। **কিন্তু কেউ যদি কাজটি গোনাহ হওয়ার ইলম অর্জন করতে সক্ষম হয়,** তাহলে সে শাস্তির উপযুক্ত হবে। এজন্যই আমরা এ ব্যাপারে একমত যে, ইহুদি ইহুদি হওয়ার কারণে শাস্তি ভোগ করবে, যদিও সে জানে না যে ইহুদি হওয়া অন্যায়। **কেননা তার এই ইলম অর্জন করার সুযোগ ছিলো** যে ইহুদি হওয়া গোনাহ ও অপরাধ, এতোটুকুই শাস্তির উপযুক্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট।" (আততাফসিরুল কাবির, ১০/৫, সুরা নিসা, আয়াত: ১৭)

ইবনে কুদামা আলহাম্বলি (মৃ-৬২০ হি.)

ولأن الجهل بأحكام الشرع **مع التمكن من العلم** لا يسقط أحكامها كالجهل بتحريم الأكل في الصوم. (المغني لابن قدامة، باب صفة الصلاة، فصل ترك الترتيب بالجهل بوجوبه، ٣٤٦/٢)

"**জানার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও** শরিআতের বিধি-বিধানের ব্যাপারে অজ্ঞতা তার হুকুমকে বিয়োজন করে না। যেমন রোযা অবস্থায় পানাহার হারাম হওয়ার ব্যাপারে অজ্ঞতা।" (আলমুগনি, ২/৩৪৬)

(٣٢٩) مسألة؛ قال: (ومن ترك الصلاة، وهو بالغ عاقل، جاحداً لها أو غير جاحد، دعي إليها في وقت كل صلاة، ثلاثة أيام، فإن صلى وإلا قتل) وجملة ذلك أن تارك الصلاة لا يخلو؛ إما أن يكون جاحداً لوجوبها، أو غير جاحد، فإن كان جاحداً لوجوبها نظر فيه، فإن كان جاهلاً به، **وهو ممن يجهل ذلك، كالحديث الإسلام والناشئ ببادية،** عرف وجوبها وعلم ذلك، ولم يحكم بكفره؛ لأنه معذور. **وإن لم يكن ممن يجهل ذلك، كالناشئ بين المسلمين في الأمصار والقرى، لم يعذر ولم يقبل منه ادعاء الجهل،** وحكم بكفره؛ لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة، والمسلمون يفعلونها على الدوام، فلا يخفى وجوبها على

من هذا حاله، فلا يجحدها إلا تكذيباً لله تعالى ولرسوله وإجماع الأمة، وهذا يصير مرتداً عن الإسلام، وحكمه حكم سائر المرتدين، في الاستتابة والقتل، ولا أعلم في هذا خلافاً. (المغني، باب الحكم في من ترك الصلاة، ٣/٣٥١)

"(অস্বীকার করে বা না করে কোনো আকেল বালেগ যদি নামাযকে বর্জন করে, তাকে তিনদিন প্রতি ওয়াক্তে নামাযের জন্য আহ্বান করা হবে। যদি নামায আদায় করে তাহলে তো ভালো, অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে।) মোটকথা, নামায বর্জনকারী হয়তো নামায ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে অথবা করে না। যদি অস্বীকারকারী হয়, তাহলে তার অবস্থা দেখতে হবে। যদি সে জাহেল হয় **এবং নতুন মুসলমান বা বেদুঈন হওয়ার মতো জাহেল থাকার কারণ বিদ্যমান থাকে,** তাহলে নামায ফরয হওয়ার বিষয়টি তাকে জানানো হবে এবং কুফরের হুকুম দেয়া হবে না। কেননা সে অপারগ। **আর যদি অজ্ঞ থাকার কোনো কারণ তার মাঝে বিদ্যমান না থাকে, যেমন শহরে-গ্রামে সে মুসলমানদের মাঝে বসবাস করে, তার 'ওযর' ধর্তব্য হবে না এবং তার অজ্ঞতার দাবি গ্রহণ করা হবে না।** বরং তার কুফরের হুকুম দেয়া হবে। কেননা কুরআন-সুন্নাহে তা ফরয হওয়ার দলিল স্পষ্ট এবং মুসলমানরা দৈনন্দিন তা পালন করে চলছে। মুসলমানদের মাঝে বসবাসরত ব্যক্তির নিকট নামায ফরয হওয়ার বিষয়টি অস্পষ্ট হওয়ার কথা নয়। সুতরাং বুঝা যাবে, সে আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও উম্মাহর 'ইজমা'কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতেই সেটিকে অস্বীকার করছে। এই লোক মুরতাদ হিসেবে সাব্যস্ত হবে এবং তার হুকুমও অন্যান্য মুরতাদদের ন্যায়; হয়তো তাওবা করতে বলা হবে নতুবা হত্যা করা হবে। এ ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য আমার জানা নেই।" (আলমুগনি, ৩/৩৫১)

আবুল আব্বাস আলকারাফি আলমালেকি (মৃ-৬৮৪ হি.)

واعلم أن الجهل بما تؤدي إليه هذه الأدعية ليس عذراً للداعي عند الله تعالى؛ **لأن القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل،** فإن الله تعالى بعث رسله إلى خلقه برسائله، وأوجب عليهم كافة أن يعلموها ثم يعملوا بها، فالعلم والعمل بها واجبان، فمن ترك التعلم والعمل وبقي جاهلاً فقد عصى معصيتين لتركه واجبين، وإن علم ولم يعمل فقد عصى معصية واحدة بترك العمل، ومن علم وعمل فقد

بما. (الفروق للقرافي، الفرق الثاني والسبعون والمئتان، ٤/٤٤٧)

"জেনে রাখা উচিত, এ সকল দাবিতে যে অজ্ঞতার কথা ফুটে উঠে, তা আল্লাহ তাআলার নিকট দাবিদারের 'ওযর' হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। **কেননা শরয়ি মূলনীতি প্রমাণ করে, যে অজ্ঞতাকে দূর করা সম্ভব, জাহেলের জন্য সে অজ্ঞতা (ওযরের) দলিল হবে না।** কারণ আল্লাহ তাআলা তার বার্তা দিয়ে মানুষদের নিকট রাসুলদেরকে প্রেরণ করেছেন এবং সকলের জন্য তা জেনে সে অনুযায়ী আমল করা আবশ্যকীয় করে দিয়েছেন। সুতরাং জানা ও আমল করা দু'টোই ওয়াজিব। যে শেখা ও আমল করা বর্জন করে এবং অজ্ঞ থাকে, সে দু'টি ওয়াজিব বর্জন করার পাপে পাপিষ্ঠ হবে। আর যে শিখলো কিন্তু আমল করলো না, সে আমল না করার গোনাহে গোনাহগার হবে। আর যে শিখলো এবং আমল করলো সে সফলকাম হলো।" (আলফুরুক, ৪/৪৪৭)

ইবনে তাইমিয়া আলহাম্বলি (মৃ-৭২৮ হি.)

لكن من الناس من يكون جاهلاً ببعض هذه الأحكام جهلاً يعذر به، فلا يحكم بكفر أحد **حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة**، كما قال تعالى: {لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} وقال تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا}. (مجموع الفتاوى لابن تيمية، ١١/٤٠٦)

"এ সকল বিধি-বিধানের কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষদের কেউ কেউ এ পর্যায়ের অজ্ঞতার শিকার হয় যা 'ওযর' হিসেবে গ্রহণযোগ্য। সুতরাং **বার্তা পৌঁছানোর মাধ্যমে 'ইকামাতে হুজ্জাত' দলিল পূর্ণ করার পূর্বে** কারো ব্যাপারে কুফরের হুকুম দেয়া হবে না। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'যাতে আল্লাহর বিপক্ষে রাসুলদের পর মানুষের জন্য কোন অজুহাত না থাকে।' আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 'আর রাসুল প্রেরণ না করা পর্যন্ত আমি শাস্তিদাতা নই।" (মাজমুউল ফাতাওয়া, ১১/৪০৬)

ফখরুদ্দিন যাইলায়ি আলহানাফি (মৃ-৭৪৩ হি.)

والذمي لو أسلم يلزمه لقدرته على التحصيل؛ **لأن الدار دار العلم**، فإذا لم يحصل كان التقصير من جهته فلا يعذر. (تبيين الحقائق للفخر الزيلعي، ١/١٠٢)

"যিম্মি যদি মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে ইলম অর্জন করার সুযোগ থাকায় তার জন্য বিধি-বিধান আবশ্যকীয় হয়ে যাবে। **কেননা অঞ্চলটি ইলম ব্যাপক হয়ে থাকা অঞ্চল**। তাই ইলম অর্জন না করলে এটি তার ত্রুটি হিসেবে গণ্য হবে, সুতরাং তা 'ওযর' হিসেবে ধর্তব্য হবে না।" (তাবয়িনুল হাকায়েক, ১/১০২)

ইবনে হাজার হাইতামি আশশাফেয়ি (মৃ-৯৭৪ হি.)

نعم يعذر مدعي الجهل، إن عذر **لقرب عهده بالإسلام، أو بعده عن العلماء**. (الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي، صـ٢٨٢، إكفار الملحدين، صـ٩١)

"হ্যাঁ! অজ্ঞতার দাবিদার 'ওযর' পেশ করলে তা 'ওযর' হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে, **যদি সে নবমুসলিম হয় অথবা উলামায়ে কেরাম থেকে দূরে বসবাসরত হয়।**" (আলই'লাম বি কাওয়াতিয়িল ইসলাম, পৃ: ২৮২ -আলজামে' ফি আলফাযিল কুফর নামক চার কিতাবের সমষ্টির সঙ্গে-, ইকফারুল মুলহিদিন, পৃ: ৯১)

অজ্ঞতার দাবি করা দ্বীনি বিষয়ে 'মুদাহানাত' শিথিলতা

চতুর্থত: তথাকথিত বর্তমান মুসলিম বিশ্বের গণতান্ত্রিক সরকারদের ব্যাপারে অজ্ঞতার দাবি করা কি দ্বীনি বিষয়ে 'মুদাহানাত' নয়? যেখানে যুগের পর যুগ ইসলামি দলগুলো -চাই তাদের মানহাজ সহিহ হোক বা না হোক- ইসলামি হুকুমত, শরয়ি কানুন, আল্লাহর সংবিধান-কুরআনের সংবিধানের দাবি করে আসছে এবং তা করে আসছে সংসদে আইন প্রণেতাদের সামনে, রাষ্ট্রের হর্তাকর্তাদের সামনে। দ্বীনের ধারক-বাহকগণ ধর্মনিরপেক্ষতা ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ার ঘোষণা দিয়ে আসছেন। এবং এটি একবার বা একদিনের ঘটনা নয়; বরং যুগের পর যুগ ধরে চলছে। এরপরও তাদের ব্যাপারে অজ্ঞতার দাবি করা কি অনর্থক নয়? এ দাবিকে কুরআন, সুন্নাহ, ফিকহ কতোটুকু সমর্থন করবে তা কি দেখার কোনো প্রয়োজন নেই?

'ইতমামে হুজ্জাত' দলিল পূর্ণ করা

এক্ষেত্রে কেউ কেউ আবার 'ইতমামে হুজ্জাত'র কথা বলেন। অর্থাৎ সব ঠিক আছে, তবে 'ইতমামে হুজ্জাত' হয়নি। 'ইতমামে হুজ্জাত'র পূর্বে কারো ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা করা মুশকিল।

'ইতমামে হুজ্জাত'র কয়েকটি চিত্র

'ইতমামে হুজ্জাত'র কী অর্থ? ফুকাহায়ে কেরাম যে সকল বিষয়ে বা অবস্থায় অজ্ঞতাকে 'ওযর' নয় বলে ফয়সালা দিয়েছেন; তা কি এজন্য নয় যে, তাতে 'ইতমামে হুজ্জাত' হয়ে গেছে? অন্যথায় অজ্ঞতা কেনো 'ওযর' হিসেবে ধর্তব্য হচ্ছে না? তবুও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস, সাহাবায়ে কেরামের আসার ও আইম্মায়ে দ্বীনের বক্তব্য থেকে আরো কিছু 'ইতমামে হুজ্জাত'র চিত্র তুলে ধরছি-

হাদিস

قال الإمام أبو داود: حدثنا مُحَمَّد بن سليمان الأنباري، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: كان رسول الله ﷺ إذا بعث أميراً على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيراً، وقال: إذا لقيت عدوك من المشركين **فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال**، فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم، وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، **فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم**...... (سنن أبي داوُد، كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين، صـ٥٧٣، رقم الحديث: ٢٦١٢. وأيضاً يراجع صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها، صـ٧٣٩، رقم الحديث ٤٥٢٢)

"বুরাইদা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই ছোটো বা বড়ো কোনো সৈন্যদলের আমির হিসেবে কাউকে প্রেরণ করতেন, প্রথমেই তাকে নিজের ব্যাপারে তাকওয়া ও তার সাথী অন্যান্য মুসলমানদের ব্যাপারে কল্যাণকামিতার অসিয়ত করতেন। এবং বলতেন, যখন

তোমার শত্রু মুশরিকদের সঙ্গে মুখোমুখি হবে, **তাদেরকে তিনটি বিষয়ের কোনো একটি গ্রহণ করার প্রতি আহ্বান জানাবে।** তা থেকে যেকোনো একটির প্রতি সাড়া দিলে তুমি তাদের থেকে তা গ্রহণ করে নিবে এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে। প্রথমেই তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার প্রতি আহ্বান করো। যদি তারা সেটির প্রতি সাড়া দেয়, তাদের থেকে তা গ্রহণ করে নাও এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকো। অতঃপর তাদেরকে তাদের অঞ্চল থেকে মুহাজিরদের অঞ্চলে স্থানান্তর হওয়ার আহ্বান জানাও। এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও; যদি তারা এমনটি করে, তাহলে মুহাজিরগণ যে অধিকার পায় তারাও সে অধিকার পাবে এবং মুহাজিরদের উপর যা অর্পিত হয় তাদের উপরও তা অর্পিত হবে। যদি তারা স্থানান্তরের ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানিয়ে নিজেদের অঞ্চলে অবস্থান করাকেই গ্রহণ করে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দাও; তারা বেদুঈন মুসলমানদের ন্যায় পরিগণিত হবে। অন্যান্য মুসলমানদের ক্ষেত্রে আল্লাহর যে সকল বিধান কার্যকর হয়, তাদের ক্ষেত্রেও তাই কার্যকর হবে এবং মুসলমানদের সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ না করলে 'গনিমত' যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও 'ফাই' সন্ধিসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদে তাদের কোনো অংশ থাকবে না। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তাদেরকে 'জিযয়া' অমুসলিমদের উপর ধার্যকৃত কর আদায় করতে বলো। যদি তারা তাতে সাড়া দেয়, তাদের থেকে তা গ্রহণ করো এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকো। **যদি তারা 'জিযয়া' দিতেও অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করে তাদের মোকাবেলায় কিতাল করো.....।"** (সুনানে আবু দাউদ, পৃঃ ৫৭৩, হাদিস নংঃ ২৬১২, আরো দেখুনঃ সহিহ মুসলিম, পৃঃ ৭৩৯, হাদিস নংঃ ৪৫২২)

রিবয়ি ইবনে আমেরের রাযি. বক্তব্য

রিবয়ি ইবনে আমের রাযি. রুস্তমকে উদ্দেশ্য করে যে কথাগুলো বলেছিলেন-

قال: الله ابتعثنا، والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه، وتركناه وأرضه يليها دوننا، ومن أبى قاتلناه أبداً، حتى نفضي إلى موعود الله. قال: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي. فقال رستم: قد سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه

وتنظروا! قال: نعم، كم أحب إليكم؟ أيوماً أو يومين؟ قال: لا بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا، وأراد مقاربته ومدافعته، فقال: إن مما سن لنا رسول الله ﷺ وعمل به أئمتنا، ألا نمكن الأعداء من آذاننا، ولا نؤجلهم عند اللقاء أكثر من ثلاث، فنحن مترددون عنكم ثلاثاً، فانظر في أمرك وأمرهم، **واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل، اختر الإسلام وندعك وأرضك، أو الجزاء، فنقبل ونكف عنك**، وإن كنت عن نصرنا غنياً تركناك منه، وإن كنت إليه محتاجاً منعناك **أو المنابذة في اليوم الرابع**، ولسنا نبدؤك فيما بيننا وبين اليوم الرابع إلا أن تبدأنا، أنا كفيل لك بذلك على أصحابي وعلى جميع من ترى قال: أَسَيِّدُهم أنت؟ قال: لا، ولكن المسلمين كالجسد بعضهم من بعض، يجير أدناهم على أعلاهم. (تاريخ الطبري، ٥٢٠/٣، البداية والنهاية، ٣٩/٧)

"রিবয়ি ইবনে আমের রাযি. বলেন, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলাই আমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছেন তাঁর ইচ্ছানুযায়ী মানুষকে মানুষের উপাসনা থেকে আল্লাহর ইবাদত, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে প্রশস্ততা এবং অন্যান্য ধর্মের অবিচার থেকে ইসলামের ন্যায়পরায়ণতার দিকে বের করে আনার জন্য। তাই তিনি তাঁর দ্বীন দিয়ে আমাদেরকে মানুষদের নিকট পাঠিয়েছেন সেই দ্বীনের দিকে আহ্বান করার জন্য। যে সেই দ্বীনকে গ্রহণ করবে আমরা তার থেকে সেটি গ্রহণ করে ফিরে যাবো এবং তাকে ও তার অঞ্চল ছেড়ে চলে যাবো; সেই এটির দেখা-শুনা করবে। আর যে তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতিতে পৌঁছা পর্যন্ত আমরা তার মোকাবেলায় যুদ্ধ করতেই থাকবো। রুস্তম বললো, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কী? রিবয়ি ইবনে আমের বললেন, অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে যে মারা যায় তার জন্য জান্নাত, আর যে জীবিত থাকে তার বিজয়। রুস্তম বললো, আমি তোমাদের কথা শুনেছি। তোমরা কি এ বিষয়ে একটু বিলম্ব করবে যেনো আমরাও ভেবে দেখতে পারি এবং তোমরাও একটু ভেবে দেখো! রিবয়ি ইবনে আমের বললেন, ঠিক আছে! তুমি কতোদিন সুযোগ চাও? একদিন নাকি দু'দিন? রুস্তম বললো, না! বরং আমি এ বিষয়ে জ্ঞানী-গুণী ও নেতা পর্যায়ের লোকদের সঙ্গে পত্র বিনিময় করা পর্যন্ত সুযোগ চাই। রুস্তম রিবয়ি ইবনে আমেরের নৈকট্য অর্জন করে তাঁকে তাঁর অবস্থান থেকে ফেরাতে চেয়েছে। রিবয়ি ইবনে আমের বললেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পদ্ধতি প্রবর্তন করে গেছেন এবং আমাদের ইমামগণ যে পদ্ধতি কার্যকর করেছেন; তা হচ্ছে, শত্রুর হাতে আমরা যেনো আমাদের কান ন্যস্ত করে না দেই এবং মোকাবেলার মুহূর্তে শত্রুকে যেনো তিন দিনের অধিক সুযোগ না দেই। সুতরাং আমরা তিনদিন তোমাদের থেকে বিরত থাকবো, তুমি তোমার ও তোমার সৈন্যদের বিষয়ে ভেবে দেখো। **তিনদিন পর তিনটির কোনো একটি গ্রহণ করে নাও। হয়তো ইসলাম গ্রহণ করে নাও; আমরা তোমাকে ও তোমার অঞ্চল ছেড়ে চলে যাবো। অথবা 'জিযয়া'র বিধান স্বীকার করে নাও; আমরা তোমার থেকে তা গ্রহণ করবো এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবো।** তখন তুমি যদি আমাদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী না হও, আমাদের তা করার প্রয়োজন হবে না। আর যদি সাহায্যের প্রয়োজন মনে করো, তাহলে তোমাকে আমরা রক্ষা করবো। আর যদি প্রস্তাবগুলো গ্রহণ না করো, **তাহলে চতুর্থদিন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।** এই চারদিনের মাঝে তোমরা না করলে আমরা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধের সূচনা করবো না। এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার ব্যাপারে আমি আমার সকল সহচর এবং যাদেরকে তুমি দেখছো সকলের দায়িত্ব নিচ্ছি। রুস্তম বললো, তুমি কি তাদের নেতা? রিবয়ি ইবনে আমের বললেন, না! কিন্তু মুসলমানরা শরীরের ন্যায় একে অপরের অংশ। তাদের নিম্নস্তরের ব্যক্তিও উচ্চস্তরের ব্যক্তির ক্ষেত্রে আশ্রয় দিতে পারে।" (তারিখে তাবারি, -১৪ হিজরির আলোচনা- ৩/৫২০, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া, ৭/৩৯)

নাফে' আলফকিহ মাওলা ইবনে উমরের দাবি (মৃ-১১৭ হি.)

قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، حدثنا سليم بن أخضر، عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إلي: "**إنما كان ذلك في أول الإسلام**، قد أغار رسول الله ﷺ على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم، وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ - قال يحيى: أحسبه قال- جويرية -أو قال: البتة- ابنة الحارث"، وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر، وكان في ذاك الجيش. (صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة، ص٧٣٩، رقم الحديث: ٤٥١٩، سنن أبي داوُد، كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين، ص٥٧٧، رقم الحديث: ٢٦٣٣)

"ইবনে আউন বলেন, কিতালের পূর্বে ইসলামের প্রতি আহ্বানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে আমি নাফে'র নিকট লিখে পাঠালাম। তিনি প্রত্যুত্তরে আমাকে লিখলেন, **ইসলামের সুচনাকালে এটির বিধান ছিলো**। পরবর্তীতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বনিল মুসতালিককে অনবগত রেখেই তাদের উপর হঠাৎ আক্রমণ করেছেন, অথচ তাদের গবাদিপশুকে তখন পানি পান করানো হচ্ছিল। তাদের যুদ্ধাদেরকে হত্যা করেছেন এবং বন্দির উপযোগীদেরকে বন্দি করেছেন। সেদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারেসকে গনিমত হিসেবে পেয়েছেন। নাফে' বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর আমাকে এটি বর্ণনা করেছেন, তখন তিনি সে সৈন্যদলে ছিলেন।" (সহিহ মুসলিম, পৃ: ৭৩৯, হাদিস নং: ৪৫১৯, সুনানে আবু দাউদ, পৃ: ৫৭৭, হাদিস নং: ২৬৩৩)

ইমাম শাফেয়ির দাবি (মৃ-২০৪ হি.)

لو عذر الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيراً من العلم؛ إذ كان يحط عن العبد أعباء التكليف ويريح قلبه من ضروب التعنيف، **فلا حجة للعبد في جهله بالحكم بعد التبليغ والتمكين:** {لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل}. (المنثور في القواعد للبدر الزركشي، حرف الجيم، ٢٧٢/١، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٠١/١٦)

"জাহেলের জাহালত যদি 'ওযর' হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে তো ইলমের চেয়ে জাহালতই উত্তম হতো। যেহেতু তা দায়িত্বভারের বোঝা নামিয়ে দেয় এবং বিভিন্ন ধরনের তীব্র ভর্ৎসনা থেকে তার অন্তরকে প্রশান্তি দেয়। **সুতরাং বার্তা পৌঁছা বা সেটির জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ থাকার পর বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে জাহালত-অজ্ঞতা কারো জন্য (ওযরের) দলিল হতে পারে না**। 'যাতে আল্লাহর বিপক্ষে রাসুলদের পর মানুষের জন্য কোন অজুহাত না থাকে।" (আলমানসুর ফিল কাওয়ায়েদ, ১/২৭২, আলমাউসুআতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যাহ, ১৬/২০১)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার দাবি (মৃ-৭২৮ হি.)

وإذا أخبر بوقوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها لم يكن من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر ونهي الناهي منها إلى كل مكلف في العالم؛ إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة، فكيف يشترط فيما هو من توابعها؟ **بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك**

إليهم. ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه كان التفريط منهم لا منه. (مجموع الفتاوى لابن تيمية، قاعدة في الحسبة، فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ١٢٥/٢٨)

"যখন সৎ কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করা প্রতিফলিত হওয়ার ব্যাপারে অবগত করা হয়, তখন সেক্ষেত্রে এটি শর্ত নয় যে, আদেশদাতার আদেশ এবং বারণকারীর নিষেধ পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে। কেননা এটি তো 'রিসালত' পৌঁছানোর ক্ষেত্রেও শর্ত নয়, তাহলে কীভাবে তা রিসালতের আনুষঙ্গিক বিষয়ের ক্ষেত্রে শর্ত হতে পারে! বরং শর্ত হলো, **মানুষদের নিকট তা পৌঁছার সুযোগ থাকা**। দায়িত্বশীল তার দায়িত্ব আদায় করার পর যদি তারা তাদের নিকট সেই জ্ঞান পৌঁছার জন্য চেষ্টা না করে শিথিলতা প্রদর্শন করে, তাহলে এটি তাদের অবহেলা হিসেবে পরিগণিত হবে, দায়িত্বশীলের নয়।" (মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৮/১২৫)

ومن جواب **هؤلاء أن حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم**، فليس من شرط حجة الله تعالى علم المدعوين بها. ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعاً من قيام حجة الله تعالى عليهم، وكذلك إعراضهم عن استماع المنقول عن الأنبياء وقراءة الآثار المأثورة عنهم لا يمنع الحجة، إذ المكنة حاصلة. (كتاب الرد على المنطقيين لابن تيمية، إنكار المتواترات هو من أصول الإلحاد والكفر، صـ١٤٠)

"এদের প্রত্যুত্তরে বলা যায়, **রাসুলগণের আবির্ভাবের পর ইলম অর্জনের সুযোগ থাকার মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে দলিল পূর্ণ হয়ে গেছে**। আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে দলিল পূর্ণ হওয়ার জন্য আহ্বানকৃত প্রত্যেকের তা জানা শর্ত নয়। এজন্যই তো কুরআন শ্রবণ ও তা নিয়ে গবেষণা করা থেকে কাফেরদের বিরত থাকা আল্লাহ তাআলার দলিল পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হয়নি। তেমনিভাবে নবীদের থেকে বর্ণিত বিষয়াদি শুনা এবং তাদের থেকে ক্রমাগত সূত্রে বর্ণিত হাদিস পড়া থেকে বিরত থাকা দলিল পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক নয়। কেননা সুযোগ বিদ্যমান আছে।" (কিতাবুর রদ্দি আলাল মানতিকিয়্যিন, পৃ: ১৪০)

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরির বক্তব্য (মৃ-১৩৫২ হি.)

ويريد (أي ابن تيمية) -رحمه الله- بإقامة الحجة في تصانيفه في مسألة التكفير: **التبليغ لا غير**، كأخبار معاذ، ودعوة علي ﷺ ليهود خيبر. (إكفار الملحدين، ص٦١)

"কুফর আখ্যা দেয়ার মাসআলায় ইবনে তাইমিয়া রহ. দলিল পূর্ণ হওয়া দ্বারা **শুধুমাত্র বার্তা পৌঁছানো উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন, অন্য কিছু নয়।** যেমন, মুআয রাযি. -এর হাদিস ও আলি রাযি. কর্তৃক খাইবারের ইহুদিদের ইসলামের প্রতি আহ্বান করা।" (ইকফারুল মুলহিদিন, পৃঃ ৬১)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সৈন্যদলকে অসিয়ত, রিবয়ি ইবনে আমের রাযি. কর্তৃক রুস্তমকে বলা কথাগুলো এবং নাফে' আলফকিহের ফাতওয়া কি 'ইতমামে হুজ্জাত'র বাস্তব নমুনা নয়? এরপরও যদি কেউ তাদের অজ্ঞতা দূর না হওয়ার দাবি করে, তখন ইমাম শাফেয়ির কণ্ঠে বলতে হয়, 'তাহলে তো ইলমের চেয়ে জাহালতই উত্তম হতো।'

'ইলকাউল ইয়াকিন' বিশ্বাস স্থাপন করানো

অথবা কেউ যদি দাবি করে (যেমনটি কেউ কেউ ইতোমধ্যে করেছেন), 'এতোটুকুতেই যথেষ্ট হবে না; বরং তাদের অন্তরে 'ইলকাউল ইয়াকিন' বিশ্বাস স্থাপন করাতে হবে, অতঃপর হটকারিতা প্রদর্শন করলে হুকুম দেয়া যাবে।' তাদের ব্যাপারে আমরা আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ. এর বক্তব্যটি হুবহু তুলে দিচ্ছি।

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরির বক্তব্য

ومن زعم أنه لا بد من إلقاء اليقين في قلبه وإثلاج صدره، فإذا عاند بعد ذلك فقد كفر وإلا فلا، فإن ذلك الزاعم لم يضع للدين حقيقة تارة، وإنما جعله يدور مع الخيال كيفما دار، وهذا باطل قطعاً، فإن الأمر فيما ثبت ضرورة مفروغ عنه، فمن آمن به فقد دان بدين الله، ومن أنكره فقد كفر، وإن لم يقصد الكفر، وإنما الدور مع الظن في المحل المجتهد فيه لا في غيره، فكما أن في باب إنكار الحقائق عنادية وعندية ولا أدرية وشاكة في الشك، فكذلك هذه الأقسام في إنكار الضروريات، وكلها كفر. (إكفار الملحدين، ص١٢٨)

“যে মনে করে যে, ‘তার অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করাতে হবে এবং হৃদয় সন্তুষ্ট করাতে হবে, এরপর যদি সে হটকারিতা প্রদর্শন করে তাহলে কাফের হয়ে যাবে, অন্যথায় নয়।’ এই লোক মূলত দ্বীনের কোনো বাস্তবতাই অবশিষ্ট রাখেনি। সে দ্বীনকে কল্পনাপ্রসূত বানিয়েছে যে, কল্পনায় যা আসে তাই। এটি নিশ্চিত একটি বাতিল-অসার দাবি। কেননা অকাট্যভাবে যা প্রমাণিত, সেক্ষেত্রে আর কোনো দায়-দায়িত্ব থাকে না। যে ঈমান আনলো সে আল্লাহর দ্বীনকে মেনে নিলো, আর যে অস্বীকার করলো সে কুফরি করলো; যদিও সে কুফরের ইচ্ছা না করে। ধারণা অনুযায়ী চলা যায় মতভেদপূর্ণ মাসআলায়, অন্য ক্ষেত্রে নয়। তো যেমনিভাবে ‘হাকিকত’ বাস্তবতা অস্বীকারের ক্ষেত্রে ‘ইনাদিয়্যাহ’, ‘ইনদিয়্যাহ’, ‘লা আদরিয়্যাহ’ এবং ‘শাক্কাহ’ বিভিন্ন দল-উপদল আছে, তেমনিভাবে অকাট্য বিধান অস্বীকারের ক্ষেত্রেও এ প্রকারগুলো রয়েছে। আর এ সবগুলোই কুফর।” (ইকফারুল মুলহিদিন, পৃ: ১২৮)

ষষ্ঠ সংশয়: 'ইকরাহ'-জবরদস্তির 'ওযর'

'তাকফির' প্রতিবন্ধক বিষয়াদি থেকে কেউ কেউ আবার 'ইকরাহ'র প্রসঙ্গ এনে বলেন, তাদের কোনো বাধ্যবাধকতা আছে কি না; তাও খতিয়ে দেখতে হবে। বাহিরের কোনো চাপের কারণে যদি এমনটি করে থাকে, তাহলে তো 'ইকরাহ'-জবরদস্তির কারণে তাদের ব্যাপারে কুফরের হুকুম দেয়া যাবে না।

সংশয়ের পর্যালোচনা

'ইকরাহ'র সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, কোন প্রকারের 'ইকরাহ'র ক্ষেত্রে কুফরের অনুমতি আছে এবং কী কী শর্তে তা 'ইকরাহ' হিসেবে ধর্তব্য হবে; আমি এ সংক্রান্ত আইম্মায়ে দ্বীনের কিছু বক্তব্য উল্লেখ করে দিচ্ছি। সচেতন পাঠক আশা করি ফলাফল বের করে নিতে পারবেন।

'ইকরাহ' সংক্রান্ত আইম্মায়ে দ্বীনের বক্তব্য

ইমাম শাফেয়ি (মৃ-২০৪ হি.)

والإكراه أن يصير الرجل في يدي من لا يقدر على الامتناع منه من سلطان أو لص أو متغلب على واحد من هؤلاء، ويكون المكرَه يخاف خوفاً عليه دلالة أنه إن امتنع من قول ما أمر به يبلغ به الضرب المؤلم أو أكثر منه أو إتلاف نفسه. (الأم للشافعي، الإقرار، الإكراه وما في معناه، ٤/٤٩٦)

"ইকরাহ' হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি বাদশাহ, দস্যু বা এদের থেকে পরাভূতকারী এমন কারো হাতে পড়া যার থেকে পরিত্রাণের সক্ষমতা তার নেই। এবং 'মুকরাহ' বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তি এই আশঙ্কা করছে যে, যদি সে আদিষ্ট কথা বলা থেকে বিরত থাকে, তাহলে তাকে যন্ত্রণাদায়ক প্রহার বা তার চেয়েও অধিক অথবা তার আত্মা হরণ করা হবে।" (আলউম্ম, ৪/৪৯৬)

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (মৃ-২৪১ হি.)

فصل- الإكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها. وفي الإكراه المبيح لذلك عن أحمد روايتان: إحداهما: أنه يخاف على نفسه أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمر به، والثانية: أن التخويف لا يكون إكراهاً حتى ينال بعذاب، وإذ ثبت جواز التقية فالأفضل ألا يفعل. (زاد المسير لابن الجوزي، سورة النحل، -الآية: ١٠٦- ٤٩٦/٤)

"কুফরি কথার উপর 'ইকরাহ' সেটি উচ্চারণ করার বৈধতা প্রদান করে। এই বৈধতা প্রদানকারী 'ইকরাহ'র ব্যাপারে ইমাম আহমাদ থেকে দু'টি বর্ণনা আছে। একটি হচ্ছে, আদিষ্ট কাজটি না করলে সে তার জীবননাশ বা অঙ্গহানীর আশঙ্কা করছে। দ্বিতীয় বর্ণনা হচ্ছে, কষ্ট দেয়ার পূর্বে শুধুমাত্র ভীতিপ্রদর্শনের মাধ্যমে 'ইকরাহ' সাব্যস্ত হবে না। আর যেহেতু 'তাকিয়্যা' মুখে একটি বলে অন্তরে আরেকটি উদ্দেশ্য নেয়ার বৈধতা প্রমাণিত, তাহলে আদিষ্ট কাজটি না করাই উত্তম।" (যাদুল মাসির, ৪/৪৯৬, সুরা নাহল, আয়াত: ১০৬)

আবু বকর আলজাসসাস আলহানাফি (মৃ-৩৭০ হি.)

قال أبو بكر: هذا أصل في جواز إظهار كلمة الكفر في حال الإكراه، والإكراه المبيح لذلك هو أن يخاف على نفسه أو بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمره به، فأبيح له في هذه الحال أن يظهر كلمة الكفر ويعارض بها غيره إذا خطر ذلك بباله، فإن لم يفعل ذلك مع خطوره بباله كان كافراً. (أحكام القرآن للجصاص، سورة النحل، باب الاستعاذة، ١٣/٥)

"আবু বকর আলজাসসাস বলেন, 'ইকরাহ' অবস্থায় কুফরি কথা প্রকাশের বৈধতার পক্ষে এই আয়াতটি দলিল। আর এটির বৈধতা প্রদানকারী 'ইকরাহ' হচ্ছে, আদিষ্ট কাজটি না করলে জীবননাশ বা কোনো অঙ্গহানীর আশঙ্কা করা। এ অবস্থায় কুফরি কথা প্রকাশ করার বৈধতা দেয়া হয়েছে। তবে কুফরি কথা উচ্চারণ করার সময় যদি কুফরি নয় এমন আরেকটি উদ্দেশ্য মনে আসে, তাহলে সেটি উদ্দেশ্য নেবে। মনে আসা সত্ত্বেও যদি সে তা না করে, তাহলে কাফের হয়ে যাবে।" (আহকামুল কুরআন, ৫/১৩)

আলাউদ্দিন কাসানি আলহানাফি (মৃ-৫৮৭ হি.)

(كتاب الإكراه)..... وفي الشرع عبارة عن الدعاء إلى الفعل بالإيعاد والتهديد مع وجود شرائطها التي نذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى.

فصل- وأما بيان أنواع الإكراه فنقول: إنه نوعان: نوع يوجب الإلجاء والاضطرار طبعاً، كالقتل والقطع والضرب الذي يخاف فيه تلف النفس أو العضو قل الضرب أو كثر........ وهذا النوع يسمى إكراهاً تاماً، ونوع لا يوجب الإلجاء والاضطرار، وهو الحبس والقيد والضرب الذي لا يخاف منه التلف......... وهذا النوع من الإكراه يسمى إكراهاً ناقصاً.

فصل- وأما شرائط الإكراه فنوعان: نوع يرجع إلى المكرِه، ونوع يرجع إلى المكرَه. أما الذي يرجع إلى المكرِه، فهو أن يكون قادراً على تحقيق ما أوعد، لأن الضرورة لا تتحقق إلا عند القدرة............ وأما النوع الذي يرجع إلى المكرَه، فهو أن يقع في غالب رأيه وأكثر ظنه أنه لو لم يجب إلى ما دعي إليه تحقق ما أوعد به، لأن غالب الرأي حجة خصوصاً عند تعذر الوصول إلى التعين، حتى إنه لو كان في أكثر رأي المكرَه أن المكرِه لا يحقق ما أوعده لا يثبت حكم الإكراه شرعاً.................

وأما النوع الذي هو مرخص، فهو إجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب بالإيمان، إذا كان الإكراه تاماً، وهو محرم في نفسه مع ثبوت الرخصة، فأثر بالرخصة في تغير حكم الفعل وهو المؤاخذة لا في تغير وصفه وهو الحرمة، لأن كلمة الكفر مما لا يحتمل الإباحة بحال، فكانت الحرمة قائمة إلا أنه سقطت المؤاخذة لعذر الإكراه. (بدائع الصنائع للكاساني، ٧/١٧٥، ١٧٦)

"(কিতাবুল ইকরাহ)..... শরিআতের পরিভাষায় 'ইকরাহ' বলা হয়, ভীতিপ্রদর্শন ও হুমকিপ্রদানের মাধ্যমে কোনো কাজ করতে বলা, সঙ্গে ওই সকল শর্তও প্রযোজ্য যা যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

'ইকরাহ'র প্রকারভেদ সম্পর্কে আমরা বলবো যে, 'ইকরাহ' দু'প্রকার। একটি হচ্ছে, যা স্বভাবত বাধ্যতাকে আবশ্যকীয় করে। যেমন, হত্যা, কর্তন বা এমন

প্রহার যার কারণে জীবননাশ বা অঙ্গহানীর আশঙ্কা করা হয়, চাই প্রহারের পরিমাণ কম হোক বা বেশি।..... এই প্রকারটিকে 'ইকরাহে তাম' পূর্ণমাত্রার জবরদস্তি বলা হয়। আরেকটি প্রকার যা বাধ্যতাকে আবশ্যকীয় করে না। যেমন, গ্রেফতারি, বন্দিকরণ এবং এমন প্রহার যাতে অঙ্গহানীর আশঙ্কা থাকে না।..... এটিকে 'ইকরাহে নাকেস' স্বল্পমাত্রার জবরদস্তি বলা হয়।

'ইকরাহ'র শর্তাবলী দু'প্রকার। একটি প্রকার যা 'মুকরিহ' বলপ্রয়োগকারীর সঙ্গে সম্পৃক্ত, আর অপরটি বলপ্রয়োগকৃতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। 'মুকরিহ' বলপ্রয়োগকারীর সঙ্গে সম্পৃক্ত শর্ত হচ্ছে, সে যে হুমকি দিচ্ছে তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হওয়া। কেননা শক্তির উপস্থিতি ব্যতীত 'যরুরাত' ঠেকায় পড়া অবস্থা পরিগণিত হয় না।..... আর 'মুকরাহ' বলপ্রয়োগকৃতের সঙ্গে সম্পৃক্ত শর্ত হচ্ছে, তার প্রবলধারণা হতে হবে যে, আহ্বানকৃত বিষয়ে যদি সে সাড়া না দেয় তাহলে প্রদান করা হুমকি সে বাস্তবায়ন করবে। কেননা প্রবলধারণা এটি দলিল, বিশেষকরে যখন নির্দিষ্টকরণ পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব হয় না। সুতরাং 'মুকরাহ'র যদি প্রবলধারণা হয় যে, 'মুকরিহ' যে হুমকি দিয়েছে তা বাস্তবায়ন করবে না, তাহলে শরিআতের দৃষ্টিতে তা 'ইকরাহ' হিসেবে সাব্যস্ত হবে না।...............

আর শরিআত যে প্রকারের ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছে তা হচ্ছে, 'ইকরাহে তাম' পূর্ণমাত্রার জবরদস্তির সময় ইমানের উপর অন্তরকে স্থির রেখে মুখে কুফরি শব্দ উচ্চারণ করা। তা মূলত হারাম, তবে ছাড়ও প্রমাণিত। সুতরাং ছাড়ের প্রভাব পড়বে কাজের হুকুম পরিবর্তন হওয়ার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হবে না। হারাম হওয়ার যে বিশেষণ ছিলো তা পরিবর্তন হবে না। কেননা কুফরি কথা কোনো অবস্থাতেই বৈধতাকে গ্রহণ করতে পারে না। তাই তা হারাম হওয়া যথারীতিই অবশিষ্ট থাকবে, তবে অপরাধী হওয়াটা 'ইকরাহ'র ওযরের কারণে বাদ যাবে।" (বাদায়েউস সানায়ে', ৭/১৭৫, ১৭৬)

ফখরুদ্দিন রাযি আশশাফেয়ি (মৃ-৬০৬ হি.)

المسألة الرابعة: يجب ههنا بيان الإكراه الذي عنده يجوز التلفظ بكلمة الكفر، وهو أن يعذبه بعذاب لا طاقة له به، مثل التخويف بالقتل، ومثل الضرب الشديد والإيلامات القوية. (التفسير الكبير للرازي، سورة النحل، -الآية: ١٠٦- ١٢٣/٢٠)

“চতুর্থ মাসআলা: যে ‘ইকরাহ’র কারণে কুফরি কথা উচ্চারণ করা জায়েয, এখানে সেটির আলোচনা করা আবশ্যক। আর তা হচ্ছে, কাউকে এমন শাস্তি দেয়া যা সহ্য করা তার জন্য অসম্ভব। যেমন, হত্যা, কঠিন প্রহার এবং অস্বাভাবিক যন্ত্রণার ধমকি দেয়া।” (আততাফসিরুল কাবির ২০/১২৩, সুরা নাহল, আয়াত: ১০৬)

ইবনে তাইমিয়া আলহাম্বলি (মৃ-৭২৮ হি.)

وقال أبو العباس: تأملت المذهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكرَه عليه، فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها، فإن أحمد قد نص في غير موضع على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بتعذيب من ضرب أو قيد، ولا يكون الكلام إكراهاً. (الفتاوى الكبرى لابن تيمية، كتاب الطلاق، ٤٩٠/٥)

“আবুল আব্বাস ইবনে তাইমিয়া বলেন, আমি মাযহাবের কিতাবাদিতে এই মাসআলা গবেষণা করে দেখলাম যে, ‘মুকরাহ’ বলপ্রয়োগকৃতের অবস্থাভেদে ‘ইকরাহ’র হুকুম বিভিন্ন হবে। ‘হিবা’ ইত্যাদির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ‘ইকরাহ’ কুফরি কথার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ‘ইকরাহ’র মতো নয়। কেননা ইমাম আহমাদ একাধিক স্থানে এ কথা বলেছেন যে, প্রহার বা বন্দিকরণের মাধ্যমে শাস্তিপ্রদান করলে কুফরের ক্ষেত্রে ‘ইকরাহ’ সাব্যস্ত হবে। শুধুমাত্র মুখের ধমকি ‘ইকরাহ’ হতে পারে না।” (আলফাতাওয়াল কুবরা, ৫/৪৯০)

ফখরুদ্দিন যাইলায়ি আলহানাফি (মৃ-৭৪৩ হি.)

والإكراه نوعان ملجئ وغير ملجئ، فالملجئ هو الكامل، وهو أن يكرهه بما يخاف على نفسه أو على تلف عضو من أعضائه، فإنه يعدم الرضا ويوجب الإلجاء ويفسد الاختيار. وغير الملجئ قاصر، وهو أن يكرهه بما لا يخاف على نفسه ولا على تلف عضو من أعضائه، كالإكراه بالضرب الشديد أو القيد أو الحبس، فإنه يعدم الرضا ولا يوجب الإلجاء ولا يفسد الاختيار. (تبيين الحقائق للفخر الزيلعي، كتاب الإكراه، ١٨١/٥)

“‘ইকরাহ’ দু’প্রকার; ‘মুলজি’ যা বাধ্যতাকে প্রমাণ করে, অপরটি ‘গাইরে মুলজি’ যা বাধ্যতাকে প্রমাণ করে না। ‘মুলজি’ হচ্ছে ‘ইকরাহে কামেল’

পূর্ণমাত্রার জবরদস্তি। আর তা হচ্ছে, এমন শাস্তি দিয়ে বাধ্য করা যাতে সে জীবননাশ বা অঙ্গহানীর আশঙ্কাবোধ করে। কেননা এমতাবস্থায় তার সন্তুষ্টি বিলুপ্ত হয়ে যায়, বাধ্যতা প্রমাণিত হয় এবং ইচ্ছাশক্তি বাতিল হয়ে যায়। আর 'গাইরে মুলজি' হচ্ছে 'ইকরাহে কাসের' স্বল্পমাত্রার জবরদস্তি। আর তা হচ্ছে, এমন শাস্তি দিয়ে বাধ্য করা যাতে সে জীবননাশ বা অঙ্গহানীর আশঙ্কাবোধ করে না। যেমন, কঠিন প্রহার, বন্দিকরণ ও গ্রেফতারির মাধ্যমে জবরদস্তি করা। কেননা এতে যদিও সন্তুষ্টি বিলুপ্ত হয়, কিন্তু বাধ্যতা প্রমাণিত হয় না এবং ইচ্ছাশক্তি বাতিল হয় না।" (তাবয়িনুল হাকায়েক, ৫/১৮১)

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি আশশাফেয়ি (মৃ-৮৫২ হি.)

قوله: كتاب الإكراه– هو إلزام الغير بما لا يريده. وشروط الإكراه أربعة: الأول: أن يكون فاعله قادراً على إيقاع ما يهدد به، والمأمور عاجزاً عن الدفع ولو بالفرار، الثاني: أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك، الثالث: أن يكون ماهدده به فورياً، فلو قال: إن لم تفعل كذا ضربتك غداً لا يعد مكرَهاً، ويستثنى ما إذا ذكر زمناً قريباً جداً، أو جرت العادة بأنه لا يخلف، الرابع: أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره.

(فتح الباري للعسقلاني، ٢٢/٢٧٩)

"কিতাবুল ইকরাহ- 'ইকরাহ' বলা হয়, অন্যের উপর এমন কিছু চাপিয়ে দেয়া যা সে চাচ্ছে না। 'ইকরাহ' সাব্যস্ত হওয়ার শর্ত চারটি; এক. 'মুকরিহ' বলপ্রয়োগকারী যেটির হুমকি দিচ্ছে তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হওয়া এবং 'মুকরাহ' বলপ্রয়োগকৃত তা প্রতিহত করতে অক্ষম হওয়া, চাই তা পলায়ন করার মাধ্যমেই হোক না কেনো। দুই. 'মুকরাহ'র প্রবলধারণা হওয়া যে, যদি সে তা থেকে বিরত থাকে, তাহলে 'মুকরিহ' প্রদান করা হুমকি বাস্তবায়ন করবে। তিন. যে হুমকি দিচ্ছে তা তাৎক্ষণিক হতে হবে। যদি এমনটি বলে, তুমি যদি এ কাজ না করো তোমাকে আগামীকাল মারবো, তাহলে এটি 'ইকরাহ' হিসেবে ধর্তব্য হবে না। তবে এর ব্যতিক্রম হবে; যদি খুবই নিকটবর্তী সময়ের কথা উল্লেখ করে বা সকলেই জানে সে যা বলে তার ব্যতিক্রম করে না। চার. আদিষ্ট ব্যক্তির স্বেচ্ছায় করার কোনো প্রমাণ প্রকাশ হতে পারবে না।" (ফাতহুল বারি, ২২/২৭৯)

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি আলহানাফি (মৃ-১৩৫২ হি.)

وجملة الكلام فيه، أن الإكراه عندنا لا يتم إلا بتهديد إيقاع الفعل المهدد به على ذاته، أو أطرافه، أو القريب من أقاربه، فإن سابه أو هدده بإيقاع الفعل على غيره، لا يكون مكرَهاً. (فيض الباري للكشميري، كتاب الإكراه، ٦/٤٠٩)

"মোটকথা, আমাদের মতে নিজের, নিজের অঙ্গের বা কোনো নিকটাত্মীয়ের উপর প্রদান করা হুমকি বাস্তবায়ন হওয়ার ধমক আসা পর্যন্ত 'ইকরাহ' সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং যদি তাকে গালি দেয় বা অন্যের উপর হুমকি বাস্তবায়ন করার ধমক দেয়, তাহলে সে 'মুকরাহ' বলপ্রয়োগকৃত সাব্যস্ত হবে না।" (ফায়যুল বারি, ৬/৪০৯)

অত্যাশ্চর্যজনক 'ইকরাহ'র চিত্র

দ্বিতীয়ত: এটি কি পৃথিবীর এক অত্যাশ্চর্যজনক 'ইকরাহ'র চিত্র নয়? যে 'ইকরাহ'র স্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে প্রত্যেকে নিজের ও অন্যের জান-মাল, মেধা-সময়, ইজ্জত-আবরু এবং সর্বশেষ ইমানটাও কুরবান করে দিতে প্রস্তুত। 'মুকরাহ-অপারগদের দুআ তো কুরআনে বিবৃত হয়েছে এভাবে-"ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها"। আর এখন যাদের ব্যাপারে 'মুকরাহ' হওয়ার দাবি করা হচ্ছে; তাদের অবস্থাদৃষ্টের দুআ হচ্ছে- "ربنا (الديمقراطية) ثَبِّتْنا على هذه الرتبة المكره أهلها!"।

যারা 'ইকরাহ'র দাবি করছেন তারা কি একটি জিজ্ঞাসার জবাব দেবেন? একজন লোক শুধু ১০০% নয় বরং ২০০% নিশ্চিত, অমুক স্থানে গেলে তাকে 'ইকরাহ'র শিকার হয়ে কুফরিতে লিপ্ত হতে হবে। তবুও স্বাচ্ছন্দ্যে লোকটি সেখানে যাওয়ার পর 'ইকরাহ'র শিকার হলে সে 'ইকরাহ' কি 'ওযর' হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে?

এই 'ইকরাহ'র দাবির দৃশ্যটি কি এমন নয়? একজন লোক স্বেচ্ছায় গলায় রশি পেঁচিয়ে শূন্যে ঝুলে পড়েছে। নিচ থেকে এক পথিক আফসোস করে বললো, হায়! লোকটি আত্মহত্যার মতো একটি জঘন্যতম পাপাচারে লিপ্ত হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছে। পাশ থেকে আরেকজন বলে উঠলো, আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে কথা বলা উচিত। পাপ হবে কেনো? তার প্রাণ নিচ্ছে ওই রশিটা, সে তো এখন অপারগ!!!

এটি " ولكن من شرح بالكفر صدراً " এর অন্তর্ভুক্ত

তৃতীয়ত: শাসক শ্রেণির কোনো আচরণে কি বুঝা যায় যে তারা "إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان" এর অন্তর্ভুক্ত? নাকি তার বিপরীতে তাদের কথা-কাজ থেকে এটাই স্পষ্ট যে, তারা "ولكن من شرح بالكفر صدراً" এর অন্তর্ভুক্ত। কুফরি সংবিধান বাস্তবায়নে কার কতো বেশি অর্জন, কে কতো বেশি স্বাধীনভাবে কাজ করে চলছে, বিশ্বের ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের তালিকায় কে কতো নম্বর স্থান অধিকার করেছে, কে বিশ্বের পরাশক্তিকেও বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে দিতে পেরেছে, কোনো চাপের মুখে কাজ করছে না বলে কে কতো বেশি প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারছে, কোন সরকারের আমলে বিচার বিভাগ সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করেছে; এ সকল বিষয় যখন জনসম্মুখে কোনো রাখ-ঢাক ছাড়াই বলা হচ্ছে এবং দম্ভভরে বুক ফুলিয়ে বলা হচ্ছে, তখন তাদের ব্যাপারে 'মুকরাহ' হওয়ার দাবি করে তাদেরকে বাঁচাতে চাই নাকি আমরা বাঁচতে চাই? এটি কি "صرف الكلام إلى ما لا يرضى به المتكلم" হয়ে যাচ্ছে না?

তারপরও তাদেরকে বাঁচাতে যদি কেউ বলে, তারা দুনিয়ার মোহে পড়ে জাগতিক স্বার্থোদ্ধারে এমনটি করছে। তখন তাকে বলতে হয়; হাঁ! এ সকল লোকদের ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. **ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.** أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ. (سورة النحل، الآية: ١٠٦-١٠٩)

"যে ইমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরি করেছে এবং যারা তাদের অন্তর কুফর দ্বারা উন্মুক্ত করেছে, তাদের উপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। ওই ব্যক্তি ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয় (কুফরি করতে), অথচ তার অন্তর থাকে ইমানে পরিতৃপ্ত। **এটা এ জন্য যে, তারা আখিরাতের তুলনায়**

দুনিয়ার জীবনকে পছন্দ করেছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। এরাই তারা, যাদের অন্তর, কান ও দৃষ্টির উপর আল্লাহ মোহর করে দিয়েছেন এবং তারাই হচ্ছে গাফেল। সন্দেহ নেই, তারাই আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত। (সুরা নাহল, আয়াত: ১০৬-১০৯)

সপ্তম সংশয়: ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

কারো কারো দাবি হচ্ছে, ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে সবকিছু প্রমাণিত হলে তাকে কাফের বলা যাবে। সামগ্রিকভাবে 'তাকফির' করা যাবে না।

সংশয়ের পর্যালোচনা

উসুলে ফাতওয়া কী বলে?

এক্ষেত্রে উসুলে ফাতওয়া কী বলে? কোনো কুফরি মতবাদ যখন একটি মতবাদরূপে ব্যাপক হয়ে যায়, তখন ফাতওয়া কি ব্যক্তিবিশেষের উপর হয় নাকি উসুলিভাবে ওই মতবাদের উপর হয়ে থাকে? যুগ যুগ ধরে উলামায়ে কেরামের কর্মপদ্ধতি এক্ষেত্রে কীরূপ ছিলো? কাদিয়ানি সম্প্রদায়কে যখন উলামায়ে কেরাম কাফের হিসেবে ফাতওয়া দিয়েছিলেন, তখন কি ব্যক্তি ব্যক্তি ধরে ফাতওয়া দিয়েছিলেন নাকি গোলাম আহমাদ কাদিয়ানির কুফরি মতবাদের ভিত্তিতে পুরো সম্প্রদায়কে কাফের বলা হয়েছিলো? তেমনিভাবে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মতিক্রমে শিয়া নুসাইরি, আলাবি, আগাখানি ও ইসমাঈলি সম্প্রদায়কে যে কাফের সাব্যস্ত করা হয়েছে, তা কি ব্যক্তিবিশেষের ভিত্তিতে হয়েছিলো নাকি মতবাদের ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে হয়েছিলো? মওদুদি মতবাদে বিশ্বাসী হওয়ায় পুরো জামায়াতে ইসলামি দলকে কি গোমরাহ বলা হচ্ছে না? প্রতিটি ক্ষেত্রে কি এমন কিছু লোক পাওয়া যাবে না যারা মূল হুকুমের আওতাভুক্ত নয়?

যুগ যুগ ধরে উলামায়ে কেরামের কর্মপদ্ধতি থেকে এটাই স্পষ্ট যে, এ সকল ক্ষেত্রে ফাতওয়া হয় মতবাদের ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যক্তিবিশেষ শরয়ি দলিলের আলোকে বিশেষ ওযরের কারণে মূল হুকুমের আওতাভুক্ত নাও থাকতে পারে। তা হবে সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে ওযর প্রমাণিত হওয়ার পর।

ঝুঁকিমুক্ত মাসআলার ক্ষেত্রে এই উসুলের উপরই এখনও আমল চলছে। কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ মাসআলায় স্বীকৃত উসুলটিকে বিপরীত দিক থেকে বাস্তবায়নের জন্য কেনো বলা হচ্ছে তা বোধগম্য নয়।

অষ্টম সংশয়: জিয়াউর রহমানের ব্যাপারে কী বলা হবে?

কেউ কেউ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রসঙ্গ এনে বলেন, তার ব্যাপারে কী বলা হবে?

সংশয়ের পর্যালোচনা

প্রথম কথা: এ ধরনের সংশয় একেবারেই অবান্তর। দলিলের আলোকে ইমান-কুফরের আলোচনায় ব্যক্তিবিশেষ দিয়ে সংশয় প্রকাশ অপ্রাসঙ্গিক। দলিলের আলোকে জিয়াউর রহমানের কুফর প্রমাণিত হলে কি দ্বীনের খুব বিশাল ক্ষতি হয়ে যাবে?

মুজিব-জিয়া-এরশাদ-হাসিনা-খালেদা; কী পার্থক্য?

দ্বিতীয়ত: এক্ষেত্রে মুজিব-জিয়া-এরশাদ-হাসিনা-খালেদা; কী পার্থক্য? প্রত্যেকেই তো খিলাফত প্রতিষ্ঠার পথে বাধা। বরং কিছু কিছু কপট পোশাকধারী গণতান্ত্রিকের বাড়তি 'ইলহাদ' হচ্ছে, 'আল্লাহর আইন চাই' শ্লোগানের আড়ালে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ-সাম্প্রদায়িকতাসহ সকল কুফরি মতবাদ, দর্শন ও আইন-কানুনকে ইসলামি পোশাক পরানোর চেষ্টা করা। যেক্ষেত্রে হকের দাবিদার কেউ কেউ এখন তাদেরকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

তুলনামূলক ভালোর সঙ্গে আলোচ্য মাসআলার কী সম্পর্ক?

তৃতীয়ত: ফেরাউন ভালো ছিলো নাকি নমরুদ, শ্যারন নাকি নেতানিয়াহু, বুশ-ওবামা-ট্রাম্প থেকে কে ভালো? এ সকল তুলনামূলক ভালোর সঙ্গে আলোচ্য মাসআলার কী সম্পর্ক?

জিয়াউর রহমানের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি-

চতুর্থত: জিয়াউর রহমানের একটি বক্তব্য আমরা লক্ষ্য করতে পারি-

জিয়াউর রহমানের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি-

১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বরে একটি কর্মশালা উদ্বোধনকালে তিনি দলের কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন, **কোনো রাজনৈতিক আদর্শ ধর্মকে ভিত্তি করে হতে পারে না**। একটা অবদান থাকতে পারে, কিন্তু ধর্মকে কেন্দ্র করে কখনই রাজনীতি করা যেতে পারে না। অতীতে আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, ধর্মকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান সময়ে যখনই রাজনীতি করা হয়েছিলো সেটা বিফল হয়েছে। কারণ ধর্ম ধর্মই। আমাদের অনেকে আছে যারা আমাদের দেশে যে বিভিন্ন ধর্ম রয়েছে, সেগুলোকে কেন্দ্র করে রাজনীতির পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন, রাজনীতির রূপরেখা বানাতে চেষ্টা করেন। আমরা বারবার দেখেছি তারা বিফল হয়েছে। ধর্মের অবদান থাকতে পারে রাজনীতিতে, কিন্তু রাজনৈতিক দল ধর্মকে কেন্দ্র করে হতে পারে না। এটা মনে রাখবেন, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। (জিয়াউর রহমান উইকিপিডিয়া)।

এছাড়াও এদেশে মদের বৈধতা কে দিয়েছিলো তা আশা করি আমাদের জানা আছে।

ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাদ দিয়ে 'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে' কথাটি যোগ করলেই কি অন্যান্য সকল কুফর মাফ হয়ে যাবে! যদি মেনেও নেয়া হয়, তাহলে বর্তমানে যারা 'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে' কথাটিকে তুলে দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাকে আবার ফিরিয়ে এনেছে, তাদের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত?

নবম সংশয়: এটি একটি ‘শায’ রায়

সবকিছুর পরও একশ্রেণির দাবি, এটি একটি ‘শায’ রায়। জুমহুরের মতামত এর বিপরীত।

সংশয়ের পর্যালোচনা

‘জুমহুর’ ও ‘শায’ নির্ধারণের মাপকাঠি কী?

‘জুমহুর’ ও ‘শায’ নির্ধারণের মাপকাঠি কী? সুস্পষ্ট দলিল বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ‘শুযুয’ এবং দলিলবিহীন ‘জুমহুর’ প্রমাণিত হওয়ার পদ্ধতি কী? নাকি এটিও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে নির্ধারণ হবে? ‘খালকে কুরআনের মাসআলা’য় ইমাম আহমাদ ‘জুমহুর’ ছিলেন নাকি ‘শায’? বাস্তব অবস্থা কী ছিলো? ইবনে আবি দুআদ কি খলিফা মু’তাসিমকে একথা বলেনি; হে আমিরুল মুমিনিন! আপনি কি মনে করেন, আপনি, আপনার বিচারকরা এবং সকল মুফতি বাতিলের উপর আছে আর এক আহমাদ ইবনে হাম্বলই হকের উপর আছে? একই মাসআলায় ইমাম বুখারি ‘শায’ ছিলেন নাকি ‘জুমহুর’? নিজ আসাতিযায়ে কেরাম ও সমসাময়িকদের বিশাল কাফেলার বিরোধিতার ফলে ইমাম বুখারির অবস্থা কি এ পর্যায়ে পৌঁছে যায়নি যে তাঁকে দুআ করতে হয়েছে- "اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت، فاقبضني إليك"। কিন্তু হকের উপর কে ছিলেন? ফকিহুন নফস রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহির নিকট যখন তাঁর শায়খের দিকে নিসবত করে লেখা রিসালা ‘ফয়সালায়ে হাফত মাসআলা’ পৌঁছালো, তিনি তা জ্বালিয়ে দিলেন আর লোকেরা তার বিরুদ্ধে শোরগোল-হাঙ্গামা করলো, (দেখুন: তাযকিরায়ে মাশায়েখে দেওবন্দ, পৃ: ১৪৭) তখন তিনি ‘শায’ ছিলেন নাকি ‘জুমহুর’? হকের উপর কে ছিলেন? মূলত তাঁরাই ছিলেন ‘জুমহুর’ আর অধিকাংশ

ছিলো ‘শায’। ইতিহাসের পাতায় এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। এখানে প্রসিদ্ধ কয়েকটি উল্লেখ করলাম।

‘জুমহুর’ ও ‘জামাআহ’র ব্যাখ্যায় সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তীগণ

এগুলো ছিলো বাস্তবতা যা ঘটেছে। এবার আমরা দেখবো সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তীগণ ‘জুমহুর’ ও ‘জামাআহ’ থেকে কী বুঝেছেন-

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. (মৃ-৩২ হি.)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর বক্তব্যটি আমার তালাশ অনুযায়ী তিনজন ইমাম নিজস্ব সনদে শব্দের কিছুটা পরিবর্তনে উল্লেখ করেছেন। আবুল কাসেম হিবাতুল্লাহ আললালাকায়ি (মৃ-৪১৮ হি.), খতিবে বাগদাদি (মৃ-৪৬৩ হি.) এবং আবুল কাসেম ইবনে আসাকির (মৃ-৫৭১ হি.)। পূর্ণতার কারণে হাফেয ইবনে আসাকিরের শব্দে বক্তব্যটি উল্লেখ করা হচ্ছে।

عن عمرو بن ميمون الأودي قال: صحبت معاذاً باليمن، فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام، ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود، فسمعته يقول: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ويرغب في الجماعة، ثم سمعته يوماً من الأيام وهو يقول: سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لميقاتها فهو الفريضة، وصلوا معهم فإنها لكم نافلة، قال: قلت: يا أصحاب محمد! ما أدري ما تحدثوا؟ قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول لي: صل الصلاة وحدك وهي الفريضة، وصل مع الجماعة وهي النافلة. قال: يا عمرو بن ميمون! قد كنت أظنك أفقه أهل هذه القرية، **تدري ما الجماعة؟ قال: قلت: لا! قال: إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة، الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك. وفي رواية: الجماعة ما وافق طاعة وإن كنت وحدك. وفي رواية: فضرب على فخذي وقال: ويحك! إن جمهور الناس فارقوا الجماعة، إن الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل.** (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، ١٢١/١، رقم الحديث: ١٦٠، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، ٤٠٤/٢، الرقم: ١١٧٦، تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، ٤٠٩/٤٦-٤١٠)

"আমর ইবনে মাইমুন আলআউদি বলেন, ইয়ামেনে আমি মুআযের সংশ্রব গ্রহণ করেছিলাম। পরবর্তীতে সিরিয়ায় তাঁকে কবরে দাফন করার পূর্ব পর্যন্ত আমি তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করিনি। অতঃপর আমি সর্বশ্রেষ্ঠ ফকিহ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের সংশ্রব গ্রহণ করেছি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, তোমরা 'জামাআহ'কে আঁকড়ে ধরো, কেননা 'জামাআহ'র উপর আল্লাহর সাহায্য রয়েছে। এবং তিনি 'জামাআহ'র ব্যাপারে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করলেন। অতঃপর তাঁকে একদিন বলতে শুনলাম, তোমাদের উপর এমন কিছু আমির নিযুক্ত হবে যারা নামাযকে আপন সময় থেকে বিলম্ব করে আদায় করবে। তোমরা সময়মতো ফরয নামায আদায় করে নাও, অতঃপর তাদের সঙ্গে নফল হিসেবে নামায আদায় করো। আমর ইবনে মাইমুন বলেন, আমি বললাম, হে মুহাম্মাদের সাহাবিরা! বুঝতে পারছি না তাঁরা কী বলতে চায়? ইবনে মাসউদ বললেন, কেনো, কী হয়েছে? আমি বললাম, আপনি আমাকে 'জামাআহ'র ব্যাপারে আদেশ দিলেন এবং তা আঁকড়ে ধরতে উদ্বুদ্ধ করলেন, অতঃপর আপনিই আমাকে বলছেন, ফরয নামায একাকী আদায় করে জামাআতের সঙ্গে নফল হিসেবে নামায আদায় করতে। ইবনে মাসউদ বললেন, হে আমর ইবনে মাইমুন! আমি তো তোমাকে এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড়ো ফকিহ হিসেবে ধারণা করেছিলাম। **তুমি কি জানো 'জামাআহ' কী? আমি বললাম, না! তিনি বললেন, অধিকাংশ 'জামাআহ' হচ্ছে যারা জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। 'জামাআহ' হচ্ছে যা 'হক' অনুযায়ী হয়, যদিও তুমি একাকী হও। অন্য বর্ণনায় আছে, 'জামাআহ' হচ্ছে যা আনুগত্যের অনুযায়ী, যদিও তুমি একাকী হও। অন্য বর্ণনায় আছে, আমার রানের উপর তিনি হাত মারলেন এবং বললেন, তোমার জন্য আফসোস; মানুষদের মধ্যে 'জুমহুর' তো হচ্ছে, যারা জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আল্লাহর আনুগত্য অনুযায়ী যা হবে, তাই হচ্ছে 'জামাআহ'।"** (শরহু উসুলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়ালজামাআহ, ১/১২১, হাদিস নং: ১৬০, আলফকিহ ওয়ালমুতাফাক্কিহ, ২/৪০৪, নং ১১৭৬, তারিখে দিমাশক, ৪৬/৪০৯-৪১০)

ইবরাহিম নাখায়ি (মৃ-৯৬ হি.)

قال الخطيب البغدادي: أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس مُحَمَّد بن يعقوب الأصم، نا أبو علي الحسن ابن إسحاق بن يزيد العطار بغدادي، نا عمر يعني ابن شبيب

المسلي، نا عثمان بن ثوبان عن أبيه، قال: قال إبراهيم النخعي: **الجماعة هو الحق وإن كنت وحدك**. (الفقيه والمتفقه، ٢/٤٠٤، الرقم: ١١٧٧)

"ইবরাহিম নাখায়ি বলেন, **'হক'ই হচ্ছে 'জামাআহ', যদিও তুমি একাকী হও।"** (আলফকিহ ওয়ালমুতাফাক্কিহ, ২/৪০৪, নং: ১১৭৭)

নুআইম ইবনে হাম্মাদ (মৃ-২২৮ হি.)

قال ابن عساكر: قال: وأنا أبو بكر البيهقي، أنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الله السديدي البيهقي، أنا أبو حامد أحمد بن مُحَمَّد بن الحسين الخُسْرَوْجِرْدي، نا داود بن الحسين البيهقي، نا حميد بن زنجوية، قال قال نعيم بن حماد في هذا الحديث (حديث ابن مسعود المذكور): يعني **إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ**. (تاريخ مدينة دمشق، ٤٠٩/٤٦، تهذيب الكمال للمزي، ٢٦٥/٢٢)

"আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের উপরিউক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় নুআইম ইবনে হাম্মাদ বলেন, **জামাআতে যখন ফাসাদ এসে যায়, তখন তুমি ফাসাদ আসার পূর্বে জামাআত যে আদর্শের উপর ছিলো সেটিকে আঁকড়ে ধরো, যদিও তুমি একাকী হও। কেননা তখন তুমিই 'জামাআহ'।"** (তারিখে দিমাশক, ৪৬/৪০৯, তাহযিবুল কামাল, ২২/২৬৫)

আবু শামা আলমাকদেসি (মৃ-৬৬৫ হি.)

قال الإمام أبو شامة المقدسي: وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة **فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلاً والمخالف كثيراً**، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. (الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة المقدسي، ص١٩)

"আবু শামা আলমাকদেসি বলেন, 'জামাআহ' আঁকড়ে ধরার যে আদেশ বর্ণিত হয়েছে, **তা দ্বারা উদ্দেশ্য 'হক' আঁকড়ে ধরা ও তার অনুসরণ করা। যদিও সত্যের অনুসারী কম হয় এবং বিরোধীদের সংখ্যা অধিক হয়।** কেননা 'হক'

তো হচ্ছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে প্রথমদিকের 'জামাআহ' যে আদর্শের উপর ছিলো। পরবর্তীতে বাতিলের আধিক্যের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।" (আলবায়েস আলা ইনকারিল বিদা' ওয়ালহাওয়াদেস, পৃ: ১৯)

ইবনুল কাইয়িম (মৃ-৭৫১ হি.)

قال الحافظ ابن القيم: -العالم صاحب الحق- واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق، وإن كان وحده، وإن خالفه أهل الأرض (ثم ذكر كلام ابن مسعود ونعيم بن حماد، ثم قال:) وقال بعض أئمة الحديث وقد ذكر له السواد الأعظم، فقال: أتدري ما السواد الأعظم؟ هو محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه. فمسخ المختلفون الذين جعلوا السواد الأعظم والحجة والجماعة هم الجمهور، وجعلوهم عياراً على السنة، وجعلوا السنة بدعة، والمعروف منكراً لقلة أهله وتفردهم في الأعصار والأمصار، وقالوا: من شذ شذ الله به في النار، وما عرف المختلفون أن الشاذ ما خالف الحق وإن كان الناس كلهم عليه إلا واحداً منهم فهم الشاذون. وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا نفراً يسيراً؛ فكانوا هم الجماعة، وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون، وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة، ولما لم تحمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين! أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل وأحمد وحده هو على الحق؟ فلم يتسع علمه لذلك؛ فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل؛ فلا إله إلا الله، ما أشبه الليلة بالبارحة، وهي السبيل المهيع لأهل السنة والجماعة حتى يلقوا ربهم، مضى عليها سلفهم، وينتظرها خلفهم: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا} [الأحزاب: ٢٣] ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. (إعلام الموقعين لابن القيم، ٥/٣٨٨)

"হাফেয ইবনুল কাইয়িম বলেন, -হকের পতাকাবাহী আলেম- জেনে রাখা উচিত, 'ইজমা', 'হুজ্জাহ' ও 'সাওয়াদে আ'যাম' বড়ো জামাআত সবই হচ্ছে

মূলত হকের পতাকাবাহী আলেম, যদিও সে একাকী হয় এবং দুনিয়াবাসী তার বিরোধিতা করে। (অতঃপর তিনি ইবনে মাসউদ রাযি. ও নুয়াইম ইবনে হাম্মাদের বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন) কোনো এক ইমামুল হাদিসকে বড়ো জামাআত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তোমরা কি জানো বড়ো জামাআত কী? তা হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনে আসলাম আততুসি ও তার সঙ্গীরা। মতভেদ সৃষ্টিকারীরা বিকৃতি সাধন করে অধিকাংশকে 'সাওয়াদে আ'যাম', 'হুজ্জাহ' ও 'জামাআহ' আখ্যা দিয়েছে। বিভিন্ন যুগে ও অঞ্চলে 'সাওয়াদে আ'যাম'র অনুসারীর স্বল্পতা ও একাকীত্বের কারণে 'সুন্নাহর' মোকাবেলায় অধিকাংশকে মানদণ্ড বানিয়ে সুন্নাতকে বিদআত এবং স্বীকৃতকে অস্বীকৃত আখ্যা দিয়েছে। আরো দলিল দিচ্ছে, যে একাকী হবে আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নামে একাকী রাখবেন। এই মতভেদ সৃষ্টিকারীরা জানে না যে, যা হকের বিপরীত তাই মূলত 'শায' বিচ্ছিন্ন। যদিও একজন ব্যতীত সকলেই সেটির উপর থাকে, তাহলেও তারা সকলেই 'শায'। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের সময়ে কিছু সংখ্যক ব্যতীত সকলেই 'শায' ছিলো, আর কিছু সংখ্যক ছিলেন 'জামাআহ'। ওই সময়ের বিচারকমণ্ডলী, মুফতিরা, খলিফা ও তার অনুসারীরা সকলেই ছিলো 'শায', আর ইমাম আহমাদ একাই ছিলেন 'জামাআহ'। লোকদের মেধা যখন তা অনুধাবন করতে পারলো না, তখন তারা খলিফাকে বললো, হে আমিরুল মুমিনিন! এটি কী করে সম্ভব যে, আপনি, আপনার বিচারক, আপনার গভর্নর এবং ফকিহ ও মুফতি সকলেই বাতিলের উপর রয়েছে আর এক আহমাদই শুধু হকের উপর আছে? খলিফার জ্ঞানে তা সঙ্কুলান হয়নি; তাই সে দীর্ঘ সময় তাঁকে বন্দি রেখে ছড়ির আঘাত ও শাস্তি দিতে লাগলো। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। গত রাত্রির সঙ্গে আজ রাতের কতোইনা সাদৃশ্যতা। প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাত করা পর্যন্ত এটিই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের প্রশস্ত পথ। এটির উপরই তাদের পূর্ববর্তীরা অতিবাহিত হয়েছে এবং পরবর্তীরা তার অপেক্ষা করছে। 'মুমিনদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত তাদের প্রতিশ্রুতি সত্যে বাস্তবায়ন করেছে। তাদের কেউ কেউ [যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করে] তার দায়িত্ব পূর্ণ করেছে, আবার কেউ কেউ [শাহাদাত বরণের] প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা (প্রতিশ্রুতিতে) কোন পরিবর্তনই করেনি।' (সুরা আহযাব, ২৩)। 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইয়িল আযিম'।" (ই'লামুল মুআক্কিয়িন, ৫/৩৮৮)

হাফেয ইবনে কাসির (মৃ-৭৭৪ হি.)

قال الحافظ ابن كثير: وفي بعض الروايات "عليكم بالسواد الأعظم الحق وأهله"، فأهل الحق هم أكثر الأمة، ولا سيما في الصدر الزمان الأول، ولا يكاد يوجد فيهم من هو على بدعة، **وأما في الأعصار المتأخرة فقد يجتمع الجمع الغفير على بدعة.** (النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير، لا تجتمع الأمة على ضلالة، ٢/٢٥)

"হাফেয ইবনে কাসির বলেন, কোনো কোনো বর্ণনায় আছে 'তোমরা হক ও হকের অনুসারী বড়ো জামাআতকে আঁকড়ে ধরো'। তো উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠতাই হলো আহলে হক, বিশেষকরে প্রথম যুগে। সে যুগে কাউকে বিদআতের উপর পাওয়াই দুষ্কর ছিলো। **কিন্তু পরবর্তী যুগে এসে এমন হচ্ছে যে, বড়ো জামাআতও কখনো বিদআতের উপর একত্রিত হয়ে যায়।** (আননিহায়া ফিল ফিতানি ওয়ালমালাহিম, ২/২৫)

আলি ইবনে আবি তালেব রাযি. ও হাসান বসরির বক্তব্য

আলি ইবনে আবি তালেব রাযি. কর্তৃক ইবনে আব্বাস রাযি.কে উদ্দেশ্য করে লেখা জবাবি চিঠির কথা ও হাসান বসরি রহ. এর বক্তব্যও আমরা দেখতে পারি।

আলি ইবনে আবি তালেব রাযি. (মৃ-৪০ হি.)

قال الخطيب البغدادي: أخبرني علي بن أبي علي البصري، أنا مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد بن همام الشيباني، حدثني أحمد بن مُحَمَّد الخوارزمي بأرمية، نا بقية، نا أبو حاتم الرازي، نا أحمد بن أبي الحواري، قال: حدثني أبو حفص الماعوني، عن عبد الله بن لهيعة قال: كتب ابن عباس إلى علي يستحثه، فكتب إليه علي مجيباً: إنه ينبغي لك أن يكون أول عملك بما أنت فيه، البصر بهداية الطريق، **ولا تستوحش لقلة أهلها، فإن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين، لم يستوحش مع الله في طريق الهداية إذ قل أهلها، ولم يأنس بغير الله.** (الفقيه والمتفقه، ٢/٤٠٥، الرقم: ١١٧٨)

"আব্দুল্লাহ ইবনে লাহিআ বলেন, আব্বাস রাযি. অনুপ্রেরণা যোগাতে আলি রাযি. -এর নিকট চিঠি লিখলেন। আলি রাযি. উত্তরে লিখে পাঠালেন; তোমার জন্য তোমার প্রথম কাজ তোমার অবস্থান অনুযায়ী হওয়া উচিত, তথা সঠিক

রাস্তার প্রতি দৃষ্টি রাখা। সংখ্যার স্বল্পতার কারণে কখনো ভীত হয়ো না। কেননা ইবরাহিম ছিলেন এক উম্মত, আল্লাহর একান্ত অনুগত ও একনিষ্ঠ। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। **সংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও তিনি সঠিক পথে আল্লাহর সঙ্গে থাকতে ভীত হননি এবং আল্লাহ ব্যতীত কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেননি।"** (আলফকিহ ওয়ালমুতাফাক্কিহ, ২/৪০৫, নং ১১৭৮)

হাসান বসরি (মৃ-১১০ হি.)

قال أبو شامة المقدسي: قال الدرامي: أخبرنا الحسين بن منصور، حدثنا أبو أسامة، عن مبارك، عن الحسن رحمه الله تعالى قال: سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، **فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا.** (الباعث على إنكار البدع والحوادث، صـ١٣)

"হাসান রহ. বলেন, আল্লাহ যিনি ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই তাঁর কসম করে বলছি, তোমাদের সুন্নাত-অনুমোদিত পথ হচ্ছে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির মাঝে। তোমরা সেটিকেই আঁকড়ে ধরো, আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করুন! **কেননা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত সবসময় সংখ্যায় কমই ছিলেন, যাঁরা বিলাসীদের সঙ্গে তাদের বিলাসিতায় এবং বিদআতিদের সঙ্গে তাদের বিদআতে অংশগ্রহণ করেননি। তাঁরা প্রভুর সাক্ষাত পর্যন্ত তাঁদের সুন্নাতের উপর অবিচল ছিলেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হলে তোমরাও তাঁদের মতো হও।"** (আলবায়েস আলা ইনকারিল বিদা' ওয়ালহাওয়াদেস, পৃ: ১৩)

আরো কিছু স্থূল আপত্তি

মৌলিক সংশয়গুলোর পর্যালোচনার এখানেই ইতি টানছি। তবে এক্ষেত্রে কিছু স্থূল আপত্তি রয়েছে, যা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা অনর্থক। "لا نكفر أهل القبلة" এবং "لا يُكَفر أحد بذنب" কে অপাত্রে ব্যবহার করে কিছুটা সংশয় সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। এ ব্যাপারে আমি আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরির আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ হুবহু উল্লেখ করে দেয়াই যথেষ্ট মনে করছি, যা তিনি "ما

المراد بأهل القبلة الذين لا يكفرون" শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করেছেন। সচেতন পাঠক মূল কিতাব থেকে পুরো আলোচনাটি পড়ে নিতে পারেন।

কাশ্মিরি রহ. এর আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ

اعلم أن المراد بأهل القبلة: الذين اتفقوا على ما هو من ضروريات الدين، كحدوث العالم، وحشر الأجساد، وعلم الله تعالى بالكليات والجزئيات، وما أشبه ذلك من المسائل المهمات، فمن واظب طول عمره على الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم العالم ونفي الحشر أو نفي علمه سبحانه بالجزئيات لا يكون من أهل القبلة، **وإن المراد بعدم تكفير أحد من أهل القبلة عند أهل السنة: أنه لا يكفر ما لم يوجد شيء من أمارات الكفر وعلاماته، ولم يصدر عنه شيء من موجباته.**

إن غلا فيه -أي في هواه- حتى وجب إكفاره به لا يعتبر خلافه ووفاقه أيضاً، لعدم دخوله في مسمى الأمة المشهود لها بالعصمة وإن صلى إلى القبلة واعتقد نفسه مسلماً، **لأن الأمة ليست عبارة عن المصلين إلى القبلة، بل عن المؤمنين، وهو كافر وإن كان لا يدري أنه كافر.** ونحوه في "الكشف شرح البزدوي" من الإجماع، و"الإحكام" للآمدي من المسألة السادسة منه.

لا خلاف في كفر المخالف في ضروريات الإسلام وإن كان من أهل القبلة المواظب طول عمره على الطاعات. كما في "شرح التحرير". "رد المختار" من الإمامة ومن جحود الوتر. أيضاً ثم قال (أي صاحب "البحر"): والحاصل أن المذهب عدم تكفير أحد من المخالفين فيما ليس من الأصول المعلومة من الدين ضرورة. إلخ. فافهم.

أهل القبلة في اصطلاح المتكلمين من يصدق بضروريات الدين أي الأمور التي علم في الشرع واشتهر، فمن أنكر شيئاً من الضروريات كحدوث العالم وحشر الأجساد، وعلم الله سبحانه بالجزئيات، وفرضية الصلاة والصوم لم يكن من أهل القبلة، ولو كان مجاهداً بالطاعات، وكذلك من باشر شيئاً من أمارات التكذيب كسجود الصنم **والإهانة بأمر**

شرعي والاستهزاء عليه، فليس من أهل القبلة، **ومعنى: "عدم تكفير أهل القبلة أن لا يكفر بارتكاب المعاصي، ولا بإنكار الأمور الخفية غير المشهورة**. هذا ما حققه المحققون فاحفظه. (إكفار الملحدين، ص١٦-١٧)

"জেনে রাখা উচিত, 'আহলে কিবলা' দ্বারা উদ্দেশ্য যারা দ্বীনের অকাট্য-সুস্পষ্ট বিধানের ব্যাপারে একমত। যেমন, পৃথিবী আধুনিক হওয়া, শরীরের হাশর-পুনরুত্থান হওয়া, সার্বিক ও আনুষঙ্গিক বিষয় আল্লাহ তাআলার ইলমে থাকা এবং এ জাতীয় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল। সুতরাং কেউ পৃথিবী আদি, হাশর হবে না এবং আনুষঙ্গিক বিষয় আল্লাহর ইলমে নেই বলে বিশ্বাস রেখে জীবনভর ইবাদত ও আনুগত্যে কাটিয়ে দিলেও সে 'আহলে কিবলা'র অন্তর্ভুক্ত হবে না। **আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে 'আহলে কিবলার কাউকে কাফের বলা হবে না' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যতোক্ষণ পর্যন্ত কুফরের কোনো নিদর্শন পাওয়া যাবে না এবং কুফরকে আবশ্যক করে এমন কোনো কিছু প্রকাশ পাবে না, ততোক্ষণ পর্যন্ত 'আহলে কিবলা'র কাউকে কাফের আখ্যায়িত করা যাবে না।**

যদি সে তার প্রবৃত্তির ব্যাপারে এ পর্যায়ের বাড়াবাড়ি করে যে, তাকে কাফের আখ্যা দেয়া আবশ্যক হয়, তাহলে তার একমত হওয়া আর দ্বিমত হওয়ারও কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। কেননা সে সংরক্ষণের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যদিও সে কিবলামুখী হয়ে নামায আদায় করে এবং নিজেকে মুসলমান মনে করে। **কারণ, উম্মত তো কিবলামুখী হয়ে নামায আদায় করার নাম নয় বরং তা মুমিনদেরকে বলা হয়। তো সে কাফের, যদিও সে জানে না যে সে কাফের।** 'উসুলে বাযদাবি'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'কাশফুল আসরার' নামক কিতাবের 'ইজমা' অধ্যায়ে এবং আল্লামা আমেদির 'ইহকাম' নামক কিতাবের ষষ্ঠ নম্বর মাসআলায় এ জাতীয় আলোচনা রয়েছে।

ইসলামের অকাট্য বিধানের বিরোধীর কুফরের ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই, যদিও সে 'আহলে কিবলা' হয়ে জীবনভর আনুগত্যে কাটিয়ে দেয়। যেমনটি 'শরহুত তাহরির' কিতাবে রয়েছে। তার উদ্ধৃতিতে রদ্দুল মুহতারের 'ইমামত' ও 'জুহুদুল বিতর' অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে আরো উল্লেখ আছে, অতঃপর 'আলবাহরুর রায়েক'র মুসান্নিফ বলেন, মোটকথা, মাযহাবের সিদ্ধান্ত হলো, বিরোধীদের কাউকে কাফের আখ্যা দেয়া হবে না ওই সকল

ক্ষেত্রে, যা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত দ্বীনের অকাট্য বিধান নয়।... বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে নাও।

'মুতাকাল্লিম' ইলমে কালাম বিশারদদের পরিভাষায় 'আহলে কিবলা' বলা হয়, যে 'যরুরিয়্যাতে দ্বীন' অর্থাৎ শরিআতের অকাট্য ও প্রসিদ্ধ বিষয়াদিকে সত্যায়ন করে। সুতরাং কেউ যদি তা থেকে কোনো একটিকে অস্বীকার করলো যেমন, পৃথিবী আধুনিক হওয়া, শরীরের হাশর-পুনরুত্থান হওয়া, আনুষঙ্গিক বিষয় আল্লাহ তাআলার ইলমে থাকা এবং সালাত ও সাওম ফরয হওয়া। তাহলে সে 'আহলে কিবলা'র অন্তর্ভুক্ত হবে না, যদিও ইবাদত সাধনায় লিপ্ত থাকে। তেমনিভাবে কেউ যদি অস্বীকার নির্দেশক কোনো কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, যেমন, মূর্তিকে সিজদা করা, **শরিআতের কোনো বিষয়কে হেয় করা এবং তা নিয়ে রসিকতা করা**। এই লোক 'আহলে কিবলা'র অন্তর্ভুক্ত নয়। **'আহলে কিবলা'কে কাফের আখ্যায়িত করা হবে না দ্বারা উদ্দেশ্য, গোনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া এবং অপ্রসিদ্ধ সূক্ষ্ম কোনো দ্বীনি বিষয়কে অস্বীকার করার কারণে কাউকে কাফের সাব্যস্ত করা হবে না**। গবেষক উলামায়ে কেরামের গবেষণার সারাংশ এটিই। সুতরাং এটি ভালোভাবে বুঝে নাও।" (ইকফারুল মুলহিদিন, পৃ: ১৬-১৭)

ثم رأيت في"كتاب الإيمان" للحافظ ابن تيمية رحمه الله صرح به قال: **ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، فإنما نريد بها المعاصي كالزنا والشرب** إهـ. وأوضحه القونوي في "شرح العقيدة الطحاوية".

ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحداً بذنب، **بل يقال: إنا لا نكفرهم بكل ذنب كما يفعله الخوارج.** ثم قال القونوي: وفي قوله: "بذنب" إشارة إلى تكفيره بفساد اعتقاده كفساد اعتقاد المجسمة والمشبهة ونحوهم، لأن ذلك لا يسمى ذنباً، والكلام في الذنب. "شرح فقه أكبر" -من بحث الإيمان- ونحوه كلام الطحاوي في "المعتصر" -من تفسير الفرقان- ومن آخر "الاقتصاد" للغزالي. (إكفار الملحدين، صـ٢٣)

"অতঃপর আমি দেখলাম, হাফেয ইবনে তাইমিয়া তাঁর 'কিতাবুল ইমানে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, **আমরা যখন বলি, গোনাহের কারণে কাউকে কাফের না**

বলার ব্যাপারে আহলে সুন্নাত একমত; তখন তা দ্বারা আহলে সুন্নাত যিনা ও মদপানের ন্যায় পাপকাজ উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে। আল্লামা কাওনাবি 'আলআকিদাতুত তাহাবিয়্যার'র ব্যাখ্যাগ্রন্থে তা স্পষ্ট করেছেন।

এ কারণে 'আমরা কোনো গোনাহের কারণে কাউকে কাফের বলি না' এভাবে বলা থেকে অনেক ইমাম বিরত থেকেছেন। **বরং বলা হবে, আমরা খারেজিদের ন্যায় যেকোনো গোনাহের কারণে তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করি না।** অতঃপর আল্লামা কাওনাবি বলেন, 'গোনাহ' শব্দ বলায় এদিকে ইঙ্গিত হয় যে, আকিদা বিনষ্ট হলে কাফের আখ্যা দেয়া যাবে। যেমন, মুজাসসিমা ও মুশাববিহা প্রমুখদের ফাসেদ আকিদা। কেননা এটিকে 'গোনাহ' বলা হয় না, আর কথা চলছে 'গোনাহ' নিয়ে। 'শরহে ফিকহে আকবার' - ঈমানের অধ্যায়- তেমনিভাবে ইমাম তহাবির বক্তব্য রয়েছে 'আলমু'তাসার' কিতাবের সুরা ফুরকানের তাফসিরে এবং গাযালির 'আলইকতিসাদ' কিতাবের শেষদিকে এমনটি রয়েছে।" (ইকফারুল মুলহিদিন, পৃ: ২৩)

قال العلامة زاهد الكوثري الحنفي:

وأما الساكت من أهل الشأن عن تأييد الحق في مثل تلك الكارثة، فإنما هو شيطان أخرس ورد لأهل الردة. (مقالات الكوثري صـ٢٧٩).

{দুই}

العلمانية—ধর্মনিরপেক্ষতা

ধর্মনিরপেক্ষতা একটি কুফরি ধর্ম

মাসআলা: ধর্মনিরপেক্ষতা একটি স্বতন্ত্র ধর্ম এবং 'এন্টি ইসলাম' ইসলামের মোকাবেলায় ইসলামের প্রকাশ্য শত্রুদের হাতে তৈরি একটি মতবাদ। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মে বিশ্বাসী, তা প্রতিষ্ঠাতা ও বাস্তবায়নকারী নির্বাহী শক্তি, সেটির নীতি অনুসারী বিচারকবর্গ এবং তা রক্ষাকারী প্রশাসন কাফের-মুরতাদ।

দলিল

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ একটি কুফরি ও ভয়ঙ্কর মতবাদ হওয়া সংক্রান্ত অত্যন্ত চমৎকার ও দলিলনির্ভর প্রবন্ধ আমরা মাসিক আলকাউসার (ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃ: ০৩-১০) থেকে পড়ে নিতে পারি। আমি সেখান থেকে ছোট্ট একটি অংশ উল্লেখ করছি- 'আমি শুধু সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছি এবং সেক্যুলার ব্যক্তিবর্গের কথা ও লেখা থেকে প্রমাণ করেছি যে, **ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মহীনতা সমার্থবোধক। এবং এর সবচেয়ে হালকা ব্যাখ্যাদাতারও দাবি হল, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। যা সুস্পষ্ট কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী বক্তব্য।'**

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ কুফরি হওয়ার বিষয়টি অনেকটা ঐক্যমত্যে সাব্যস্ত হওয়ায় আমি এ বিষয়ে বিশেষ কোনো দলিল উল্লেখ করছি না। তবে কেউ কেউ মতবাদটি কুফরি মতবাদ স্বীকার করে নিলেও সেটির ভিত্তিতে সামগ্রিকভাবেও 'তাকফির' করতে প্রস্তুত নয়।

পৃথিবীর এক অত্যাশ্চর্যের বিষয়

এ ব্যাপারে আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে, এটি কি পৃথিবীর এক অত্যাশ্চর্যের বিষয় নয় যে, মতবাদ কুফরি ও ভয়ঙ্কর কিন্তু সে মতবাদের কারণে

সামগ্রিকভাবেও 'তাকফির' করা যাবে না? যে পৃথিবীতে সুস্পষ্ট কুফর থেকে মানুষদের বিরত রাখা যাচ্ছে না, সে পৃথিবীতে গ্রহণযোগ্য কারো মুখ থেকে যখন মানুষ এ ধরনের অস্পষ্ট কথা শুনবে, তখন বাকি ফলাফল তারা নিজেরাই বের করে নেবে- 'ও! মতবাদ কুফরি ঠিক আছে, কিন্তু এর কারণে তো আর ইমানহারা হচ্ছি না।' পাঠকদের কী মনে হয়! মানুষদের কি এ কুফরি ও ভয়ঙ্কর মতবাদ থেকে ফেরানো যাবে?

ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা দিয়ে কাউকে বাঁচানো যাবে না

দ্বিতীয়ত: কেউ যদি নিজকে অথবা নিজের নেতা বা দলকে বাঁচানোর জন্য ব্যক্তিগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করে, তাহলে ওই ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার কারণে কি বাস্তবেই কেউ বেঁচে যাবে? আমাদের মনে রাখতে হবে, ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি যে অর্থকে সমর্থন করে না তা ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দের অর্থ হতে পারে না।

আর রাষ্ট্রের হর্তকর্তাদের (নির্বাহী শক্তি, বিচারবিভাগ ও প্রশাসন) তো কোনোভাবেই কুফর থেকে বাঁচানো যাবে না। কারণ-

- ✓ ব্যক্তিগত ব্যাখ্যাটি রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে; এমন কোনো প্রমাণ নেই।
- ✓ পরিচিত ও স্বীকৃত অর্থটি রাষ্ট্র অস্বীকার করেছে; এর কোনো প্রমাণ নেই।
- ✓ পরিচিত ও স্বীকৃত অর্থটি রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে; এর পক্ষে তাদের বক্তব্য আছে।
- ✓ পরিচিত ও স্বীকৃত অর্থটি রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে; এর পক্ষে তাদের আমল আছে।
- ✓ পরিচিত ও স্বীকৃত অর্থটি রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে; এর পক্ষে তাদের আইন আছে।
- ✓ পরিচিত ও স্বীকৃত অর্থটি রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে; এর পক্ষে তাদের আইনের বাস্তবায়ন আছে।
- ✓ পরিচিত ও স্বীকৃত অর্থটি রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে; এর বিপরীত পক্ষের উপর তাদের ধমকি আছে।

- ✓ পরিচিত ও স্বীকৃত অর্থটি রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে; এর বিপরীত পক্ষের উপর তাদের এ্যাকশান আছে।
- ✓ পরিচিত ও স্বীকৃত অর্থটি রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে; এর উপর তাদের গর্ব আছে।

সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতাকে তার আসল অর্থে বিশ্বাস, বাস্তবায়ন, সমর্থন ও প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে সবধরনের সহযোগিতা করে ক্ষেত্রবিশেষ নিজকে, নিজের নেতা ও দলকে আড়াল করার জন্য এর কৃত্রিম ব্যাখ্যা দেয়াকে সর্বোচ্চ ইলহাদ ও নিফাক বলা যেতে পারে, যা প্রকৃতপক্ষে কুফর এবং তার ক্ষেত্রে কুফরের হুকুমই প্রযোজ্য হবে।

মাসিক আলকাউসারের একটি প্রবন্ধের একটি অংশ আমরা লক্ষ্য করতে পারি- 'এ অর্থগুলো লিখেছে বাংলা একাডেমীর অভিধান। এটির সম্পাদনায় কোনো ডানপন্থী বা কোনো 'হুজুর' জড়িত ছিলেন না। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব ছিলেন এর সম্পাদক। এটা এমন নয় যে, কোনো মতবাদ ওয়ালারা নিজ মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এ ব্যাখ্যা লিখেছে; **বরং দেশের সরকার-নিয়ন্ত্রিত এবং বর্তমান সরকার নিয়ন্ত্রিত সরকারী প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী, যারা সংবিধানে আবার সেকুলারিজমকে স্থান দিয়েছে তাদের কর্তৃক নিয়োজিত, নির্ভরযোগ্য, যোগ্য ব্যক্তিরাই সেকুলারিজমের এই অর্থ ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন**। আমার দেখে ভালো লেগেছে যে, ওনারাও ভালো মানুষ। রাখঢাক না করে সাফ সাফ কথাটাই মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। 'ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মহীনতা নয়'-এমন কথা লেখেননি। (মাসিক আলকাউসার, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃ: ০৩)।

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের কারণে কাফের মুরতাদ হওয়ার ফাতওয়া

তৃতীয়ত: যে সকল উলামায়ে কেরাম ধর্মনিরপেক্ষতা তথা দ্বীনকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করার অসারতা খুব কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁরা শুধু মতবাদকে কুফর বলেই ক্ষান্ত হননি; বরং মতবাদের কারণে কাফের-মুরতাদ হওয়ার ফাতওয়া দিয়েছেন। আমি উসমানি খিলাফতের দুই মুখপাত্র শাইখুল ইসলাম যাহেদ কাউসারি ও শাইখ মুস্তফা সাবারির এ বিষয়ক আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ এবং দুয়েকটি 'মাওসুআহ' ও 'মাজাল্লাহ' থেকে কিছু কথা উল্লেখ করছি। সচেতন পাঠক আশা করি পুরো আলোচনা পড়ে নেবেন।

শাইখুল ইসলাম যাহেদ কাউসারি আলহানাফি (মৃ-১৩৭১ হি.)

حكم محاولة فصل الدين عن الدولة- بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد! فقد ورد من بعض العلماء الأفاضل في حلب الشهباء استفتاء يسألني فيه عن حكم شرع الله في مسلم يطالب حكومته في بلد إسلامي عريق في الإسلام بإبعاد النص على أن (دين الدولة الرسمي هو الإسلام) عن دستور تلك الحكومة، إحلالاً للأحكام الوضعية اللادينية محل أحكام شرع الله؟ ويسألني فيه أيضاً عن حكم الشرع الأغر في مسلم يكون سبباً لاستفحال ذلك الشر بسكوته عن تأييد الحق في هذه الكارثة، وفي هذا الخطر الداهم؟

فأقول مستعيناً بالله جلت قدرته: إن هذه هي أدهى الدواهي وأعظم المصائب يذوب لهولها قلب كل مؤمن صادق الإيمان، ولا سيما في مثل بلاد الشام التي لها ماض مجيد في خدمة الإسلام. فالمسلم إذا طالب بمثل ذلك في سلامة عقله، يجري عليه حكم الردة في بلد يكون فيه الإسلام نافذ الأحكام، وفي غيره يهجر هذا المطالب هجراً كلياً، فلا يكلم ولا يعامل في أمر أصلاً حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت ويتوب وينيب.

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن دين الإسلام جامع لمصلحتي الدنيا والآخرة، ولأحكامهما دلالة واضحة لا ارتياب فيها، **فتكون محاولة فصل الدين عن الدولة كفراً صارخاً منابذاً لإعلاء كلمة الله، وعداءً موجهاً إلى الدين الإسلامي في صميمه، ويكون هذا الطلب من هذا المطالب إقرار منه بالانبتار والانفصال فيلزمه بإقراره، فنعده عضواً مبتوراً من جسم جماعة المسلمين وشخصاً منفصلاً عن عقيدة أهل الإسلام، فلا تصح مناكحته ولا تحل ذبيحته، لأنه ليس من المسلمين ولا من أهل الكتاب.** (مقالات الكوثري، صـ٢٧٨)

“রাষ্ট্র থেকে দ্বীনকে পৃথককরণের প্রচেষ্টার বিধান- বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। হামদ ও সালাতের পর! হলব শহরে এক শ্রদ্ধেয় আলেমের পক্ষ হতে একটি ‘ইস্তিফতা’ এসে পৌঁছেছে। তাতে তিনি আমার নিকট ওই মুসলমানের

ব্যাপারে শরিআতের হুকুম জানতে চাচ্ছেন; যে মুসলমান আল্লাহর শরিআতের বিধি-বিধানের স্থানে মানবরচিত ধর্মহীন বিধি-বিধানকে অবতরণ করাতে দৃঢ়মূল একটি মুসলিম দেশের সংবিধান থেকে 'রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম' ধারাটি বাদ দিতে সরকারের নিকট দাবি জানায়। ওই 'ইস্তিফতা'য় তিনি আরো জানতে চেয়েছেন; ওই মুসলমানের ব্যাপারে শরিআতের কী হুকুম, যে এই অব্যাহত ভয়াবহ মুহূর্তে এবং এই বিপর্যয়ে সত্যের সমর্থন করা থেকে চুপ থেকে ওই অন্যায় গুরুতর হওয়ার কারণ হয়?

আল্লাহর সহযোগিতা কামনা করে আমি বলছি, এটি এমন একটি ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ও বড়ো ধরনের বিপর্যয়, যার আতঙ্কে সাচ্চা ইমানের অধিকারী প্রত্যেক মুমিনের অন্তর গলে যায়। বিশেষকরে শামের মতো অঞ্চলে; ইসলামের খেদমতে যার গৌরবান্বিত অতীত রয়েছে। সুতরাং সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী কোনো মুসলমান যদি তা দাবি করে, তাহলে যে অঞ্চলে ইসলামের বিধি-বিধান কার্যকর সে অঞ্চলে তার ক্ষেত্রে 'ইরতিদাদ' ধর্মত্যাগের বিধান বাস্তবায়ন হবে। আর অন্য অঞ্চলে এই দাবিদারের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে। সুতরাং তার সঙ্গে কথা বলা হবে না এবং কোনো ক্ষেত্রেই তার সঙ্গে কোনো ধরনের লেনদেন হবে না, যাতে দুনিয়া প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং সে তাওবা করে ও তার দাবি থেকে ফিরে আসে।

কুরআন ও সুন্নাহর 'নুসুস' স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, দ্বীন ইসলাম দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের কল্যাণ সমন্বিত। এবং কুরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধানের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে যার ব্যাপারে কোনো ধরনের সন্দেহ নেই। **সুতরাং রাষ্ট্র থেকে দ্বীনকে পৃথককরণের প্রচেষ্টা হবে প্রকাশ্য কুফর, আল্লাহর কালেমা উঁচু করার পথে প্রতিবন্ধক এবং দ্বীন ইসলামের অন্তরমুখী সুস্পষ্ট শত্রুতা। এই দাবিদারের এই দাবি হবে তার পক্ষ হতে সম্পর্কহীনতা ও বিচ্ছিন্নতার স্বীকারোক্তি। তার স্বীকারোক্তিতেই তার জন্য তা আবশ্যক হবে। সুতরাং আমরা তাকে মুসলমান জামাআতের শরীর থেকে একটি বিচ্ছিন্ন অঙ্গ এবং মুসলমানদের আকিদা থেকে এক পৃথক মানুষ মনে করবো। তার সঙ্গে বিবাহ-শাদি সহিহ হবে না এবং তার জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়া হালাল হবে না। কেননা সে মুসলমানও নয় এবং আহলে কিতাবিও নয়।"** (মাকালাতুল কাউসারি, পৃ: ২৭৮)

وأما الساكت من أهل الشأن عن تأييد الحق في مثل تلك الكارثة، فإنما هو شيطان أخرس ورد لأهل الردة. (مقالات الكوثري، ص٢٧٩)

"এ ধরনের বিপর্যয়ের মুহূর্তে সত্যের সমর্থন করা থেকে যে ব্যক্তিত্ব চুপ থাকে, সে মূলত 'বোবা শয়তান'; মুরতাদদের সমর্থনে যার আবির্ভাব ঘটেছে।" (মাকালাতুল কাউসারি, পৃ: ২৭৯)

শাইখুল ইসলাম মুস্তফা সাবারি (মৃ-১৩৭৩ হি.)

قال الشيخ مصطفى صبري: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ. الباب الرابع في عدم جواز فصل الدين عن السياسة- ... لكن حقيقة الأمر أن هذا الفصل مؤامرة بالدين للقضاء عليه، وقد كان في كل بدعة أحدثها العصريون المتفرنجون في البلاد الإسلامية كيد للدين ومحاولة الخروج عليه، لكن كيدهم في فصله عن السياسة أدهى وأشد من كل كيد في غيره، فهو ثورة حكومية على دين الشعب -في حين أن العادة أن تكون الثورات من الشعب على الحكومة- وشق عصا الطاعة منها أي الحكومة لأحكام الإسلام، بل ارتداد عنه من الحكومة أولاً ومن الأمة ثانياً، إن لم يكن بارتداد الداخلين في حوزة تلك الحكومة باعتبارهم أفراداً، فباعتبارهم جماعةً، **وهو أقصر طريق إلى الكفر من ارتداد الأفراد، بل إنه يتضمن ارتداد الأفراد أيضاً لقبولهم الطاعة لتلك الحكومة المرتدة التي ادعت الاستقلال لنفسها بعد أن كانت خاضعة لحكم الإسلام عليها،** وماذا الفرق بين أن تتولى الأمر في البلاد الإسلامية حكومة مرتدة عن الإسلام وبين أن تحتلها حكومة أجنبية عن الإسلام، بل المرتد أبعد عن الإسلام من غيره أشد، وتأثيره الضار في دين الأمة أكثر، من حيث إن الحكومة الأجنبية لا تتدخل في شؤون الشعب الدينية وتترك لهم جماعة فيما بينهم تتولى الفصل في تلك الشؤون، ومن حيث إن الأمة لا تزال تعتبر الحكومة المرتدة عن دينها من نفسها فترتد هي أيضاً معها تدريجاً، إن لم نقل بارتدادها معها دفعة باعتبارها مضطرة في طاعة الحكومة، ومن حيث إن موقفها الاضطراري تجاه حكومة تأخذ سلطتها وقوتها من نفس الأمة ليس

كموقفها الاضطراري تجاه حكومة أجنبية لها قوة أجنبية مثلها. (موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، ٤/٢٨١-٢٨٥)

"চতুর্থ অধ্যায় রাষ্ট্রনীতি থেকে দ্বীনকে পৃথককরণ জায়েয না হওয়া সম্পর্কে-..... কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এই পৃথককরণ মূলত দ্বীনকে ধ্বংস করার একটি ষড়যন্ত্র। সাম্প্রতিক পশ্চিমাদের আদর্শে বিশ্বাসীরা ইসলামি বিশ্বে নতুন যা কিছুরই প্রবর্তন করেছে, তা দ্বীনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ইসলামের সঙ্গে বিদ্রোহের প্রচেষ্টা হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রনীতি থেকে দ্বীনকে পৃথককরণের ক্ষেত্রে তাদের চক্রান্ত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের চক্রান্ত থেকে কঠিন ও ভয়ঙ্কর। এটি জনগণের ধর্মের বিপক্ষে একটি রাষ্ট্রীয় বিপ্লব -যদিও বিপ্লব সাধারণত রাষ্ট্রের বিপক্ষে জনগণের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে- এবং ইসলামি বিধি-বিধানের সামনে রাষ্ট্রের আত্মসমর্পণের বিষয়টি বিনষ্টকরণ। বরং তা প্রথমত রাষ্ট্রের এবং দ্বিতীয়ত জনগোষ্ঠীর ইসলাম থেকে 'ইরতিদাদ' নিবৃত্ত হওয়া। যদি ওই রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তি ব্যক্তির 'ইরতিদাদ' নাও হয়, তবে সামগ্রিকভাবে তো অবশ্যই। **এটি ব্যক্তি ব্যক্তির 'ইরতিদাদ'র চেয়ে কুফরের দিকে আরো সংক্ষিপ্ত পথ। বরং তা ব্যক্তি ব্যক্তির 'ইরতিদাদ'কেও আবশ্যক করে। কেননা তারা ওই মুরতাদ রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়, যে রাষ্ট্র ইসলামি বিধি-বিধানের অনুগত থাকার পর এখন নিজকে স্বতন্ত্র দাবি করছে।** ইসলাম থেকে মুরতাদ হওয়া কোনো শাসনব্যবস্থা ইসলামি বিশ্বের উপর ক্ষমতাসীন হওয়া এবং ইসলামবিবর্জিত ভিনদেশি কোনো রাষ্ট্র ইসলামি বিশ্ব দখল করে নেয়া; দু'য়ের মধ্যে কী পার্থক্য? বরং মুরতাদ অন্যের তুলনায় ইসলাম থেকে বেশি দূরে এবং উম্মতের দ্বীনের জন্য তার ক্ষতিকর প্রভাব আরো প্রবল। কেননা ভিনদেশি রাষ্ট্র সাধারণত ধর্মীয় জাতি-গোষ্ঠীর বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করে না এবং তাদের থেকে একটি শ্রেণিকে নির্ধারণ করে দেয় যারা ওই সকল বিষয়াদিতে ফয়সালা প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। অপরদিকে নিজের দ্বীন থেকে মুরতাদ হওয়া রাষ্ট্রকে উম্মত নিজেদের অন্তর্ভুক্ত মনে করে চলছে। ফলে রাষ্ট্রের সঙ্গে তারাও ধীরে ধীরে মুরতাদ হয়ে যাচ্ছে। যদিও রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকারের ক্ষেত্রে নিরুপায় হওয়ার বিষয়টি রয়েছে বলে রাষ্ট্রের সঙ্গে সবাই একসাথে মুরতাদ হয়ে যায়; এ কথা আমরা বলি না। এছাড়াও নিজ জাতির শক্তি ও

ক্ষমতায় ক্ষমতাবান রাষ্ট্রের বিপরীতে বাধ্যতামূলক অবস্থান কখনো ভিনদেশি রাষ্ট্রের বিপরীতে বাধ্যতামূলক অবস্থানের মতো নয়, যার শক্তিও অনুরূপ ভিনদেশি।" (মাওকিফুল আকলি ওয়ালইলমি ওয়ালআলাম, ৪/২৮১-২৮৫)

والحق أن ترويج فصل الدين عن الدولة سواء كان هذا الترويج من رجال الحكومة أو الكتاب المفكرين في مصلحة الدولة والأمة، لا يتفق مع الإيمان، بأن الدين منزل من عند الله وأن أحكامه المذكورة في الكتاب والسنة أحكام الله المبلغة بواسطة رسوله، وكل من أشار بمبدأ الفصل إلى المجتمع فهو إما مستبطن للإلحاد... وإما بليد جاهل بمعنى فصل الدين عن الدولة ومغزاه، مع ظهور كونه عبارة عن عزل الإسلام عن حكومته على حكومة الدولة ومنعه من التدخل في شؤونها، ولأجل ذلك يمنع العلماء الذين في العادة مع قبول مبدأ الفصل، عن الاشتغال بالسياسة، **فإذا خرج عن الإسلام من لا يقبل سلطة الدين عليه بالأمر والنهي وتدخله في أعماله حال كونه فرداً من أفراد المسلمين، فكيف لا يخرج من لا يقبل هذه السلطة وهذا التدخل، بصفة أنه داخل في هيئة الحكومة؟** (موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، ٤/٢٩٤)

"সহিহ কথা হচ্ছে, রাষ্ট্র থেকে দ্বীনকে পৃথককরণের বিষয়টি তরান্বিত করা, চাই তা রাষ্ট্র ও জনগণের কল্যাণে রাষ্ট্রীয় হর্তকর্তাদের পক্ষ থেকে হোক বা বুদ্ধিজীবী লেখকদের পক্ষ থেকে হোক; ইমানের সঙ্গে মিলতে পারে না। কেননা দ্বীন আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে অবতারিত এবং কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত বিধি-বিধান আল্লাহ তাআলার বিধি-বিধান, যা তাঁর রাসুলের মাধ্যমে পৌঁছানো হয়েছে। যে ব্যক্তি সমাজকে পৃথককরণের নীতির নির্দেশনা দেয়, সে হয়তো 'ইলহাদ' নাস্তিকতা গোপনকারী...... অথবা এমন নির্বোধ যে রাষ্ট্র থেকে দ্বীনকে পৃথক করার অর্থ ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে অজ্ঞ। অথচ এটা স্পষ্ট যে, এ দাবির অর্থই হচ্ছে, রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার উপর ইসলামের কর্তৃত্ব থেকে ইসলামকে সরিয়ে দেয়া এবং রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের অনুপ্রবেশকে বাধাগ্রস্ত করা। এজন্যই তো সাধরণত যে সকল আলেম পৃথককরণের নীতির পক্ষে; তারাও রাষ্ট্রীয় কাজে জড়াতে নিষেধ করেন। **তো যে ব্যক্তি মুসলমানদের একজন হওয়া সত্ত্বেও তার উপর দ্বীনের আদেশ-নিষেধের কর্তৃত্ব**

এবং তার প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের অনুপ্রবেশ গ্রহণ করে না সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, তাহলে ওই ব্যক্তি কেনো ইসলাম থেকে বের হবে না; যে রাষ্ট্রের কমিশনের সদস্য হিসেবে এই কর্তৃত্ব ও এই অনুপ্রবেশকে গ্রহণ করে না? (মাওকিফুল আকলি ওয়ালইলমি ওয়ালআলাম, ৪/২৯৪)[২৫]

আলমাউসুআতুল আরাবিয়্যাতুল আলামিয়্যাহ

وقد انتشرت هذه الظاهرة (ظاهرة الإلحاد) انتشاراً واسعاً في الدول الأوروبية بصفة خاصة، وأصبحت له في بعض البلاد حكومات تحرسه ودول تحميه، وهو يتسلح ببعض النظريات العلمية المادية لتؤيده. ويمكن اعتبار ظاهرة "العَلمانية" جزءاً من التيار الإلحادي بمفهومه العام. فعلى الرغم من ارتباط العلمانية بفصل الدين عن الدولة أو السياسة في الاستعمال الشائع، فإن لتلك الظاهرة دلالتها الأخرى المتصلة بذلك الفصل، والتي لا تقل أهمية في الاستعمال الغربي المعاصر. فهي تدل لدى كثير من المفكرين ومؤرخي الفكر على "نزع القداسة عن العالم بتحويل الاهتمام من الدين بما يتضمنه من إيمان بإله وبروح وبعالم أخروي أو مغاير خفي إلى انشغال بهذا العالم المرئي أو المحسوس وغير المقدس". ويمكن اعتبار العلمانية بمفهومها الشائع -أي فصل الدين عن الدولة- مرحلة مبكرة في هذا التوجه العام نحو ربط الحياة الإنسانية بعالم الحس، لأنها تمنح الأولوية لذلك العالم في التشريع لحياة الإنسان وسياستها. وفي الآية القرآنية الكريمة إشارة إلى هذا المعنى العام والأساسي للعلمانية، حيث يقول الله تعالى على لسان الذين كفروا: "إن هي إلا حياتنا

---

২৫. মাওকিফুল আকলি ওয়ালইলমি ওয়ালআলাম থেকে একটি আলোচনা উদ্ধৃত করতে গিয়ে শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. কিতাব ও কিতাবের রচয়িতা সম্পর্কে যে স্তুতিবাক্য ব্যবহার করেছেন তা হচ্ছে,

"قال أستاذنا المحقق الإمام، خاتمة شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية، شيخ الإسلام مصطفى صبري التوقادي رحمه الله تعالى، في كتابه الفذ العجاب، الذي وُصف حين صدوره بأنه (كتاب القرن الرابع عشر): "موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين". (الإسناد من الدين وصفحة مُشرِقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين، ص٨٦)

الدنيا وما نحن بمبعوثين" (الأنعام: ٢٩). والدنيا هي العالم الوحيد بالنسبة للعلمانية. ومن هنا استخدم مفهوم "الدنيوية" كمرادف للعلمانية. ومن العلمانية اشتق فعل "العلمنة" ليدل على عملية التحول نحو هذا العالم. (الموسوعة العربية العالمية، المادة: الإلحاد، ٥٢٨/٢)

"এই নাস্তিকতা বিশেষভাবে ইউরোপে ব্যাপক হয়ে আছে। কোনো কোনো অঞ্চলে সেটিকে পাহারা দেয়ার মতো শাসনব্যবস্থা এবং পৃষ্ঠপোষকতা করার মতো রাষ্ট্র তৈরি হয়ে গেছে। তা আবার নাস্তিকতার সমর্থনে কিছু বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক মতবাদের সজ্জা গ্রহণ করছে। ধর্মনিরপেক্ষতাকে ব্যাপক অর্থের নাস্তিক্য প্রবাহের একটি অংশ হিসেবে ধরা যায়। সাধারণ ব্যবহারে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রনীতি থেকে দ্বীনকে পৃথক করার সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতার সম্পৃক্ততা তো রয়েছেই। কেননা এ পৃথককরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যান্য প্রমাণাদি সেক্ষেত্রে রয়েছে এবং সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য ব্যবহারে এটির গুরুত্ব কম নয়। এটিই অনেক চিন্তাবিদ ও গবেষকের দৃষ্টিতে দ্বীন তথা আল্লাহ, রূহ, আখেরাত বা অদৃশ্যের উপর ইমান থেকে গুরুত্ব সরিয়ে এই দৃশ্যত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অপবিত্র পৃথিবীতে লিপ্ত করে পৃথিবী থেকে পবিত্রতাকে অপসারণ করার প্রমাণ বহন করে। অনুভূত পৃথিবীর সঙ্গে মানবজীবনকে সম্পৃক্তকরণের দিকে অভিমুখী হওয়ার ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাকে তার প্রসিদ্ধ অর্থে -রাষ্ট্র থেকে দ্বীনকে পৃথককরণ- প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কেননা ধর্মনিরপেক্ষতা মানবজীবনের আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ওই পৃথিবীকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। ধর্মনিরপেক্ষতার এই ব্যাপক ও মৌলিক অর্থের প্রতি কুরআনে কারিমে ইঙ্গিত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা কাফেরদের ভাষ্যে বলছেন, 'আমাদের এ দুনিয়ার জীবন ছাড়া কিছু নেই এবং আমরা পুনরুজ্জীবিত হবো না।' (সুরা আনআম ২৯)। 'আলমানিয়্যাহ' ধর্মনিরপেক্ষতার দৃষ্টিতে দুনিয়াটাই একমাত্র 'আলাম' জগৎ। এটির ভিত্তিতেই 'দুনয়াবিয়্যাহ' পার্থিবতার অর্থকে 'আলমানিয়্যাহ' ধর্মনিরপেক্ষতার সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। রূপান্তরের সকল কার্যকলাপ এই পৃথিবী কেন্দ্রিক হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করাতে 'আলমানিয়্যাহ' থেকে 'আলমানাহ' নির্গত করা হয়েছে।" (আলমাউসুআতুল আরাবিয়্যাতুল আলামিয়্যাহ, ২/৫২৮)

ومن زعم فصل الدين عن الدولة، وأن الدين محله المساجد والبيوت، وأن للدولة أن تفعل ما يشاء وتحكم بما تشاء فقد أعظم على الله الفرية، وكذب على الله ورسوله، وغلط أقبح الغلط، بل هذا كفر وضلال بعيد، عياذاً بالله من ذلك. (مجلة البحوث الإسلامية، العدد الخامس والأربعون، الشق الثاني ضرورة البشر إلى الشريعة الإسلامية، ٣٧/٤٥)

"যে মনে করবে রাষ্ট্র থেকে দ্বীন আলাদা, দ্বীনের ক্ষেত্র শুধু মসজিদ ও আবাসস্থল এবং রাষ্ট্রের যে কোনো কিছু করা ও যে কোনোভাবে ফয়সালা দেয়ার অধিকার আছে, সে মূলত আল্লাহর ব্যাপারে কঠিন অপবাদ দিলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উপর মিথ্যারোপ করলো এবং ভয়ঙ্কর প্রকারের ভুলে লিপ্ত হলো। বরং এটি কুফর ও বিদূরিত ভ্রষ্টতা। আল্লাহ তাআলার নিকট এর থেকে আশ্রয় চাই।" (মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ, ৪৫/৩৭)

এ ব্যাপারে শাইখুল হাদিস আজিজুল হক রহ. ও মুফতি তাকি উসমানি হাফিযাহুল্লাহ -এর মন্তব্যও উল্লেখযোগ্য।

শাইখুল হাদিস আজিজুল হক (মৃ-১৪৩৩ হি.)

দৈনিক সংগ্রাম: কেউ যদি ইসলাম থেকে রাজনীতি বা রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থা সজ্ঞানভাবে আলাদা করে তাহলে তার ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিনা?

শাইখুল হাদীস: যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, ইসলামে রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যবস্থা বা রাজনীতির বিধান নেই, **কিংবা ইসলামী ব্যবস্থার বিকল্প বা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন ব্যবস্থা আছে অথবা মুসলমানদের রাজনীতি ও ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন তাহলে কুরআন, সুন্নাহ ও ফেকাহ শাস্ত্রে তাকে জিন্দীক বা ধর্মদ্রোহী আখ্যায়িত করা হয়েছে।** (অন্তরঙ্গ আলোকে শাইখুল হাদীস রহ., পৃ: ১৪৭-১৪৮)

মুফতি তাকি উসমানি হাফিযাহুল্লাহ

مكانة السياسة في الدين: قد اشتهر عن النصارى أنهم يفرقون بين الدين والسياسة بقولهم المعروف: "دع ما لقيصر لقيصر، وما لله لله"، فكأن الدين لا علاقة له بالسياسة، والسياسة لا ربط لها بالدين، وإن هذه النظرية الباطلة قد تدرجت إلى أبشع صورها في

العصور الأخيرة باسم "العلمانية" أو "سيكولر إزم" التي أخرجت الدين من سائر شؤون الحياة حتى قضت عليه بتاتاً.

وإن هذه النظرية في الحقيقة نوع من أنواع الإشراك بالله، من حيث إنها لا تعترف للدين بسلطة في الحياة المادية، وإنما تقصر سلطة الدين على رسوم وعبادات يمارسها المرء في خلوته أو في معبده، فكأن الإله ليس إلهاً إلا في العبادات والرسوم، وأما الأمور الدنيوية، فلها إله آخر، والعياذ بالله. (تكملة فتح الملهم للمفتي تقي العثماني، كتاب الإمارة، ١٥٣/٣)

"দ্বীনে রাজনীতির অবস্থান: খৃস্টানদের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ আছে যে তারা দ্বীন ও রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য করে। তাদের প্রসিদ্ধ প্রবাদ রয়েছে, 'কায়সারের অধিকার কায়সারের জন্য রাখো আর আল্লাহর প্রাপ্য আল্লাহকে দাও।' তো কেমন জানি রাজনীতির সঙ্গে দ্বীনের কোনো সম্পর্ক নেই এবং দ্বীনের সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পৃক্ততা নেই। এই বাতিল মতবাদ সাম্প্রতিক সময়ে 'আলমানিয়্যাহ' বা 'সেকুলারিজম' ধর্মনিরপেক্ষতার নামে তার সবচেয়ে কুৎসিত আকৃতিতে ক্রমবর্ধমান হচ্ছে, যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে দ্বীনকে বের করে দিয়েছে, এমনকি দ্বীনকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে।

এই মতবাদ মূলত আল্লাহ তাআলার সঙ্গে শিরকের একটি প্রকার। কেননা এটি বস্তুবাদী জীবনে দ্বীনের কর্তৃত্বকে স্বীকার করে না এবং দ্বীনের কর্তৃত্বকে কিছু রীতি-নীতি ও ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করে যা মানুষ একাকীত্বে বা ইবাদতখানায় চর্চা করে। কেমন জানি 'ইলাহ' তিনি শুধু ইবাদত ও রীতি-নীতির ক্ষেত্রে 'ইলাহ', আর জাগতিক বিষয়ের জন্য আরেকজন 'ইলাহ' রয়েছে। আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ৩/১৫৩)

مفتی نظام الدین شامزی رح نے فرمایا: اڑتالیس (۴۸) سال علماء نے انتخابی اور جمہوری سیاست میں ضائع کئے، میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس طرز حکومت سے اڑتالیس (۴۸) ہزار سال میں بھی اسلام نہیں آئے گا۔ (خطبات شامزی، علماء کرام اور ان کی ذمہ داریاں ۱/ ۲۰۳-۲۰۴)۔

{তিন}

الديمقراطية-গণতন্ত্র

গণতন্ত্র একটি স্বতন্ত্র ধর্ম

মাসআলা: গণতন্ত্র একটি স্বতন্ত্র ধর্ম এবং আল্লাহ তাআলার সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করে ইসলামের প্রকাশ্য শত্রুদের হাতে তৈরি একটি মতবাদ। সুতরাং গণতন্ত্র ধর্মে বিশ্বাসী, তা প্রতিষ্ঠাতা ও বাস্তবায়নকারী নির্বাহী শক্তি, সেটির নীতি অনুসারী বিচারকবর্গ এবং তা রক্ষাকারী প্রশাসন কাফের-মুরতাদ।

দলিল

গণতন্ত্র একটি কুফরি মতবাদ হওয়ার ব্যাপারে পূর্বসূরিদের কোনো দ্বিমত আছে বলে আমাদের জানা নেই। এ বিষয়ে লেখালেখি কম হয়নি। গণতন্ত্র কুফরি মতবাদ হিসেবে প্রমাণিত হওয়ার জন্য সেটির মৌলিক শ্লোগান অর্থাৎ সার্বভৌমত্বের অধিকারী একমাত্র জনগণ এবং জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস এবং এর বিপরীতে "إن الحكم إلا لله" এর মতো আল্লাহ তাআলার 'সরিহ'-সুস্পষ্ট ঘোষণাই যথেষ্ট। যদিও এর সমর্থনে আরো বহু আয়াত ও হাদিস বিদ্যমান আছে। উসুলে ফিকহের পরিভাষায় যেগুলো "قطعي الثبوت" হওয়ার পাশাপাশি "قطعي الدلالة" -ও বটে। তাই অর্থ ও ব্যাখ্যা করে 'ওযহে ইসতেদলাল' বুঝানোর প্রয়োজন নেই। তবে কোনো কোনো মুলহিদ যেহেতু ইতোমধ্যে উমর রাযি.কে গণতন্ত্রের প্রবর্তক বানিয়ে দিয়েছে, এছাড়াও 'ইসলামি গণতন্ত্র'র শ্লোগান খুব ব্যাপক হয়ে গেছে, তাই গণতন্ত্রের ব্যাপারে ভারতবর্ষের কয়েকজন আকাবিরে আসলাফের মন্তব্য উল্লেখ করা জরুরি মনে করছি।

গণতন্ত্রের ব্যাপারে ভারতবর্ষের কয়েকজন আকাবিরের মন্তব্য

শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি (মৃ-১১৭৬ হি.)

ولما كانت المدينة ذات اجتماع عظيم لا يمكن أن يتفق رأيهم جميعاً على حفظ السنة العادلة، ولا أن ينكر بعضهم على بعض من غير أن يمتاز بمنصب، إذ يفضي ذلك إلى مقاتلات عريضة، لم ينتظم أمرها إلا برجل اصطلح على طاعته جمهور أهل الحل والعقد، له أعوان وشوكة، وكل من كان أشح وأحد وأجرأ على القتل والغصب، فهو أشد حاجة إلى السياسة. (حجة الله البالغة للشاه ولي الله الدهلوي، المبحث الثالث، باب سياسة المدينة، ١٦١/١)

“কোনো শহরে যখন ব্যাপক আকারে জনগণের বসবাস হবে, তখন ‘সুন্নাতে আদেলা’ শরিআত কর্তৃক অনুমোদিত পন্থা সংরক্ষণের ব্যাপারে সকলের রায় এক হওয়া এবং বিশেষ অবস্থান ব্যতীত একে অপরের কর্মের বিরোধিতা করা অসম্ভব। কেননা এটি ব্যাপক হানাহানি পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। তাদের বিষয়াদির কোনো শৃঙ্খলা থাকবে না, যদি অধিকাংশ ‘আহলুল হল্লে ওয়ালআকদ’ শুরা সদস্য কোনো এক ব্যক্তির আনুগত্যের ব্যাপারে সম্মত না হয়, যার অনেক সহযোগী ও দাপট রয়েছে। আর হত্যা ও জবরদস্তির ব্যাপারে যে যতো বেশি লোভী, তেজী ও দুঃসাহসী হবে, তাকে পরিচালনা করা ততো বেশি প্রয়োজন।” (হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা, ১/১৬১)

হাকিমুল উম্মাহ আশরাফ আলি থানবি (মৃ-১৩৬২ হি.)

গণতন্ত্র ইসলামের বিপক্ষ মতবাদ হওয়া এবং গণতন্ত্রের ভয়ঙ্কর দিক ও অসারতার কথা থানবি রহ. এর রচনা, মালফুযাত ও মাকতুবাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সচেতন পাঠক আহসানুল ফাতাওয়ার জিহাদ অধ্যায় (৬/৮৫-১৪০) থেকে মুফতি তাকি উসমানি হাফিযাহুল্লাহ কর্তৃক লিখিত "حکیم الامت رحمہ اللہ تعالیٰ کے سیاسی افکار" শিরোনামের প্রবন্ধটি পড়ে নিতে পারেন। আমি থানবি রহ. এর দু'য়েকটি মন্তব্য উল্লেখ করছি-

(شخصی حکومت) غرض اسلام میں جمہوری سلطنت کوئی چیز نہیں، اسلام میں محض شخصی حکومت کی تعلیم ہے، اور جن مفاسد کی وجہ سے جمہوری سلطنت قائم کی گئی ہے، وہ سلطنت شخصی میں تو محتمل ہی ہیں اور جمہوری میں متیقن ہیں۔ (اشرف الجواب، ۳/۳۱۹)

"(ব্যক্তি রাজত্ব) **মোটকথা, ইসলামে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কোনো স্থান নেই।** ইসলামে শুধুমাত্র ব্যক্তি কর্তৃক শাসনের শিক্ষা রয়েছে। আর যে সকল ক্ষতির কথা চিন্তা করে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে, তা ব্যক্তি রাজত্বে তো সম্ভাব্য কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নিশ্চিত।" (আশরাফুল জওয়াব, ৩/৩১৯)

(شخصی سلطنت)......... بعض لوگوں کو یہ حماقت سوجھی کہ وہ جمہوری سلطنت کو اسلام میں ٹھونسنا چاہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام میں جمہوریت ہی کی تعلیم ہے، اور استدلال کرتے ہیں: "وشاورهم في الأمر" (اور تم معاملات میں ان سے مشورہ کرو)، مگر یہ بالکل غلط ہے، لوگوں نے مشورہ کی دفعات ہی کو دفع کر دیا ہے، اسلام میں مشورہ کا جو درجہ ہے اس کو بالکل نہیں سمجھا۔ (اشرف الجواب، ۳۲۱/۳)

"(ব্যক্তি রাজত্ব)...... **কতিপয় লোক ইসলামে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অনুপ্রবেশ ঘটাতে চাওয়ার মতো নির্বুদ্ধিতায় পড়েছে। তারা দাবি করে, ইসলামে গণতন্ত্রেরই শিক্ষা রয়েছে** এবং "وشاورهم في الأمر" (আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো) কে দলিল হিসেবে পেশ করে। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল। লোকেরা মশওয়ারা-পরামর্শের ধারাকেই বিলুপ্ত করে দিয়েছে। ইসলামে মশওয়ারার যে অবস্থান রয়েছে তা তারা বুঝেইনি।" (আশরাফুল জওয়াব, ৩/৩২১)

সাইয়েদ সুলাইমান নাদাবি (মৃ-১৩৭৩ হি.)

جمہوریت اور جمہوری عمل کا اسلام سے کیا تعلق؟ اور خلافت اسلامی سے کیا تعلق؟ موجودہ جمہوریت تو سترہویں صدی کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ یونان کی جمہوریت بھی موجودہ جمہوریت سے الگ تھی، لہذا اسلامی جمہوریت ایک بے معنٰی اصطلاح ہے......... ہمیں تو اسلام میں کہیں بھی مغربی جمہوریت نظر نہیں آئی اور اسلامی جمہوریت تو کوئی چیز ہے ہی نہیں......... جمہوریت ایک خاص تہذیب و تاریخ کا ثمرہ، اسے اسلامی تاریخ میں ڈھونڈنا معذرت خواہی ہے۔ (امالی علامہ سلیمان ندوی، ماہ نامہ سنابل کراچی، مئی ۲۰۱۳ء، ۸/۲۷-۲۸، شمارہ نمبر ۱۱، ماہ نامہ ساحل کراچی، جون ۲۰۰۶ء، بحوالہ ادیان کی جنگ، صہ ۵۴)

"গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ইসলামের কী সম্পর্ক? এবং ইসলামি খিলাফতেরই বা কী সম্পর্ক? বর্তমান গণতন্ত্রের আবিষ্কার তো হচ্ছে সপ্তদশ

শতাব্দীর পর। গ্রিক গণতন্ত্রও বর্তমানের গণতন্ত্রের থেকে পৃথক ছিলো। সুতরাং ‘ইসলামি গণতন্ত্র’ একটি অর্থহীন পরিভাষা।..... আমরা তো ইসলামের কোথাও পশ্চিমা গণতন্ত্র দেখছি না, আর ‘ইসলামি গণতন্ত্র’ বলতে কোনো কিছুই নেই।..... গণতন্ত্র এক বিশেষ কালচার ও ইতিহাসের ফসল, ইসলামি ইতিহাসে সেটিকে অন্বেষণ করা বাহানা তালাশ করা ছাড়া আর কিছুই নয়।” (আমালিয়ে আল্লামা সুলাইমান নাদাবি, মাহনামা সানাবেল করাচি, মে ২০১৩, ৮/২৭-২৮, নং ১১, মাহনামা সাহেল করাচি, জুন ২০০৬, সূত্রে আদইয়ান কি জঙ্গ, পৃ: ৫৪)

সাইয়েদ হুসাইন আহমাদ মাদানি (মৃ-১৩৭৭ হি.)

(مکتوب نمبر-۸۵)........وہاں (پاکستان) کی حکومت ایک یورپین طرز کی جمہوری حکومت ہے، جس میں حسب آبادی مسلم اور غیر مسلم سب حصہ دار ہیں، اس کو اسلامی حکومت کہنا غلطی ہے۔ (مکتوبات شیخ الاسلام، ۲/۲۴۲)

“(মাকতুব নং ৮৫)..... পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থা একটি ইউরোপীয় পদ্ধতির গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। যাতে অধিবাসী হিসেবে মুসলিম ও অমুসলিম সকলেই অংশীদার। সেটিকে ইসলামি রাষ্ট্র বলা ভুল। (মাকতুবাতে শাইখুল ইসলাম, ২/২৪২)

ইদরিস কান্ধলবি (মৃ-১৩৯৪ হি.)

(خلافت راشدہ کی تعریف)........جو حکومت اللہ کی حاکمیت اور قانون شریعت کی برتری اور بالادستی کو نہ مانتی ہو بلکہ یہ کہتی ہو کہ حکومت عوام کی اور مزدوروں کی ہے اور ملک کا قانون وہ ہے جو عوام اور مزدور مل کر بنالیں، سو ایسی حکومت بلاشبہ حکومت کافرہ ہے۔ (عقائد الاسلام، ۱/۱۹۵)

“(খিলাফতে রাশেদার পরিচয়)..... যে রাষ্ট্র আল্লাহ তাআলার কর্তৃত্ব এবং শরিআতের বিধি-বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব ও ক্ষমতাকে গ্রহণ করে না, বরং এ কথা বলে যে, রাষ্ট্র হলো জনসাধারণ ও শ্রমিকদের এবং রাষ্ট্রের আইন তাই হবে যা জনসাধারণ ও শ্রমিকরা মিলে তৈরি করবে। **তো এ ধরনের রাষ্ট্র নিঃসন্দেহে কাফের রাষ্ট্র।**” (আকায়েদুল ইসলাম, ১/১৯৫)

কারি মুহাম্মাদ তাইয়িব (মৃ-১৪০৩ হি.)

(قانون سازی غیر اللہ کا حق نہیں)......... پس وہ سلطنت کبھی بھی اسلامی سلطنت نہیں کہی جاسکتی جس میں قانون سازی انسان کا حق تسلیم کی گئی ہو اور اس طرح حکمرانی کا منصب انسانوں کو دیا جارہا ہو کہ یہ خدا کی صفت ملکیت میں بھی شرکت ہے اور صفت علم میں بھی اشتراک ہے جو روح عبدیت کے منافی ہے جس کے لئے انسان دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ (فطری حکومت، ۲/۶۰)

"(আইন প্রণয়ন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো অধিকার নয়)..... সুতরাং ওই রাষ্ট্র কখনই ইসলামি রাষ্ট্র হতে পারে না, যে রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন মানুষের অধিকার হিসেবে মেনে নিয়েছে এবং স্বতন্ত্র নীতিতে রাজ্য পরিচালনার পদ মানুষদেরকে দিয়ে দিয়েছে। এটি আল্লাহ তাআলার মালিকানায়ও অংশীদারিত্ব এবং ইলমেও অংশীদারিত্ব, যা বান্দার বাস্তবতার বিপরীত, যে উদ্দেশ্যে মানুষকে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছে।" (ফিতরি হুকুমত, ২/৬০)

মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর (মৃ-১৪০৭ হি.)

"আমি নাছারাদের রেখে যাওয়া রাজনীতি জায়েয মনে করি না"।

(হাফেজ্জী হুজুর রহ. স্মারকগ্রন্থ, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৮৩ ইং সনে অনুষ্ঠিত তিন দিন ব্যাপী জাতীয় মহাসম্মেলনে হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) এর উদ্বোধনী ভাষণ, পৃ: ৯৫৮)।

শাইখুল হাদিস আব্দুল হক (মৃ-১৪০৯ হি.)

প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম ও শাইখুল হাদিস, দারুল উলুম হক্কানিয়া পাকিস্তান।

سوشلزم، کمیونزم اور مغربی جمہوریت یہ تمام نظامہائے زندگی اسلام کے اصول سے متصادم ہیں، ایسے کسی بھی نظام کے خلاف آواز اٹھانا، جد وجہد کرنا یا کوئی تحریک چلانا یہ سب امور موجب ثواب ہیں، اس لئے کہ یہ سب نظامہائے زندگی منکرات میں داخل ہیں، خاص کر جب ان نظامہائے زندگی میں دینی اقدار متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے ہوں، اس وقت مسلمانوں پر لازم ہو جاتا ہے کہ ان منکرات کا سدباب کریں۔ اور اگر منکرات کو ختم کرنے کے لئے کوئی جماعت مقرر ہو جائے یا کوئی خاص تحریک چلائی جائے تو یہ ایک مستحسن اور قابل فخر عمل ہو گا۔ (فتاوی حقانیہ، کتاب السیاسۃ، غیر اسلامی نظام کے خلاف تحریک چلانا، ۲/۳۲۷-۳۲۸)

“সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ ও পশ্চিমা গণতন্ত্র; এ সকল জীবনব্যবস্থা ইসলামের মূলনীতির সঙ্গে সংঘাতময়। এ ধরনের যে কোনো ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কথা বলা, চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানো অথবা কোনো আন্দোলন গড়ে তোলা সওয়াবের কাজ হবে। কেননা এ সকল জীবনব্যবস্থা ‘মুনকারাত’ অন্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। বিশেষকরে যখন এ সকল জীবনব্যবস্থার কারণে দ্বীনি পরিবেশ প্রভাবান্বিত না হয়ে থাকে না, তখন মুসলমানদের জন্য এ সকল অন্যায়ের মূলোৎপাটন করা আবশ্যক হয়ে যায়। যদি অন্যায়ের প্রতিরোধে কোনো শ্রেণি তৈরি হয়ে যায় অথবা কোনো বিশেষ আন্দোলন চালানো হয়, তাহলে এটি প্রশংসনীয় ও গৌরবের বিষয়।” (ফাতাওয়া হক্কানিয়া, ২/৩২৭-৩২৮)

মুফতি মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহি (মৃ-১৪১৭ হি.)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رح نے جمہوریت کی تردید فرمائی ہے، وہاں قوانین احکام کا مدار دلائل پر نہیں بلکہ اکثریت پر ہے یعنی کثرت رائے سے فیصلہ ہوتا ہے، پس اگر کثرت رائے قرآن وحدیث کے خلاف ہو تو اسی پر فیصلہ ہوگا، قرآن کریم نے اکثریت کی اطاعت کو موجب ضلالت فرمایا ہے "وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله" الآية، اہل علم، اہل دیانت، اہل فہم کم ہی ہوا کرتے ہیں، خلفاء اربعہ رضی اللہ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، انہوں نے اس کے خلاف کوئی دوسری راہ اختیار نہیں کی ہے۔ (فتاوی محمودیہ، کتاب الجہاد والہجرۃ والسیاسۃ، باب چہارم جمہوریت ومشاورت، ۲۰/۴۱۲)

“শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. গণতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাতে বিধি-বিধানের ভিত্তি দলিলের উপর নয়, বরং আধিক্যের উপর। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সুতরাং অধিকাংশের রায় যদি কুরআন-হাদিসের বিপরীত হয়, তবুও সে অনুযায়ী ফয়সালা হবে। **অথচ কুরআন অধিকাংশের অনুসরণকে ভ্রষ্টতার কারণ হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।** "وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله" (আর যদি তুমি যারা জমিনে আছে তাদের অধিকাংশের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে)। জ্ঞানী, দ্বীনদার ও বিবেকী কমই হয়ে থাকে। চার খলিফা রাযিয়াল্লাহু আনহুম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতির উপর ছিলেন। তাঁরা নববি পদ্ধতির পরিপন্থী কোনো পন্থা অবলম্বন করেননি।” (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ২০/৪১২)

সাইয়েদ আতাউল মুহসিন শাহ বুখারি (মৃ-১৪২০ হি.)

সাহেবযাদা, সাইয়েদ আতাউল্লাহ শাহ বুখারি রহ.

اگر کسی ایک قبر کو مشکل کشا ماننا شرک ہے تو کسی اور نظام ریاست، امپریل ازم، ڈیمو کریسی، کمیونزم، کیپٹل ازم اور تمام باطل نظام ہائے ریاست کو ماننا کیسے اسلام ہو سکتا ہے؟........ قبر کو سجدہ کرنے والا مشرک، پتھر لکڑی اور درخت کو مشکل کشا ماننے والا، حاجت روا ماننے والا مشرک، اور غیر اللہ کے نظاموں کو مرتب کرنا اور اس کے لئے تگ و دو کرنا اور اس نظام کو قبول کرنا، یہ توحید ہے؟........ کہاں ہے جمہوریت اسلام میں؟ (ماہ نامہ سنابل کراچی، بحوالہ ادیان کی جنگ، ص۵۶)

"যদি কাউকে কবরে উদ্ধারকারী মনে করা শিরক হয়ে থাকে, তাহলে অন্য কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থা; সাম্রাজ্যবাদ, গণতন্ত্র, সাম্যবাদ ও পুঁজিবাদ এবং সকল বাতিল রাষ্ট্রব্যবস্থাকে গ্রহণ করা কীভাবে ইসলাম হতে পারে?..... কবরপূজারি মুশরিক, যে পাথর, লাকড়ি এবং গাছকে উদ্ধারকারী ও প্রয়োজন সম্পন্নকারী মনে করে সে মুশরিক, আর মানবরচিত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে চয়ন করা, সেটির জন্য লম্ফঝম্ফ করা এবং সেটিকে গ্রহণ করে নেয়া; এটি তাওহিদ!!!..... ইসলামে কোথায় আছে গণতন্ত্রের স্থান?" (মাহনামা সানাবেল করাচি, সূত্রে আদইয়ান কি জঙ্গ, পৃ: ৫৬)

ইউসুফ লুধিয়ানবি শহিদ (মৃ-১৪২১ হি.)

(جمہوریت اس دور کا صنم اکبر)....... جمہوریت دور جدید کا وہ "صنم اکبر" ہے جس کی پرستش اول اول دانایان مغرب نے شروع کی، چونکہ وہ آسمانی ہدایت سے محروم تھے اس لئے ان کی عقل نارسا نے دیگر نظام ہائے حکومت کے مقابلہ میں جمہوریت کا بت تراش لیا اور پھر اس کو مثالی طرز حکومت قرار دے کر اس کا صور اس بلند آہنگی سے پھونکا کہ پوری دنیا میں اس کا غلغلہ بلند ہوا یہاں تک کہ مسلمانوں نے بھی تقلید مغرب میں جمہوریت کی مالا چپنی شروع کر دی، کبھی یہ نعرہ بلند کیا گیا کہ "اسلام جمہوریت کا علمبر دار ہے" اور کبھی "اسلامی جمہوریت" کی اصطلاح وضع کی گئی، حالانکہ مغرب جمہوریت کے جس بت کا پجاری ہے اس کا نہ صرف یہ کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ اسلام کے سیاسی نظریہ کی ضد ہے، اس لئے اسلام کے ساتھ جمہوریت کا پیوند لگانا اور جمہوریت کو مشرف بہ اسلام کرنا صریحاً غلط ہے۔ (آپ کے مسائل اور ان کا حل، سیاست، ۱۹۰/۸)

"(গণতন্ত্র সাম্প্রতিককালের বড়ো মূর্তি)..... গণতন্ত্র সাম্প্রতিককালের ওই 'বড়ো মূর্তি' যার পূজা প্রথম প্রথম পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীরা শুরু করেছিলো। যেহেতু তারা আসমানি হেদায়াত থেকে বঞ্চিত ছিলো, তাই তাদের অকৃতকার্য মেধা অন্যান্য রাষ্ট্রব্যবস্থার মোকাবেলায় গণতন্ত্রের মূর্তির আকৃতি গঠন করলো। অতঃপর সেটিকে আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা আখ্যা দিয়ে সেটির শিঙ্গা এতো উঁচু আওয়াজে ফুৎকার দিয়েছে যে, পুরো বিশ্বে তার ধুমধাম পড়ে গেছে। এমনকি মুসলমানরাও পাশ্চাত্যের অনুসরণে গণতন্ত্রের মালা পরতে শুরু করেছে। কখনো 'ইসলাম গণতন্ত্রের ঝাণ্ডাবাহী' শ্লোগান দিয়েছে, আবার কখনো 'ইসলামি গণতন্ত্র' পরিভাষা আবিষ্কার করেছে। **অথচ পশ্চিমা বিশ্ব যে গণতন্ত্রের মূর্তিপূজারি তা শুধু এতোটুকু নয় যে ইসলামের সঙ্গে সেটির কোনো সম্পর্ক নেই, বরং তা ইসলামি রাষ্ট্রনীতির বিপরীত। এ জন্য ইসলামের সঙ্গে গণতন্ত্রের জোড়া লাগানো এবং গণতন্ত্রকে মুসলমান বানানো সুস্পষ্ট ভুল।"** (আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল, ৮/১৯০)

মুফতি রশিদ আহমাদ লুধিয়ানবি (মৃ-১৪২২ হি.)

(اسلام میں مغربی جمہوریت کی کوئی گنجائش نہیں).........یہ تمام برگ وبار مغربی جمہوریت کے شجرۂ خبیثہ کی پیداوار ہیں، اسلام میں اس کافرانہ نظام کی کوئی گنجائش نہیں۔ (احسن الفتاوی، کتاب الجہاد، ۶/۲۶)

"(ইসলামে পশ্চিমা গণতন্ত্রের কোনো সুযোগ নেই)..... এ সকল ফল-পাতা পশ্চিমা গণতন্ত্রের অপবিত্র গাছের উৎপাদন। **ইসলামে এ কুফরি ব্যবস্থার কোনো সুযোগ নেই।"** (আহসানুল ফাতাওয়া, ৬/২৬)

মুফতি নিযামুদ্দিন শামেযি শহিদ (মৃ-১৪২৫ হি.)

শাইখুল হাদিস, জামিআ বানুরি টাউন, করাচি, পাকিস্তান।

(دنیا کے اندر تین نظام)............اسلامی نظام کا عملی نمونہ اب صرف امارت اسلامی افغانستان میں ہے، لیکن دنیا کے کسی اور اسلامی ملک میں اسکا نمونہ نہیں۔ عجیب تعجب کی بات یہ ہے کہ دنیا کے اکثر ممالک میں جو سیاسی نظام چل رہے ہیں یہ دونوں سیاسی نظام بھی یہودیوں کے ہیں، جمہوری نظام ہے یہ بھی یہودیوں کا ہے، یہودی ہی اس کے خالق اور یہودی ہی اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، اور اس طریقے سے یہ جو کیمونسٹ نظام

تھا اس کو بھی دنیا کے سامنے پیش کرنے والے یہودی تھے۔ (خطبات شامزی، دینی مدارس کے خلاف عالمی سازشیں، ۱/ ۱۷۲-۱۷۳)

"(বিশ্বের তিন রাষ্ট্রব্যবস্থা)..... ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার কার্যত নমুনা এখন (তালেবানদের ক্ষমতাকালে) শুধু 'ইমারতে ইসলামি' আফগানিস্তানে রয়েছে। কিন্তু বিশ্বের অন্য কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে সেটির নমুনা নেই। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, বিশ্বের অধিকাংশ দেশে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা চলছে; এ দু'টি রাষ্ট্রব্যবস্থাই ইহুদিদের তৈরি। **গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এটিও ইহুদিদের আবিষ্কার, ইহুদিরাই তার স্রষ্টা এবং ইহুদিরাই সেটিকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে।** তেমনিভাবে এই যে সাম্যবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিলো, সেটিকেও বিশ্বের সামনে ইহুদিরাই পেশ করেছে।" (খুতবাতে শামেযি, ১/১৭২-১৭৩)

শাহ হাকিম মুহাম্মাদ আখতার (মৃ-১৪৩৪ হি.)

(اسلام میں جمہوریت کی حقیقت) ارشاد فرمایا کہ اسلام میں جمہوریت کوئی چیز نہیں ہے کہ جدھر زیادہ ووٹ ہو جائیں ادھر ہی ہو جاؤ، بلکہ اسلام کا کمال یہ ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن مسلمان اللہ ہی کا رہتا ہے۔ (خزائن معرفت ومحبت، ص ۱۸۳)

"(ইসলামে গণতন্ত্র-সংখ্যাগরিষ্ঠতার মূল্যায়ন) তিনি বলেছেন, **ইসলামে গণতন্ত্র-সংখ্যাগরিষ্ঠতার কোনো স্থান নেই যে,** যেদিকে ভোট বেশি হবে সেদিকে হয়ে যাও। বরং ইসলামের উৎকর্ষতা হচ্ছে, পুরো বিশ্বও যদি একদিকে হয়ে যায় কিন্তু মুসলমান আল্লাহর জন্যই থাকে।" (খাযায়েনে মা'রেফাত ওয়ামুহাব্বাত, পৃ: ১৮৩)

মুফতি ফজলুল হক আমিনী (মৃ-১৪৩৪ হি.)

আমাদের আকিদা হলো, নবীজী ও খোলাফায়ে রাশেদিনের পদ্ধতির রাষ্ট্রব্যবস্থাই একমাত্র খিলাফতভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। খিলাফত ছাড়া সব রাষ্ট্রব্যবস্থাই হয়ত কুফরি অথবা পথভ্রষ্ট। বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী প্রধান রাষ্ট্রব্যবস্থা হচ্ছে গণতন্ত্র (Democracy) ও সমাজতন্ত্র (Socialism)- **উভয়টাই কুফরি রাষ্ট্রব্যবস্থা।** (মুফতি ফজলুল হক আমিনী রহ. জীবন ও সংগ্রাম, পৃ: ২১)

মুফতি হামিদুল্লাহ জান (মৃ-১৪৩৮ হি.)
রঈস, দারুল ইফতা, জামিআ আশরাফিয়া লাহোর।

مشاہدہ اور تجربے سے ثابت ہے کہ موجودہ مغربی جمہوری نظام ہی بے دینی، بے حیائی اور تمام فسادات کی جڑ ہے اور خصوصا اس میں اسمبلیوں کو حق تشریع (آئین سازی، قانون سازی کا حق) دینا سراسر کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ (ماہنامہ سنابل کراچی، مئی ۲۰۱۳ء، ۸/ ۳۲، شمارہ نمبر ۱۱، بحوالہ ادیان کی جنگ، ص ۵۶)

"প্রত্যক্ষদর্শন ও অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে, বর্তমানের পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই দ্বীনহীনতা, নির্লজ্জতা ও সকল নষ্টের মূল। **বিশেষকরে এ ব্যবস্থাপনায় এ্যাসেম্বলি-সংসদকে আইন প্রণয়নের অধিকার দেয়া সম্পূর্ণরূপে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মতের বিপরীত।**" (মাহনামা সানাবেল করাচি, মে ২০১৩, ৮/৩২, নং ১১, সূত্রে আদইয়ান কি জঙ্গ, পৃ: ৫৬)

মুফতি হামিদুল্লাহ জান রহ. এর একটি বক্তব্যের ভিডিও আমার সংরক্ষণে আছে। বক্তব্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি বক্তব্যের প্রথমদিকের কিছু অংশের অনুবাদ উল্লেখ করছি।

তিনি বলেন, '**যতোদিন এই দুর্গন্ধযুক্ত গণতন্ত্র, ইংরেজ প্রদত্ত শাসনব্যবস্থা এই দেশে থাকবে, ততোদিন কূপ পাক হতে পারে না। সর্বপ্রথম মৃত কুকুরকে কূপ থেকে বের করতে হবে, তবেই এই পানি পাক হবে। যতোক্ষণ মরা কুকুর পানিতে পড়ে থাকবে, হাজার বালতি পানি বের করুন; আলেমগণ বসা আছেন! সেই কূপ কি পাক হতে পারে? হতে পারে না। নারাজ হবেন না।** আমি একটি মৌলিক কথা বলছি, সংক্ষেপে বলছি। "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله" কুরআনে কারিমের এই আয়াতের ব্যাপারে হযরত আদি ইবনে হাতেম রাযি. জিজ্ঞাসা করেছেন; তাফসিরে রুহুল মাআনি খুলে দেখুন, তাফসিরে মাযহারি খুলে দেখুন, অন্যান্য তাফসির খুলে দেখুন, আরবি না বুঝলে উর্দুতে মাওলানা ইদরিস কান্ধলবির মাআরিফুল কুরআন খুলে দেখুন! যাই হোক, হযরত আদি ইবনে হাতেম রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা আহলে কিতাবরা তো কখনো উলামাদের সামনে ইবাদত করতাম না, সিজদা দিতাম না, আমরা তো কখনো আমাদের পীরদের ইবাদত করতাম না। তাহলে আল্লাহ তাআলা কীভাবে বললেন যে, তারা তাদের পীর,

মৌলবিদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করতো? তো তারা কীভাবে রব বানালো, আমরা তো তাদের ইবাদত করিনি? তখন হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন -হাদিসে আছে- হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা শরিআত প্রণয়নের অধিকার, হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করার অধিকার পীর-মৌলবিদেরকে দিয়েছিলো। অর্থাৎ আইন প্রণয়নের অধিকার পীর-মৌলবিদেরকে দিয়েছিলো। হারামকে হালাল সাব্যস্ত করা এবং হালালকে হারাম সাব্যস্ত করা, শরিআত প্রণয়নের অধিকার, আইন প্রণয়ন, আইন তৈরির অধিকার দিয়েছিলো। অথচ আইন প্রণয়ন ও আইন তৈরির অধিকার শুধু আল্লাহ তাআলার জন্য। "إن الحكم إلا لله" বিধানদাতা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই।' (ইউটিউবে লিখে সার্চ করুন 'সংশয় নিরসন, মুফতি তাকি উসমানি (দা. বা.)র আশ্চর্য সংশয়' ১৮.১৭ মি. - ২০.৪২ মি.)

মুফতি তাকি উসমানি হাফিযাহুল্লাহ

إن الحكم إلا لله: إن المبدأ الأول من مبادئ الأحكام السياسية للإسلام هو أن الحكم الحقيقي في هذا الكون إنما هو لله سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين. وبناء على هذا الأساس، فلا يجوز إصدار قانون يصادم أحكام الله سبحانه وتعالى المشروحة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ولا إصدار حكم أو أمر إلا بما يوافق شرع الله الذي شرع لعباده.

وإن هذا المبدأ هو الذي يميز النظام السياسي الإسلامي من كل من الديموقراطية والدكتاتورية، فإن الديموقراطية تفوض الحكم إلى الشعب دون أي قيد، والدكتاتورية تفوضه إلى الحاكم الذي لا يخضع في أفعاله إلى سلطة أخرى. (تكملة فتح الملهم، كتاب الإمارة، ٣/١٥٥)

"إن الحكم إلا لله" (বিধানদাতা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই): ইসলামি রাষ্ট্রনীতির ধারাসমূহের প্রথম ধারাই হচ্ছে, এই পৃথিবীতে প্রকৃত হুকুমের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তিনি সবচেয়ে উত্তম বিধানদাতা। এই মৌলিক ধারার ভিত্তিতেই কুরআনে কারিম ও সুন্নাতে নববিতে বিশ্লেষিত আল্লাহ

তাআলার বিধি-বিধানের পরিপন্থী কোনো আইন ইস্যুকরণ জায়েয নয়। এবং আল্লাহ তাআলা বান্দার জন্য যে শরিআত দিয়েছেন সে শরিআত অনুযায়ী নয়; এমন কোনো বিধান বা বিষয় ইস্যু করা যাবে না।

এই ধারাতেই ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে পৃথক হয়ে যায়। কেননা গণতন্ত্র কোনো শর্ত ছাড়াই বিচারের দায়িত্ব জনগণের হাতে ন্যস্ত করে। আর একনায়কতন্ত্র অর্পণ করে শাসকের হাতে, যে তার কার্যকলাপে অন্য কোনো কর্তৃত্বের বশ্যতা স্বীকার করে না।” (তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ৩/১৫৫)

(۲-اسلام کا نظام حکومت)............ خلاصہ یہ کہ جمہوریت نے کثرت رائے کو (معاذ اللہ) خدائی مقام دیا ہوا ہے کہ اس کا کوئی فیصلہ رد نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اسی بنیاد پر مغربی ممالک میں بد سے بدتر قوانین کثرت رائے کے زور پر مسلسل نافذ کئے جاتے رہے ہیں، اور آج تک کئے جا رہے ہیں۔ زنا جیسی بدکاری سے لے کر ہم جنسی جیسے گھناؤنے عمل تک کو اسی بنیاد پر سند جواز عطاء کی گئی ہے، اور اس طرز فکر نے دنیا کو اخلاقی تباہی کے آخری سرے تک پہنچا دیا ہے۔ (احسن الفتاوی، کتاب الجہاد، حکیم الامت رحمہ اللہ تعالی کے سیاسی افکار - تحریر مولانا محمد تقی عثمانی-،۶/۹۵)

“(ইসলামের শাসনব্যবস্থা)..... মোটকথা, গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়কে (আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই) প্রভুত্বের স্থান দিয়ে দিয়েছে যে, সেটির কোনো সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। এর ভিত্তিতেই পশ্চিমা বিশ্বে সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ের প্রভাবে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর আইনের প্রচলন করা হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত করে চলছে। এর ভিত্তিতেই যিনা-ব্যভিচারের মতো অন্যায় কাজ থেকে নিয়ে সমকামিতার মতো ঘৃণিত কাজের পর্যন্ত বৈধতা দেয়া হয়েছে। আর এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বকে চারিত্রিক অধঃপতনের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে।” (আহসানুল ফাতওয়া, ৬/৯৫)

মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ

প্রচলিত গণতন্ত্র ও ইসলামের খেলাফত পদ্ধতি মৌলিক নীতিমালা ও আদর্শ-উদ্দেশ্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দু'টি ব্যবস্থা। ইসলামী শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা কখনও মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, আর ক্ষমতাশীলদের যাচ্ছেতাই করার কোনোই সুযোগ নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে মনগড়া যে কোনো আইন তৈরি করা,

বিরোধীদের দমন-পীড়ন, জনগণকে নিজেদের গোলামের মতো ভেবে যে কোনো আইন বা করের বোঝা তাদের ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ ইসলামে নেই। (মাসিক আলকাউসার, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ: ০৭)।

গণতন্ত্র একটি কুফরি ও ভয়ঙ্কর মতবাদ হওয়ার ব্যাপারে আকাবিরে আসলাফের অবস্থান সুস্পষ্ট। এরপরও উপদেশ, অনুযোগ ও অভিমানের মাধ্যমে এমন একটি কুফরি ও ভয়ঙ্কর মতবাদকে শুদ্ধ করার পেছনে যে আমরা আমাদের জীবনের সিংহভাগ ব্যয় করে চলছি, তা কি কূপে মৃত কুকুর রেখেই কূপ পরিষ্কার করার ব্যর্থ চেষ্টা নয়?

গণতন্ত্রের ব্যাপারে একটি পরামর্শ

একটি ইসলামি মাসিক পত্রিকায় গণতন্ত্রের ব্যাপারে একটি পরামর্শ দেয়া হয়েছে যে, 'ইসলামের পাশাপাশি গণতন্ত্র চলতে পারে বলে সাধারণ জনগণের যে মত উক্ত জরিপে প্রকাশিত হয়েছে এর অর্থ- গণতন্ত্রের অতটুকুই নেয়া যাবে, যতটুকু শরীয়া অনুমোদন করে। এ বিষয়েও মুসলিম জনগণের সঠিক রাহনুমায়ী দাঈগণের কর্তব্য।'

এই পরামর্শ কতোটুকু শরিআত সম্মত?

প্রথম কথা: সুস্পষ্ট একটি কুফরি মতবাদের অংশবিশেষ গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়া কতোটুকু শরিআত সম্মত?

দ্বিতীয়ত: গণতন্ত্র ধর্মের যে বিষয়গুলো গ্রহণ করতে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে, সেগুলো কি ইসলাম ধর্মে বিদ্যমান আছে? যদি থেকে থাকে তাহলে সেগুলো ইসলাম ধর্ম থেকে না নিয়ে গণতন্ত্র ধর্ম থেকে নিতে হবে কেনো? আর যদি ইসলাম ধর্মে না থেকে থাকে তাহলে সেগুলো গ্রহণযোগ্য হওয়ার পদ্ধতি কী?

তৃতীয়ত: এই উপদেশ ও মওদুদি মতবাদের ধ্বজাধারীদের আদর্শের মধ্যে কী পার্থক্য? অধ্যাপক গোলাম আযমের বক্তব্যের ভিডিও আমার সংরক্ষণে আছে। তার বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে, গণতন্ত্রের একটি দিক কুফরি অর্থাৎ সার্বভৌমত্বের অধিকারী জনগণকে বলা। বাকি তিনটি পয়েন্টের সঙ্গে ইসলামের কোনো বিরোধ নেই। তাই পাইকারিভাবে গণতন্ত্রকে কুফরি মতবাদ বলা মোটেও ঠিক না। (ইউটিউবে লিখে সার্চ করুন 'সংশয় নিরসন, গণতন্ত্র ও অধ্যাপক গোলাম আযম)।

অথচ ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান রাখা ব্যক্তিও জানে, কোনো মতবাদ কুফরি হওয়ার জন্য ওই মতবাদের সকল দিক কুফর হওয়া জরুরি নয়। খৃস্টবাদ, ইহুদিবাদের সকল দিক কুফর বিষয়টি এমন নয়। অন্যান্য কুফরি মতবাদেও এমন বিষয় আছে যার সঙ্গে ইসলামের কোনো বিরোধ নেই। তাই বলে সেগুলো 'ইসলামি খৃস্টবাদ' ও 'ইসলামি ইহুদিবাদ' হয়ে যাবে না। ঠিক তেমনিভাবে গণতন্ত্রের মতো একটি কুফরি মতবাদের ক্ষেত্রেও 'ইসলামি গণতন্ত্র' ব্যবহার হতে পারে না।

ভোট প্রদানের ব্যাপারে একটি ফাতওয়া

এমন একটি কুফরি মতবাদের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোট প্রদানের ব্যাপারে একটি মন্তব্য আমরা লক্ষ্য করতে পারি।

পূর্বোক্ত পত্রিকায় 'ভোট অবশ্যই দিতে হবে' শিরোনামের অধীনে বলা হয়েছে, 'উপরোক্ত আলোচনা পড়ে প্রশ্ন আসতে পারে যে, তা হলে তো বর্তমান সমাজে অধিকাংশ আসনের লোকদের ভোট দেওয়াই সম্ভব হবে না। কারণ, এমন লোক তো পাওয়া যাবে না, যার সপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করা যায় এবং এ কারণে অনেকে ভোট দেওয়া থেকে বিরতও থাকেন, এমনকি বহু লোক ভোটার হতেও আগ্রহী হন না। সাধারণ বিবেচনায় এ চিন্তা যুক্তিযুক্ত মনে হলেও এক্ষেত্রে কিন্তু মুদ্রার ভিন্ন পিঠও রয়েছে। তা হচ্ছে, মন্দের ভালো বা তুলনামূলক কম ক্ষতিকে বেছে নেওয়া এবং অধিক ক্ষতি থেকে বাঁচার চেষ্টা করা। বর্তমানে ভোটকে এ দৃষ্টিকোণ থেকেই বিবেচনায় আনতে হবে এবং ভোটের মাধ্যমে অধিক ক্ষতি থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। কোনো আসনে একজন লোককেও যদি সাক্ষ্য ও ভোট দেওয়ার উপযুক্ত মনে না হয় তবে তাদের মধ্যে যে জন নীতি-নৈতিকতা, চিন্তা-চেতনা ও কাজে-কর্মে অন্য প্রার্থীর তুলনায় কম খারাপ তাকেই ভোট দিতে হবে। কারো ব্যাপারে যদি খোদাদ্রোহিতা, ইসলাম-দুশমনী, রাষ্ট্র ও জনগণের স্বার্থ-বিরোধী হওয়ার সুস্পষ্ট আলামত থাকে তবে ঐ অসৎ ব্যক্তির বিজয় ঠেকানোর চেষ্টা করতে হবে ভোটারাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে। **মোটকথা, গণতন্ত্র ও বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতির যতই ত্রুটি থাকুক এর কারণে ভোট দানে বিরত থাকা সমীচীন হবে না;** বরং বুদ্ধি-বিবেচনা খরচ করে, ভেবে-চিন্তে ভোটারাধিকার প্রয়োগ করতে হবে ভাল-মন্দের ভালো অথবা অন্তত কম মন্দের পক্ষে। এ ক্ষেত্রে

শরীয়তের দৃষ্টিতে কাউকে ভোটদানের অর্থ হবে, এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, লোকটি তার প্রতিদ্বন্দ্বিদের তুলনায় কিছুটা হলেও ভালো।'

এই ফাতওয়া কতোটুকু উসুলে শরিআহ সম্মত?

প্রথম কথা: একটি কুফরি ও ভয়ঙ্কর মতবাদের গোড়ার বিষয় অগোচরে রেখে সেটির একটি পদ্ধতির ব্যাপারে এভাবে ফাতওয়া দেয়া কতোটুকু উসুলে শরিআহ সম্মত? গণতন্ত্রের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভোট প্রদান কি শুধু ব্যক্তির ভালো-মন্দের সার্টিফিকেট দেয়া? এর আগ-পরের পর্যায়গুলো নিয়ে কি ভাবার কোনো প্রয়োজন নেই? এছাড়াও ভোট প্রদানের অর্থ কি গণতন্ত্রকে মেনে নেয়া নয়?

গুণ দু'টির সমন্বয় অসম্ভব

দ্বিতীয়ত: উপরিউক্ত ফাতওয়ায় ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে প্রার্থী নির্বাচনের ব্যাপারে দু'টি গুণের কথা বলেছেন, ইসলামবিরোধী ও রাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী না হওয়া। কথা হলো, কুফরি সংবিধানের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কোনো প্রার্থীর ক্ষেত্রে এ দু'টি গুণ একত্রিত হওয়ার পদ্ধতি কী? ইসলামি খিলাফত প্রতিষ্ঠার শিরোনাম ব্যবহার করলে বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী তা রাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী, আর ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বললে তা ইসলামবিরোধী। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের কথা বললে তা ইসলামবিরোধী, আর এগুলোর বিপক্ষে কথা বললে তা বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রবিরোধী। এছাড়াও প্রার্থীর নীতি-নৈতিকতা ও চিন্তা-চেতনা বিবেচনার কথা যে বলা হয়েছে, তা কি ইসলামের আলোকে বিবেচ্য হবে নাকি রাষ্ট্রের স্বার্থের আলোকে?

এ প্রশ্নের উত্তর কী হবে?

তৃতীয়ত: উপর্যুক্ত ফাতওয়ায় যদি শুধু ইসলামের শিরোনাম ব্যবহারকারী প্রার্থীকে ভোট দেয়ার কথা বলা হতো, দলিলের আলোকে সেটি সমর্থনযোগ্য না হলেও তার একটি পর্যায় ছিলো। কিন্তু ঢালাওভাবে যে ভোট প্রদান করাকে আবশ্যকীয় করে দেয়া হলো, সেক্ষেত্রে এরূপ প্রশ্ন আসলে উত্তর কী হবে? আমাদের এলাকায় দু'জন প্রার্থী যারা নীতি-নৈতিকতায় উনিশ-বিশ। একজন কাদিয়ানি মতবাদে বিশ্বাসী, অপরজন দেওয়ানবাগির নির্ভেজাল মুরিদ। এক্ষেত্রে আমরা কাকে ভোট দেবো? অথবা আমাদের আসনে দু'জন প্রার্থীর একজন সদ্য মুসলমান থেকে খৃস্টান হয়ে যাওয়া মুরতাদ, তবে তার নীতি-

নৈতিকতা বর্তমান সমাজের দৃষ্টিতে ভালো, অপরজন নামে মুসলমান হলেও সমাজের মানুষ তাকে গালি দেয়া ব্যতীত তার নাম মুখে নেয় না। এক্ষেত্রে আমরা কাকে ভোট দেবো? অথবা আমাদের আসনে দু'জন প্রার্থী। একজনের নীতি-নৈতিকতা সমাজের দৃষ্টিতে খুব ভালো, কিন্তু তাকে ভোট দিলে যে দল ক্ষমতায় যাবে সেটি ইসলামবিদ্বেষী। অপর প্রার্থীকে মানুষ হারামযাদা ছাড়া কথা বলে না, তাকে ভোট দিলে যে দল ক্ষমতায় যাবে তাকে অনেকটা ইসলামবান্ধব মনে করা হয়। এক্ষেত্রে আমরা কাকে ভোট দেবো? এ জাতীয় হাজারো প্রশ্নের জবাব প্রস্তুত রেখেই ফাতওয়া দেয়া কাম্য!!!

ভোট প্রদানের ব্যাপারে কয়েকজন আকাবিরের মন্তব্য

চতুর্থত: আমরা ভোট প্রদানের ব্যাপারে কয়েকজন আকাবিরের মন্তব্য দেখতে পারি।

সাইয়েদ আতাউল মুহসিন শাহ বুখারি (মৃ-১৪২০ হি.)

সাহেবযাদা, সাইয়েদ আতাউল্লাহ শাহ বুখারি রহ.

نہ ووٹ ہے، نہ مفاہمت ہے، نہ ان کا وجود برداشت ہے، نہ ان کی تہذیب برداشت ہے...... اسلام آپ سے اطاعت مانگتا ہے۔ آپ سے ووٹ نہیں مانگتا، آپ کی رائے نہیں مانگتا۔ من يطع الرسول فقد أطاع الله.

(ماہ نامہ سنابل کراچی، بحوالہ ادیان کی جنگ، ص۵۷)

"ভোটও নয়, বোঝাপড়াও নয়। তাদের অস্তিত্বও অসহ্যকর, তাদের কালচারও অসহ্যকর।..... ইসলাম আপনার আনুগত্য কামনা করে, আপনার কাছে ভোটও চায় না এবং আপনার রায়ও কামনা করে না। 'যে রাসুলের অনুসরণ করলো সে যেনো আল্লাহর অনুসরণ করলো'।" (মাহনামা সানাবেল করাচি, সূত্রে আদইয়ান কি জঙ্গ, পৃ: ৫৭)

ইউসুফ লুধিয়ানবি শহিদ (মৃ-১৪২১ হি.)

(مروجہ طریق انتخاب اور اسلامی تعلیمات) .... ہفتم: موجودہ طریق انتخاب تجربہ کی کسوٹی پر بھی کھوٹا ثابت ہوا ہے، اس طریق انتخاب سے جو لوگ مسند اقتدار تک پہنچے وہ ملک کی شکست وریخت کے سوا ملک وقوم کی کوئی خدمت نہ کرسکے، اور جو چیز تجربہ سے مضر ثابت ہوئی ہو اور قوم اس کا خمیازہ بھگت چکی ہو، اس تجربہ کو دوبارہ دہرانا نہ تو شرعاً جائز ہے اور نہ عقلاً ہی اسے صحیح اور درست کہا جاسکتا۔ (آپ کے مسائل اور ان کا حل، سیاست، ۲۰۲/۸)

“(প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতি ও ইসলামি শিক্ষা)..... সাত. প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতি অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে নকল প্রমাণিত হয়েছে। এই নির্বাচন পদ্ধতিতে যারা ক্ষমতার সিংহাসন দখল করেছে, তারা রাষ্ট্রের পতন ও বিপর্যয়সাধন ব্যতীত দেশ ও জাতির কোনো সেবাই করতে পারেনি। আর যা অভিজ্ঞতায় ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে এবং জাতি তার কষ্ট ভোগ করেছে, **সেই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি শরিআতের দৃষ্টিতেও জায়েয নেই এবং বিবেকও তার অনুমতি দেয় না।”** (আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল, ৮/২০২)

শাহ হাকিম মুহাম্মাদ আখতার (মৃ-১৪৩৪ হি.)

(اسلام میں جمہوریت کی حقیقت)..........جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر نبوت کا اعلان کیا تھا تو الیکشن اور ووٹوں کے اعتبار سے کوئی بھی نبی کے ساتھ نہ تھا۔ نبی کے پاس صرف ایک اپنا ووٹ تھا، لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کے اعلان سے باز آ گئے؟ کہ جمہوریت کیوں کہ میرے خلاف ہے، اکثریت کی ووٹنگ میرے خلاف ہے اس لئے میں اعلان نبوت سے باز رہتا ہوں۔(خزائن معرفت و محبت، ص۱۸۳)

“(ইসলামে গণতন্ত্র-সংখ্যাগরিষ্ঠতার মূল্যায়ন)..... রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ‘সফা’ পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে নবুওয়াতের ঘোষণা দিয়েছিলেন, তখন নির্বাচন ও ভোটের বিবেচনায় কেউই তাঁর সঙ্গে ছিলো না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুধু নিজের ভোটই ছিলো। তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি রিসালতের ঘোষণা থেকে বিরত ছিলেন? সংখ্যাগরিষ্ঠ যেহেতু আমার বিরুদ্ধে, অধিকাংশের ভোট যেহেতু আমার বিপরীতে, তাই আমি নবুওয়াতের ঘোষণা থেকে বিরত থাকছি।” (খাযায়েনে মা‘রেফাত ওয়ামুহাব্বাত, পৃ: ১৮৩)

মুফতি হামিদুল্লাহ জান (মৃ-১৪৩৮ হি.)

রঈস, দারুল ইফতা, জামিআ আশরাফিয়া লাহোর।

اور ووٹ کا استعمال مغربی جمہوری نظام کو عملاً تسلیم کرنا اور اس کی تمام خرابیوں میں حصہ دار بننا ہے، اس لئے موجودہ مغربی جمہوری نظام کے تحت ووٹ کا استعمال شرعاً ناجائز ہے۔ (ماہ نامہ سنابل کراچی، مئی ۲۰۱۳ء، ۸/۳۲، شمارہ نمبر ۱۱، بحوالۂ ادیان کی جنگ، ص۵۶)

“ভোটের ব্যবহার মূলত পশ্চিমা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে কার্যত মেনে নেয়া এবং সেটির সকল অন্যায়ের অংশীদার হওয়াকে সাব্যস্ত করে। **এজন্য প্রচলিত পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার অধীনে ভোটের ব্যবহার শরিআতের দৃষ্টিতে জায়েয নয়।”** (মাহনামা সানাবেল করাচি, মে ২০১৩, ৮/৩২, নং ১১, সূত্রে আদইয়ান কি জঙ্গ, পৃ: ৫৬)

মুফতি হামিদুল্লাহ জান রহ. এর পূর্বোল্লিখিত বক্তব্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের অনুবাদ উল্লেখ করছি।

তিনি বলেন, **কেউ বলবে ভোট আমানত, কেউ বলবে ভোট ওকালত বা প্রতিনিধিত্ব, কেউ বলবে ভোট হচ্ছে সাক্ষ্য। ভোট যাই হোক না কেনো; আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করছি। সাক্ষ্য সর্বদা হকের ব্যাপারে দেয়া হবে। যে বাতিল শাসনব্যবস্থা রয়েছে, তার সমর্থনে ভোট দেয়া সেই বাতিল নেযামকে মেনে নেয়া যে, এই বাতিল শাসনব্যবস্থা সঠিক। আপনি শাহাদত-সাক্ষ্য বলছেন তো আমি শাহাদত মেনে নিচ্ছি, আপনি ওকালত-প্রতিনিধিত্ব বলছেন তো আমি ওকালত মেনে নিচ্ছি, আপনি আমানত বলছেন তো আমি আমানত মেনে নিচ্ছি। আপনি যাই বলতে চান বলুন, কিন্তু আপনি বলুন তো, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, এই নাপাক শাসনব্যবস্থা, ইংরেজদের দেয়া শাসনব্যবস্থা; এটাকে কার্যকরভাবে মেনে নেয়া নয় কি? উত্তর দিন, আপনারা ফাতওয়া দিন, এটাকে কার্যকরভাবে মেনে নেয়া নয় কি?** (ইউটিউবে লিখে সার্চ করুন ‘সংশয় নিরসন, মুফতি তাকি উসমানি (দা. বা.)র আশ্চর্য সংশয়’ ২০.৪২ মি. - ২১.৩৯ মি.)

আমাদের বুযুর্গদের মানহাজের মূল্যায়ন

এক্ষেত্রে স্বাভাবিক একটি প্রশ্ন এসে যায়, আমাদের বুযুর্গদের মধ্যে যাঁরা এ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ইসলামি আইন বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের এ মানহাজের মূল্যায়ন কী হবে?

এ ব্যাপারে আমাদের স্বল্প জ্ঞানের সাধারণ মূল্যায়ন হচ্ছে, সে সকল বুযুর্গের ইখলাস ও দ্বীনের প্রতি দরদের ব্যাপারে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। "ولا أزكي على الله أحداً"। তবে ইসলামি খিলাফতের পতনের পর বা বলতে গেলে ইসলামের শক্তি ও কর্তৃত্ব বিলুপ্তির পর ইসলামের শক্তি, কর্তৃত্ব ও খিলাফত পুনরুদ্ধারের যুগ যুগ ধরে চলে আসা নববি তরিকা গ্রহণ না করে শত্রুদের

পাতানো ফাঁদে পা দেয়ায় যে সকল বাস্তবতার সম্মুখীন আমাদেরকে হতে হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে তা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। এ বিষয়ে পাঠকদের সামনে কয়েকটি কথা পেশ করবো, ইনশাআল্লাহ।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামি আইনের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়

এক. আকাবিরের অনেকেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামি আইনের বাস্তবায়ন সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন। আমি এখানে কয়েকজন আকাবিরের মন্তব্য উল্লেখ করছি, যাদের অধিকাংশই পাকিস্তানের; যে পাকিস্তানের জন্মই হয়েছিলো ইসলামের শিরোনামে। সে পাকিস্তানের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের আলোকে বলা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা থেকে গ্রহণ করার মতো শিক্ষণীয় বহু উপাদান রয়েছে। তবে শিক্ষা তো তারাই গ্রহণ করবে যাদের শিক্ষা গ্রহণ করার মতো মানসিকতা আছে।

আকাবিরের মন্তব্য থেকে

আতহার আলি সিলেটি (মৃ-১৩৯৬ হি.)

মাওলানা আতহার আলি রহ. জীবনভর প্রচলিত অর্থের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকা সত্ত্বেও জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে নিজের বড়ো ছেলেকে রাজনীতির সঙ্গে না জড়ানোর অসিয়ত করেছেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয়টি হচ্ছে, মাওলানা আতহার আলি রহ. অবশ্যই ইসলামি আইন বাস্তবায়নের ফরয দায়িত্ব পালনার্থে প্রচেষ্টাস্বরূপ রাজনীতি করেছেন। তো এমন একটি ফরয দায়িত্ব পালন না করার অসিয়ত তিনি করতে পারেন না। সুতরাং অনিবার্য বাস্তবতা এটাই যে, তাঁর নিষেধাজ্ঞার সম্পর্ক হচ্ছে প্রচলিত ধারায় ইসলামি আইন বাস্তবায়নের প্রচেষ্টার সঙ্গে। কারণ তিনি ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছেন যে, এ পদ্ধতিতে কখনই ইসলামি আইনের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই নববি তরিকা পরিপন্থী এ পদ্ধতি থেকে দূরে থাকার অসিয়ত করে যাওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। আমি উর্দু ভাষায় রচিত তাঁর জীবন চরিত থেকে অসিয়তের বিষয়টি তুলে ধরছি।

(فرزند ارجمند کو وصیت) حضرت رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کا ایک معتد بہ حصّہ میدان سیاست میں صرف کرنے کے بعد دور حاضر کی سیاست سے آپ کو جو تلخ تجربہ حاصل ہوا تھا، اسکی بناء پر آپ نے اپنے بڑے صاحبزادہ فرزند ارجمند حضرت مولانا انور شاہ صاحب کو جو فی الحال جامعۂ امدادیہ کے مہتمم اور شہیدی مسجد کے خطیب اور متولی ہیں بعض مصلحت کی بناء پر سیاست سے علیٰحدہ رہنے کی وصیت فرمائی تھی، جسکی عبارت یہ ہے- "میری

وصیت ہے کہ تم سیاست میں حصّہ نہ لینا، اس لئے کہ میں نے سیاست میں حصّہ لیکر بہت تلخ تجربہ حاصل کر چکا ہوں کہ اپنے لوگ غداری کرتے ہیں"۔ (حیات اطہر از شفیق الرحمن جلال آبادی، ص۲۶۹-۲۷۰)

"(সন্তানকে অসিয়ত) হযরত রহ. নিজের জীবনের উল্লেখযোগ্য অংশ রাজনৈতিক ময়দানে ব্যয় করা সত্ত্বেও বর্তমানের রাজনীতি থেকে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছে, সেটির ভিত্তিতে তিনি তাঁর বড়ো ছেলে মাওলানা আনওয়ার শাহকে -যিনি বর্তমানে জামিআ ইমদাদিয়ার মুহতামিম ও শহিদি মসজিদের খতিব ও মুতাওয়াল্লি- বিভিন্ন মাসলাহাতে রাজনীতি থেকে দূরে থাকার জন্য অসিয়ত করেছেন। অসিয়তের মূলপাঠ এরূপ- 'আমার অসিয়ত হচ্ছে, তুমি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবে না। কেননা আমি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি যে, আপন লোকেরাই বিশ্বাসঘাতকতা করে।" (হায়াতে আতহার, পৃ: ২৬৯-২৭০)

ইউসুফ লুধিয়ানবি শহিদ (মৃ-১৪২১ হি.)

اب رہا آخری سوال کہ ملک وملت اور دین ومذہب کے حق میں یہ انتخاب کس حد تک مفید اور بار آور ہوں گے؟ اس کا فیصلہ تو مستقبل ہی کریگا۔ لیکن گذشتہ تجربات اور موجودہ حالات پر نظر ڈالی جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان انتخابات سے (سوائے تبدیلی اقتدار کے) خوش کن توقعات وابستہ نہیں کی جاسکتیں۔ (آپ کے مسائل اور ان کا حل، سیاست، ۸/۱۸۴)

"এখন আছে শেষ প্রশ্নটি; দেশ ও জাতি এবং দ্বীন ও ধর্মের ক্ষেত্রে এই নির্বাচন কতোটা উপকারী ও ফলদায়ক? এটির ফয়সালা তো ভবিষ্যতই করবে। **কিন্তু বিগত অভিজ্ঞতা ও বর্তমান অবস্থার উপর যদি দৃষ্টিপাত করা হয় তাহলে এটিই অনুভূত হয় যে, এ সকল নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পালাবদল ছাড়া কাঙ্খিত কোনো কিছু আশা করা যায় না।"** (আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল, ৮/১৮৪)

মুফতি রশিদ আহমাদ লুধিয়ানবি (মৃ-১৪২২ হি.)

حیرت تو ان حضرات پر ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں- "موجودہ سیاست میں حصّہ لینے سے ہمارا مقصود ملک میں صحیح اسلامی نظام قائم کرنا ہے"

مگر پھر بھی وہ سیاسی کاموں میں احکام اسلام کی پروا نہیں کرتے، غیر مشروع تدابیر اختیار کرتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے:

"آپ تو اسلامی نظام قائم کرنے کے مدعی ہیں مگر آپ خود اسلام نافذ کرنے کے لئے جو طریقے اختیار کر رہے ہیں وہ غیر اسلامی اور ناجائز ہے"

تو جواب دیتے ہیں:

"اگرچہ یہ طریقے ناجائز ہیں مگر ان کے بغیر اسلام لانا ممکن نہیں، اس لئے اب تو جائز ناجائز کی پروا کئے بغیر اقتدار حاصل کرنے کی جدوجہد لازم ہے، اقتدار حاصل ہو جانے کے بعد پورے طور پر اسلام نافذ کر دیں گے"

یہ محض دھوکہ ہے، ہمیں ان کی نیت پر شبہ نہیں، مگر انکا طریق کار ایسا ہے کہ اس سے نفاذ اسلام کی توقع ہرگز نہیں کی جا سکتی، کیونکہ غیر اسلامی طریقوں سے بے دینوں کی کامیابی تو ممکن ہے مگر دینداروں کو اوّلاً تو کامیابی ہوگی نہیں، اور اگر صورۃ کامیابی ہو بھی گئی تو اسکے نتیجہ میں اسلام نہیں آئے گا بلکہ اسلام کے نام کا کوئی اور چیز ہوگی، اور صورۃ جو کامیابی ہوگی وہ بھی چند روز سے آگے نہ بڑھے گی، جب اس کی بنیاد ہی کمزور تھی تو اس پر عمارت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ (احسن الفتاوی، کتاب الجہاد، ٦/٤٣)

"আফসোস তো হয় ওই সকল ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে যারা দাবি করে, 'প্রচলিত রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশে সহিহ ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।' অথচ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তারা ইসলামি বিধি-নিষেধের তোয়াক্কা করে না এবং শরিআত পরিপন্থী কৌশল অবলম্বন করে।

যখন তাদেরকে বলা হয়; আপনারা তো ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার দাবিদার। কিন্তু আপনারা ইসলাম বাস্তবায়নের জন্য যে পন্থা অবলম্বন করছেন, তা তো অনৈসলামিক এবং নাজায়েয।

তখন তারা প্রত্যুত্তরে বলে, 'যদিও এ পদ্ধতি নাজায়েয, কিন্তু তা ব্যতীত ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এজন্য এখন তো জায়েয-নাজায়েযের তোয়াক্কা না করে ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা আবশ্যক। ক্ষমতা অর্জিত হলে পরিপূর্ণভাবে ইসলাম বাস্তবায়ন করবো।'

এটি ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের নিয়তের ব্যাপারে আমরা সন্দেহ করছি না; কিন্তু তাদের কর্মপদ্ধতি এমন, যার মাধ্যমে কখনই ইসলাম বাস্তবায়নের আশা করা যায় না। কেননা অনৈসলামিক পদ্ধতিতে দ্বীনহীনদের জন্য তো সফলতা অর্জন করা সম্ভব, কিন্তু দ্বীনদারদের জন্য প্রথমত সফলতা অর্জন করাই সম্ভব নয়।

আর যদি বাহ্যত সফল হয়েও যায়, তবুও সেটির পরিণামে ইসলাম আসবে না, বরং ইসলামের নামে অন্য কিছু হবে। বাহ্যত যে সফলতা অর্জন হয়েছে, তাও দীর্ঘস্থায়ী হবে না। যেহেতু তার ভিত্তিই দুর্বল ছিলো, তো সেটির উপর বিল্ডিং কীভাবে টিকে থাকবে?" (আহসানুল ফাতাওয়া, ৬/৪৩)

মুফতি নিযামুদ্দিন শামেযি শহিদ (মৃ-১৪২৫ হি.)
শাইখুল হাদিস, জামিআ বানুরি টাউন, করাচি, পাকিস্তান।

(بنیاد پرستی کیا ہے؟) ....اڑتالیس (۴۸) سال علماء نے انتخابی اور جمہوری سیاست میں ضائع کئے....... میں دعویٰ سے کہتا ہوں...... کہ اس طرز حکومت سے اڑتالیس (۴۸) ہزار سال میں بھی اسلام نہیں آئے گا۔

جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں:بقول اقبال!

جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں + بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔

لہذا اس طرز عمل پر محنت نہ کرے بلکہ نوجوانوں پر محنت کریں........ان کا ذہن بنائیں، امریکہ اور یہودی منصوبے انہیں بتادیں......... اور پہلے خود اس کو سمجھے۔ (خطبات شامزی، علماء کرام اور ان کی ذمہ داریاں، ۱/۲۰۳-۲۰۴)

"..... নির্বাচন পদ্ধতি ও গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে উলামায়ে কেরাম আটচল্লিশটি বছর নষ্ট করেছে।..... আমি জোরদাবি করে বলছি..... এই ব্যবস্থাপনায় আটচল্লিশ হাজার বছরেও ইসলাম আসবে না।"

কবি ইকবালের কথা অনুযায়ী; গণতন্ত্র এমন একটি শাসনব্যবস্থা, যাতে মানুষদেরকে গণনা করা হয় কিন্তু মাপা হয় না।

সুতরাং এ কর্মপন্থায় শ্রম ব্যয় না করে তরুণদের নিয়ে মেহনত করুন।..... তাদের মানসিকতা তৈরি করুন। মার্কিন ও ইহুদি অভিসন্ধি তাদের বুঝিয়ে দিন।..... প্রথমে নিজেও বিষয়টি বুঝে নিন।" (খুতুবাতে শামেযি, ১/২০৩-২০৪)

دنیا میں اللہ تبارک وتعالیٰ کا دین ووٹ کے ذریعے سے، مغربی جمہوریت کے ذریعے سے غالب نہیں ہو گا، اس لئے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے دشمنوں کی اکثریت ہے، فساق وفجار کی اکثریت ہے، اور جمہوریت جو ہے وہ

بندوں کو گننے کا نام ہے تولنے کا نہیں........ دنیا میں جب بھی اسلام غالب ہو گا تو اس کا واحد راستہ وہی ہے جو راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا اور وہ جہاد کا راستہ ہے۔ (ماہ نامہ سنابل کراچی، مئی ۲۰۱۳ء، ۸/۳۳-۳۴، شمارہ نمبر ۱۱، بحوالۂ ادیان کی جنگ، ص۵۸)

"আল্লাহ তাআলার দ্বীন পৃথিবীতে ভোটের মাধ্যমে, পশ্চিমা গণতন্ত্রের মাধ্যমে বিজয় লাভ করতে পারবে না। কেননা পৃথিবীতে ফাসেক-ফাজের দুষ্টমতি ও দুশমনদের আধিক্যতা। আর গণতন্ত্র হচ্ছে মানুষদেরকে গণনা করার নাম, মাপার নাম নয়।..... **পৃথিবীতে ইসলামকে বিজয়ী করার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে, যেটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রহণ করেছেন। আর তা হচ্ছে জিহাদ-কিতালের রাস্তা।"** (মাহনামা সানাবেল করাচি, মে ২০১৩, ৮/৩৩-৩৪, নং ১১, সূত্রে আদইয়ান কি জঙ্গ, পৃ: ৫৮)

শাইখুল হাদিস আজিজুল হক (মৃ-১৪৩৩ হি.)

গোলাপ কুড়ি: আমরা জানি, রাজনৈতিক ময়দানেও আপনি একজন শীর্ষনেতা। বাংলাদেশের বর্তমান প্রচলিত নির্বাচনের মাধ্যমে আপনার রাজনৈতিক দর্শন প্রতিফলিত হবে কি মনে করেন?

শাইখুল হাদীস: **প্রচলিত নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলামী রাজনীতির নীতি-আদর্শের প্রতিফলন ঘটানো খুবই কঠিন।** মানবতার সত্যিকার মুক্তি নিশ্চিত করার একমাত্র গ্যারান্টি হচ্ছে খেলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থা। (অন্তরঙ্গ আলোকে শাইখুল হাদীস রহ., পৃ: ১২৮)

মুফতি হামিদুল্লাহ জান (মৃ-১৪৩৮ হি.)

রঈস, দারুল ইফতা, জামিআ আশরাফিয়া লাহোর।

মুফতি হামিদুল্লাহ জান রহ. এর পূর্বোল্লিখিত বক্তবের এ সংক্রান্ত অংশের অনুবাদ উল্লেখ করছি।

তিনি বলেন, **আমরা বুযুর্গদের প্রতি সালাম নিবেদন করছি। আমরা বুযুর্গদের সম্মান করি। আমরা বুযুর্গদের ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ করি না। কিন্তু বুযুর্গদের এ কাজকে কিছু মৌলিক, কিছু অপারগতা অথবা জরুরত বা ইজতিহাদি ভুল মনে করুন। যে ব্যাখ্যাই করুন না কেনো; কিন্তু অভিজ্ঞতা এটাই প্রমাণ করে দেয় যে, গণতান্ত্রিক পন্থায় এই হযরতদের এই চেষ্টা-প্রচেষ্টা**

কামিয়াব হতে পারেনি। সুতরাং "لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين" মুমিন একই গর্তে দু'বার দংশিত হয় না। পঞ্চাশ বছরের চেয়েও বেশী সময় আমরা লোকদের কাছে ভোট চেয়েছি। লোকেরা আমাদের ভোট দিয়েছে। কখনো এমনও হয়েছে যে, আমাদের পঁচাশি মেম্বার-সংসদ সদস্য অর্জন হয়েছে, জাতীয় এসেম্বলিতে যথেষ্ট আধিক্যতা অর্জন হয়েছে। কিন্তু আপনারা দেখেছেন, কোন ইসলামি বিধানটা এসেছে? তাঁরা বলে, আমরা প্রতিরক্ষা করছি। প্রতিরক্ষা কাকে বলে? নারী অধিকার বিল পাস হয়েছে। কেউ এটাকে প্রতিহত করতে পেরেছে? জবাব দিন! (সংসদে কিছু) বলা তো উদ্দেশ্য নয়। প্রতিরক্ষার অর্থ তো হচ্ছে কাজটাকে রুখে দেয়া। প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্য তো আগে বুঝে নিন। প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্য তো শুধুমাত্র বলা নয়। প্রতিরক্ষার অর্থ তো হচ্ছে রুখে দেয়া। কে রুখেছে সে বিলকে? পাস হয়েছে কি না বলুন? আমি আরয করবো, আল্লাহর ওয়াস্তে আগে বাস্তবতা বুঝুন! হে মৌলবিরা তাওবা করুন! আমি বলছি, আমি গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশ নিয়েছি। ৭০ সালে আমি মাওলানা সদরুশ শহিদের প্রার্থী ছিলাম। পাসও করেছি। ষাট হাজার ভোটের ব্যবধানে পাস করেছি। কিন্তু আমি পরিষ্কার ভাষায় বলছি, আমি এই গুনাহ থেকে তাওবা করে নিয়েছি। আল্লাহ আমাদের তাওবা কবুল করুন! আপনাদের কাছে দরখাস্ত করছি, আপনারাও তাওবা করুন এবং খিলাফত শাসনব্যবস্থার জন্য আন্দোলনের মূল ভিত্তি অনুসারে ময়দানে আসুন! ঘাবড়াচ্ছেন কেনো? আসুন! ময়দানে আসুন! দেখুন! ইসলামি শাসনব্যবস্থা আসে কি না!

(ইউটিউবে লিখে সার্চ করুন 'সংশয় নিরসন, মুফতি তাকি উসমানি (দা. বা.)র আশ্চর্য সংশয়' ২২.০৪ মি. - ২৪.২৪ মি.)।

শাইখুল হাদিস সালিমুল্লাহ খান (মৃ-১৪৩৮ হি.)

শাইখুল হাদিস মাওলানা সালিমুল্লাহ খান রহ.কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো;

"کیا انتخابی سیاسی نظام یا جمہوری نظم کے تحت اسلامی نظام کا نفاذ ممکن ہے؟"

"নির্বাচন পদ্ধতিতে বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার অধীনে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার বাস্তবায়ন কি সম্ভব?"

তিনি উত্তরে বলেছিলেন-

نہیں!ایسا ممکن نہیں ہے۔نہ انتخابات کے ذریعے اسلام لایا جاسکتا ہے،نہ جمہوریت کے ذریعے اسلام لایا جاسکتا ہے۔

جمہوریت میں کثرت رائے کا اعتبار ہوتا ہے اور اکثریت جہلاء کی ہے جو دین کی اہمیت سے واقف نہیں۔ان سے کوئی توقع نہیں ہے۔(ماہنامہ سنابل کراچی، مئی ۲۰۱۳ء، جلد ۸، شمارہ نمبر ۱۱، سرورق، بحوالہ ادیان کی جنگ، ص ۵۸)

"না! এটি সম্ভব নয়। নির্বাচনের মাধ্যমেও ইসলাম আনা যাবে না এবং গণতন্ত্রের মাধ্যমেও ইসলাম আনা যাবে না। গণতন্ত্রে রায়ের আধিক্যতার বিবেচনা করা হয়। আর আধিক্যতা হচ্ছে মূর্খদের, যারা দ্বীনের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে অবগত নয়। তাদের কাছে কিছু আশা করা যায় না।" (মাহনামা সানাবেল করাচি, মে ২০১৩, খ: ৮, নং ১১, সূত্রে আদইয়ান কি জঙ্গ, পৃ: ৫৮)

মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ

সুতরাং এ ব্যবস্থায় যে শান্তি বা কল্যাণের আশা করা যায় না এবং এ পদ্ধতিতে সৎ, যোগ্য, নিষ্ঠাবান লোকজনের সরকার গঠিত হওয়া যে অনেকটা অসম্ভব তা বুঝিয়ে বলার দরকার আছে বলে মনে হয় না। (মাসিক আলকাউসার, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ: ০৭)

আকাবিরের অভিজ্ঞতার বাস্তবায়ন

দুই. আকাবিরের অভিজ্ঞতা বাস্তবতায় প্রমাণিত হয়েছে। আমরা দেখেছি তুরস্ক, ইয়ামেন, তিউনিসিয়া এবং সর্বশেষ মিসরে ইসলামি শিরোনাম ব্যবহারকারী গণতান্ত্রিক দলগুলো বিপুল ভোটে বিজয় লাভ করে ক্ষমতা গ্রহণ করা সত্ত্বেও ইসলামি আইন বাস্তবায়ন করা তো দূরের কথা, এক মিনিটের জন্যও গণতন্ত্রের একটি মৌলিক ধারাও পরিবর্তন করতে পারেনি বা পরিবর্তনের কোনো ফিকির তাদের মনের ধারে-কাছে এসেছে বলেও কোনো আলামত পাওয়া যায়নি।

অথচ এর বিপরীতে আফগানিস্তানে তালেবান মুজাহিদরা জিহাদের মাধ্যমে বিজয় লাভ করার পরপরই খিলাফতের ঘোষণা দিয়ে পর্যায়ক্রমে ইসলামি আইনের বাস্তবায়ন শুরু করে দিয়েছিলো। এখনও বিশ্বের যে সকল অঞ্চল সহিহ মানহাজের মুজাহিদদের দখলে রয়েছে, সেখানে তারা পর্যায়ক্রমে ইসলামি আইন বাস্তবায়ন করে চলছে। পার্থক্যটা কোথায়? পার্থক্যটা আমরা আরবের একটি প্রবাদ বাক্যের আলোকে বুঝতে পারি। আরবের একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ হচ্ছে- **"الغالب بسيفه هو الغالب برأيه"**।

শত্রুর পাতানো ফাঁদে পা

তিন. শত্রুর পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে আমরা কীভাবে ধারণা করলাম যে, শত্রুর চোখ ফাঁকি দিয়ে আমরা আমাদের উদ্দেশ্যে সফল হতে পারবো! শত্রুর বিছানো জালের ফাঁক-ফোকর সম্পর্কে শত্রু অধিক অবগত হওয়াই স্বাভাবিক। এছাড়াও খিলাফত পুনরুদ্ধারের জন্য যুগ যুগ ধরে চলে আসা নববি তরিকা গ্রহণ না করে যে পদ্ধতিতে ইসলামি খিলাফতের পতন ঘটানো হলো, সে পদ্ধতিতেই খিলাফত পুনরুদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টা করতে থাকা কতোটুকু যুক্তিযুক্ত!

কিছু ভয়ঙ্কর বাস্তবতা

চার. ইসলামি শিরোনাম ব্যবহার করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নির্বাচনে অংশগ্রহণ করায় যে সকল ভয়ঙ্কর বাস্তবতার সম্মুখীন আমরা হচ্ছি, তার মধ্যে একটি মৌলিক বাস্তবতা হচ্ছে, জনসাধারণকে এখন আর বুঝানো যাচ্ছে না যে, গণতন্ত্র একটি কুফরি বা অসার মতবাদ। কারণ 'নির্বাচনই যে শুধু গণতন্ত্র নয়' এটা বুঝার মতো অবস্থা সাধারণ জনগণের নেই। সাধারণ মানুষ যুগ যুগ ধরে দেখে চলছে যে, হুযুররাও গণতন্ত্রকে মেনে নিয়েছে।

এর চেয়েও ভয়ঙ্কর বাস্তবতা হচ্ছে, আমাদের বুযুর্গরা যাঁরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁরা গণতন্ত্রকে কুফরি মনে করেই বিভিন্ন ব্যাখ্যাসাপেক্ষ (চাই সে ব্যাখ্যা সমাদৃত হোক বা না হোক) তাতে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁদের প্রতিষ্ঠিত দলের অনেক কর্মী গণতন্ত্রকে এখন আর কুফরি মতবাদ মানতে প্রস্তুত নয়। কোনো কোনো মুলহিদ তো ইতোমধ্যে উমর রাযি.কে গণতন্ত্রের প্রবর্তক বানিয়ে দিয়েছে। إنا لله وإنا إليه راجعون।

জিহাদি চেতনা উজ্জীবনের পথে প্রতিবন্ধক

পাঁচ. খিলাফত পুনরুদ্ধারের এ পদ্ধতি সাধারণ মুসলমান তো বটেই উলামা-তলাবাদের অন্তর থেকে জিহাদি চেতনা নির্মূল করার ক্ষেত্রে বড়ো ধরনের প্রভাব ফেলেছে। বলতে গেলে জিহাদি কর্মকাণ্ড এবং জিহাদি চেতনা উজ্জীবনের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষকরে যখন কোনো কোনো মুলহিদ এ ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে, 'বর্তমানে সশস্ত্র জিহাদ মানে আত্মহত্যা করা এবং নির্বাচনই হচ্ছে জিহাদ', তখন নির্বোধ ভক্ত-মুরিদরা এই ঝুঁকিমুক্ত অস্ত্রবিহীন জিহাদ (?) করেই তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে লাগলো। প্রজন্ম বুঝে নিয়েছে, খিলাফত পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করাই যেহেতু মূল উদ্দেশ্য, তাহলে

বুযুর্গদের সমর্থিত এ পদ্ধতিতে চেষ্টা করলে দায়িত্বও আদায় হয়ে যাবে এবং নির্ঝঞ্ঝাট জীবন-যাপন করা যাবে। সুতরাং অপাত্রে (?) জীবন বিলিয়ে দেয়ার মতো বোকামো আর হতে পারে না।

কিন্তু প্রজন্ম ভুলেই গেছে যে, জিহাদ একটি স্বতন্ত্র ইবাদত, একটি ফরয দায়িত্ব। খিলাফত পুনরুদ্ধারই শুধু জিহাদের উদ্দেশ্য নয়। প্রজন্ম জিহাদের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য, উপকারিতা ও ফযিলত সবই ভুলে গেছে। প্রজন্ম আর ভাবতে পারছে না যে, ইমানের পর সর্বোত্তম ইবাদত জিহাদ কখনই শত্রুদের আঁকা ছকে আদায় হতে পারে না।

জিহাদের শাব্দিক অর্থের ব্যাপকতাকে পুঁজি করে যদিও বুযুর্গদের কেউ কেউ তাদের খিলাফত পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে জিহাদ শব্দ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু আমাদের জানা মতে তাঁদের কেউই সশস্ত্র জিহাদকে অস্বীকার করেননি এবং এর মাধ্যমে জিহাদের ফরয দায়িত্ব আদায় হয়ে যাচ্ছে; এমনটি মনে করেননি। কেউ করে থাকলে সেটিও শরিআতের দলিলের আলোকেই বিবেচ্য হবে।

আমাদের হৃদয়ের আকুতি

এ সকল অপ্রীতিকর বাস্তবতার সাক্ষী হয়ে আমাদের হৃদয়ের আকুতি কী হতে পারে? ছোটোকাল থেকে মওদুদিবাদবিরোধী সেমিনার-আলোচনা সভায় বড়োদের মুখে মওদুদিবাদের ভ্রান্তি শুনে এসেছি। তাদের ভ্রান্তির তালিকায় ছিলো 'গণতন্ত্রের সঙ্গে ইসলাম যুক্ত করে ইসলামি গণতন্ত্র বলা'। বড়োদেরকে এভাবে বলতে শুনেছি, 'তারা আজ ইসলামি গণতন্ত্র আবিষ্কার করেছে, আগামীকাল ইসলামি মদ তৈরি করবে'। তাদেরকে জিহাদের অপব্যাখ্যার দোষে দুষ্ট সাব্যস্ত করতে শুনেছি। আজ যখন অপব্যাখ্যার ময়দানে হকের দাবিদার কেউ কেউ তাদেরকে অতিক্রম করে চলছে, তখন কোনো এক অদৃশ্য শক্তির অশুভ হাত আমাদের বাকশক্তি রুদ্ধ করে দিয়েছে, নিশ্চল করে দিয়েছে তাঁদের ক্ষুরধার কলমকে।

আমরা কি একটু ভেবে দেখবো, এ সকল বাস্তবতা কিসের প্রতিফলন! এটি কি মুফতি হামিদুল্লাহ জান রহ. এর কথার বাস্তবতা নয়? কূপে মরা কুকুর রেখেই আমরা পানি পরিষ্কার করতে চাচ্ছি। যারফলে পানি তো পরিষ্কার হচ্ছেই না, বরং দুর্গন্ধ কূপকে অতিক্রম করে আশেপাশের আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তুলছে। কিন্তু দিনে দিনে সে দুর্গন্ধ আমাদের নিকট সহনীয় হয়ে গেছে আর

আমরা মনে করেছি দুর্গন্ধ কমে গেছে। যে দুর্গন্ধের কারণে আমরা একসময় নাকে রুমাল দিয়েছি, সে দুর্গন্ধেই আমরা এখন নির্দ্বিধায় বসবাস করছি।

একটি চুটকি

একটি চুটকি মনে পড়লো। মা তার ছোটো ছেলেকে নিয়ে এক বস্তিতে ভাড়া বাসায় উঠেছে। ছেলে প্রথমদিন এসেই বললো, মা! এখানে তো অনেক দুর্গন্ধ; এখানে থাকবো কীভাবে? মা বললো, আস্তে আস্তে কমে যাবে। একমাস পর ছেলে নিজ থেকেই বলে ফেললো, হাঁ, মা! দুর্গন্ধ দেখি কমে গেছে। মা বললো, বলছি না দুর্গন্ধ কমে যাবে!

দুর্গন্ধ কি আসলে কমে গেছে নাকি সয়ে গেছে? এভাবেই মূলত সমস্ত কুফরি মতবাদ, সমস্ত 'মুনকারাত' আমাদের কাছে সহনীয় হয়ে উঠছে। সহনীয় হওয়াতে কি তার বিষক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে নাকি আমাদের উদাসীনতায় আরো কঠিনভাবে আঘাত করবে! বরং কঠিনভাবে আঘাত করে চলছে, যার বাস্তবতা প্রতিনিয়ত আমাদের সামনে। إنما أشكو بثي وحزني إلى الله।

مفتی محمد شفیع رح نے فرمایا: اور ان چند لوگوں کے داخل اسلام ماننے سے ہزاروں مسلمانوں کے خارج از اسلام ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے، جیسا کہ بہت دفعہ اس کا تجربہ اور مشاہدہ ہو چکا ہے۔ اور یہ ایک مضرت ایسی ہے کہ اگر فی الواقع ہزاروں مصالح بھی اس کے مقابلہ میں موجود ہوں تو وہ کسی مذہب دوست مسلمان کے لئے ہر گز قابل التفات نہیں ہو سکتیں، بالخصوص جب کہ وہ مصالح بھی محض موہوم اور خیالی ہوں۔ (جواہر الفقہ، تکفیر کے اصول ۱/۲۱-۲۲)۔

কয়েকটি মৌলিক নিবেদন

{এক}

মুসলমানকে কাফের ও কাফেরকে মুসলমান বলা; দু'টোই অপরাধ

'নাওয়াকেযুল ইমান' ইমান ভঙ্গ বা কুফরের বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে একটি কথা প্রায়ই শুনতে হয়; শুধু শুধু কাউকে কাফের সাব্যস্ত করায় কী লাভ? বাস্তবে মুসলমান হয়ে থাকলে তাকে কাফের বা মুরতাদ বলা তো জঘন্যতম অপরাধ। এটি খারেজি সম্প্রদায়ের ভ্রষ্টতা।

এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে, একজন মুসলমানকে কাফের বলা যেমনিভাবে জঘন্যতম অপরাধ, তেমনিভাবে কোনো কাফের-মুরতাদকে মুসলমান বলাও ভয়ঙ্কর অপরাধ। উসুলের প্রথম অংশটি মনে রেখে দ্বিতীয় অংশ ভুলে যাওয়া অনুচিত। আমরা খারেজি হওয়ার অপবাদ থেকে বাঁচার জন্য নিজের অজান্তে কখন যে 'মুরজিয়া'র খাঁচায় ঢুকে পড়ি তা উপলব্ধি করতে পারি না। আমরা ভুলে যাই যে, খারেজিরা সুস্পষ্ট কুফরি বিশ্বাস ও কথা-কাজের কারণে কাফের-মুরতাদ হওয়া ব্যক্তিদের কাফের বলার কারণে খারেজি হয়নি, বরং তারা খারেজি হয়েছে কবিরা গোনাহে লিপ্ত হওয়া মুসলমানকে কাফের বলার কারণে। 'আ'মালে মুকাফফিরা'য় লিপ্ত হওয়া লোকদের কাফের বলায় খারেজি হয়নি, বরং 'আ'মালে মুফাসসিকা'য় লিপ্ত হওয়া মুসলমানকে কাফের বলায় খারেজি হয়েছে। সুস্পষ্ট কুফরি বিশ্বাস ও কথা-কাজের কারণে কাফের-মুরতাদ হওয়া ব্যক্তিদের কাফের-মুরতাদ বলার কারণে যদি খারেজি হতে হয়, তাহলে এ শ্রেণির খারেজিদের তালিকায় সর্বপ্রথম নামটি আসবে ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক রাযি. এর নাম। এ তালিকায় আরো যাদের নাম আসবে; সেটি কেউ চাইলে আমরা তৈরি করে দেবো, ইনশাআল্লাহ।

আকাবিরের বক্তব্য থেকে

মুসলমানকে কাফের বলা এবং কোনো কাফের-মুরতাদকে মুসলমান বলা; দু'টোই যে জঘন্যতম অপরাধ, এ বিষয়ে দুয়েকজন আকাবিরে আসলাফের কথা উল্লেখ করছি-

ইমামুল হারামাইন আবুল মাআলি আলজুওয়াইনি (মৃ-৪৭৮ হি.)

ولمثل هذا ذهب أبو المعالي رحمه الله في أجوبته لأبي مُحَمَّد عبد الحق وكان سأله عن المسألة فاعتذر له بأن الغلط فيها يصعب، **لأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم عنها عظيم في الدين.** (الشفا للقاضي عياض، فصل في تحقيق القول في إكفار المتأولين ٢/٢٧٧، إكفار الملحدين، صـ٢٧)

"এ ধরনের কারণেই আবু মুহাম্মাদ আব্দুল হক কর্তৃক এক মাসআলা সংক্রান্ত করা প্রশ্নের উত্তরে আবুল মাআলি রহ. অপারগতা প্রকাশ করে বলেন, এ মাসআলায় ভুল করা বড়ো কঠিন। **কেননা কোনো কাফেরকে মিল্লাতে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করা এবং কোনো মুসলমানকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়া; দু'টোই দ্বীনের মধ্যে ভয়াবহ ব্যাপার।**" (আশশিফা, ২/২৭৭, ইকফারুল মুলহিদিন, পৃ: ২৭)

মুফতি মুহাম্মাদ শফি (মৃ-১৩৯৩ হি.)

کسی مسلمان کو کافر یا کافر کو مسلمان کہنا دونوں جانب سے نہایت ہی سخت معاملہ ہے۔ قرآن کریم نے دونوں صورتوں پر شدید نکیر فرمائی ہے.............

لیکن آج کل اس کے بر عکس یہ دونوں معاملے اس قدر سہل سمجھ لئے گئے ہیں کہ کفر واسلام اور ایمان وارتداد کا کوئی معیار اور اصول ہی نہ رہا۔

ایک جماعت ہے جس نے تکفیر بازی کو ہی مشغلہ بنا رکھا ہے۔ ذرا سی خلاف شرع بلکہ خلاف طبع کوئی بات کسی سے سرزد ہوئی اور ان کی طرف سے کفر کا فتویٰ لگا، ادنیٰ ادنیٰ فرعی باتوں پر مسلمانوں کو اسلام سے خارج کہنے لگتے ہیں۔ ادھر ان کے مقابل دوسری جماعت ہے جن کے نزدیک اسلام وایمان کوئی حقیقت محصلہ نہیں رکھتے۔ بلکہ وہ ہر اس شخص کو مسلمان کہتے ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، خواہ قرآن وحدیث اور احکام اسلامیہ کا انکار

اور توہین کرتا رہے، ان کے نزدیک اسلام کے مفہوم میں ہر قسم کا کفر کھپ سکتا ہے۔ انہوں نے دوسرے مذاہب باطلہ کی طرح اسلام کو بھی محض ایک لقب بنا دیا کہ عقائد جو چاہے رکھے، اقوال واعمال میں جس طرح چاہے آزاد رہے، وہ بہر حال مسلمان ہے۔ اور اس کو اپنے نزدیک وسعت خیال اور وسعت حوصلہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور تمام سیاسی مصالح کا محور ومدار اسی کو بنا رکھا ہے۔ (جواہر الفقہ، تکفیر کے اصول، ۱/ ۲۰-۲۱)

"কোনো মুসলমানকে কাফের বা কোনো কাফেরকে মুসলমান আখ্যা দেয়া; দু'টোই জঘন্য ব্যাপার। কুরআন কারিমে উভয় ব্যাপারে কঠিন ধমকি উল্লেখ হয়েছে।...............

কিন্তু বর্তমানে এর বিপরীতে উভয়ক্ষেত্রে এতোটা শিথিলতা প্রদর্শন করা হচ্ছে যে, কুফর ও ইসলাম এবং ইমান ও ইরতিদাদের কোনো মানদণ্ড ও মূলনীতিই থাকেনি।

একটি দল আছে যারা কাফের আখ্যা দেয়াকেই নিজেদের পেশা বানিয়ে নিয়েছে। কারো থেকে সামান্য শরিআত পরিপন্থী বরং রুচি পরিপন্থী কিছু প্রকাশ পেলেই তাকে কুফরের ফাতওয়া দিয়ে দিচ্ছে। সামান্য থেকে সামান্যতর শাখাগত বিষয়ে মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে বের করে দিচ্ছে। এর বিপরীতে আরেকটি শ্রেণি আছে, যাদের দৃষ্টিতে ইসলাম ও ইমানের কার্যত কোনো বাস্তবতা নেই। বরং তারা যেই মুসলমান হওয়ার দাবি করে তাকে মুসলমান মনে করে, যদিও সে কুরআর-হাদিস এবং ইসলামি বিধি-বিধানকে অস্বীকার বা অবমাননা করতে থাকে। তাদের মতে ইসলামের পরিধিতে সবধরনের কুফর খাপ খায়। তারা অন্যান্য বাতিল ধর্মের ন্যায় ইসলামকেও শুধু একটি পরিভাষা বানিয়ে দিয়েছে যে, **আকিদা যাই হোক না কেনো, কথা ও কাজে যা ইচ্ছে তাই করুক না কেনো; সর্বাবস্থায় সে মুসলমান। এবং এটিকে নিজেদের মতে প্রশস্ত চিন্তা এবং উন্মুক্ত মানসিকতা হিসেবে প্রকাশ করে। আর সমস্ত রাজনৈতিক 'মাসলাহাত'র মানদণ্ড ও পরিধি এটিকেই বানিয়ে রেখেছে।"** (জাওয়াহিরুল ফিকহ, ১/২০-২১)

মুফতির ফাতওয়া কাউকে কাফের বা মুসলমান বানায় না

এটা তো বুঝা গেলো যে, কোনো কাফেরকে মুসলমান বলা বা কোনো মুসলমানকে কাফের সাব্যস্ত করা জঘন্যতম অপরাধ। তবে এ বিষয় সকলেরই জানা আছে যে, মুফতির ফাতওয়া কাউকে কাফের-মুসলমান বানায় না।

সাধারণত যাদেরকে মুসলমান মনে করা হয়, তাদের কেউ কোনো অপ্রকাশ্য কারণে আল্লাহ তাআলার নিকট কাফের হতে পারে। এর বিপরীতে যাদেরকে কাফের সাব্যস্ত করা হচ্ছে, তাদের কেউ অপ্রকাশ্য বিশেষ কোনো ওযরে আল্লাহ তাআলার কাছে মুমিন হতে পারে। এই সত্য সত্য হওয়া সত্ত্বেও একজন মুফতিকে বাহ্যত কথা-কাজ ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে ফাতওয়া দিতে হয়।

কাফের-মুরতাদকে মুসলমান সাব্যস্ত করার ভয়াবহতা

সাধারণত মনে করা হয়, একজন কাফের-মুরতাদকে মুসলামান বলার চেয়ে একজন মুসলমানকে কাফের-মুরতাদ সাব্যস্ত করা অধিক জঘন্য। এটি তার আপন জায়গায় ঠিক আছে এবং এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সতর্কতা কাম্য হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্য বিবেচনায় একজন কাফের-মুরতাদকে মুসলমান বলার মধ্যে এর চেয়েও অধিক ভয়াবহতা রয়েছে। কেননা বাহ্যত কুফরি কথা-কাজ ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে যদি কাউকে সতর্কতামূলক কাফের-মুরতাদ বলা না হয়, তাহলে আরো হাজারো-লাখো মানুষ এই কুফরিতে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ তখন আর এটিকে কুফর মনে করবে না বা কুফর মনে করলেও যেহেতু এ কুফরের কারণে সে কাফের-মুরতাদ হচ্ছে না, তাই তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে না। এর বিপরীতে বাহ্যত কুফরের কারণে যদি কোনো শ্রেণিকে সামগ্রিকভাবে কাফের-মুরতাদ ফাতওয়া দেয়া হয়, তাহলে হাজারো-লাখো মানুষের ইমান ঠিক হয়ে যায়। বর্তমান সময়ে কি এটি উদ্ভাসিত সূর্যের ন্যায় একটি বাস্তবতা নয়!

আজ যদি মানবরচিত আইনের বাস্তবায়ন, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ তথা সাম্প্রদায়িকতার মতো সুস্পষ্ট কুফরের কারণে এক শ্রেণিকে কাফের-মুরতাদ হওয়ার ফাতওয়া প্রদান করা হতো, তাহলে হাজারো-লাখো মানুষের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশেষ শ্রেণিরও অনেকের ইমান শুদ্ধ হয়ে যেতো। "النصح لكل مسلم" এর প্রতিফলন কি এই অবস্থান গ্রহণ করলে অধিকহারে পরিলক্ষিত হতো না!

"وتكفيرٍ جدَّد إيماناً"

কিন্তু আমরা এই বাস্তবতা অনুভব না করে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। "رُبَّ عقوبةٍ أورثت صلاحاً وقصاصٍ ردع ظلماً وموتٍ أحيا نفوساً" আরবের এই প্রবাদের

সঙ্গে আমার মনে হয় আরেকটি অংশ যোগ করা যায়; "وتكفيرٍ جدَّد إيماناً"। যদিও এটিকে কেউ কেউ হয়তো খারেজি হওয়ার অপবাদ দিয়ে মূল্যায়ন করবেন। فالله يحكم بيننا وبينهم يوم القيامة।

মুফতি মুহাম্মাদ শফি রহ. (মৃ-১৩৯৬ হি.) এর একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

এ বিষয়ক মুফতি মুহাম্মাদ শফি রহ. এর আলোচনাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন-

لیکن یاد رہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کجروی اور افراط و تفریط کے دونوں پہلوؤں سے سخت بیزار ہیں۔ اسلام نے اپنے پیرووں کے لئے ایک آسمانی قانون پیش کیا ہے، جو شخص اس کو ٹھنڈے دل سے تسلیم کرے اور کوئی تنگی اپنے دل میں اس کے ماننے سے محسوس نہ کرے وہ مسلمان ہے، اور جو اس قانون الٰہی کے کسی ادنیٰ حکم کا انکار کر بیٹھے وہ بلا شبہ وبلا تردد دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے دائرۂ اسلام میں داخل رکھنے سے اسلام بیزار ہے، اور اس کے ذریعہ اسلامی برادری کی مردم شماری بڑھانے سے اسلام اور مسلمانوں کو غیرت ہے۔ اور ان چند لوگوں کے داخل اسلام ماننے سے ہزاروں مسلمانوں کے خارج از اسلام ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے، جیسا کہ بہت دفعہ اس کا تجربہ اور مشاہدہ ہو چکا ہے۔

اور یہ ایک مضرت ایسی ہے کہ اگر فی الواقع ہزاروں مصالح بھی اس کے مقابلہ میں موجود ہوں تو وہ کسی مذہب دوست مسلمان کے لئے ہرگز قابل التفات نہیں ہو سکتیں، بالخصوص جب کہ وہ مصالح بھی محض موہوم اور خیالی ہوں۔ (جواہر الفقہ، تکفیر کے اصول، ۱/۲۱-۲۲)

“কিন্তু মনে রাখতে হবে, ইসলাম ও ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বক্রতা এবং বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি; উভয় ব্যাপারে কঠিন অসন্তুষ্ট। ইসলাম তার অনুসারীদের জন্য এক আসমানি সংবিধান পেশ করেছে। যে সেটিকে স্বাভাবিক মনে গ্রহণ করে নেবে এবং তা গ্রহণ করার ব্যাপারে অন্তরে কোনো ধরনের সংকোচ অনুভব করবে না, সে মুসলমান। 'আর যে আল্লাহ প্রদত্ত সে সংবিধানের সামান্যতর কোনো বিধানকে অস্বীকার করে বসবে, সে নিঃসন্দেহে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে। ইসলাম তার গণ্ডির ভেতরে তাকে রাখতে চায় না। তার মাধ্যমে আদমশুমারিতে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে ইসলাম ও মুসলমানদের আত্মমর্যাদায় লাগে।

এই কিছু লোককে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করলে হাজারো মুসলমানের ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। যেমন বহু ক্ষেত্রে এটির অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা প্রমাণিত হয়েছে।

এবং এটি এমন একটি ক্ষতিকর বিষয়; এর বিপরীতে যদি বাস্তবে হাজারো 'মাসলাহাত' বিদ্যমান থাকে, তবুও দ্বীনপ্রেমী কোনো মুসলমানের জন্য এটি কখনো ভ্রূক্ষেপ করার মতো বিষয় হতে পারে না। বিশেষকরে যদি সে 'মাসলাহত'ও শুধুমাত্র কাল্পনিক ও ধারণাপ্রসূত হয়।" (জাওয়াহিরুল ফিকহ, ১/২১-২২)

(تنبیہ)..........اور امر دوم (کافر کو مسلمان کہنا) کے متعلق بھی صحابہ کرام اور سلف صالحین کے تعامل نے یہ بات متعین کر دی کہ اس میں تہاون و تکاسل کرنا اصول اسلام کو نقصان پہنچانا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو لوگ مرتد ہوئے تھے ان کا ارتداد قسم دوم ہی کا ارتداد تھا، صریح طور پر تبدیل مذہب (عموماً) نہ تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان پر جہاد کرنے کو اتنا زیادہ اہم سمجھا کہ نزاکت وقت اور اپنے ضعف کا بھی خیال نہ فرمایا۔ (جواہر الفقہ، تکفیر کے اصول، ۱/۳۵)

"(বিশেষকথা)..... এবং দ্বিতীয় বিষয় (কাফেরকে মুসলমান বলা) সম্পর্কেও সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহিনের কর্মপন্থা এটি নির্ণয় করে দিয়েছে যে, এক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করা ইসলামের মূলনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর যারা মুরতাদ হয়েছিলো, তারা দ্বিতীয় প্রকারের মুরতাদই ছিলো। সাধারণত তারা সুস্পষ্টভাবে ধর্মত্যাগ করেনি। কিন্তু সিদ্দিকে আকবার রাযি. তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এতোটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন যে, সময়ের প্রতিকূলতা এবং নিজেদের দুর্বলতাকেও আমলে আনেননি।" (জাওয়াহিরুল ফিকহ, ১/৩৫)

আমরা বাস্তব খারেজিদেরকে খারেজি হিসেবে চিহ্নিত করলে উম্মাহ লাভবান হবে। সহিহ মানহাজের জিহাদি কাফেলাকেও যারা 'তাকফির' করে চলছে তাদেরকে খারেজি হিসেবে চিহ্নিত করি; তাহলে খারেজিদের চিনতে কোনো অস্পষ্টতা থাকবে না। অন্যথায় খারেজি শব্দের অন্যায় ব্যবহারে খারেজিরাই বেশি লাভবান হবে এবং এই অবস্থানের কারণে সৃষ্ট অস্পষ্টতার দায়ভার আমাদের উপরই বর্তাবে।

{দুই}

ব্যক্তির কুফর ও জামাআতের কুফর এক নয়

ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক কখনো সংঘটিত হওয়া শরিআহ পরিপন্থী বিষয়ের সঙ্গে শরিআতের আচরণ এবং দলবদ্ধভাবে শরিআহ পরিপন্থী কোনো বিষয়ের উপর অবিচল থাকার সঙ্গে শরিআতের আচরণ এক নয়। এজন্যই তো এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলো ব্যক্তিবিশেষ কখনো করে ফেললে উলামায়ে কেরাম সেটিকে বিদআত বলেননি, কিন্তু একই বিষয় যখন এক বৃহৎ শ্রেণি বিশেষ পদ্ধতিতে সেটির উপর অবিচল হয়ে আমল করতে থাকে তখন উলামায়ে কেরাম সেটিকে বিদআত আখ্যা দিয়েছেন। একইভাবে শরিআতের অনেক বিধান এমন আছে যেগুলো ব্যক্তিবিশেষ আদায় করতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে হত্যা করা হয় না, কিন্তু একই বিধান এক অঞ্চলের সকলে আদায় করতে অস্বীকৃতি জানালে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ যাকাতের বিধান। ব্যক্তিবিশেষ যাকাতের 'ফারযিয়্যাত' মেনে নিয়ে শুধু আদায় না করলে তাকে হত্যা করা হয় না, কিন্তু এক অঞ্চলের সকলে যাকাত আদায় করতে অস্বীকৃতি জানালে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, যদিও তারা যাকাতের 'ফারযিয়্যাত'কে অস্বীকার না করে। যার বাস্তব উদাহরণ ইসলামের ইতিহাসে বিদ্যমান আছে।

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (মৃ-১৮৯ হি.) এর একটি ফাতওয়ার আলোকে

আমরা ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশশাইবানির একটি মাসআলার আলোকে কথা বলতে পারি। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর ফাতওয়াটি ফিকহে হানাফির বিভিন্ন কিতাবে শব্দের কিছুটা ভিন্নতায় উদ্ধৃত হয়েছে। আমি ইমাম সারাখসি (মৃ-৪৯০ হি.) ও ইমাম আলাউদ্দিন কাসানি (মৃ: ৫৮৭ হি.) উভয়ের শব্দে ফাতওয়াটি উল্লেখ করছি-

قال شمس الأئمة السرخسي: وعلى هذا قال محمد رحمه الله تعالى: إذا أصر أهل المصر على ترك الأذان والإقامة أمروا بهما، فإن أبوا قوتلوا على ذلك بالسلاح كما يقاتلون عند الإصرار على ترك الفرائض والواجبات. (المبسوط للسرخسي، باب الأذان، ١٣٣/١)

"ইমাম সারাখসি বলেন, এর উপর ভিত্তি করেই ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেছেন, কোনো শহরবাসী যদি আযান ও ইকামত বর্জনের ব্যাপারে জেদ ধরে, তাদেরকে প্রথমে সে ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হবে। এরপরও যদি তারা অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে অস্ত্র নিয়ে তাদের মোকাবেলায় যুদ্ধ করা হবে, যেমনিভাবে ফরয বা ওয়াজিব বর্জনের ব্যাপারে জেদ ধরলে যুদ্ধ করা হয়।" (আলমাবসুত, ১/১৩৩)

قال علاء الدين الكاساني: أما الأول فقد ذكر محمد ما يدل على الوجوب فإنه قال: **إن أهل بلدة لو اجتمعوا على ترك الأذان لقاتلتهم عليه ولو تركه واحد ضربته وحبسته.**

(بدائع الصنائع، فصل في واجبات الصلاة، ١٤٦/١)

"ইমাম কাসানি বলেন, প্রথম বিষয়টি: তো ইমাম মুহাম্মাদের আলোচনা তা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ বহন করে। তিনি বলেছেন, **কোনো অঞ্চলের মানুষ যদি আযান বর্জনের ব্যাপারে একমত হয়ে যায়, তাহলে তাদের মোকাবেলায় আমি যুদ্ধ করবো। আর যদি কোনো একজন তা বর্জন করে, তাকে প্রহার করবো ও বন্দি করবো।**" (বাদায়েউস সানায়ে', ১/১৪৬)

পার্থক্যের একটি সাধারণ কারণ

মোটকথা, এ সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের বর্জন ও সম্মিলিতভাবে বর্জনের উপর অবিচল থাকার হুকুম এক নয়। এই পার্থক্যের একটি সাধারণ কারণ বলা যেতে পারে, ব্যক্তিবিশেষের শুধুমাত্র বর্জন অস্বীকারের ইঙ্গিত বহন করে না, কিন্তু এর বিপরীতে বর্জনের ক্ষেত্রে দলবদ্ধতা ও অবিচলতা যেমনিভাবে 'বাগাওয়াত' বিদ্রোহের ইঙ্গিত বহন করে তেমনিভাবে অস্বীকারের ইঙ্গিতও বহন করে, যদিও মৌখিক ওই বিধানকে অস্বীকার করা না হয়। যেমনিভাবে বিভিন্ন ইবাদতের ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ থেকে কখনো ঘটে যাওয়া প্রথম যুগে অনুপস্থিত কোনো 'মুবাহ' পদ্ধতি সেটিকে আবশ্যকীয় মনে করার ইঙ্গিত বহন করে না, তাই তা বিদআতের অন্তর্ভুক্ত হয় না। কিন্তু যখনই সেক্ষেত্রে দলবদ্ধতা, অবিচলতা ও

বিশেষ পদ্ধতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে তখন তা আবশ্যকীয় মনে করার ইঙ্গিত বহন করে, ফলে তা বিদআতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যদিও মৌখিক দাবি করা হয় যে, আমরা সেটিকে আবশ্যকীয় মনে করি না।

উল্লিখিত মূলনীতির আলোকে বলা যায়, 'তাকফির' কাউকে কাফের-মুরতাদ আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে যে 'অস্বাভাবিক সতর্কতা' অবলম্বনের কথা বলা হয়ে থাকে, প্রথমত তা শরিআতের সুস্পষ্ট ও অকাট্য বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। দ্বিতীয়ত সে সতর্কতার মাত্রা ব্যক্তিবিশেষ এবং অবিচল দলের ক্ষেত্রে এক পর্যায়ের হবে না। ব্যক্তিবিশেষ থেকে কখনো কোনো কুফর সংঘটিত হয়ে গেলে কোনো ব্যাখ্যার সুযোগ থাকলে সেটির আশ্রয় নিয়ে বা কোনো 'ওযর' তালাশ করে তাকে 'মুবাহুদ দাম' থেকে রক্ষা করাই কাম্য। কেননা একজন অপরাধী শাস্তির আওতায় না আসার চেয়ে একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া অধিক জঘন্যতম। কিন্তু সে মাত্রাতিরিক্ত সতর্কতা কখনো ওই শ্রেণির ক্ষেত্রে কাম্য হতে পারে না যারা যুগের পর যুগ শরিআতের আলোকে সুস্পষ্ট কুফরিকে আঁকড়ে ধরে আছে, সেটির উপর গর্ব করছে, উত্তরোত্তর তা যুগোপযোগী করার জন্য নিজেদের পুরো মেধা ও সময় ব্যয় করছে এবং সতর্ক করা সত্ত্বেও তা থেকে ফিরে আসছে না।

পার্থক্যের আরেকটি সাধারণ কারণ

কুফরের ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ এবং দলবদ্ধতার মধ্যে পার্থক্যের আরেকটি সাধারণ কারণ হিসেবে বলা যায়; ব্যক্তিবিশেষ থেকে ঘটে যাওয়া কুফর সাধারণত অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। বিশেষকরে যখন তার উপর 'কুওয়াতে কাহেরা' পরাক্রমশালী ক্ষমতা থাকে। কিন্তু একটি শ্রেণি যখন যুগের পর যুগ কোনো কুফরের উপর অবিচল থাকে, বিশেষকরে যদি তারা শাসকগোষ্ঠী হয়ে থাকে, তাহলে সে কুফর অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে এবং তা সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ে। সেটির উপর কোনো 'কুওয়াতে কাহেরা' না থাকায় তা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে।

এই আলোচনার মাধ্যমে ওই মাসআলার ব্যাখ্যাও স্পষ্ট হয়ে গেছে যা ফিকহের অনেক কিতাবে উল্লেখ হয়েছে- "إذا كان في المسألة وجوه توجب الكفر ووجه واحد يمنع، فعلى المفتي أن يميل إلى ذلك الوجه، إلا إذا صرح بإرادة توجب الكفر، فلا ينفعه

"التأويل"। (কোনো ক্ষেত্রে যদি অধিকাংশ দিক কুফর হওয়াকে সাব্যস্ত করে আর একটি ব্যাখ্যা অনুযায়ী সেটিকে কুফর সাব্যস্ত না করার সুযোগ থাকে, তাহলে মুফতির সে দিকটি গ্রহণ করা উচিত। হাঁ! সে যদি এমন কোনো ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় যা সুস্পষ্ট কুফরকে আবশ্যক করে, তখন কোনো ব্যাখ্যা কাজে আসবে না)। এটি ব্যক্তিবিশেষ থেকে কখনো ঘটে যাওয়া কুফরি কথা-কাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এটি কখনো ওই কুফরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না যে কুফরের উপর দলবদ্ধতা ও অবিচলতা তৈরি হয়েছে। অন্যথায় কোনো কুফরি মতবাদের কারণে কাউকে কাফের-মুরতাদ আখ্যায়িত করা যাবে না।

নিরান্নব্বই কুফর ও মুসলমান

উপরিউক্ত মাসআলার সম্পর্ক হচ্ছে ব্যক্তিবিশেষ থেকে প্রকাশ পাওয়া কোনো কুফরি কথা-কাজের সঙ্গে। সেই কথা-কাজের যদি অধিকাংশ দিক কুফর হওয়াকে সাব্যস্ত করে আর একটি ব্যাখ্যা অনুযায়ী সেটিকে কুফর সাব্যস্ত না করার সুযোগ থাকে, তাহলে সে ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করে তাকে বাঁচানো উচিত। কিন্তু এ মাসআলাটি অনেককে এভাবে বলতে শুনা যায়- 'কেউ যদি নিরান্নব্বইটি কুফরি কাজ করে আর একটি কাজ এমন করে যা প্রমাণ করে যে সে মুসলমান, তাকে কাফের বলা যাবে না।' এ কথার কোনো উদ্ধৃতি আমাদের জানা নেই এবং উপর্যুক্ত মাসআলার সঙ্গেও এর কোনো সম্পর্ক নেই। এটির ব্যাপারে এতোটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করছি যে, এ কথাটি মেনে নিলে পৃথিবীতে কোনো কাফেরের অস্তিত্ব থাকবে না।

{তিন}

'তাবিল' হচ্ছে 'ইলহাদ'র বারান্দা

বর্তমান পৃথিবীতে 'তাবিল' ব্যাখ্যা বরং অপব্যাখ্যার জোয়ার চলছে। শুধু তাবিল আর তাবিল। সুস্পষ্ট কুফরের ক্ষেত্রেও তাবিল, ইলহাদ ও যানদাকার ক্ষেত্রেও তাবিল। শরিআতের সুস্পষ্ট হুকুমের বিপরীতেও তাবিল। অপব্যাখ্যার স্রোতে হারিয়ে যাচ্ছে ইসলামের অকাট্য কিছু বিধান। আর এই অপকর্মের সমর্থন হিসেবে কারো কারো নিরবতাকে লুফে নিচ্ছে এক শ্রেণির অপদার্থ।

এটা যেমন বাস্তব যে, সালাফের ব্যাখ্যাকে উপেক্ষা করে কুরআন-হাদিস তথা 'নস' এর বাহ্যিক অর্থের উপর আমল কখনো পথভ্রষ্টতার কারণ হয়, ঠিক তেমনিভাবে এটাও বাস্তব যে, 'তাবিল' ব্যাখ্যা-অপব্যাখ্যা কখনো মানুষকে 'ইলহাদ' পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

শাইখ মুহাম্মাদ আওয়ামার আলোচনা থেকে

এ সংক্রান্ত আরবের প্রসিদ্ধ হানাফি আলেম শাইখ মুহাম্মাদ আওয়ামা হাফিযাহুল্লাহ চমৎকার কথা বলেছেন। কথাটির গুরুত্ব অনুভব করা উচিত।

قال الشيخ محمد عوامة في كتابه الماتع "معالم إرشادية لصِناعة طالب العلم": ومن الملكة النقدية التي ينبغي أن ينشّأ عليها طالب العلم: فهمُه حرفيَّة النصّ، والوقوف عند ما يفيده، على وَفْق الطريقة التي يتعامل فيها علماؤنا وأشياخنا مع نصوص العلماء السابقين، ومع نصوص الكتاب والسنة، لا جموداً عند ظاهرها، كما يقال: ظاهريةٌ ولا ابن حزم لها، ولا تأويلاً وتعطيلاً إلى الحد الذي يوصل إلى ما كان يقوله أشياخنا: **التأويل دِهْليز الإلحاد، فلا يجمد عند النص وحرفيته، ولا يلوي النص ليتمشّى مع فهمه.** (معالم إرشادية لصِناعة طالب العلم، المعلم الخامس عشر، تربية الملكة النقدية الأدبية في طالب العلم، ص٣٩٨)

"শাইখ মুহাম্মাদ আওয়ামা বলেন, যাচাই-বাছাইয়ের যে সকল যোগ্যতার উপর ছাত্রদের গড়ে তোলা উচিত তার মধ্যে একটি হচ্ছে, 'নস' -এর আক্ষরিক অর্থ বুঝা এবং কুরআন-সুন্নাহর 'নুসুস' ও পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের 'নুসুস'কে সামনে রেখে আমাদের উলামা-মাশায়েখের বাস্তবায়নের পন্থা অনুসারে 'নস' -এর দাবির পক্ষে অবস্থান করা। শুধুমাত্র বাহ্যিক অর্থের উপর গোঁ ধরে না বসা। যেমন বলা হয়, যথাযথ বাহ্যিক অর্থের উপর চলার মতো এখন আর ইবনে হাযম নেই। আবার ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা যেনো এ পর্যায়ের না হয়, যা আমাদের মাশায়েখদের কথার বাস্তবতা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তাঁরা বলেছেন, **ব্যাখ্যা হচ্ছে 'ইলহাদ'র বারান্দা। তাই শুধুমাত্র 'নস' ও তার আক্ষরিক অর্থের উপর গোঁ ধরা যাবে না এবং নিজের বুঝের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য 'নস'কে বিকৃত করা যাবে না।"** (মাআলিমু ইরশাদিয়্যাহ, পৃঃ ৩৯৮)

{চার}

আমরা বাঁচাতে চাই নাকি বাঁচতে চাই!

একটি বিষয় সবসময় আমার মনকে অস্থির করে তুলে। আমরা যারা সুস্পষ্ট কুফরকে কুফর বলতে প্রস্তুত নই, প্রকাশ্য ইলহাদ-যানদাকাকে প্রতিরোধ করতে প্রস্তুত নই বা কুফরকে কুফর বললেও সেই কুফরের কারণে কোনো শ্রেণিকে, বিশেষকরে শাসকগোষ্ঠীকে সামগ্রিকভাবে কাফের-মুরতাদ আখ্যা দিতে প্রস্তুত নই; আমরা কি আসলে তাদেরকে বাঁচাতে চাই নাকি নিজেরা বাঁচতে চাই! আমার কেবলই মনে হয় যে, তাদের বাঁচাতে নয় বরং আমরা নিজেরা বাঁচতে চাই। কারণ, আমাদের ধারণা মতে শাসকশ্রেণিকে কুফর থেকে বাঁচাতে পারলে আমরা অনেক দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে যাবো। এর বিপরীতে শাসকশ্রেণির কুফর-ইরতিদাদ প্রমাণিত হলে আমাদের উপর যে দায়িত্বগুলো আসবে, সেগুলোর কথা কল্পনা করলেও আমাদের শরীরে রীতিমতো কম্পন শুরু হয়ে যায়।

আমার ব্যক্তিগতভাবে দু'য়েকজনের কথা জানা আছে যারা তাদের ছাত্রদের ক্ষোভের স্বরে বলেছেন, 'শুধু যে 'দারুল হারব দারুল হারব করো; দারুল হারব হলে কী কী দায়িত্ব কাঁধে আসবে খবর আছে?' আসলে এ খবর আছে বলেই আমরা বহু সত্যকে বিভিন্ন অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে মূল থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু হাজার অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েও যে দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না; তা কিতাবের পৃষ্ঠা উলটিয়ে দেখার মতো আমাদের 'নাশাত' তৈরি হয় না। বা না দেখলে তো মুখস্থের ভিত্তিতে বহু মন্তব্য করে দেয়া যায়, কিন্তু দেখে ফেললে তো সে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়।

আমরা বাঁচাতে চাই নাকি বাঁচতে চাই শিরোনামে আরেকটি কথা মনে পড়লো। কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত নয় এমন যার সঙ্গেই

খিলাফত পুনরুদ্ধারের ফরয দায়িত্বের ব্যাপারে কথা বলেছি তিনি এ জবাব দিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছেন যে, ইসলামি দলগুলো সেটির জন্য চেষ্টা করে চলছে। যখন প্রশ্ন করেছি, সে ফরয দায়িত্ব আদায় করতে আপনি কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত? তখন সন্তোষজনক আর কোনো উত্তর পাইনি।

মূলত এই শ্রেণির মুহতারামগণ ভালো করেই জানেন যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে খিলাফত পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা শুধুই ব্যর্থ সময়ক্ষেপণ। তাই কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত হওয়া বা কোনোটিকে সমর্থন করার মতো অনর্থক কাজে তারা সময় ব্যয় করতে চান না। এজন্যই তো বলতে গেলে বাংলাদেশের আশি-নব্বই ভাগ উলামা-তলাবা রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত নন। কিন্তু যখনই ফরয দায়িত্বের প্রশ্ন আসে তখনই নিজেদের কাছেও অগৃহীত পদ্ধতির উদ্ধৃতিতে বাঁচার চেষ্টা করা হয়। আমাদের নিকট এটির মূল্যায়ন আর কী হতে পারে!

{পাঁচ}

একটি হাদিসের 'মিসদাক'

সর্বশেষ মুহতারাম উলামায়ে কেরামের সামনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত একটি 'মারফুয়ে হুকমি' হাদিস পেশ করছি। আশা করি উলামায়ে কেরাম হাদিসটির 'মিসদাক' প্রতিপাদ্য নির্ণয়ের ব্যাপারে গবেষণা করবেন।

قال عبد الله بن مسعود: كيف أنتم إذا لبستْكم الفتنة يربو فيها الصغير، ويهرم فيها الكبير، **ويتخذها الناس سنة، فإن غُيِّر منها شيء قيل: غُيِّرت السنة!** قالوا: متى يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثُرت قراؤكم، وقلَّت أمناؤكم، وكثرت أمراؤكم، وقلت فقهاؤكم، والتُمِست الدنيا بعمل الآخرة.

قال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم، وسكت عنه الحاكم. وقال الشيخ محمد عوامة: إسناده صحيح. (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الفتن، من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها، ٤٩/٢١، رقم الحديث: ٣٨٣١١، ويراجع أيضاً: المصنف لعبد الرزاق، باب الفتن، ٣٥٩/١١، رقم الحديث: ٢٠٧٤٢، سنن الدارمي، كتاب العلم، باب تغير الزمان وما يحدث فيه، صـ١٣٢، رقم الحديث: ١٩٣، ١٩٤، المستدرك للحاكم، كتاب الفتن والملاحم، ٤١٨/٥، رقم الحديث: ٨٧٤٨)

"আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, তখন তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন ফিতনা তোমাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরবে। যে দীর্ঘস্থায়ী ফিতনায় ছোটো বড়ো হয়ে যাবে এবং বড়ো বৃদ্ধ হয়ে যাবে, **আর মানুষ সেটিকে সুন্নাত-অনুমোদিত পন্থা হিসেবে গ্রহণ করে নেবে। তা থেকে কিছু পরিবর্তন করতে চাইলে বলা হবে, এতোদিনের অনুমোদিত পন্থা পরিবর্তন করে দেয়া**

হচ্ছে। শিষ্যরা বললো, হে আবু আব্দুর রহমান! (ইবনে মাসউদের উপনাম) এটি কখন ঘটবে? তিনি বললেন, যখন তোমাদের আলেমদের সংখ্যা অধিক হবে, কিন্তু বিশ্বস্ত খুব কমই হবে এবং তোমাদের আমিরদের সংখ্যা অধিক হবে, কিন্তু ফকিহদের সংখ্যা খুব কম হবে, আর আখেরাতের আমলের বিনিময়ে দুনিয়া কামনা করা হবে।" (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, ২১/৪৯, হাদিস নং: ৩৮৩১১। আরো দেখুন: মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, ১১/৩৫৯, হাদিস নং: ২০৭৪২, সুনানে দারেমি, পৃ: ১৩২, হাদিস নং: ১৯৩, ১৯৪, মুসতাদরাকে হাকেম, ৫/৪১৮, হাদিস নং: ৮৭৪৮)

হাদিসে বর্ণিত দীর্ঘ সময়ব্যাপী বিদ্যমান সে ফিতনা কী হতে পারে যেটিকে মানুষ সুন্নাত-অনুমোদিত পন্থা হিসেবে গ্রহণ করে নেবে এবং কেউ সেটির উপর আপত্তি করলেই বলা হবে, হায়রে এতোদিন ধরে চলে আসা সুন্নাত পরিবর্তন করে দেয়া হচ্ছে?

هذا، وصلى الله تعالى على سيد الأنبياء والمرسلين. آمين.

{সংযোজন}

পরিমার্জিত সংস্করণে মাওলানা ইসহাক উবাইদি রহ. এর 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামি রাজনীতি: ইতিহাস, বাস্তবতা ও ফলাফল' নামে একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সংযোজন করা হয়েছে; যা তিনি একটি 'মুহাযারা'য় পেশ করেছিলেন। নোয়াখালীর বশিরিয়া ইসলামিয়া মাদরাসার সাবেক মুহতামিম, বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও রাজনীতিবিদ মাওলানা ইসহাক উবাইদি রহ. হাফেজ্জী হুজুর রহ. এর রাজনৈতিক প্রেস সচিব ছিলেন। রাজনীতি, রাজনীতির মাঠ, রাজনীতির বাস্তবরূপ, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও রাজনীতির হালচাল তিনি খুব কাছ থেকে অবলোকন করেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে তৈরি করা প্রবন্ধটি খুবই গুরুত্বপূণ এবং পাঠক তা থেকে পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করার মতো বহু উপাদান পাবেন বলে আশা করছি।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামি রাজনীতি: ইতিহাস, বাস্তবতা ও ফলাফল

মাওলানা ইসহাক উবাইদি রহ.

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম। আম্মা বা'দ-

ইসলাম মানুষের ধর্ম। মানবকল্যাণে নিবেদিত একটি বহুজাতিক ধর্ম। কোটি কোটি মানুষের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে এর পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য প্রয়োজন একটি রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর। যার মাধ্যমে বিলিয়ে দেয়া যাবে মানবতার সুফল ও সুনীতিগুলো। ফলে গড়ে উঠবে সুশীল একটি সমাজব্যবস্থা। আর এর জন্য প্রয়োজন হয় লোক নির্বাচন করার, যারা মানবতার সুবাতাসকে ছড়িয়ে দেবে দেশব্যাপী।

এই নির্বাচন কীভাবে হওয়া উচিত; তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেয়া আছে ইসলামের বড়ো বড়ো আইনি গ্রন্থগুলোতে। পবিত্র কুরআনের মধ্যে বর্তমান পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের অসারতার কথা পরিষ্কারভাবেই বলা আছে। "وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ" 'হে নবী! তুমি যদি জমিনের অধিকাংশ লোকের আনুগত্য করো, তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করে ফেলবে।' পৃথিবীতে বসবাসকারী যতো মানুষ রয়েছে, তার মধ্যে খারাপ লোকের সংখ্যাই বেশি। ভালো মানুষের সংখ্যা খুবই কম। পবিত্র কুরআনের কোথাও বলা হয়েছে "وقليل ما هم" অর্থাৎ ভালো মানুষ সংখ্যায় কমই হয়ে থাকে। আবার কোথাও বলা হয়েছে "أكثرهم لا يعلمون", "أكثرهم لا يعقلون" অর্থাৎ তাদের অধিকাংশ মূর্খ, অধিকাংশ অজ্ঞ। আবার কোথাও বলা হয়েছে "لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ" 'সৎ আর অসৎ সমান নয়। যদিও অসত্যের আধিক্য তোমাকে আশ্চর্যান্বিত করে।' সব কুরআনিক দর্শন থেকে

একটি কথাই ফুটে উঠেছে যে, পৃথিবীতে খারাপের সংখ্যা সব সময় বেশিই থাকে। তাই বলে ওই সংখ্যাধিক্যের মতে বা তাদের সিদ্ধান্তে পৃথিবী চলতে পারে না। পৃথিবী চলবে অল্প সংখ্যক সৎ মানুষের নেতৃত্বে। নতুবা পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য।

অন্যদিকে আজকের গণতন্ত্রের ভাষ্য হচ্ছে পুরো উল্টো। অধিকাংশ মানুষ যা বলবে তাই সঠিক। অধিকাংশ মানুষ যাকে দেশ চালানোর কাজে নির্বাচিত করবে, আইন পরিষদ বা আইন প্রণয়নকারী হিসেবে নির্বাচন করবে, সে বা তারাই দেশ চালাবে বা আইন তৈরি করবে। আগেই বলেছি, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ খারাপ; কুরআনের এই দর্শনের সঙ্গে আমরা বাস্তবেও তার মিল হুবহু দেখতে পাচ্ছি। আমাদের সমাজে সৎ মানুষের সংখ্যা নেই বললেই চলে। দু'একজন থাকলেও তারা সমাজপতি নয়। অর্থাৎ সমাজ তাদের কথায় উঠে-বসে না। এমতাবস্থায় অধিকাংশ অসৎ লোকের ভোটে যে লোকটি নির্বাচিত হবে, সে কী করে সৎ হতে পারে। একজন অসৎ লোক কোনোদিন একজন সৎ লোককে দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রেও নির্বাচন করবে না এবং করছে না যে এটাই বাস্তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাই ম্যাজরিটির এই গণতন্ত্র দ্বারা একটি দেশের কল্যাণ কোনোদিনই আশা করা যায় না। এই গণতন্ত্র আছে বলেই বোমাবাজি ও সন্ত্রাস দিন দিন বেড়েই চলছে। কারণ, সন্ত্রাসীদের ভোটে নির্বাচিত ব্যক্তিটি সন্ত্রাসী হবে না তো হবেটা কী? এই গণতন্ত্র আছে বলেই নিজের পক্ষে ভোটের আধিক্য দেখানোর জন্য সন্ত্রাস করে হলেও ভোট চুরি করা হচ্ছে, জালভোট ডাকাতি হচ্ছে। এই গণতন্ত্রের কারণেই আইনের কোনো প্রয়োগ-ব্যবস্থা নেই। খুন-খারাবি করে জেলে গিয়ে নির্বাচিত মহারথীদের টেলিফোনেই আবার ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে। এখন তো তাও লাগে না; খুন করে গিয়ে মন্ত্রী-মিনিস্টারের বাড়িতে-ছত্রছায়ায় লালিত পালিত হতে থাকে। এতোসব কাণ্ড-কারখানা চোখের সামনে হওয়া সত্ত্বেও নেতা-নেত্রীরা এই গণতন্ত্রের কথা বলে বেড়ায়। এই গণতন্ত্রের জয়গানই তারা সব সময় গেয়ে যায়। কারণ একটিই, সরকার বা বিরোধীপক্ষ যেই হোক না কেনো; তারা কেউই একটি সৎ নেতৃত্ব বা সৎ সমাজ গড়ে তুলতে আগ্রহী নয়।

সাবেক রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন বলেছিলো, 'ঋণখেলাপিদের কেউ কিছু করতে পারবে না। কারণ, তারা সরকারি দলে যেমন আছে, বিরোধীদলেও ঠিক তেমনি

রয়েছে। তাদেরকে আইনও কিছু করতে পারবে না।' (কোনো একজন ঋণখেলাপি কর্তৃক গভর্নরকে ধমকানোর কথা কে না জানে)। কারণ, আইন তো সেই অসৎ মানুষগুলো দ্বারাই পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন একবার ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দিতে বলেছিলো। কিন্তু নেতা-নেত্রীরা এতে সাড়া তো দিলই না; বরং প্রত্যেক দল নিজ নিজ ছাত্র সংগঠন দিয়ে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকাই গ্রহণ করা হয়েছিলো। কারণ একটাই, সৎ নেতৃত্ব না থাকায় জনসাধারণের ছেলে-সন্তানদের দিয়ে নিজ নিজ অসৎ চিন্তা-চেতনা বাস্তবায়নের কাজে নেতা-নেত্রীরা সদা ব্যস্ত। পড়ালেখার নামে গরিব মা-বাপেরা টাকা-পয়সা জোগান দিতে যেখানে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন, সেখানে তাদের সন্তানরা রাজনীতির নামে মাস্তানি, হত্যা-রাহাজানিসহ আরও বহু অসৎ কাজে লিপ্ত হয়ে ছাত্রজীবন তো নষ্ট করছেই, উপরন্তু ভাবী মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রী যে এসব সন্ত্রাসীরাই হতে যাচ্ছে, তাও আমরা দিব্বি চোখে দেখতে পাচ্ছি। এ ব্যাপারে ছাত্রদের দোষ মোটেও নেই। যতো দোষ নেতা-নেত্রীদের। তারা নিজ নিজ স্বার্থোদ্ধারের কাজে এই তারুণ্যকে ব্যবহার করছে। অথচ তাদের সন্তানরা কিন্তু এখানে পড়ে না, পড়ে বিদেশে। (এই নেতা-নেত্রীদের স্বার্থে কতো মায়ের বুক এ পর্যন্ত খালি হয়েছে তার হিসাবই বা কে দেবে? নেত্রীদের জন্য খুব সহজ একটা পন্থা আবিষ্কার হয়েছে, আর তা হচ্ছে, একটি রক্ত ঝরলে নেত্রী দৌড়ে গিয়ে তার মাকে বুকে চেপে ধরে কেঁদে ফেলবেন। ব্যস! সব ঠাণ্ডা)। এর অর্থ এই যে, আমাদের সন্তানরা শিক্ষিত হয়ে গড়ে উঠুক এবং শাসন-শোষণের জন্য যোগ্য হয়ে উঠুক, আর গরিব জনসাধারণের ছেলেরা বখাটে, মাস্তান, সন্ত্রাসী, হাইজ্যাকার ইত্যাদি হয়ে অশিক্ষা ও অরাজকতার দিকে চলে যাক। আর এটা যে শুধু নেতা-নেত্রীদের দ্বারাই হচ্ছে তাও পুরোপুরি মনে হয় না, বরং এর পেছনে বিদেশী ষড়যন্ত্রেও কাজ করছে বলে আমার মনে হয়। কারণ বাংলাদেশ একটি স্বনির্ভর সোনার বাংলা গড়ে উঠুক, এটা আমাদের পাশ্চাত্য বন্ধুরা (?) যেমন চায় না, আমাদের প্রতিবেশী অনেক বন্ধুও (?) তা চায় না।

গণতন্ত্রের নামে অস্ত্রের মহড়া চলছে। এক সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও নাকি বলেছিলো, 'অস্ত্র তাদের কাছে থাকলে আমাদের কাছেও আছে। দেখা যাবে কে কতোটা প্রদর্শন করতে পারে?' এই ভাষ্য যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে জাতিকে নতুন করে ভাবতে হবে নির্বাচন সম্পর্কে। অস্ত্র সরকারি দলের কাছে যেমন আছে, বিরোধীদলের কাছেও তেমনি আছে। এ কথা সচেতন নাগরিকরা

এমনিতেই ভালো করে জানেন। তারপর সরকারের একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি, তাও যার হাতে খোদ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় ন্যস্ত; তার মুখে উলঙ্গভাবে অস্ত্রের ঘোষণায় দেশ কোন দিকে যাচ্ছে তা বুঝতে কোনো সচেতন নাগরিকের জন্য কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

অন্যের মিটিং-মিছিল ও অফিস কক্ষে বোমা হামলা করা, মানুষের রক্ত নিয়ে হোলি খেলায় মেতে উঠা, আমার বিরোধীকে আমার এলাকায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা, বিরোধীদলীয় নেত্রীর রাজনৈতিক সফর ঠেকিয়ে দেয়া, এমনকি বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ করা- এটাই মূলত গণতন্ত্র। এ কথা বুঝতে জনগণের খুব একটা কষ্ট হচ্ছে না। এরই নাম যেহেতু গণতন্ত্র, তাহলে বলা যায় জনগণ এই গণতন্ত্র চায় না। এ কথা উচ্চকণ্ঠে বলা যায়। যে কোনোভাবে ক্ষমতায় যাওয়াই যদি রাজনীতির উদ্দেশ্য হয়, দেশের কল্যাণে বা মঙ্গলের চিন্তা কারও মধ্যে না থাকে, তাহলে সে রাজনীতির কী দরকার? টাকা আর পিস্তলের জোরে ক্ষমতায় যাওয়ার ট্র্যাডিশন বেশ কিছুদিন থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। দলের ৩০ বছরের নিষ্ঠাবান গরিব নেতাকর্মীদের মনোনয়ন দেয়া হয় না। দেয়া হয় অসৎ উপায়ে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়া একশ্রেণীর অসৎ টাকার কুমিরকে। কারণ টাকা ও পিস্তলের জোরে হয়ে যেতে পারে এই ভাবনায়। আর এই মনোভাব সরকার ও বিরোধীদল উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান। এমনটির চেয়ে সামরিক শাসন অনেক শ্রেয়। যদি সৎ হয় তাহলে কোনো কথাই নেই সোনায় সোহাগা, আর যদি সৎ না হয়, তাদের স্বেচ্ছাচারিতায় দেশের ক্ষতি হলেও জনগণের উপর তার ছাপ সরাসরি পড়ে না, পড়ে পরোক্ষভাবে। এমতাবস্থায় এই তথাকথিত গণতন্ত্রের অসারতার কথা কি কাউকে বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে?

এই পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের আবার বহু রূপ আছে। আমেরিকায় এর রূপ-রূপায়ন এক রকম, ব্রিটেন-ফ্রান্স ইত্যাদি ইউরোপীয় গণতন্ত্রের রূপ আরেক রকম। অর্থাৎ যার যার দেশে তাদের স্বার্থ অনুযায়ী এই গণতন্ত্রকে কেটে-ছেঁটে সাইজ করা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে এই গণতন্ত্রের অসারতার কথা কারও বুঝতে আর বাকি থাকলো না। এবার আসুন, এই গণতন্ত্রে কি সত্যিই ম্যাজরিটির ভোটে বিজয়ী হয়ে দেশ শাসন করা হচ্ছে? নাকি মাইনরটির ভোটে পাস করে ম্যাজরিটির উপর শাসন চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে, তা একটু খতিয়ে দেখি। প্রথমে আমরা দেখতে পাই, টোটাল ভোটারের শতকরা ৫৫ ভাগ ভোট

কাস্ট করাতেও প্রশাসন ও প্রার্থীদের পক্ষে হিমশিম খেতে হয়। এর কারণ হিসেবে অনেকেই অশিক্ষা, কম শিক্ষা ইত্যাদিকে দায়ী করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় তা সত্য নয়। বরং জনগণের হতাশাই এর মূল কারণ বলে আমি মনে করি। কারণ, তারা দীর্ঘ বয়সে ব্রিটিশ শাসন দেখেছে, দেখেছে পাকিস্তানের শাসন, এরপর বাংলাদেশেও বহুজনের বহু সাদা-কালো, লাল-নীল ইত্যাদি রংয়ের শাসনও তারা দেখেছে। কিন্তু জনগণের আশা-আকাঙ্খা পূরণ করার মতো কোনো শাসনকেই তারা দেখতে পায়নি। জনগণ যে তিমিরে সে তিমিরেই পড়ে আছে। মাঝখানে যারাই ক্ষমতার ছোঁয়া পেয়েছে, আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হতে দেখেছে তাদের জনগণ। তাই তারা 'ভোট করে কী হবে'? এই এক মনোচিন্তার কারণে ভোট থেকে বিরত থাকাকে শ্রেয় বলে মনে করছে। ভোটের ব্যাপারে গণস্বতঃস্ফূর্ততা পরিলক্ষিত না হওয়ার এই কারণটিই আমার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে। তারপর যাওবা ৫৫ ভাগ ভোট কাস্ট করানো হয়, তার মধ্যে যদি ৪ জন প্রার্থী থাকে, তাহলে দেখা যায়, বিজয়ী ব্যক্তিটি মাত্র ১৪/১৫ ভাগ ভোট পেয়েও বিজয়ী হতে পারে। বাকিদের কেউ দশভাগ, কেউ আটভাগ, বিভিন্নভাবে পেয়ে পরাস্ত হলো বটে, কিন্তু এই পরাজিত তিনজনের সম্মিলিত ভোটের সংখ্যা বিজয়ী ব্যক্তির প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা থেকে অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও মাইনরটির ভোটে বিজয়ী ব্যক্তিটি এই ম্যাজরিটিকেও শাসন করছে এবং বাকি ৪৫ ভাগকে (যারা ভোট দেয়নি) তাদেরকেও শাসন করছে। তাহলে দেখা যায় শতকরা ১৪/১৫ ভাগ ভোটে বিজয়ী ব্যক্তিটি শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষের উপর মাইনরটি শাসনকে চাপিয়ে দিচ্ছে। একেই ম্যাজরিটির শাসন বা গণতন্ত্রের শাসন বলা হচ্ছে। অথচ সম্পূর্ণ মাইনরটির শাসন ম্যাজরিটির উপর চাপানো হচ্ছে।

আবার এই গণতন্ত্রে বোকা আর জ্ঞানী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সৎ-অসৎ, চোর-ডাকাত সবার ভোটকেই সমভাবে মর্যাদা দেয়া হয়। রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর ভোট আর একজন ডাকাতের ভোটকে যে গণতন্ত্রে একই মাপে মূল্যায়ন করা হয়, সে গণতন্ত্রের অসারতার কথা যুক্তি দিয়ে বোঝানোর প্রয়োজন হয় না।

ইসলাম এ ব্যাপারে 'আহলুল হল্লে ওয়ালআকদ' এর নির্বাচনের কথা বলে। যাকে এক কথায় শুরায়ি নিযাম বলা হয়। এদের নির্বাচনকে বাকি সাধারণ মানুষ মেনে নেবে। এটাই ইসলামের প্রথম যুগ থেকে চলে আসতে দেখা যায়।

বঙ্গদেশে আলেমদের রাজনীতির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র

আমরা ছাত্র জীবনে মাইবুযি কিতাবে সিয়াসত বা রাজনীতিকে তিন ভাগে বিভক্ত করতে দেখেছি। তাহযিবে আখলাক, তাদবিরে মানযিল ও সিয়াসতে মুদুন। তাহযিবে আখলাক অর্থ আত্মশুদ্ধি, আর তাদবিরে মানযিল অর্থ পারিবারিক শুদ্ধি, তৃতীয় ধাপ হচ্ছে সিয়াসতে মুদুন বা নগরকেন্দ্রিক রাজনীতি। তাহলে বোঝা গেল, ব্যক্তিশুদ্ধি বা আত্মশুদ্ধি রাজনীতির প্রথম স্তর বা ধাপ। অন্যদিকে পারিবারিক শুদ্ধি বা সামাজিক শুদ্ধি হচ্ছে রাজনীতির দ্বিতীয় স্তর। আর নগরকেন্দ্রিক বা বৃহত্তর সমাজ অথবা রাষ্ট্রীয় শুদ্ধি রাজনীতির তৃতীয় ধাপ বা শেষ স্তর।

আমরা ছোটোবেলায় যে ভূগোল বই পড়েছি, তাতে রয়েছে কয়েকটি ব্যক্তি নিয়ে একটি পরিবার গঠিত হয়। আর কয়েকটি পরিবার নিয়ে একটি মহল্লা বা গ্রাম গঠিত হয়। আবার কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন, আর কয়েকটি ইউনিয়ন নিয়ে একটি থানা গঠিত হয়। কয়েকটি থানা নিয়ে একটি মহকুমা, আবার কয়েকটি মহকুমা নিয়ে একটি জেলা, আর কয়েকটি জেলার সমন্বয়ে একটি বিভাগ, আবার কয়েকটি বিভাগ নিয়ে একটি প্রদেশ, আর কয়েকটি প্রদেশ নিয়েই একটি দেশ গঠিত হয়। আর কয়েকটি দেশ নিয়ে একটি মহাদেশ আর ওই সকল মহাদেশের সমন্বিত নাম আজকের বিশ্ব। তাহলে বোঝা গেল রাজনীতির স্তর বিন্যাসের ব্যাপারে আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে ইসলামি দর্শনের হুবহু মিল রয়েছে। ধাপে ধাপে তার বিকাশও হয়।

মানুষের চব্বিশ ঘন্টার প্রতিটি মুহূর্তের ব্যাপারেই ইসলামের এক সুমহান নির্দেশনা রয়েছে। রয়েছে শৈশব-কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্যের ব্যাপারেও নীতিমালা। তাই একটি শিশুর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি স্তরেই রয়েছে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ছায়া। এজন্যই ইসলামকে মানবজীবনের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা বলা হয়। অর্থাৎ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, চাকরি-বাকরি বা বিয়ে-শাদি ইত্যাকার যাবতীয় বিষয়েই ইসলামের কিছু না কিছু ফরমান রয়েছে। ইসলামের পরিভাষায় এসব স্তরকেই রাজনীতি বলা হয়।

স্পষ্টতই অনুধাবন হচ্ছে, মানুষের জন্য কখনো রাজনীতি বিবর্জিত কোনো অবস্থাই নেই। মানুষের প্রতিটি স্তরেই রাজনীতি বিরাজমান। রাজনীতির এই সংজ্ঞা ও স্তর বিন্যাস বোঝার পর আমরা বলতে পারি যে, ইসলামে রাজনীতির

সংজ্ঞা অনেক ব্যাপক। মানুষ যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, তার রাজনীতি মুক্ত থাকার কোনো সুযোগ নেই। সে পড়ছে বা পড়াচ্ছে, সে ক্ষেত-খামারে চাষাবাদ করছে বা ব্যবসা-বানিজ্য করছে, সে মালিক হোক বা মজুর, সে গরীব হোক বা ধনী, শাসক হোক বা শাসিত, সর্বাবস্থায় সে রাজনীতিতে লিপ্ত রয়েছে।

মুঘল সম্রাট শাহজাহান কন্যা জেবুন্নেছার মারাত্মক কোনো রোগ এক ইংরেজ ডাক্তারের উসিলায় ভালো হলে পরে সম্রাট খুশি হয়ে তাকে পুরস্কৃত করতে চাইলেন। ডাক্তার পুরস্কারস্বরূপ তার জাতির জন্য একটি বানিজ্য সুবিধার অনুমতি প্রার্থনা করেন। ধুরন্ধর ইংরেজ ডাক্তার সে সুবিধা মঞ্জুর করে নেয়ার মাধ্যমে প্রায় সাতশ বছর যাবত মুসলিম শাসিত ভারত উপমহাদেশটি ইংরেজ বেনিয়াদের গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ করে দেয়।

এরপর হযরত শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. এর ফর্মূলা অনুযায়ী তাঁর পুত্র হযরত শাহ আব্দুল আযিয রহ. এর দারুল হারবের ফতওয়ার মাধ্যমে আযাদী আন্দোলন আরম্ভ হয়। এক পর্যায়ে শাহ আব্দুল আযিয সাহেবের অন্যতম খলিফা হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলবি রহ. এর জিহাদি আন্দোলন জোরদার হলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে ইসলামি হুকুমত পুনরায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং তা বেশ কয়েক বছর যাবত চালুও থাকে। কিন্তু ইংরেজদের কূটচালে হিন্দু শিখদের ষড়যন্ত্রের ফলে ঐতিহাসিক বালাকোট যুদ্ধে তার সাময়ীক পরিসমাপ্তি ঘটলেও ইতিহাস সাক্ষী যে, হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলবির শিষ্য-শাগরিদ ও খলিফাদের মাধ্যমেই বঙ্গদেশে ইসলামী রাজনীতির জোয়ার আরম্ভ হয়।

ইংরেজ বিরোধী জিহাদ চলাকালে তার খলিফা হযরত মাওলানা কারামত আলি জৈনপুরি রহ. কে তিনি ইসলামি দাওয়াতি মিশন এবং জিহাদের জন্য রসদ সাপ্লাইয়ের কাজেই বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। তার মাধ্যমে হাজার হাজার মুসলমান জিহাদি কাফেলায় যেমন শরিক হয়েছিল তেমনি লক্ষ লক্ষ মানুষ ইসলামের ছায়াতলে এসে সহিহ দ্বীনের উপর আমল করারও সুযোগ পায়।

ঐতিহাসিক বাঁশের কেল্লার নায়ক হাজি নেছার আলি ওরফে তিতুমীর তাঁরই একজন স্বনামধন্য শিষ্য ছিলেন। ফরিদপুরের ঐতিহাসিক ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা হাজি শরিয়তুল্লাহও নাকি তাঁর ভাব শিষ্য ছিলেন। তাঁদের

মাধ্যমে বঙ্গদেশে রাজনীতির প্রথম দুই ধাপে যেমন কাজ হয়েছে, তৃতীয় ধাপের কাজটি তার চাইতেও বেশী সফল হয়েছে। কুখ্যাত ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ-জিহাদের ফলে ইতিহাসেও তাঁরা অমর হয়ে আছেন। ফকির মজনু শাহ'র আন্দোলনও কম নাড়া দেয়নি তখন। তঁদের কালে ইংরেজরা বহু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বারবার।

নোয়াখালীর হযরত মাওলানা ইমামুদ্দিন রহ. হযরত সৈয়দ আহমদ রহ. এর অন্যতম খলিফা ও বালাকোট যুদ্ধের গাজি ছিলেন। পরে তিনি দেশে ফিরে হযরত মাওলানা কারামত আলি জৈনপুরির উস্তাদ ও পীর হিসেবেও বরিত হন। নোয়াখালীর তৎকালীন তাহযিব-তামাদ্দুনে তার অবদান অনস্বীকার্য হয়ে আছে। বঙ্গদেশে ইসলামি রেনেসাঁর দুই অগ্রপথিক শর্ষিনা ও ফুরফুরার পীর হযরত মাওলানা নেছার উদ্দিন সাহেব ও হযরত মাওলানা আবু বকর সাহেবের দাদা পীর যিনি ছিলেন তিনিও হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলবির অন্যতম খলিফা ও বালাকোটের গাজি ছিলেন। যাঁর নাম সূফী নূর মোহাম্মদ রহ.। তিনি বর্তমান চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে পরবর্তী আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের মাধ্যমে বঙ্গদেশে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব ঘটিয়েছেন।

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া চনুতির শাহ আহমদ সাহেবদের পূর্বপুরুষ হযরত মাওলানা আব্দুল হাকীমও হযরত সৈয়দ আহমদ রহ. এর অন্যতম খলিফা ও বালাকোটের গাজি ছিলেন। বর্তমান দৈনিক প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার পত্রিকার প্রকাশক জনাব মাহফুজ আনামের বাবা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রি ও কথাসাহিত্যিক মরহুম আবুল মানসুর আহমদের দাদা এবং নানা তারা দু'জনও নাকি বালাকোটের গাজি ছিলেন। বৃহত্তর ময়মনসিংহতে তৎকালে ইসলামি সিয়াসতে তাঁরা বড় রকমের অবদান রাখতে সক্ষম হন। আবুল মানসুর আহমদ সাহেব তার আত্মজীবনীতে তাদের ব্যাপারে গাজি সাহেব বলে বলে অনেক আলোচনা করেছেন। এরা সবাই হযরত সৈয়দ আহমদ রহ. এর শিস্যত্ব গ্রহণ করে তৎকালীন বাংলায় রাজনীতির ত্রিধারাতেই সফল ভূমিকা রেখেছেন।

১৮৫৭ সনের সিপাহী বিদ্রোহের পর কতো হাজার আলেমকে যে গ্র্যান্ডট্রাংক রোডের দুই ধারে অবস্থিত গাছের সাথে ঝুলিয়ে ও পেরেক মেরে শহীদ করা হয়েছে তার সঠিক হিসাব কোনো ঐতিহাসিক দিতে পারবেনা। হযরত মোহাম্মদ

মিয়া রচিত 'উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযি' গ্রন্থে সবিস্তারে তার কিছু বর্ণিত হয়েছে। ইংরেজ ঐতিহাসিক ডব্লিউ হান্টারের 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্স' গ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী বোঝা যায়, চট্রগ্রাম থেকে আরম্ভ করে কাবুল সীমান্ত খাইবার গিরিপথ পর্যন্ত বিস্তৃত গ্র্যান্ডট্রাংক রোডের দুইপাশে অবস্থিত একটি গাছও এমন ছিলনা, যাতে কোনো না কোনো আলেমকে লটকানো হয়নি।

আলেমদের এসব নির্যাতনের পর সম্মুখ যুদ্ধ পরিহার করে ডিফেন্স করার স্বার্থে কর্মকৌশল পরিবর্তন করা হয় এবং ১৮৬৬ সনে হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবি রহ. এর উদ্যোগে দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আযাদি আন্দোলনের দ্বিতীয় ধাপের কাজ আরম্ভ হয়। আযাদি আন্দোনের পরিবর্তিত এই ধারায় বঙ্গদেশে বহু মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলায় ১৯০১ সনে হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ রহ. ও হযরত মাওলানা হাবিবুল্লাহ রহ. কর্তৃক চট্রগ্রামের হাটহাজারী মাদরাসা স্থাপনের মধ্য দিয়ে শুভ এ ধারা আরম্ভ হয়। আযাদি আন্দোলনের অন্যতম সিংহপুরুষ শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রহ. এর অন্যতম শিষ্য হযরত মাওলানা সাঈদ আহমদ সন্ধিপি রহ. ও হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াদুদ সন্ধিপি রহ. এর মাধমে হাজার হাজার ইসলামি মনীষী ও মুজাহিদ তৈরী হয়ে বঙ্গদেশে ওই ধারাকে সমুন্নত রাখতে প্রয়াস পান।

আযাদী আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯০৫ সালে ঢাকায় নওয়াব সলিমুল্লাহ খাঁর মাধ্যমে মুসলিমলীগ প্রতিষ্ঠা লাভ করলে আন্দোলনের এই ধারাটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যেহেতু মুসলিমলীগের অন্যতম সমর্থক ও তাত্ত্বিক ছিলেন উপমহাদেশের অন্যতম বুযুর্গ আলেমে দীন মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানবি রহ. এবং এশিয়ার অন্যতম মুহাক্কিক ও দার্শনিক আল্লামা ড. মুহাম্মদ ইকবাল; তাই আলেমদের একটা অংশ মুসলিমলীগকে সমর্থন জানায়।

অন্যদিকে শায়খুল হিন্দের অন্যতম জানশিন আযাদি আন্দোলনের অন্যতম বীর পুরুষ শায়খুল আরব ওয়ালআজম হযরত মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানিসহ বেশ কিছু বড় মাপের বুযুর্গ আলেমেদ্বীন খণ্ডিত ভারতের বিরুদ্ধে অখণ্ড ভারত আন্দোলনের পক্ষে থাকায় বঙ্গদেশের শীর্ষ আলেমদের একটি অংশ উলামায়ে হিন্দের সদস্য হয়ে অখণ্ড ভারত আন্দোলনে সক্রিয় হন। হযরত থানবি রহ. এর বক্তব্য ছিল, মুসলমানদের স্বাধীন একটা ভূখণ্ডের

অনেক প্রয়োজন। যেখানে ইসলামি শাসনব্যবস্থা তথা কুরআনি হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা যায়। পক্ষান্তরে হযরত মাদানি রহ. এর বক্তব্য ছিল, মুসলমানদের আলাদা ভূখণ্ড এবং সেখানে ইসলামি হুকুমতের বাস্তবায়ন একজন মুসলিম হিসেবে কে না চায়? তবে কথা হচ্ছে, যে মেজরিটির ভিত্তিতে তা প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, সেই মেজরিটি মুসলমানদের সাথে সেখানে মাইনরিটি হিন্দুরাও তো থেকে যাবে, তাদেরকে ছেঁকে এনে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের হিন্দুস্তানে তো পাঠিয়ে দেয়া যাবে না। ঠিক তদ্রুপ হিন্দুদের হিন্দুস্তানেও তো সংখ্যালঘু মুসলমানদের একই অবস্থা হবে। তাদেরকেও ছেঁকে নিয়ে পাকিস্তানে পাঠানো সম্ভব নয়। তাহলে এই দুই দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থা কী দাঁড়াবে? যদি সংখ্যালঘুদের ছেঁকে এনে যার যার কাঙ্খিত দেশে পাঠানো যেতো, তবে না হয় বিষয়টি বিবেচনায় আনা যেতে পারতো, কিন্তু এটা তো কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। তাহলে একটি অবাস্তব ও অসম্ভব বিষয়কে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা কীভাবে করা যায়? যা কোনো বিবেকবান মানুষ করতে পারে না। তিনি আরো মনে করতেন, মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর মাধ্যমে ইসলামের বাস্তবায়ন কোনো দিন সম্ভব নয়। ইংরেজ দেশে ইংরেজদের ভাবধারায় গঠিত মন-মস্তিষ্কের অধিকারী জিন্নাহ সাহেব কোনো দিন ইসলাম বাস্তবায়ন করতে পারবে না।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই আলেমদের একটি বিরাট অংশ পাকিস্তানের জন্মলগ্নে কৃত ওয়াদা পূরণের দাবীতে নেযামে ইসলাম পার্টি এবং জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম নামে দু'টি দল গঠনের মাধ্যমে রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। তৎকালীন পূর্ব নেযামে ইসলামের কর্ণধার হযরত মাওলানা আতহার আলী রহ. আজীবন সংগ্রাম করে গেছের। তার সাথে খতিবে আযম হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ রহ.ও কাঁধে কাঁধ মেলান। খতিবে আযম রহ. একবার অখণ্ড পাকিস্তানের সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে এম,এল,এ পদেও বরিত হন। তাঁর সাথে নেযামে ইসলামের অনেক সদস্যই তখন সংসদ সদস্য হয়েছিলেন। অন্যদিকে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের পূর্ব পাকিস্তান অংশের আলেমরাও সবসময় রাজনীতিতে সক্রিয় থাকেন। তাঁদের অধিকাংশ আলেম ছিলেন সিলেটের বড় বড় পীর মাশায়েখ ও বুযুর্গ আলেমরা। যেমন হযরত মাদানির অন্যতম খলীফা হযরত শায়খে বাগা, হযরত মাওলানা মোশাহেদ আলী রহ, ও কৌড়িয়ার শেখ সাহেব হযরত মাওলানা আব্দুল করিম, বরুনার পীর সাহেব হযরত মাওলানা লুৎফর রহমান সাহেব প্রমুখ বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গ।

পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তের সভাপতি ছিলেন ঐতিহাসিক ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা হাজি শরিয়তুল্লাহর উত্তরপুরুষ হযরত মাওলানা পীর মুহসিনুদ্দিন দুদু মিয়া এবং জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন ঢাকা আরজাবাদ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা শামসুদ্দিন কাসেমী রহ.। যশোরের প্রখ্যাত বুযুর্গ হযরত মাওলানা আবুল হাসান যশোরী রহ.ও জমিয়তের সাথে আজীবন সম্পৃক্ত ছিলেন। ময়মনসিংহের হযরত মাওলানা ফয়জুর রহমান ও নেত্রকোণার হযরত মাওলানা মঞ্জুর আহমদ সাহেব ছিলেন নেযামে ইসলাম পার্টির অন্যতম বড় নেতা। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী সাহেব নেযামে ইসলামের তাত্ত্বিক ও বড় নেতা ছিলেন। কক্সবাজারের মৌলভী ফরিদ আহমদ চৌধুরী নেযামে ইসলামের বড় নেতা হওয়ার সাথে সাথে পাকিস্তান সংসদের একজন অভিজ্ঞ পার্লমেন্টেরিয়ানও ছিলেন। ফেনী শর্শদী মাদরাসার বুযুর্গ আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা নজীর আহমদ শহীদ রহ. আজীবন নেযামে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। লালবাগ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. (সদর সাহেব হুজুর) নেযামে ইসলামের অন্যতম তাত্ত্বিক ও পরামর্শদাতা বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব। এখানে অনেক আলেমের নামই বাদ পড়ে যাচ্ছে হয়তো। কেননা, হাজার হাজার আলেমের মধ্যে ক'জনের জীবন সম্পর্কেই বা আমার জানা আছে।

এই রাজনীতিতে একটা মজার ব্যাপার পরিলক্ষিত হয় যে, যারা বৃটিশ ভারতে মুসলিমলীগ বা পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেছিলেন তাঁদের সংখ্যাগুরু আলেমকে দেখা যায়, পাকিস্তান হওয়ার পর তাঁরা নেযামে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত থেকে রাজনীতি করেছেন। অপরদিকে যারা বৃটিশ ভারতে অখণ্ড ভারতের পক্ষে রাজনীতি করেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশ আলেমকে দেখা যায় জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের পরিবর্তে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত থেকে কাজ করতে।

পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাক্কালের ওয়াদা কুরআনি হুকুমত বাস্তবায়ন করা যখন চরম মোনাফেকিতে পর্যবসিত হলো এবং স্বৈরশাসক ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খাঁর উপদেষ্টা ড. ফজলুর রহমানের 'ইসলাম' নামীয় অনৈসলামি একটি গ্রন্থে ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক কিছু প্রকাশ পেলো, তখন আবার বাংলার আলেম সমাজ সোচ্চার হয়ে গর্জে উঠলেন। আমার খুব মনে পড়ছে, নেযামে

ইসলামের অন্যতম নেতা খতিবে আযম হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ রহ. ও মৌলভী ফরিদ আহমদ চৌধুরীসহ বড়ো বড়ো নেতাদের আহ্বানে রাজপথ, মাঠ-ঘাট কাঁপানো সভা-সমিতি তখন বাংলাকে আবার কাঁপিয়ে তুলেছিলো। জেনারেল আইয়ুব খাঁর মসনদ যখন তাঁদের সংগ্রামের তোড়ে নড়বড়ে হয়ে ওঠে, তখন ওই আন্দোলনে নতুন মাত্রা হিসেবে যোগ হয় আওয়ামীলীগের ৬ দফা আন্দোলন ও ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলন। এতে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন আরো বেগবান হয়ে গণবিস্ফোরণের রূপ নেয়। এবং আইয়ুব খান পদত্যাগে বাধ্য হয়ে জেনারেল ইয়াহইয়া খানকে প্রেসিডেন্ট বানিয়ে সাময়িকভাবে জনরোষ থেকে নিস্তার পান। কিন্তু দুঃখের বিষয় আলেমদের সৃষ্ট এই আন্দোলনের ঘোড়ায় কোনো যোগ্য ঘোড়সওয়ার না থাকায় শেখ মুজিব ওই ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বসে এবং ইসলামি বিস্ফোরণের পরিবর্তে একটি সাধারণ গণবিস্ফোরণের জন্ম দেন। ফলে তিনি তার দেশ পূর্ব পাকিস্তানে শুধু দুইটি আসন ব্যতীত বাকী সব আসনেই জয়ী হয়ে যান। কিন্তু তারপরও পশ্চিমারা তার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে টাল-বাহানা শুরু করায় আবারো আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্র গতিতে এগিয়ে যায়। এক পর্যায়ে ঢাকায় প্রহসনমূলক গোলবৈঠক ডাকা হয় বটে; কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া তখন গোপনে পশ্চিম থেকে পূর্বে সেনা সমাবেশ বাড়াতে থাকে এবং সেই ঐতিহাসিক ২৫শে মার্চের কালো রাতে ঢাকা আক্রমণ করে বসে। ফলে স্বায়ত্বশাসন চাওয়া পূর্ব পাকিস্তানের ঘাড়ে অতর্কিতভাবে একটি যুদ্ধ চেপে বসে। আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে এই যুদ্ধের আগাম প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা না থাকায় এবং যুদ্ধের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ পরিষ্কার ছিলো না বিধায় যুদ্ধের ব্যাপারে এখানকার আলেম সমাজ কিছুটা দ্বিধা-সংকোচে পড়ে যান। ফলে অনেক আলেম অখণ্ড পাকিস্তানের আশায় জামাত-মুসলিমলীগের সাথে হাত মেলান। কিন্তু অধিকাংশ আলেম খামোশ ও নীরব ভূমিকা পালন করেন।

গোলটেবিল বৈঠক শেষে নিখিল পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সেক্রেটারী জেনারেল হযরত মাওলানা মুফতি মাহমুদ সাহেব পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তের সভাপতি পীর মুহসিনুদ্দিন দুদুমিয়ার সিদ্ধেশ্বরীর বাসভবনে এখানকার জমিয়ত নেতা ও কর্মীদের কিন্তু ২৫শে মার্চের পূর্বেই বৈঠক সফল না হওয়ার বিষয় সম্পর্কে জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, আপনারা আপনাদের দেশীয় স্বার্থের সাথে মিলেমিশে কাজ করবেন। ফলে যুদ্ধের সময়

এখানকার অধিকাংশ জমিয়ত নেতা স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বপক্ষে কাজ করেন। জমিয়তের অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা জনাব মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ সাহেব তাঁদের অন্যতম ছিলেন। অন্যদিকে জমিয়তের সভাপতি পীর দুদুমিয়া সাহেব ও সহসভাপতি জনাব মাওলানা মুহিউদ্দিন খান সাহেবরা হতাহতের সংখ্যা কম রাখার স্বার্থে এবং লুটতরাজ ও নৈরাজ্য বন্ধ রাখার স্বার্থে যুদ্ধের এক পর্যায়ে ঢাকার শান্তি কমিটিতে যোগ দেন এবং রাও ফরমান আলী খান ও জেনারেল টিক্কা খানের সাথে সরাসরি সাক্ষাতের মাধ্যমে দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক চিত্র তুলে ধরেন।

এই যুদ্ধ যে ইসলাম বনাম অনৈসলামের যুদ্ধ ছিলো না; বরং দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য ও জুলুমের বিরুদ্ধে ছিলো, একথাটা পরিস্কার না হওয়ায় জামায়াতে ইসলামের সাথে হাত মেলানো নেযামে ইসলামের অনেক বড়ো বড়ো আলেমকে মুক্তিযোদ্ধারা শহিদ করে দিয়েছিলো। যেমন শর্শদীর হযরত মাওলানা নজীর আহমদ সাহেবকে তারা উজুর সময় গুলি করে হত্যা করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের চার স্তম্ভের একটি স্তম্ভ ধর্মনিরপেক্ষতা থাকায় এবং আওয়ামী সরকারের পক্ষ থেকে যে কোনো ইসলামি রাজনীতি বন্ধ করে দেয়ার ঘোষণায় এবং অধিকাংশ বন্ধ থাকা মাদরাসা সম্পর্কে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো রকম বক্তব্য না থাকায়, আলেমদের বিরাট একটা অংশ আওয়ামীলীগের বিপক্ষে অবস্থান নেন। ইতোমধ্যে সরকারের লাল বাহিনী, সবুজ বাহিনী ও রক্ষী বাহিনীর জুলুম নির্যাতনের ফলে দেশ স্বাধীন হয়েও একটা অরাজক দেশে পরিণত হয়।

শেষ পর্যন্ত মেজর ডালিম, কর্ণেল ফারুক ও রশিদের মাধ্যমে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সেই নির্মম রক্তক্ষয়ী পটপরিবর্তনের বেশ কিছুদিন পর জিয়াউর রহমান সাহেব যখন দেশের প্রেসিডেন্ট হয়ে আসেন এবং প্রথমে ফোরাম ও জাগদল এবং আরো পরে বিএনপি গঠন করেন এবং ইসলামি রাজনীতিকে ছাড় দিয়ে দেন, তখন আবার আলেম সমাজের সেই অংশটিকে মুসলিমলীগ আর বিএনপি একই ঘরানার হওয়াতে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর দিকে একটু বেশী ঝুঁকে পড়তে দেখা যায়। খতিবে আযম রহ. তো সরাসরি জামায়াতের বিকল্প আইডিএল এর সভাপতি পর্যন্ত হন। কিন্তু জামায়াত যখন তার সাথে চরম বেআদবি ও মোনাফেকি করে বসে, তখন হযরতের টনক নড়ে। কিন্তু

ততক্ষণে তারা হযরতের ঘাড়ে বসে তাদের সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া পথকে অনেকটা প্রশস্ত করে নিতে সক্ষম হয়ে যায়। অন্যদিকে আওয়ামীলীগ তাদের রাজনৈতিক দর্শনের কারণেই আলেম সমাজকে তাদের প্রতি কখনো আকৃষ্ট করতে পেরেছে বলে দেখা যায় না।

১৯৮১ এর পর মে মাসের ৩০ তারিখে প্রেসিডেন্ট জিয়া আততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার পর ৮১ এর শেষের দিকে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হক্কানি আলেমদের পক্ষ থেকে বাংলার বয়োবৃদ্ধ মহান বুযুর্গ আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর রহ. এর অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে হক্কানি আলেম সমাজের মাঝে আবার এক নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। শুধু আলেম সমাজই নয় সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ইসলামী রাজনীতির এই তৃতীয় ধাপে এক গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। নির্বাচনে হাফেজ্জী হুজুর তৃতীয় স্থান অধিকার করলেও সরকারের দেখানো মাত্র তিন লাখ আশি হাজার ভোট পেয়ে তিনি থার্ড হননি, তিনি নাকি তখন প্রায় পনের লক্ষ ভোট পেয়ে তৃতীয় হয়েছিলেন। এই তথ্যটি আমাকে পরবর্তী সময়ে হাফেজ্জী হুজুরের খেলাফত আন্দোলনের ভরা জোয়ারের সময় হুজুরের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসা রাজনীতিবিদ জনাব কাজি জাফর আহমদ সাহেব দিয়েছিলেন। (ইসলামের প্রতি মানুষের বেশী সমর্থন দেখার কারণে তৎকালীন বিএনপি সরকার নাকি তার সঠিক পরিসংখ্যান গোপন রেখে কম করে দেখিয়েছিলো) নির্বাচন ও নির্বচনোত্তর খেলাফত আন্দোলনে যেহেতু আমার সরাসরি হুজুরের সাথে থাকার সৌভাগ্য নসীব হয়েছিলো, তাই আমি হলফ করে বলতে পারি, আমরা যদি রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সততা দিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপগুলো নিতে পারতাম, তাহলে আজ মনে হয় দেশের চিত্র ভিন্ন রকম হতে পারতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় এতো বড়ো গণজোয়ারকে আমরা আলেম সমাজই নিজ নিজ স্বার্থের কারণে ধরে রাখতে পারিনি। বরং হযরত হাফেজ্জী হুজুরের জীবদ্দশায়ই খেলাফত আন্দোলন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

এ ভাঙ্গনের ফলে সৎ ও হকপন্থী অধিকাংশ আলেমরাই আবার রাজনীতির এই তৃতীয় ধাপ থেকে সরে এসে প্রথম দুই ধাপে কাজ করতে প্রয়াস পান। এ থেকে আমি যা বুঝতে পেরেছি তা হচ্ছে, রাজনীতির এই তৃতীয় ধাপে কাজ করতে হলে প্রথম দুই ধাপ পরিপূর্ণভাবে অতিক্রম করে আসতে হবে।

হাফেজ্জী হুজুরের মতো শুধু দু'একজন নেতার অতিক্রম দিয়ে গোটা জাতির মুক্তি সম্ভব নয়। কমপক্ষে জাতির কর্ণধার আলেম সমাজের একটি বিরাট অংশকে এই দুই ধাপ পূর্ণাঙ্গভাবে অতিক্রম করতে হবে। তা না হলে খেলাফতের বেলায় যা দেখেছি, সব সময় তাই দেখতে হবে।

আরো একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, উপমহাদেশে যে সমস্ত বড়ো বড়ো আলেম-মনীষী রাজনীতির এই তৃতীয় ধাপে কাজ করেছেন, তাঁদের অধিকাংশকেই শেষ জীবনে এই ধাপে আর কাজ করতে দেখা যায়নি। এমনকি অনেককে নিরাশ প্রকাশ করে প্রথম দুই ধাপে কাজ করার ব্যাপারে তাঁদের ভক্ত মুরিদদের অসিয়ত পর্যন্ত করে যেতে দেখা যায়। যেমন আযাদী আন্দোলনের পুরোধা শাইখুল হিন্দ হযরত মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ. ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে মাল্টা জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তাঁর হাজার হাজার ভক্ত-মুরিদ ও স্বাধীনতাকামী আলেম শিষ্যদেরকে যে অসিয়ত করেছিলেন তা ছিলো, তিনি এ পর্যন্ত যা যা করেছেন তা তেমন কোনো কার্যকরী ফল লাভে সক্ষম হয়নি। এখন সবাই যেন বেশি বেশি কোরআনি শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করে। তবেই স্বাধীনতা তরান্বিত হবে।

হযরত মাওলানা আতহার আলী সাহেব তো তার একমাত্র ছেলেকে এই তৃতীয় ধাপে রাজনীতির ব্যাপারে নিষেধই করে গেছেন। খতিবে আযম রহ.ও মোটামুটি তাই করেছিলেন। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে আমার মনে হয়েছে, রাজনীতির এই ধাপে কাজ করার উপযুক্ততা ও যোগ্যতা অর্জন ব্যতীত এই অংশগ্রহণ করাই উচিৎ নয়।

বিষয়টি বোধগম্য হওয়ার জন্য বেশী দূর যাওয়া লাগবে না। আমাদের বর্তমান আলেম সমাজের বর্তমান রাজনীতি পর্যবেক্ষণ করলেই তা সহজে বুঝে আসবে।

নোয়াখালীর প্রখ্যাত বুজুর্গ আলেম পীরে কামেল উজানীর হযরত কারি ইবরাহীম সাহেব রহ. ও চট্টগ্রামের পটিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা বুযুর্গ হযরত মাওলানা আজিজুল হক সাহেবের মতো শত শত বুযুর্গ মনীষীরা আধ্যাত্মিকভাবে যে জাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন তাও রাজনীতির প্রথম দুই ধাপেরই কাজ ছিলো। কাজেই এ কথা অনায়াসেই বলা যায় যে, আধুনিক বঙ্গদেশেও ইসলামী রেনেসাঁ সৃষ্টিতে এখানকার আলেম সমাজের ভূমিকা ইতিহাসে সব সময় অমর হয়ে থাকবে।

ইসলামী রাজনীতির নামে

'শেখ হাসিনার পতন ও পুনরায় ক্ষমতায় আসতে না পারার জন্য যে কোনো দলের সঙ্গে ঐক্য করতে পারি' এ কথা নাকি বলেছিলেন চরমোনাই মরহুম পীর সাহেব। শেখ হাসিনার পতনের জন্য অনেক দিন আগে থেকেই নাকি কাফনের কাপড় মাথায় বেঁধে সভা-সমিতি করে বেড়াচ্ছিলেন তিনি। অথচ শেষমেশ দেখা গেল, শেখ হাসিনার পুনঃক্ষমতায়নকে নিশ্চিত করতে নামানো এরশাদ সাহেবের সঙ্গেই জোটগঠন করলেন তিনি। একেই বলে প্রচলিত রাজনীতি। যার মধ্যে শেষ কথা বলতে কিছু নেই। এই রাজনীতি যদি পীর সাহেবকেও করতে হয়, তাহলে তার এতদিনের সাধনারই বা কি হবে? আর মুরিদান ও সাধারণ মানুষই বা কোথায় যাবে?

ইসলামে রাজনীতি আছে, প্রচলিত রাজনীতি নেই। ইসলামী রাজনীতির সংজ্ঞা কিন্তু ভিন্ন। ইসলামী রাজনীতির তিন স্তরের প্রথম স্তর হচ্ছে, তাহযিবে আখলাক, ব্যক্তিশুদ্ধি বা আত্মশুদ্ধি। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে তাদবিরে মানযিল, পারিবারিক শুদ্ধি বা সামাজিক শুদ্ধি। তৃতীয় বা শেষ স্তর হচ্ছে সিয়াসতে মুদুন, নগরশুদ্ধি বা রাষ্ট্রীয় শুদ্ধি।

পীর সাহেব এতদিন রাজনীতি করছিলেন পীর-মুরিদির মাধ্যমে। কেননা, মুরিদানের আত্মশুদ্ধি বা ব্যক্তিশুদ্ধির মাধ্যমে আস্তে আস্তে পারিবারিক বা সামাজিক শুদ্ধিতে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু প্রচলিত রাজনীতির ধাক্কায় আমও গেল ছালাও যাবে যাবে প্রায়। মহিলা নেতৃত্ব ইসলামে বৈধ নয় বলে দুই মহিলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধেই সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন পীর সাহেব প্রথম দিকটায়। আবার জামায়াতবিরোধী ভূমিকায়ও অনমনীয়তার স্বাক্ষর রেখেছিলেন তিনি। জামায়াতে ইসলামী যে কোনো ইসলামী দল নয়, এ কথা তিনিই একটু একটু বড়ো গলায় বলতে শুরু করেছিলেন। মাঝখানে ভন্ড দেওয়ানবাগীর সঙ্গে যুদ্ধ-জিহাদ করেও পত্র-পত্রিকার হেড লাইনে উঠে এসেছিলেন তিনি। এতো কিছুর মধ্যেও ইসলামী ঐক্যজোটে আছেন আবার নেই, এমন একটা ভাব সব সময় লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। আবার ক্ষমতার লড়াইয়ে যুক্ত না হয়ে ইসলামের বিশুদ্ধ খেদমতে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক ইসলমি সংগঠন তাবলিগ জামাত সম্পর্কেও তাঁর কিছু বিরূপ মন্তব্য শোনা যাচ্ছিল। এতো সব বিরোধিতার পেছনে তার উদ্দেশ্য আমার মনে হয় একটাই ছিলো,

আর তা হচ্ছে, তার খাঁটিত্ব ও বিশুদ্ধতা প্রমাণ করা। তার এই খাঁটি (?) নেতৃত্বের ভেতরে আরেকটি জিনিসও লুকিয়ে থাকতে পারে বলে আমার সন্দেহ হয়েছিলো, আর তা হচ্ছে, আত্মঅহংবোধ বা অহংকার। যা হয়তো তিনিও টের করে উঠতে পারেননি। অন্যদিকে অহংকারকে কিন্তু আল্লাহ মোটেও বরদাশত করেন না। আমার যা মনে হয়, এ কারণেই হয়তো মহিলা কেলেংকারিসহ শত কেলেংকারি ও দুর্নীতিতে জড়িত এরশাদ সাহেবের সঙ্গে জোট বাঁধতে যাওয়ায় তার তুঙ্গে ওঠা রাজনৈতিক ইমেজ ধপাস করে ভুলুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলো।

অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিলো যে, এরশাদের সঙ্গে জোটের কার্যকারিতা থাকুক আর নাই থাকুক, ভুলুণ্ঠিত ইমেজকে আর সহজে দাঁড় করানো যায়নি। অন্যদিকে এরশাদ সাহেবের ইমেজ তো অনেক আগেই হারিয়ে গিয়েছিলো। উপরন্তু জাতীয় পার্টি তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে আরো জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় চারদলীয় ঐক্যজোটে যাওয়ায় এরশাদ সাহেবের গণইমেজ বাড়তে শুরু করতে না করতেই তাতে করলেন তিনি কুঠারাঘাত। জনগণকে নেতা-নেত্রীরা যত বোকা মনে করে থাকেন, আসলে তারা তা নয়। নিজের জেল-জুলুম ও অবৈধ টাকা রক্ষাসহ যাবতীয় স্বার্থোদ্ধারের জন্য একবার হাসিনার আঁচলে আবার খালেদার আঁচলে, আবার হাসিনার সঙ্গে আঁতাতে যাওয়াকে জামায়াতের মতো এরশাদও রাজনীতি মনে করতে পারেন। কিন্তু জনগণ একে ধোঁকাবাজি বলেই মনে করে থাকে।

হাসিনার পতন ও হাসিনার পুনঃক্ষমতায়নে বাধা দিতে যুদ্ধ-জিহাদে নামা পীর সাহেব হাসিনার টোপ গেলা মন্ত্রে দীক্ষিত এরশাদের সঙ্গে জোট বেঁধে পরোক্ষভাবে হাসিনাকে পুনরায় ক্ষমতায় বসাতে সহায়ক শক্তি হিসাবেই কাজ করছেন বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করছিলো। কারণ, এই জোট কার ভোট কাটবে? চারদলীয় ঐক্যজোটের ভোটই তো কাটবে। আওয়ামীলীগের ভোট মোটেও কাটবে না। অন্যদিকে চারদলীয় শক্তিতে ভাটা দেখাতে পারলে নির্বাচনে আওয়ামী জাল-জালিয়াতি বিদেশী পর্যবেক্ষকদের কাছে সহনীয় করে তোলাই ছিলো এই জোটের মুখ্য উদ্দেশ্য। পরবর্তীতে আওয়ামীলীগের সঙ্গে গভীর সম্পর্কের কারণে পীর সাহেবের ছেলে ও শাসনতন্ত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতা আব্দুল লতীফ চৌধুরীকে দল থেকে নিষ্ক্রিয় করে রাখার কথা শোনা গিয়েছিলো। বলা যায়, ওই সম্পর্ক বুঝি আরো গভীরে ছাপ রেখে গেছে।

যেই বুর্জোয়া নাশতান্ত্রিক ভোট প্রথার কথা ইসলামের কোথাও নেই, পীর সাহেবদের মতো লোকদের তা করতে হবে কেন? ইসলাম কি ভোটের মধ্যেই বন্দি হয়ে আছে নাকি? আর ইসলামে যে তওবার দুয়ার খোলা নেই তাও নয়। তবে সারা বছর আকাম-কুকাম করে শুধু বুঝি নির্বাচন প্রাক্কালে এরশাদ সাহেবের তওবার সময় হয়েছিলো। অন্যদিকে ইসলামি আইন বাস্তবায়ন কমিটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিলো। একটি পীর সাহেবের দলের মধ্য থেকে ছিলো।

প্রচলিত, বস্তাপঁচা, ঘুণেধরা এই রাজনীতির অবয়ব যে এমন, এ কথা তো আর নতুন করে বোঝাতে হবে না। কিন্তু ইসলামের নামে যারা রাজনীতি করছেন বা করবেন, তারা কেন এমন হবেন? এই প্রশ্ন আজ জনগণের।

হাফেজ্জী হুজুরের রহ. নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রেক্ষাপট

আমি রাশিয়ায় সফর করায় মস্কোপন্থী কমরেড মুযাফফর আহমদের সঙ্গে পরিচয় ছিলো। তো কমরেড মুযাফফর আমাকে একদিন বললেন, মাওলানা! হাফেজ্জী হুজুরকে ইলেকশনে কেউ না কেউ দাঁড় করিয়েছে; এটা আপনি কতোটুকু জানেন? আমি বললাম, অসম্ভব! এটা হতেই পারে না। তখন তিনি বললেন, তাহলে আপনি রাজনীতি করতে পারবেন না। আপনার মধ্যে রাজনীতি করার মতো যোগ্যতা নেই। আমি তো থ হয়ে গেলাম; এটা বলে কী? বিষয়টি আমি মাওলানা আবু তাহের মিসবাহকে জানালাম। মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ তো সরাসরি কর্মী ছিলেন না, কিন্তু ইলেকশন অফিসে আসা-যাওয়া করতেন। আমি তাকে বললাম, মুযাফফর সাহেব এমন কথা বললেন, ঘটনা কী? মাওলানা আবু তাহের বললেন, আপনি কিছু বলবেন না, আমি রাজনীতি করতে পারি কিনা দেখি। তখন তিনি বললেন, হাফেজ্জী হুজুরকে যদি কেউ ইলেকশনে দাঁড় করিয়ে থাকে, তাহলে সে লোকটা হলো সিরাজুদ্দৌলা। তার এ কথার পর আমার নযরে সিরাজুদ্দৌলা এসেছে। তখন আমি পেছনের কয়েকদিনের ঘটনাগুলো মন্থন করতে থাকি। আগেরদিন উনিশজন না কয়জনের একটি বৈঠক ছিলো কিল্লার মোড়ে। মাওলানা মহিউদ্দিন খান, সিরাজুদ্দৌলা, মাওলানা আমিনুল ইসলাম ও মাওলানা উবাইদুল হক সাহেবসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এর আগের দিন সিরাজুদ্দৌলা তার খয়েরি রংয়ের একটি গাড়িতে করে আমাকে আর মাওলানা হামিদুল্লাহকে নিয়ে

ঘুরতে বের হয়েছে কয়েক জায়গায়। বেশ অনেক জায়গায় যেতে হয়েছে আমাদের। সিরাজুদ্দৌলার সাথে আমরা কোথায় কোথায় গেলাম এবং সিরাজুদ্দৌলা কী কী বললো; এগুলো আমি খুব ভেবেছি। মাওলানা আবু তাহের বলার আগেও আমার কাছে মনে হয়েছিলো লোকটি সিরাজুদ্দৌলাই হবে। কিন্তু মাওলানা আবু তাহের আমাকে বলতে নিষেধ করায় আমি আমার মন্তব্য প্রকাশ করিনি। এর কিছুদিন পর আমি মাওলানা হাবিবুল্লাহ মিসবাহ সাহেবকেও কমরেড মুযাফফরের কথাটি বললাম। তিনিও নির্দ্বিধায় বললেন, লোকটি তো তাহলে সিরাজুদ্দৌলাই হবে। মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ কেনো সিরাজুদ্দৌলার কথা বলেছিলেন, তা আমি তাকে আর জিজ্ঞাসা করিনি। কিন্তু মাওলানা হাবিবুল্লাহ মিসবাহ সাহেবকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেনো আপনি সিরাজুদ্দৌলার কথা বলছেন? তখন তিনি বললেন, মাওলানা মুমিনুল্লাহ সাহেব হুজুরের (হাফেজ্জী হুজুরের খলিফা ও আমার শেষ শায়খ। আমি তাঁর হাতে বাইয়াত হয়েছি) সাথে একদিন দেখা হয়েছে। তিনি বললেন, এলিফ্যান্ট রোডে থাকে যে খয়েরি রংয়ের গাড়িওয়ালা; এই লোকটা জিয়াউর রহমানের ইন্তিকালের পর থেকে সবসময় গাড়ি নিয়ে তাহাজ্জুদের সময় কিল্লার মোড়ে এসে হুজুরকে এখান থেকে লালবাগের রুমে নিয়ে যেতো এবং ফজর বা ইশরাকের পর ড্রাইভ করে আবার বাসায় পৌঁছে দিতো। মাওলানা মুমিনুল্লাহ সাহেব অধিকাংশ সময় হাফেজ্জী হুজুরের খাদেম হিসেবে থাকতেন। তিনি বলেন, এই লোকটা (খয়েরি রংয়ের গাড়িওয়ালা) সবসময় বলতো যে, 'হুজুর! জিয়াউর রহমান মারা গেছে, এখন দেশ তো শেষ। ইসলামের আর কিছু হবে না, ইসলাম তো শেষ। এরকম কিছু কথাবার্তা বলতো।' হুজুর হাফেজ্জী হুজুরের খলিফা ছিলেন, আমরা তো হাফেজ্জী হুজুরের সোহবত বেশি পাইনি। আমি ওই ইলেকশনের সময় থেকে দু'য়েক বছর যা ছিলাম। মাওলানা মুমিনুল্লাহ সাহেবরা আগে থেকেই চিনতেন হুজুরকে। হুজুরের একটা তবিয়ত ছিলো, একটা কথা যদি বারবার বলা হতো, তখন তা হুজুরের মনে 'রুসুখ' হয়ে যেতো। এই কারণেই মাওলানা হাবিবুল্লাহ মিসবাহ সাহেব বললেন যে, এই লোকটা সিরাজুদ্দৌলাই হবে।

বিষয়টি যদিও আমাদের তিনজনের ধারণা মাত্র, তবে কমরেড মুযাফফরের কথা অনুযায়ী হাফেজ্জী হুজুরের রাজনীতিতে আসার ক্ষেত্রে পেছন থেকে কারো কলকাঠি নাড়ানো বা সিরাজুদ্দৌলা কেন্দ্রিক সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কয়েকটি

কারণ ছিলো। প্রথমত: সিরাজুদ্দৌলা ফেনী কলেজে পড়াকালীন ছাত্রলীগের সাথে জড়িত ছিলো এবং আওয়ামীলীগের উত্থানের সময় মন্ত্রীর বদান্যতায় সুতার লাইসেন্স ভাগিয়ে নারায়নগঞ্জ গিয়ে কিছু কাজ করতো; সেই দীর্ঘ ইতিহাসের দিকে যাচ্ছি না। দ্বিতীয়ত: আমি ছিলাম প্রেস সেক্রেটারী। অথচ কে একজন আমাদের অজান্তে হুজুরের বিভিন্ন প্রোগ্রামের এ্যাড দিয়ে দিতো। তাও শুধু ইত্তেফাক পত্রিকায় দিতো। আমাকে সবাই জিজ্ঞাসা করতে লাগলো যে, তুমি হলে প্রেস সেক্রেটারী; তাহলে এটা কে করে? মূলত এটি সিরাজুদ্দৌলাই করতো। আমি একদিন কিল্লার মোড়ে অফিসে তা প্রকাশ করে দিলাম এবং তাকে বললাম আপনি আমাদেরকে জিজ্ঞাসা না করে এ্যাড দেন কেনো? আর এক পত্রিকায় দেওয়ায় অন্যরা তো আমাদের শত্রু হয়ে যাবে। তখন সে আমাকে একটা শক্ত কথা বলেছিলো। যার কারণে মাওলানা ইসমাইল (বর্তমান আলহাইআতুল উলয়ার পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক) ও মাওলানা আতাউল্লাহ হাফেজ্জীসহ আরো কে কে যেনো ছিলো; সকলেই বয়কট করেছিলো এবং বলেছিলো, উবাইদিকে বলার অর্থ আমাদেরকেও বলা। তখন সে তার কথার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে বাধ্য হলো। তৃতীয়ত: ইত্তিফাকের চীফ রিপোর্টার নাজিমুদ্দিন মোস্তানও আমাকে একটি ইশারা দিয়েছিলো। বিষয়টি হচ্ছে, ১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান হঠাৎ করে আততায়ীর গুলিতে নিহত হওয়ায় পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন দেয়া হলে বিএনপি থেকে ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তার, আওয়ামীলীগ থেকে ড. কামাল হোসেন এবং জাসদ থেকে মেজর এম. এ. জলিল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এতো জাঁদরেল কেন্ডিডেটের মধ্যে ইসলামি আদর্শের পক্ষ থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে হযরত হাফেজ্জী হুজুর রাহিমাহুল্লাহও উক্ত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাঁদের নির্বাচনী সফরে প্রচার মাধ্যমগুলো থেকে জাঁদরেল জাঁদরেল সাংবাদিক নিযুক্ত করা হয়। তবে সবচেয়ে দুর্বল প্রার্থী হযরত হাফেজ্জী হুজুরের সাথে ইত্তেফাক থেকে যাকে নিযুক্ত করা হয়, আমার দৃষ্টিতে তিনি সবচেয়ে বেশী দক্ষ ও প্রবীন ছিলেন। আর তিনি ছিলেন ইত্তেফাকের তৎকালীন চীফ রিপোর্টার জনাব নাজিমুদ্দিন মোস্তান। হাফেজ্জী হুজুরের প্রেস সেক্রেটারী হিসেবে এই অধমও যেহেতু সফরসঙ্গী ছিলাম, তাই একদিন নাজিমুদ্দিন মোস্তানকে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করলাম। প্রশ্নটি ছিলো, এতো জাঁদরেল কেন্ডিডেট থাকতে আপনার মতো একজন ঝানু সাংবাদিক তাদের

কারো সাথে না দিয়ে হাফেজ্জী হুজুরের মতো একজন দুর্বল প্রার্থীর সাথে কেনো ফিট করে দেয়া হলো? মোস্তান সাহেব হেসে বললেন, হাফেজ্জী হুজুরের যে গণজোয়ার পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাতে আমাদের আশংকা হচ্ছে যে, ড. কামাল এবং আব্দুস সাত্তার সাহেবের মধ্যে ভোট কাড়াকাড়ি ও ভাগাভাগি হতে গিয়ে মাঝখানে হাফেজ্জী হুজুর পাশ করে না ফেলে। তাঁর পাশ করার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই সম্ভাবনার বাস্তবতা কতটুকু; মাঠে ময়দানে গিয়ে তা যাচাই করার জন্যই আমাকে হুজুরের সাথে দেয়া হয়েছে।

ইত্তেফাকে তখন আমাদের নিউজ থাকতো প্রথম পাতায় অনেক নিচে, তাও আবার এক কলামে। পক্ষান্তরে আব্দুস সাত্তার সাহেবের নিউজ থাকতো প্রথম পাতায় সবার উপরে প্রথম হেড লাইন ও কয়েক কলাম জুড়ে। অন্যদিকে কামাল হোসেনের নিউজ থাকতো প্রথম পাতায় দ্বিতীয় হেড লাইনে একটু নিচে দুই কলাম জুড়ে। হঠাৎ একদিন দেখি ড. কামালের নিউজ আর আব্দুস সাত্তার সাহেবের নিউজ প্রথম পাতায় প্রথম হেড লাইনে পাশাপাশি সমান কলামে ছাপা হয়েছে, অন্যদিকে হাফেজ্জী হুজুরের নিউজও অতো নিচে আর নেই। অনেকটা উপরে উঠে এসেছে এবং দুই কলামে। ইত্তেফাকের এসব কাণ্ড দেখে আমি মোস্তান সাহেবকে প্রশ্ন করে বসলাম। জিজ্ঞাসা করলাম যে, আমাদেরকে গাজীপুরের সভা থেকে দুই কলাম উপরে তুলে আনা হলো কেনো এবং ড. কামাল হোসেনকেও আব্দুস সাত্তার সাহেবের সাথে সমানে সমানে কয়েক কলাম জুড়ে দেয়ারই বা কারণ কী? মোস্তান সাহেব তখন বললেন, বহুদূর থেকে সাগরে দুটি জাহাজ আসতে দেখা যাচ্ছিলো। দূরবীন দিয়ে আমরা তা ঠাহর করতে পারছিলাম না যে জাহাজ দুটি কাদের? তবে ধারণা হচ্ছিলো, ড. কামালের জাহাজ মস্কো থেকে আসছিলো, আর আপনাদের জাহাজখানি মদিনা থেকে। কিন্তু জাহাজ দুটি কাছে আসতে আসতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিলো যে, ড. কামালের জাহাজ আমেরিকান পতাকা উড়াচ্ছে, অন্যদিকে আপনাদের জাহাজও সম্পূর্ণ মদিনার নয় বলে মনে হচ্ছে। তাই আমরা দুই আমেরিকান জাহাজকে সমান কলামে সমান মাপে প্রথম পাতায় হেডলাইন করে নিউজ করা আরম্ভ করলাম। আর আপনাদেরকে খাঁটি মদিনার না হওয়ায় একটু উপরে দুই কলামে নিয়ে আসলাম। মক্কা-মদিনার জাহাজ মনে করে ভয়ের কারণেই আগে কভারেজের ব্যাপারে একটু অবহেলা করা হচ্ছিলো।

কিন্তু যখন সন্দেহ দূর হয়ে গেলো এবং পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে ভয়ের কোনো কারণ নেই, তখন কভারেজের দিকটা বাড়িয়ে দেয়া হলো।

নারী নেতৃত্ব ও আলেম সমাজ

কয়েক বছর আগের কথা। আমার সমবয়সী আমার এক খালাতো ভাই জামায়াতে ইসলামীর নেতা মাওলানা শাকের আমার রুমে এসেছিলেন। বিভিন্ন কথার মাঝে নারী নেতৃত্বের সাথে আলেমদের অংশগ্রহণ সম্পর্কেও কথা হচ্ছিলো। এক পর্যায়ে হক্কানী আলেম সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী ইসলামি ঐক্যজোটের নেতা শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা আজিজুল হক সাহেব ও জনাব মুফতি ফজলুল হক আমিনি সাহেব সম্পর্কেও কথা উঠলো। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সাথে তাদের বৈঠকের ধরন সম্পর্কে বলতে গিয়ে ব্যঙ্গাত্মক হাসি দিয়ে তিনি বললেন, জামায়াতকে তো আপনারা আমলেই আনেন না, তাই আমাদের কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু একজন মহিলা নেত্রীকে মাঝখানে রেখে এতো বড়ো বড়ো আলেমদের বৈঠক কেমন দেখায়? টিভি পর্দায় তাদের অবাধে কথা-বার্তা ও হাসি-খুশী ভাব দেখে মনে হয় যেনো তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর সাথে বসতে পেরে ধন্য হয়েছেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এভাবে ছবি এসেছে নাকি? তিনি বললেন তাইতো। আমার তখন লজ্জায় আর কিছু বলার থাকলো না। শুধু বললাম, সমাজে বা রাষ্ট্রে ইসলাম বাস্তবায়নের ব্যাপারে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক দেখানো পথ ও মত ব্যতীত অন্য কোনো পন্থায় তা বাস্তবায়ন কখনো সম্ভব নয়। ইসলাম যে পথকে অনুমোদন করে না সে পথ ইসলাম বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করা হলে তা আর যাই হোক, ইসলাম কখনো হবে না। শাকের সাহেব জানেন যে, একসময় আমি তাঁদের (শাইখুল হাদিস সাহেব ও আমিনি সাহেব) সাথে একযোগে রাজনীতি করেছি। তাই তিনি কথাগুলো বলে আমাকেই ঘা-টা দিলেন।

শায়খুল হাদিস সাহেব ও আমিনি সাহেবরা আমার চাইতেও অনেক বেশী এবং খুব ভালো করেই জানেন যে, আমাদের পূর্বসূরী আকাবের বুযুর্গরা নারী নের্তৃত্ব তো দূরে থাক, ক্ষমতাশীল পুরুষ নেতাদের ধারে কাছেও যেতেন না। কদাচিৎ কেউ যদি তাঁদের দরবারে এসে পড়তেন, তখন প্রয়োজনীয় উপদেশ বা পরামর্শ দিয়ে তাকে বিদায় করে দিতেন।

মির্জা জানে জানান রহ. দিল্লির একজন বড়ো বযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। বাদশাহ আলমগির রহ. -এর খালাতো ভাই ছিলেন তিনি। তাঁর নামটিও রেখেছেন স্বয়ং বাদশাহ আলমগির। কিতাবে লেখা আছে যে, এক নওয়াব এসে তাঁকে বাইশ হাজার টাকা হাদিয়া দিতে চাইলেন। মির্জা সাহেব তা গ্রহণ করলেন না। নওয়াব সাহেব বললেন, হুজুরের প্রয়োজন না থাকলে দান করে দিলেই তো হয়। হুজুর বললেন, দান দক্ষিণার আদব বা ফর্মালিটিজি আমার জানা নেই; বরং আপনি নিজেই বাড়ি যেতে যেতে পথিমধ্যে দান করতে থাকলে বাড়ি পর্যন্ত তা আর থাকবে না। দেখুন! তৎকালীন সময়ের বাইশ হাজার টাকা কম কথা নয়। এখনকার টাকার মূল্য মানে প্রায় বাইশ কোটি টাকা হবে হয়তো। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না। আরেকবার বাদশাহ বললেন, হুজুর! আমার এতো বড়ো সাম্রাজ্য থেকে আপনি কিছু গ্রহণ করুন না! উত্তরে হুজুর বললেন, আল্লাহ তো পুরা দুনিয়াটাকেই 'মাতাউন কালিল' সামান্য সম্পদ বলেছেন। তার মধ্যে আপনার সাম্রাজ্যই বা আর কতোটুকুন? তার উপর আবার আমি ভাগ বসাবো কী? এতোদূরের পূর্বসূরীর কথা না হয় বাদই দিলাম, স্বয়ং শায়খুল হাদিস সাহেব ও আমিনি সাহেবের অতিপ্রিয় উস্তাদ, লালবাগ মাদরাসাসহ অনেকগুলো মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরি (সদর সাহবে হুজুর) রহ. -এর কথা বলা যাক না। সদর সাহেব হুজুর জিনজিরায় জায়গির থাকতেন। প্রতিদিন নদী পার হয়ে সেখান থেকে এসে লালবাগ মাদরাসায় পড়াতেন। জিনজিরায় এক ধনাঢ্য ব্যক্তি হুজুরকে একটি দালান বানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। হুজুর তাকে অনুমতি দেননি। আরেকজন ভক্ত বাইশ হাজার টাকা হাদিয়া দিতে চেয়েছিলেন, হুজুর তাও গ্রহণ করেননি। পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসক ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান হুজুরের নামে দশ লক্ষ টাকার একটি চেক পাঠিয়েছিলেন, হুজুর তাও ফেরত পাঠিয়ে দেন এবং বলেন, প্রেসিডেন্ট কি আমাকে ঘুষ দিতে চায় নাকি?

এই সকল ঘটনা আমার চাইতে শায়খুল হাদিস সাহেব ও আমিনি সাহেবের অনেক বেশি জানা ছিলো। তারপরও ইসলামি রাজনীতির খাতিরে যদি তাঁদেরকে সরকার প্রধানের সাথে দেখা-সাক্ষাত করতেই হয়, তাহলে পুরুষ নেতাদের সাথে সাক্ষাত করলেই হয়। আমার মতে তাঁদের প্রথম কর্তব্য ছিলো নারী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সোচ্ছার ভূমিকা রাখা ও আন্দোলন গড়ে তোলা। চাই তিনি খালেদা জিয়া হোক বা শেখ হাসিনাই হোক। কেননা নারী নেতৃত্ব

ইসলামের কোথাও জায়েয নেই। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সময় ফাতেমা জিন্নার পক্ষে যে কিছু আলেম কাজ করেছিলেন, তাতেও বড়ো বড়ো মুফতি সাহেবরা একমত ছিলেন না। পূর্ব পাকিস্তানের গ্রান্ড মুফতি হযরত মুফতি ফয়জুল্লাহ সাহেব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মুফতি মাহমুদসহ অনেকেই তার বিরোধিতা করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে আমিনি সাহেবদের দেখা-সাক্ষাত নিয়ে কথা বলতে গিয়ে দেশের বহুল প্রচারিত একটি দৈনিকের একজন বিভাগীয় সম্পাদক আমাকে বলেছিলেন, যদি এমনটি হতো যে, তাঁদের বৈঠকের মাঝখানে একটি পর্দা হতো; পর্দার একপাশে প্রধানমন্ত্রী আরেকপাশে আলেম সমাজ থাকতেন, তাহলেও তো জনগণের মনে তাঁদের প্রতি এবং ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ হাজার গুণ বেড়ে যেতো। আমি বিষয়টি নিয়ে তখন স্বয়ং মুফতি আমিনি সাহেবের সাথে একান্তে কথা তুলেছিলাম যে, আপনাদের নারী নেতৃত্বের সাথে এভাবে খোলামেলা সাক্ষাত করায় ইসলাম ও আপনাদের ভাবমূর্তির কী অবস্থা হচ্ছে? তিনি উত্তরে বলছিলেন, বিএনপি বা আওয়ামীলীগে ওই এক শীর্ষ নেত্রী ছাড়া আর কেউ কিছু করার ক্ষমতা রাখে না। তাই আমাদেরকে কিছু করতে হলে বা বলতে হলে বাধ্য হয়ে সরাসরি তাদেরকেই বলতে হয়। আমি বলেছিলাম, ঠিক আছে তাই করুন, তবে পর্দার মাঝে থেকে করুন বা বলুন। ইসলাম ও জনগণের এটাই চাহিদা। তাতে ইসলমের যেমন মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকবে, আপনাদেরও মর্যাদা বাড়বে শতগুণে। জনগণের মাঝে ইসলাম বাস্তবায়নের রাজনীতি করতে গিয়ে নিজেদের ইসলামের ব্যাপারটা বেমালুম ভুলে গেলে তো আর চলবে না; যা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে মানুষের উপর আরোপ করা হয়েছে। তা ব্যক্তি পর্যায়ে যেমন আছে, পারিবারিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও ঠিক তেমনি আছে। ব্যক্তি ও পরিবারকে বাদ দিয়ে শুধু রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম বাস্তবায়নের কোনো পদ্ধতি ইসলামে অন্তত নেই। বরং ইসলামে প্রথম স্তরই হচ্ছে ব্যক্তি দিয়ে আরম্ভ। আর শেষ স্তর হচ্ছে রাষ্ট্রীয়ভাবে তা বাস্তবায়ন করা। আর কোনো বস্তুর প্রথম না থাকলে তার শেষ কোথা থেকে আসবে? (সমাপ্ত)

ثَبَت المصادر والمراجع

١- القرآن الكريم

٢- آپ کے مسائل اور ان کا حل-یوسف لدھیانوی-زکریا بکڈپو، دیوبند

٣- احسن الفتاوی-رشید احمد لدھیانوی-زکریا بکڈپو، دیوبند

٤- أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص، دار إحياء التراث العربي، بيروت

٥- ادیان کی جنگ-عاصم عمر-ادارۂ حطین

٦- الإسناد من الدين وصفحة مُشرِقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين لعبد الفتاح أبي غدة، المكتبة الغفورية العاصمية، كراتشي، باكستان

٧- اشرف الجواب-افادات حکیم الامت-مکتبۂ عمر فاروق، شاہ فیصل کالونی، کراچی

٨- الأشباه والنظائر لابن نجيم، دار الفكر، بيروت

٩- أصول الإفتاء لتقي العثماني، مكتبة الحجاز، بنغلا بازار، داكا

١٠- أضواء البيان لمحمد الأمين الشنقيطي، دار عالم الفوائد

١١- الإعلام بقواطع الإسلام لابن حجر الهيتمي (الجامع في ألفاظ الكفر)، دار إيلاف الدولية، الكويت

١٢- إعلام الموقعين لابن القيم، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية

١٣- إكفار الملحدين لأنور شاه الكشميري، دار الکتب العلمیہ، اکوڑہ خٹک، پشاور

١٤- الأم للإمام الشافعي، دار الوفاء، المنصورة

١٥- الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة المقدسي، مطبعة النهضة الحديثة، مكة المكرمة

١٦- البحر الرائق لابن نجيم، دار الكتب العلمية، بيروت

١٧- بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني، دار الكتب العلمية، بيروت

١٨- البداية والنهاية لابن كثير، دار الحديث، القاهرة

١٩- تاريخ الإسلام للذهبي، المكتبة التوفيقة

٢٠- تاريخ دمشق لابن عساكر، دار الفكر، بيروت

٢١- تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك)، دار المعارف، مصر

٢٢- تأنيب الخطيب للكوثري، طبع محمد أمين

٢٣- تبيين الحقائق لفخر الدين الزيلعي، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية

٢٤- تذکرۂ مشائخ دیوبند، عزیز الرحمن بجنوری

٢٥- تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن العظيم)، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة

٢٦- تفسير ابن جزي الكلبي (التسهيل لعلوم التنزيل)، دار الكتب العلمية، بيروت

٢٧- تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)، دار الكتب العلمية، بيروت

٢٨- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)، دار ابن الجوزي، القاهرة

٢٩- تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، دار الكتب العلمية، بيروت

٣٠- تفسير البغوي (معالم التنزيل)، دار طيبة، الرياض

٣١- تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)، دار إحياء التراث العربي، بيروت

٣٢- تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل القرآن)، مكتبه ابن تيمية، القاهرة

٣٣- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)، دار عالم الكتب، الرياض

٣٤- التفسير الكبير للرازي، دار الفكر، بيروت

٣٥- تفسير المظهري للقاضي ثناء الله المظهري، زکریا بکڈپو، دیوبند

٣٦- تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، دار الكلم الطيب، بيروت

٣٧- تكملة فتح الملهم لتقي العثماني، دار القلم، دمشق

٣٨- تهذيب الكمال للمزي، مؤسسة الرسالة

٣٩- جامع الترمذي، مؤسسة الرسالة ناشرون

٤٠- جامع الفصولين لابن قاضي سماونة، اسلامی کتب خانہ، علامہ بنوری ٹاؤن، کراچی (الشبكة)

۴۱- جواہر الفتاوی - عبد السلام چاٹگامی - المکتبۃ الاتحادیۃ، امین بازار، سری نغر، منشی گنج

۴۲- جواہر الفقہ - مفتی محمد شفیع - مکتبہ سیرت النبی، جامع مسجد، دیوبند

٤٣- حجة الله البالغة للشاه ولي الله الدهلوي، دار ابن كثير، دمشق

۴۴- حیات اطہر - شفیق الرحمن جلال آبادی، کتب خانہ مظہری، گلشن اقبال ۲، کراچی

۴۵- خزائن معرفت ومحبت - حکیم محمد اختر - خانقاہ امدادیہ اشرفیہ، گلشن اقبال، کراچی

۴۶- خطبات شامزی - نظام الدین شامزی - اسلامی کتب خانہ، علامہ بنوری ٹاؤن، کراچی

٤٧- خلاصة الفتاوى لطاهر بن عبد الرشيد البخاري، مکتبۂ رشیدیہ، سرکی روڈ، کوئٹہ

٤٨- رد المحتار لابن عابدين الشامي، دار الكتاب، ديوبند، الهند

٤٩- زاد المسير لابن الجوزي، المكتب الإسلامي

٥٠- سنن أبي داوُد، مؤسسة الرسالة ناشرون

٥١- سنن الدارمي، مؤسسة الرسالة ناشرون

٥٢- سير أعلام النبلاء للذهبي، مؤسسة الرسالة

٥٣- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله اللالكائي، دار الفكر، بيروت

٥٤- شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني، دار الكتب العلمية، بيروت

٥٥- شرح الحموي على الأشباه (غمز عيون البصائر)، دار الكتب العلمية، بيروت

٥٦- شرح صحيح مسلم للنووي (المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج)، مؤسسة الرسالة ناشرون

٥٧- شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، مؤسسة الرسالة

٥٨- الشفا للقاضي عياض، دار الكتب العلمية، بيروت

٥٩- الصارم المسلول لابن تيمية، زمادي للنشر- المؤتمن للتوزيع، المملكة العربية السعودية

٦٠- صحيح البخاري، مؤسسة الرسالة ناشرون

٦١- صحيح مسلم، مؤسسة الرسالة ناشرون

۶۲- عقائد الاسلام - ادریس کاندھلوی - ادارۂ اسلامیات، کراچی، لاہور

٦٣- عمدة التفسير لأحمد شاكر، دار الوفاء، المنصورة

٦٤- عمدة القاري للعيني، السحار للطباعة والنشر، القاهرة

۶۵- فتاوی حقانیہ - عبد الحق الحقانی - جامعہ دار العلوم حقانیہ، اکوڑہ خٹک، پشاور

٦٦- الفتاوى الصغرى ليوسف بن أحمد الخوارزمي الخاصي، مخطوطة جامعة الملك سعود (الشبكة)

٦٧- فتاوى قاضي خان، (الخانية)، مكتبة الاتحاد، ديوبند، الهند

٦٨- الفتاوى الكبرى لابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت

۶۹- فتاوی محمودیہ - محمود حسن گنگوہی - زکریا بکڈپو، دیوبند

٧٠- فتاوى ورسائل لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

٧١- الفتاوى الهندية لعدة من علماء الهند، زکریا بکڈپو، دیوبند

٧٢- فتح الباري لابن حجر العسقلاني، الرسالة العالمية

٧٣- فتح القدير لابن الهمام، دار الكتب العلمية، بيروت

٧٤- الفروق للقرافي، دار الكتب العلمية، بيروت

٧٥- نظری حکومت - قاری محمد طیب - دار الکتاب، دیوبند، یوپی

٧٦- الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية

٧٧- فيض الباري لأنور شاه الكشميري، دار الكتب العلمية، بيروت

٧٨- كتاب الرد على المنطقيين لابن تيمية، مؤسسة الريان، بيروت

٧٩- الكشاف للزمخشري، مكتبة العبيكان، الرياض

٨٠- كشاف القناع للبهوتي، وزارة العدل في المملكة العربية السعودية

٨١- كشف الأسرار على أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت

٨٢- المبسوط للسرخسي، دار المعرفة، بيروت

٨٣- مجلة البحوث الإسلامية، مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد (الشاملة)

٨٤- مجموع الفتاوى لابن تيمية، مجمع الملك فهد، المملكة العربية السعودية

٨٥- مدارج السالكين لابن القيم، دار إحياء التراث العربي، بيروت

٨٦- المستدرك للحاكم النيسابوري، دار الفكر، بيروت

٨٧- مسند الإمام أحمد، مؤسسة الرسالة

٨٨- المصنف لعبد الرزاق، المكتب الإسلامي، بيروت

٨٩- المصنف لابن أبي شيبة، دار القبلة، جدة - مؤسسة علوم القرآن، بيروت

٩٠- معارف القرآن - مفتی محمد شفیع - المکتبۃ المتحدۃ، ڈھاکہ، بنگلہ دیش

٩١- معالم إرشادية لمحمد عوامة، دار اليسر - دار المنهاج

٩٢- معالم السنن للخطابي، دار الكتب العلمية، بيروت

٩٣- المغني لابن قدامة، دار عالم الكتب، الرياض

٩٤- مقالات الكوثري، دار السلام، مصر، الطبعة الرابعة

٩٥- مکتوبات شیخ الاسلام حسین احمد مدنی، مکتبۂ دینیہ، دیوبند

٩٦- المنثور في القواعد لبدر الدين الزركشي، دار الكتب العلمية، بيروت

٩٧- منهاج السنة النبوية لابن تيمية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

٩٨- الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة، الرياض، الطبعة الثانية

٩٩- الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت

١٠٠- موقف العقل والعلم والعالم لمصطفى صبري، دار إحياء التراث العربي، بيروت

١٠١- نونية ابن القيم (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية)، دار عالم الفوائد

١٠٢- النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير، دار الحديث، القاهرة

١٠٣- الولاء والبراء في الإسلام لمحمد بن سعيد القحطاني، دار طيبة، الرياض

١٠٤- الهداية لبرهان الدين المرغيناني، المكتبة الإسلامية، بنغلا بازار، داكا

১০৫- হাফেজ্জী হুজুর রহ. স্মারকগ্রন্থ, হাফেজ্জী হুজুর রহ. পরিষদ

১০৬- অন্তরঙ্গ আলোকে শাইখুল হাদীস রহ., মুহাম্মদ এহসানুল হক, থানভী লাইব্রেরী

১০৭- মুফতী ফজলুল হক আমিনী রহ. জীবন ও সংগ্রাম, নবপ্রকাশন

১০৮- ঈমান সবার আগে, মাওলানা আব্দুল মালেক, রাহনুমা প্রকাশনী

১০৯- প্রচলিত জাল হাদীসের (১) ভূমিকা, মাওলানা আব্দুল মালেক, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা, প্রথম প্রকাশ

১১০- মাসিক আলকাউসার, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

১১১- দৈনিক ইনকিলাব

১১২- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত অক্টোবর, ২০১১)

১১৩- বাংলাপিডিয়া **(google)**

১১৪- জিয়াউর রহমান উইকিপিডিয়া **(google)**

১১৫- কোম্পানী আইন ১৯৯৪ **(google)**

২

দারুল ইসলাম ও দারুল হারব

মাওলানা আবু মুসআব

অ।র্প।ণ

ওয়ালিদে মুহতারাম -রাহিমাহুল্লাহ-

-আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন-

যিনি সব সময় বলতেন, আমরা হচ্ছি নবীর ওয়ারিস। বর্তমানে নবীর উপস্থিতি থাকলে তিনি যা করতেন আমাদেরকেও তাই করতে হবে। তো নবী কি বর্তমান সময়ে গণতন্ত্র বা নারী নেতৃত্বকে মেনে নিতেন?

এবং

যিনি আজ থেকে আরো কয়েক যুগ পূর্বে বসুন্ধরা মাদরাসায় অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে যখন অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম শুধু মিছিল-মিটিং করাকেই আমাদের দায়িত্ব হিসেবে যথেষ্ট হওয়ার পক্ষে মতামত পেশ করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, কোনো কুফরি ইজম-মতবাদের অধীনে এ সকল কিছু করে আমাদের কোনো লাভ হবে না। আমাদের এখন 'খুরুজ'র (প্রকাশ্য কুফরের কারণে শাসকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ) সময় হয়ে গেছে। তখন একজন আলেম দাঁড়িয়ে তাঁর মাথায় পাগড়ি পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, আপনিই একমাত্র আমার মনের কথাটা ব্যক্ত করেছেন।

قال الله تعالى: وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً. (سورة النساء، الأية: ١٠٤)

قال النبي ﷺ: إن أخْوَفَ ما أخاف عليكم الأئمة المضلون. (مسند الإمام أحمد، رقم الحديث: ٢٧٤٨٥، سنن أبي داود، رقم الحديث: ٤٢٥٢، جامع الترمذي، رقم الحديث: ٢٢٢٩)

قال علي بن أبي طالب ؓ: إن الحق لا يُعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. (الكشاف للزمخشري، ٥/٥٩٤، تفسير القرطبي، ٣٤٠/١، تفسير البحر المحيط، ١٢٣/٨)

قال عبد الله بن مسعود ؓ: الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك. (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، ١٢١/١، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، ٤٠٤/٢، تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، ٤٠٩/٤٦-٤١٠)

قال الحافظ الذهبي (في ترجمة ابن ناجية): بل لو نطق العالم بصدق وإخلاص لعارضه عدة من علماء الوقت، ولمقتوه وجهّلوه. (سير أعلام النبلاء، ١٦٦/١٤)

وقال أيضاً (في ترجمة ابن قتيبة): قلت: هذا لم يصح، وإن صح عنه فسُحقاً له، فما في الدين محاباة. (سير أعلام النبلاء، ٢٩٨/١٣)

وقال أيضاً (في ترجمة ابن سبعين): وينبغي للمرء أن يكون غضبه لربه إذا انتهكت حرماته أكثر من غضبه لفقير غير معصوم من الزلل. (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ٢٠٦/٤٩)

قال الشيخ زاهد الكوثري: ثم إن كل واحد من الأمة فيه ما يؤخذ أو يرد، فمحك الحق هو الحجاج في كل موقف، ومنزلة كل عالم إنما تتبين بقرع الحجة بالحجة، لا بذكر أسماء

رجال غير معصومين من الزلل، ولا عصمة لغير الأنبياء عند أهل الحق. (تأنيب الخطيب، ص ٣٨٦)

قال الشيخ أحمد شاكر: ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه، غير موانين ولا مقصرين.

سيقول عني عبيد هذا "الياسق العصري" وناصروه: أني جامد، وأني رجعي، وما إلى ذلك من الأقاويل. فليقولوا ما شاؤوا، فما عبأت يوماً ما بما يقال عني، ولكني قلت ما يجب أن أقول. (عمدة التفسير، ١/٦٩٧)

قال الأستاذ محمد عبد المالك: واعلم أن شرع الله أحق بالغيرة من الغيرة على آحاد الأمة، الذين لم تكتب لهم العصمة. (تقدمة الأحاديث الموضوعة الرائجة، ١/٦٥، الطبعة الأولى)

٢٨١٨- لأجاهدن عداك ما أبقيتني .... ولأجعلن قتالهم دَيداني

٢٨١٩- ولأفضحنهم على رأس الملا .... ولأفرين أديمهم بلساني

٢٨٢٠- ولأكشفن سرائر خفيتْ على ... ضعفاء خلقك منهم ببيان

٢٦٣٩- موتوا بغيظكم فربي عالم .... بسرائرٍ منكم وخُبث جنان

٢٦٤٠- فالله ناصر دينه وكتابه .... ورسوله بالعلم والسلطان

٢٦٤١- والحق ركن لا يقوم لهَده .... أحد ولو جُمعت له الثقلان

(من نونية الحافظ ابن القيم)

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ..... ويأتيك بالأخبار من لم تُزود

(طرفة بن العبد البكريّ)

সূচিপত্র

{চার}

دار الإسلام ودار الحرب

দারুল ইসলাম ও দারুল হারব

-এক-

'আহকামুল ইসলাম' ও 'আহকামুল কুফর'র ব্যাখ্যা

-দুই-

দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার জন্য ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত অতিরিক্ত শর্তদুটি সম্পর্কে কয়েকটি কথা

-তিন-

কুরআন-সুন্নাহ ও চার মাযহাবের খিলাফত পতনের পূর্ব ও পরের ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পরিচয় নির্ধারণ

চার মাযহাবের খিলাফত পতনের পূর্ব ও পরের ফুকাহায়ে কেরাম

খিলাফত পতনের (১৩৪৩ হিঃ মোতাবেক ১৯২৪ খৃঃ) পূর্বে

খিলাফত পতনের (১৩৪৩ হিঃ মোতাবেক ১৯২৪ খৃ:) পর

-চার-

বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ পুরো ভারত উপমহাদেশ দারুল হারব হওয়ার যৌক্তিকতা ও দারুল হারব হওয়া সংক্রান্ত খিলাফত পতনের পূর্ব ও পরের উলামায়ে কেরামের সুস্পষ্ট বক্তব্য

বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ পুরো ভারত উপমহাদেশ দারুল হারব হওয়া সংক্রান্ত খিলাফত পতনের পূর্ব ও পরের উলামায়ে কেরামের সুস্পষ্ট বক্তব্য

বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ পুরো ভারত উপমহাদেশ আজো দারুল হারব

-পাঁচ-

কিছু পুস্তিকা-ফাতওয়ার পর্যালোচনা

১. 'দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব'

মুহাদ্দিসে কাবির আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমি রহ.

২. আল্লামা আব্দুল হাই লখনবির রহ. ফাতওয়া

৩. মুফতি তাকি উসমানির বক্তব্য

وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً. (سورة بني إسرائيل، الآية: ٣٦)

يا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ!

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ!

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! একজন ক্লান্ত পথিকের হৃদয় বিগলিত অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠের কিছু ভাঙ্গা কথা কি শুনবে তোমরা! লৌকিকতা নয়, যে কথাগুলো উৎসারিত হৃদয়ের রক্তক্ষরণ থেকে। কপটতা নয়, যাতে রয়েছে একটি মর্মাহত হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি। বাকপটুতা নয়, যার শব্দে শব্দে রয়েছে অস্ফুট কান্নার নিরবধি সুর।

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! আমাদের কথাগুলোর আকৃতি তৈরি করো; দেখতে পাবে তাজা রক্তের একটি স্রোত-ধারা অথবা চোখের নোনাজলের প্লাবন। আমাদের শব্দাবলীর আয়নায় চোখ রাখো; দেখতে পাবে চোয়াল বেয়ে নেমে আসা অশ্রুধারায় ভিজে আছে কিছু বক্ষ। আমাদের বাক্যের বুকে কান পাতো; অনুভব করতে পারবে কিছু জর্জরিত অন্তরের অব্যক্ত ব্যথা।

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! আমাদের কথার বুক চিরে আমাদের বাস্তব মানসিকতা অনুধাবন করার একটু চেষ্টা করো, দেখো তাতে কোনো স্বার্থের গন্ধ পাও কি না। খুঁজে পাও কি না তাতে কোনো ষড়যন্ত্রের আঁশ। আমরা ইলম-আমলে ছোটো অনেক ছোটো, আমরা গোনাহগার তোমাদের ধারণার চেয়েও বড়ো গোনাহগার (আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল গোনাহ মাফ করে দিন এবং সকল গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন, আমিন)। তবুও বিশ্বাস করো,

এ অন্তরগুলো তোমাদের কল্যাণ কামনায় ভরপুর। ঝুঁকি নিয়েও এ কথাগুলো বলে চলছে শুধু তোমাদের ইমান নিরাপদ থাকার কামনায়। ইমান ও তাওহিদের 'হাকিকত' বাস্তবতা এবং 'নাওয়াকিযুল ইমান' ইমান ভঙ্গের কারণের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে।

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! কার ভয়ে তোমরা আজ সত্যকে গ্রহণ করতে পারছো না? কোন অশুভ শক্তি তোমাদের সত্য প্রকাশের মুখ তালাবদ্ধ করে দিয়েছে? আমেরিকা, ইসরাইল, রাশিয়া, চীন, ভারত যদি তোমাদের দৃষ্টিতে বড়ো হয়, তোমরা কি জানো না তোমাদের আল্লাহ তার চেয়েও বড়ো! কুফরি শক্তিকে যদি অধিক ক্ষমতাবান মনে করো, তোমরা কি জানো না তোমাদের আল্লাহই একমাত্র 'কাদিরে মুতলাক' অসীম ক্ষমতাবান! 'তাগুত'র চোখ ফাঁকি দিয়ে কিছু করা সম্ভব নয় যদি তোমাদের ধারণায় পোষণ করো, তোমরা কি ভুলে গেছো তোমাদের আল্লাহই একমাত্র 'আলিমুল গাইব'।

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! তোমাদের আল্লাহ কি তাঁর ঘর ধ্বংস করতে আসা হস্তিবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে তাঁর বড়োত্ব প্রকাশ করে দেখাননি! তোমাদের আল্লাহ কি তিনশ' তেরোজন দ্বারা এক হাজারের বাহিনীকে পরাজিত করে তাঁর ক্ষমতা প্রকাশ করেননি! তোমাদের আল্লাহ কি শয়তানের কূটকৌশল নস্যাৎ করে আবু জাহেলের ঘেরাও বাহিনী থেকে রাসুলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্ধার করে মদিনায় পৌঁছিয়ে তাঁর কৌশলের শক্তি প্রকাশ করেননি!

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! তোমরা কি সেই নবীর উম্মত নও যিনি অসংখ্য দেবতার পূজারিদের সমাগমে দাঁড়িয়ে এক 'মা'বুদ'র ইবাদতের দিকে আহ্বান করতে সামন্যতম দ্বিধাগ্রস্ত হননি! তোমরা কি সেই নবীর উম্মত নও যিনি 'হুনাইন'র যুদ্ধে "أنا النبي لا كذب * أنا ابن عبد المطلب" বলে বলে বীরদর্পে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন! তোমরা কি সেই নবীর উম্মত নও যাঁর তেইশ বছরের সাহসী পদক্ষেপের ফলে তোমরা একটি প্রতিষ্ঠিত দ্বীন উপহার পেয়েছো! তোমরা কি সেই নবীর উম্মত নও যাঁর ঘোষণা হচ্ছে "نصرت بالرعب مسيرة شهر"! তোমরা কি সেই নবীর উম্মত নও যিনি তোমাদেরকে পুরো পৃথিবীময় ক্ষমতাবান হওয়ার সুসংবাদ শুনিয়েছেন!

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! সেই নবীর সম্মান যখন আজ ভূলুণ্ঠিত, সেই নবীর দ্বীন যখন আজ পর্যুদস্ত, সেই নবীর উম্মত যখন আজ অধঃপতনের অতল গহ্বরে পতিত; হৃদয়ের কান দিয়ে একটু চেষ্টা করে দেখো তো নবীর ক্রন্দনধ্বনি শুনতে পাও কি না। একটু অনুভব করতে পারো কি না রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুরানি চেহারার বিষণ্নতা ও পবিত্র অন্তরের ব্যথাহত ভাব।

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! তোমরা কি খুলাফায়ে রাশেদিনের উত্তরসূরি নও যাঁরা ইসলামের কর্তৃত্বকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাপৃত করে তোমাদেরকে মুনিবের আসনে বসিয়েছিলেন! তোমরা কি খালিদ বিন ওলিদের ন্যায় বীর সাহাবিগণের সন্তান নও যাঁদের কোষমুক্ত তরবারির সামনে কিসরা-কায়সার মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে এবং তোমরা তাদেরকে গোলাম হিসেবে ব্যবহার করেছো! তোমাদের একজন খলিফা কি হারুনুর রশিদ নন; রোমের সম্রাট 'নিকফুর'কে লেখা যাঁর একটি চিঠি পুরো রোমে কম্পন সৃষ্টি করেছিলো!

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! আজ কেনো তোমাদের সকল ভূখণ্ড প্রত্যেক দখলদারের লুণ্ঠিত সম্পদে পরিণত হয়েছে? আজ কেনো তোমরা মুনিবরা গোলামে পরিণত হয়েছো, আর গোলামরা মুনিবের আসনে? পরাধীনতার জীবনকেই কেনো তোমরা শান্তির জীবন মনে করছো? শত্রুর একটি সশব্দ উচ্চারণই কেনো তোমাদের দেহ-মনে কম্পন তৈরি করে দেয়?

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! তোমাদের শিরা-উপশিরায় কি সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির রক্ত প্রবহমান নয়? কেনো আজ তোমাদের প্রথম কিবলা বাইতুল মাকদিস ইহুদিদের দখলে? কেনো বাইতুল মাকদিসের আর্তনাদে তোমাদের রক্তে জিহাদি চেতনার তরঙ্গ উপচে পড়ে না?

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! তোমরা কি প্রসিদ্ধ যালেম হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ও আব্বাসি খলিফা মু'তাসিমের চেয়েও বেশি পাষণ্ড হয়ে গেছো? কাফেরদের হাতে বন্দি একজন অসহায় বোনের "وا حَجَّاجاه" শোনার পর যদি হাজ্জাজের কঠিন মনে প্রতিশোধের স্পৃহা জাগ্রত হয়ে থাকে, একজন নির্যাতিতা মুসলিমা মায়ের "وا معتصماه" বলে চিৎকার করার সংবাদ শোনার পর যদি খলিফা মু'তাসিমের হৃদয় নাড়া দিয়ে থাকে; আজ হাজারো-লাখো শিশুর গগনবিদারী চিৎকার, নির্যাতিতা মা-বোনদের আর্তনাদ তোমাদের অন্তরে সামান্যতম রেখাপাত করে না কেনো?

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! তোমরা তোমাদের সন্তানের কান্নায় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের নিষ্পাপ মুসলিম শিশুদের কান্না অনুভব করো, তোমরা তোমাদের মা-বোনদের মলিন চেহারায় বিভিন্ন ভূখণ্ডের মাযলুমা মুসলিমা মা-বোনদের মুখাবয়বের বিষণ্নতা অনুধাবন করো, বাতাসে কান পেতে শোনো; কতো অসহায় তোমাদের নাম ধরে ধরে "وا فلاناه وا فلاناه" বলে বলে হাহাকার করছে, আর একটু ভেবে দেখো তোমার মাঝে মুসলমানিত্ব কতোটুকু অবশিষ্ট আছে!

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! তোমরা তোমাদের ইমানি শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সাহসী পদক্ষেপে অগ্রসর হও; দেখো তোমাদের আল্লাহ এখনো অসীম ক্ষমতায় মহীয়ান। তোমাদের আল্লাহর কৌশল এখনো শক্তিশালী। তোমাদের আল্লাহ এখনো মুজাহিদদের ক্ষুদ্র কাফেলা দিয়ে 'তাগুত'র বৃহৎ শক্তিকে পরাভূত করেন। তোমাদের আল্লাহ এখনো আসমানের তিন হাজার-পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সহযোগিতায় প্রেরণ করেন।

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! একটু সাহসী হও! একটু বীরত্বের পরিচয় দাও! একটু নিজেদের আত্মমর্যাদার ব্যাপারে সচেতন হও! তোমাদের পূর্বসূরিদের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য একটু চেষ্টা করো! সর্বোপরি কুরআন-সুন্নাহ ও ফিকহে ইসলামির আলোকে তোমরা তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব বুঝে নাও; দেখতে পাবে তোমরা ছাগলের পালে লালিত হওয়া সিংহশাবকের দল। দেখো তোমাদের মাঝে লুকিয়ে আছে শার্দূলতা; শিয়াল পরিচয়ে বেঁচে থাকা তোমাদের জন্য বেমানান।

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! তোমরা কেনো বনি ইসরাইলের ন্যায় মুক্তির পয়গামদাতাকে অশুভ মনে করছো? মুসা আলাইহিস সালামের অনুপস্থিতিতে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হারুন আলাইহিস সালামের কথার পরিবর্তে 'সামেরি'র কথাই কেনো তোমাদের নিকট বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে? সাহাবায়ে কেরামকে বাদ দিয়ে বনি ইসরাইলকে কেনো আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করছো? বনি ইসরাইলের ন্যায় নববি কাজের ধারক-বাহকদের কেনো বলে দিচ্ছো "اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ"?

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! যে তোমাদেরকে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে আযাদির রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছে, তাকে কেনো স্বার্থপর মনে করছো? যে তোমাদেরকে

তোমাদের পরিচয় মনে করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে চলছে, তাকে কেনো পর ভাবছো? যে তোমাদেরকে ইমান ও কুফরের ব্যাপারে সচেতন করে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে কেনো শত্রুতা পোষণ করছো? যে পথিক 'গরিব'-মুসাফিরের জীবন বেছে নিয়েও তোমাদেরকে 'তাগুত'র অপকৌশল ও ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সতর্ক করে চলছে, তাকে প্রতিহত করতে কেনো আটঘাট বেঁধে নেমে পড়েছো? যে ইহুদি-খৃস্টানের চক্ষুশূল, তাকেই কেনো ইহুদি-খৃস্টানের দালাল অপবাদ দিয়ে গালিগালাজ করছো?

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! আমি জানি, আমার কলমকে এভাবে মুক্ত করে দিলে চলতেই থাকবে। তবে আমার কলমকে আমি এখানেই বন্ধ করে দিতে চাচ্ছি। আমার ব্যথিত হৃদয়ের কথা প্রকাশের স্রোত এখানেই থামিয়ে দিচ্ছি। শব্দের সিক্ত দেহাবয়বে বিচরণ করে অনুভব করো, নয়নবারিতে ভিজে আছে কাগজগুলো, টপ টপ করে ঝরে পড়া অশ্রুজলে ঝাপসা হয়ে আছে অক্ষরগুলো; হয়তো আমার কষ্ট কিছুটা লাঘব হবে, একটু হলেও ব্যথার উপশম হবে।

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! তোমাদের কারো কোনো ভর্ৎসনা, কোনো অপবাদ, কোনো খিস্তি-খেউর, কোনো অসার মন্তব্য, কোনো প্রলোভন, কোনো হুমকি আমাদের যবানকে রুদ্ধ করতে পারবে না, আমাদের কলমকে বন্ধ করতে পারবে না। আমরা তোমাদের কল্যাণ কামনায় কুরআন-সুন্নাহ ও ফিকহে ইসলামির আলোকে মাসআলাগুলো সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেই যাবো এবং আমাদের কথাগুলো বলেই যাবো, ইনশাআল্লাহ। وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب।

اللهم! أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.

فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين.

ربنا! لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين.

اللهم! إنا نجعلك في نحورهم ونعوذبك من شرورهم.

اللهم! ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك ﷺ.

اللهم! انصر المسلمين المظلومين والمجاهدين في كل بلاد.

আবু মুসআব
০৪-০৭-১৪৪০ হি.

قال أبو بكر الجصاص: والذي أظن أنَّ أبا حنيفة إنما قال ذلك على حسب الحال التي كانت في زمانه من جهاد المسلمين أهل الشرك، فامتنع عنده أن تكون دار حرب في وسط دار المسلمين، يرتد أهلها فيبقون ممتنعين دون إحاطة الجيوش بهم من جهة السلطان، ومطوِّعة الرعية.

فأما لو شاهد ما قد حدث في هذا الزمان، من تقاعد الناس عن الجهاد وتخاذلهم، وفساد من يتولى أمورهم، وعداوته للإسلام وأهله، واستهانته بأمر الجهاد وما يجب فيه، لقال في مثل بلد القِرْمِطي بمثل قول أبي يوسف ومُحَمَّد، بل في كثير من البلدان التي هذه سبيلها، مما نكره ذكره في هذا الموضع. (شرح مختصر الطحاوي للجصاص، كتاب السير والجهاد، مسألة: بيان المراد بدار الحرب ودار الإسلام، ٧/٢١٨)

{চার}

دار الإسلام ودار الحرب

দারুল ইসলাম ও দারুল হারব

কুফরি আইনে পরিচালিত ভূখণ্ড দারুল হারব

মাসআলা: বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের যে সকল ভূখণ্ড কুরআন ও সুন্নাহর আইন অনুযায়ী পরিচালিত না হয়ে তার বিপরীতে মানবরচিত কুফরি আইনে পরিচালিত হচ্ছে, কুফরি মতবাদকেই সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং আল্লাহ প্রদত্ত আইন কার্যকর করার কোনো সুযোগ রাখা হয়নি; সে সকল ভূখণ্ড 'দারুল হারব'র অন্তর্ভুক্ত।[২৬]

দলিল

পরবর্তীদের থেকে হাতেগোনা কিছু আলেমের 'শায' কথা ব্যতীত বলতে গেলে চার মাযহাবের খিলাফত পতনের পূর্ব ও পরের ফুকাহায়ে কেরাম কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এ ব্যাপারে একমত যে, কোনো ভূখণ্ড 'দারুল ইসলাম' বা 'দারুল হারব' হওয়ার মাপকাঠি হলো সে ভূখণ্ডে বাস্তবায়িত আইন

---

২৬. এ ব্যাপারে বিভিন্নজন বিভিন্ন মতামত পেশ করে থাকেন। কারো মতে, বর্তমানে কোনো দারুল হারব নেই, সবই দারুল আমান। কারো মতে, নামে মুসলিম শাসক কর্তৃক পরিচালিত রাষ্ট্রগুলো দারুল ইসলাম। কেউ পূর্বের ফুকাহায়ে কেরাম কর্তৃক দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের সংজ্ঞা দ্বারাই তা সাব্যস্ত করেন। আবার কারো দাবি, দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের সংজ্ঞা নতুন করে তৈরি করতে হবে। এছাড়াও আরো বিভিন্ন ধরনের দাবি শোনা যায়। আমাদের বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

ও সংবিধান। ইসলামি আইন ও সংবিধানে পরিচালিত হলে সেটি 'দারুল ইসলাম', আর কুফরি আইন ও সংবিধানে পরিচালিত হলে সেটি 'দারুল হারব'। তবে যেহেতু 'দারুল ইসলাম কখন দারুল হারবে পরিণত হয়' এই মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতের ভিত্তিতে পূর্বের কেউ কেউ এবং বর্তমানের একটি বড়ো অংশ ভয়ঙ্কর রকমের সংশয়ে পড়েছেন, তাই প্রথমেই ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মত ও তা সংক্রান্ত আলোচনার মাধ্যমেই আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের দিকে অগ্রসর হবো, ইনশাআল্লাহ।

ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহেবাইনের শর্তকেন্দ্রিক মতানৈক্য

'দারুল ইসলাম কখন দারুল হারবে পরিণত হয়' এ সংক্রান্ত মতামত ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (মৃঃ ১৮৯ হিঃ) তাঁর 'আযযিয়াদাত' নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তবে যেহেতু 'আযযিয়াদাত' কিতাবের স্বতন্ত্র মুদ্রিত কপি বা পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না এবং কিতাবের ব্যাখ্যাতাগণও পৃথককরে মূল ইবারত উল্লেখ করেননি, তাই তিনজন ব্যাখ্যাতার শব্দে তা উল্লেখ করছি।

শামসুদ্দিন আসসারাখসির (মৃঃ ৪৯০ হিঃ) শব্দে

ইমাম সারাখসি কর্তৃক 'আযযিয়াদাত' কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করা প্রমাণিত। তবে তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থটি হারিয়ে যাওয়া কিতাবাদির একটি। তাই তাঁর শব্দে মতামতটি তাঁর 'কিতাবুল মাবসুত' থেকে উল্লেখ করা হচ্ছে।

والحاصل: أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنما تصير دارهم دار الحرب بثلاث شرائط: أحدها أن تكون متاخمة أرض الترك ليس بينها وبين أرض الحرب دار للمسلمين، والثاني أن لا يبقى فيها مسلم آمن بإيمانه ولا ذمي آمن بأمانه، والثالث أن يظهروا أحكام الشرك فيها. وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: إذا أظهروا أحكام الشرك فيها فقد صارت دارهم دار حرب. (كتاب المبسوط للسرخسي، كتاب السير، باب المرتدين، ١٠/١١٤)

"মোটকথা, ইমাম আবু হানিফার মতে তিন শর্তে দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হয়। এক. তা তুর্কিস্তান (চীন ইত্যাদি) তথা দারুল কুফরের সঙ্গে এমনভাবে মিলিত হওয়া যে, সেটির মাঝে এবং দারুল হারবের মাঝে কোনো দারুল ইসলাম বিদ্যমান না থাকা। দুই. কোনো মুসলমান তার ইমানের দাবিতে

প্রাপ্য 'আমান'[২৭] এবং কোনো যিম্মি তার 'আমান'র ভিত্তিতে নিরাপদে না থাকা। তিন. তারা তাতে কুফরি-শিরকি আইন-কানুন প্রকাশ করা। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে কুফরি-শিরকি আইন-কানুন প্রকাশ করলেই দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হয়ে যায়।" (কিতাবুল মাবসুত, ১০/১১৪)

আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে উমর আলআত্তাবির (মৃ: ৫৮৫ হি:) শব্দে

ودار الإسلام إنما تصير دار حرب عند أبي حنيفة ﷺ بشرائط ثلاثة: أحدها إجراء أحكام الكفر على سبيل الاشتهار، والثاني أن يكون متاخمة لدار الحرب متصلة لا يتخلل بينهما بلد من بلاد المسلمين، والثالث أن لا يبقى مسلم أو ذمي آمنا بالأمان الأول..... وعندهما دار الإسلام تصير دار الحرب بإجراء أحكام الكفر. (شرح الزيادات للعتابي - المخطوطة- كتاب السير، باب من السير ما يغلب عليه من أرض المسلمين أو المرتدون ثم يظهر عليهم الإمام، صـ١٢١)

"ইমাম আবু হানিফার মতে তিন শর্তে দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হয়। এক. কুফরি আইন-কানুন প্রকাশ্যে জারি করা। দুই. তা এমনভাবে দারুল হারব সংলগ্ন হওয়া যে, উভয় দারুল হারবের মাঝে কোনো দারুল ইসলাম বিদ্যমান না থাকা। তিন. কোনো মুসলমান বা কোনো যিম্মি পূর্বের 'আমান'র ভিত্তিতে নিরাপদে না থাকা।..... আর ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে কুফরি আইন-কানুন জারি করলেই দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হয়ে যায়।" (শারহুয যিয়াদাত, -পাণ্ডুলিপি- পৃ: ১২১)

হাসান ইবনে মানসুর কাযি খানের (মৃ: ৫৯২ হি:) শব্দে

دار الإسلام تصير دار حرب بإجراء أحكام الكفر في قول أبي يوسف ومحمد. وعند أبي حنيفة بشرائط ثلاثة: إجراء أحكام الكفر، وأن تكون متاخمة بدار الحرب، أي متصلة

---

২৭. শামসুল আইম্মা হালওয়ানি রহ. (মৃ: ৪৪৮/৪৪৯ হি:) শর্তটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, "أعني بأمان أثبتها الشارع بالإيمان" অর্থাৎ এমন 'আমান' যা শারে'-শরিআত প্রণেতা ইমানের ভিত্তিতে সাব্যস্ত করেছেন। (বাযযাযিয়া, -হিন্দিয়ার পার্শ্ব টীকা- ৬/৩১৬)।

ليس بينهما بلدة من بلاد الإسلام، وأن لا يبقى فيها مؤمن آمن بإسلامه، ولا ذمي آمن بأمانه الأول، وهو الذمة. (شرح الزيادات لقاضي خان، كتاب السير، باب من السير مما يغلب عليه المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون، ٢٠٢٢/٦)

"ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে কুফরি আইন-কানুন জারি করলেই দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হয়ে যায়। আর ইমাম আবু হানিফার মতে তিন শর্তে দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হয়। কুফরি আইন-কানুন জারি করা। তা দারুল হারবের সঙ্গে মিলিত হওয়া, অর্থাৎ এমনভাবে দারুল হারব সংলগ্ন হওয়া যে, উভয় দারুল হারবের মাঝে কোনো দারুল ইসলাম বিদ্যমান না থাকা। কোনো মুসলমান তার ইমানের দাবিতে প্রাপ্য 'আমান' এবং কোনো যিম্মি তার পূর্বের 'আমান' তথা 'যিম্মা' চুক্তির মাধ্যমে গৃহীত 'আমান'র ভিত্তিতে নিরাপদে না থাকা।" (শারহুয যিয়াদাত, ৬/২০২২)

সামনের আলোচনার সুবিধার্থে ইমাম আলাউদ্দিন কাসানির শব্দেও মতামতটি উল্লেখ হওয়া জরুরি

আলাউদ্দিন আলকাসানির (মৃ: ৫৮৭ হি:) শব্দে

فنقول: لا خلاف بين أصحابنا في أن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها. واختلفوا في دار الإسلام أنها بماذا تصير دار الكفر؟ قال أبو حنيفة: إنها لا تصير دار الكفر إلا بثلاث شرائط: أحدها ظهور أحكام الكفر فيها، والثاني أن تكون متاخمة لدار الكفر، والثالث أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنا بالأمان الأول وهو أمان المسلمين. وقال أبو يوسف ومُحمَّد رحمهما الله: إنها تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها. (بدائع الصنائع للكاساني، كتاب السير، فصل وأما بيان الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين، ١٣٠/٧)

"আমাদের ইমামগণের মাঝে এ ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই যে, ইসলামি আইন-কানুন প্রকাশ পাওয়ার মাধ্যমেই একটি দারুল কুফর দারুল ইসলামে পরিণত হয়। তবে দারুল ইসলাম কখন দারুল কুফরে পরিণত হয়

সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, তিন শর্তে দারুল ইসলাম দারুল কুফরে পরিণত হয়। এক. তাতে কুফরি আইন-কানুন প্রকাশ পাওয়া। দুই. তা দারুল কুফর সংলগ্ন হওয়া। তিন. কোনো মুসলমান এবং কোনো যিম্মি পূর্বের 'আমান' তথা মুসলমানদের 'আমান'র ভিত্তিতে নিরাপদে না থাকা। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে তাতে কুফরি আইন-কানুন প্রকাশ পাওয়ার মাধ্যমেই তা দারুল কুফরে পরিণত হয়ে যায়।" (বাদায়েউস সানায়ে', ৭/১৩০)

আলোচনার ক্রমধারা

'দারুল ইসলাম কখন দারুল হারবে পরিণত হয়' এ সংক্রান্ত ইমাম আবু হানিফা ও সাহেবাইনের মতামত সামনে আসার পর আমরা আমাদের আলোচনাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি।

এক. 'আহকামুল ইসলাম' ও 'আহকামুল কুফর'র ব্যাখ্যা।

দুই. দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার জন্য ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত অতিরিক্ত শর্তদুটি সম্পর্কে কয়েকটি কথা।

তিন. কুরআন-সুন্নাহ ও চার মাযহাবের খিলাফত পতনের পূর্ব ও পরের ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পরিচয় নির্ধারণ।

চার. বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ পুরো ভারত উপমহাদেশ দারুল হারব হওয়ার যৌক্তিকতা ও দারুল হারব হওয়া সংক্রান্ত খিলাফত পতনের পূর্ব ও পরের উলামায়ে কেরামের সুস্পষ্ট বক্তব্য।

পাঁচ. কিছু পুস্তিকা-ফাতওয়ার পর্যালোচনা।

"

شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رح نے فرمایا: اور احکام کفر کے جاری ہونے سے مراد ہے کہ مقدمات انتظام سلطنت اور بندوبست رعایا و تحصیل خراج اور باج و عشر اموال تجارت میں حکام بطور خود حاکم ہوں، اور ڈاکوؤں اور چوروں کی سزا اور رعایا کے باہمی معاملات اور جرموں کی سزا کے مقدمات میں کفار کا حکم جاری ہو، اگرچہ بعض احکام اسلام مثلاً جمعہ و عیدین اور اذان اور گاؤ کشی میں کفار تعرض نہ کریں۔ (فتاوی عزیزی-اردو- باب الفقہ، دار الاسلام منقلب بدار الحرب ہو سکتا ہے، ص ۴۵۴)

"

-এক-

‘আহকামুল ইসলাম’ ও ‘আহকামুল কুফর’র ব্যাখ্যা

প্রথমত: বাক্যের ব্যবহাররীতি থেকে

‘আহকামুল ইসলাম বা আহকামুল কুফর জারি করা’ শুধুমাত্র এই বাক্যের ব্যবহাররীতি থেকেই ‘আকলে আম’ সাধারণ জ্ঞানে এটি অনুমেয় যে, এর দ্বারা মৌলিকভাবে বিধি-বিধান, আইন-কানুন ও সংবিধান উদ্দেশ্য; যদিও ব্যক্তিজীবনের ইবাদত ও মাসআলা-মাসায়েল সেটির অধীনে এসে যায়। এটি বুঝার জন্য মনে হয় ‘ফিকহে আম’রও প্রয়োজন নেই। এছাড়াও দারুল ইসলাম ও দারুল হারব সংক্রান্ত মাসআলার আলোচনায় ফুকাহায়ে কেরামের ইবারতে এ বাক্যের ব্যবহার যাদের অধ্যয়নে রয়েছে, যারা ফিকহের কিতাবাদি থেকে বিশেষকরে ‘সিয়ার-জিহাদ’ ও ‘হুদুদ-কিসাস’র অধ্যায়গুলো পড়েছেন বা পড়বেন, তাদের খুব সহজেই উপলব্ধিতে আসার কথা যে, সাধারণত ফুকাহায়ে কেরামের এ ব্যবহারের প্রয়োগক্ষেত্র কোনটি? আইন-কানুন নাকি ব্যক্তিগত সালাত-সাওম আদায় করা বা নিজেদের উদ্যোগে জুমআ ও ঈদের ব্যবস্থা করা? পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবমুক্ত হয়ে অধ্যয়ন করলে যে কারো সামনে এটি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এর দ্বারা ফুকাহায়ে কেরাম সাধারণত ইসলাম বা কুফরের আইন-কানুনই উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন এবং সেটির অধীনে ব্যক্তিগত ইবাদত-উপাসনার মাসআলার আলোচনাও এসে যায়।

দ্বিতীয়ত: শর্তের বাস্তবতার আলোকে

যে যাই উদ্দেশ্য নিয়ে থাকুন না কেনো; কমপক্ষে ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহেবাইনের কথায় ‘আহকামুল ইসলাম’ ও ‘আহকামুল কুফর’ দ্বারা যে

ব্যক্তিগত বা নিজেদের উদ্যোগে ইসলামের আদেশ-নিষেধ পালন করা নয়, বরং আইন-কানুনই উদ্দেশ্য তা একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য প্রথমে দু'টি কথা মনে রাখতে হবে-

ক) 'আহকামুল ইসলাম' দ্বারা যদি সালাত-সাওম, জুমআ-ঈদ ইত্যাদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে 'আহকামুল কুফর' দ্বারাও অমুসলিমদের ব্যক্তিগত বিভিন্ন উপাসনা উদ্দেশ্য হবে।

খ) দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার জন্য ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত শর্তগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে- 'মুসলমান তার ইমানের দাবিতে প্রাপ্য বা পূর্বের 'আমান'র ভিত্তিতে ও 'যিম্মি' তার পূর্বের 'আমান'র ভিত্তিতে নিরাপদ না থাকা। যদি নিরাপদে থাকে, তাহলে তা দারুল হারবে পরিণত হবে না। (যেটির ব্যাখ্যা সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ)। এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, একজন মুসলমান যদি সালাত-সাওম, জুমআ-ঈদ ইত্যাদি পালন করতে না পারে, তাহলে এটিকে "آمن بإيمانه" বা "آمن بالأمان الأول" বলা হবে না। ঠিক তেমনিভাবে 'যিম্মি' যদি তার ব্যক্তিগত উপাসনা করতে না পারে, তাহলে তা "آمن بالأمان الأول" বলা হবে না। সুতরাং বুঝা গেলো মুসলমানের সালাত-সাওম, জুমআ-ঈদ ইত্যাদি পালন করতে পারা-না পারা এবং 'যিম্মি'র ব্যক্তিগত উপাসনা করতে পারা-না পারা এই শর্তের অন্তর্ভুক্ত।

বিষয়দু'টি উপলব্ধি করার পর আমরা এখন সহজেই বুঝতে পারি যে, 'আহকামুল ইসলাম' বা 'আহকামুল কুফর' দ্বারা যদি ব্যক্তিগত ইবাদত বা উপাসনা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং আমরা যদি উদাহরণস্বরূপ ধরে নেই যে, একটি ভূখণ্ড দারুল ইসলাম হিসেবে বাকি থাকার দুটি শর্তই অনুপস্থিত, কিন্তু পূর্বের 'আমান' বহাল থাকায় তা (ইমাম আবু হানিফার মতে) দারুল ইসলাম, তাহলে-

ক) ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত শর্ত থেকে 'আহকামুল কুফর জারি করা' শর্তটি অনর্থক সাব্যস্ত হবে। কেননা যিম্মি কাফের কর্তৃক 'আহকামুল কুফর' তথা ব্যক্তিগত উপাসনা আগেও জারি ছিলো এবং এখনো জারি আছে, নতুন করে জারি করার কী অর্থ?

খ) মুসলামানদের সালাত-সাওম, জুমআ-ঈদ ইত্যাদি পালন করার মাধ্যমে ‘আহকামুল ইসলাম’ জারি আছে, তাহলে ‘আহকামুল ইসলাম’র মোকাবেলায় ‘আহকামুল কুফর জারি করা’র কী অর্থ?

গ) পূর্বের ‘আমান’ বিদ্যমান থাকায় তা ইমাম আবু হানিফার মতে দারুল ইসলাম, আবার সালাত-সাওম, জুমআ-ঈদ ইত্যাদি ‘আহকামুল ইসলাম’ জারি থাকায় তা সাহেবাইনের মতেও দারুল ইসলাম। তাহলে এই শর্তে ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহেবাইনের মাঝে মতানৈক্যের ফলাফল কী?

এছাড়াও ‘আহকামুল ইসলাম’ বা ‘আহকামুল কুফর’ দ্বারা যদি ব্যক্তিগত ইবাদত-উপাসনা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক এতো গভীর থেকে তিনটি শর্ত আরোপ করার প্রয়োজন কী ছিলো? শুধু এতোটুকু বললেই তো হতো; যতোক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানরা সালাত-সাওম বা জুমআ-ঈদ ইত্যাদি আদায় করতে পারবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তা দারুল হারবে পরিণত হবে না।

সুতরাং এটিই স্পষ্ট যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহেবাইন ‘আহকামুল ইসলাম’ দ্বারা ইসলামি আইন-কানুন ও সংবিধান এবং ‘আহকামুল কুফর’ দ্বারা কুফরি আইন-কানুন ও সংবিধান উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

তৃতীয়ত: কয়েকজন ফকিহের বক্তব্যের আলোকে

‘আহকামুল কুফর জারি করা’ কথাটির ব্যাখ্যা স্পষ্ট হওয়ায় অধিকাংশ কিতাবে তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বোধ করা হয়নি। তবুও কয়েকজন ফকিহের বক্তব্য উল্লেখ করছি, যা থেকে স্পষ্ট বুঝে আসে যে, এটি দ্বারা মৌলিকভাবে আইন-কানুনই উদ্দেশ্য।

ইমাম তহাবি (মৃ: ৩২১ হি:)

وكل أرض ارتد أهلها جميعاً، فلم يبق فيها من المسلمين ولا من أهل ذمتهم إلا من قد غلب عليه المرتدون، وجرت عليه أحكامهم، فإنها قد صارت بذلك أرض حرب، اتصلت بدار الحرب أو لم تتصل، وهذا قول أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهما. (مختصر الطحاوي، كتاب السير والجهاد، أرض ارتد أهلها وغلبوا عليها وجرت فيها أحكامهم، ص٢٩٤)

"যে অঞ্চলের অধিবাসীরা সকলে মুরতাদ হয়ে প্রত্যেক মুসলমান ও 'যিম্মি'র উপর ক্ষমতাশীল হয়ে যায় এবং তাদের ক্ষেত্রে মুরতাদদের আইন-কানুন জারি হয়; এর দ্বারাই তা দারুল হারবে পরিণত হয়ে যায়। চাই তা দারুল হারবের সঙ্গে মিলিত থাকুক বা না থাকুক। এটি ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতামত।" (মুখতাসারুত তহাবি, পৃ: ২৯৪)

উপর্যুক্ত বক্তব্যে 'মুসলমানদের উপর মুরতাদদের আহকাম জারি হয়' কথা থেকেই স্পষ্ট যে, তা দ্বারা তাদের রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনই উদ্দেশ্য। একের ব্যক্তিগত উপাসনা অন্যের উপর জারি হওয়ার কোনো অর্থ হয় না।

আবু বকর আলজাসসাস (মৃ: ৩৭০ হি:)

واعتبر أيضاً جريان الحكم، لأن الموضع الذي تحصل فيه السرية من بقاع دار الإسلام وإن كانت متصلة بأرض الحرب، لا تصير من دار الحرب، لأنهم غير متمكنين لإجراء الحكم. (شرح مختصر الطحاوي للجصاص، كتاب السير والجهاد، مسألة: بيان المراد بدار الحرب ودار الإسلام، ٢١٧/٧)

"ইমাম আবু হানিফা রহ. হুকুম জারি হওয়ার শর্ত করেছেন। কেননা দারুল ইসলামের যে অংশে সৈন্যদল রয়েছে, তা দারুল হারবের সংলগ্ন হলেও দারুল হারবে পরিণত হবে না। কারণ, কাফেররা তাতে আইন-কানুন জারি করতে সক্ষম নয়।" (শারহু মুখতাসারিত তহাবি, ৭/২১৭)

উপর্যুক্ত বক্তব্যে 'তারা হুকুম জারি করতে সক্ষম নয়' কথা থেকে স্পষ্ট যে, তা দ্বারা তাদের আইন-কানুন উদ্দেশ্য। কেননা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাদের ব্যক্তিগত উপাসনা জারি করতে সক্ষম নয় বলার কোনো অর্থ হয় না।

নাসিরুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আসসামারকান্দি (মৃ: ৫৫৬ হি:)

أما البلاد التي في أيديهم فلا شك أنها بلاد الإسلام لا بلاد الحرب، لأنها غير متاخمة لبلاد الحرب، ولأنهم لا (لم) يظهروا فيها حكم الكفر، بل القضاة مسلمون. (الملتقط في الفتاوى الحنفية لناصر الدين السمرقندي، كتاب السير، مطلب في السلام لأهل الذمة وردها وكراهة المصافحة، ص٢٥٤)

“যে সকল অঞ্চল কাফেরদের দখলে রয়েছে, নিঃসন্দেহে সেগুলো দারুল ইসলাম, দারুল হারব নয়। কেননা সেগুলো দারুল হারব সংলগ্ন নয় এবং তারা তাতে কুফরের আইন-কানুন প্রকাশ করেনি, বরং বিচারকরা মুসলমান।” (আলমুলতাকাত, পৃ: ২৫৪)

‘তারা তাতে কুফরের হুকুম জারি করেনি, বরং বিচারকরা মুসলমান’ কথা থেকেই স্পষ্ট যে, ‘আহকামুল ইসলাম’ বা ‘আহকামুল কুফর’ দ্বারা আইন-কানুনই উদ্দেশ্য। অন্যথায় ‘কুফরের হুকুম জারি করেনি’ বলারও কোনো অর্থ নেই এবং ‘বিচারকরা মুসলমান’ বলারও কোনো কারণ নেই। বরং শুধু এতোটুকু বললেই হতো, মুসলমানরা সেখানে জুমআ-ঈদ আদায় করতে পারে।

উপর্যুক্ত বক্তব্যটি কিওয়ামুদ্দিন কাকি, ইবনুল আলা দেহলবি ও ইবনুল বাযযায কারদারি তাঁদের ফিকহ-ফাতাওয়ার কিতাবে গ্রহণ করেছেন।

কিওয়ামুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আলকাকি (মৃ: ৭৪৯ হি:)

وفي الملتقط: البلاد التي في أيدي الكفار بلاد إسلام لا بلاد حرب، لأنها غير متاخمة بدار الحرب ولأنهم لم يظهروا فيها حكم الكفر، بل القضاة مسلمون والولاة مسلمون. (معراج الدراية شرح الهداية للكاكي -المخطوطة- كتاب الصلاة، باب الجمعة ١٧٧/١، رد المحتار لابن عابدين الشامي، كتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب في جواز استنابة الخطيب، ١٤/٣)

“যে সকল অঞ্চল কাফেরদের দখলে রয়েছে, সেগুলো দারুল ইসলাম, দারুল হারব নয়। কেননা সেগুলো দারুল হারব সংলগ্ন নয় এবং তারা তাতে কুফরের বিধান জারি করেনি, বরং বিচারক ও প্রশাসকরা মুসলমান।” (মি‘রাজুদ দিরায়া, -পাণ্ডুলিপি- ১/১৭৭, রদ্দুল মুহতার, ৩/১৪)[২৮]

---

২৮. ‘রদ্দুল মুহতার’ কিতাবে ‘মি‘রাজুদ দিরায়া’র সূত্রে "وفي الملتقط" এর স্থানে আছে "عن المبسوط"। আমাদের সাধ্যানুযায়ী ‘মাবসুতে সারাখসি’তে তা তালাশ করে না পেয়ে বহু চেষ্টা-সাধনার পর ‘মি‘রাযুদ দিরায়া’র পাণ্ডুলিপির ব্যাপারে অবগত হয়ে তাতে দেখা গেলো, ‘মাবসুত’র পরিবর্তে ‘মুলতাকাত’র উল্লেখ রয়েছে।

ইবনুল আলা আদদেহলবি (মৃ: ৭৮৬ হি:)

١٠١٣٠- وفي تجنيس الناصري: قال الإمام الأجل:...... أما البلاد التي في أيديهم فلا شك أنها بلاد الإسلام لا بلاد الحرب، لأنها غير متاخمة لبلاد الحرب، لأنهم لم يظهروا فيها حكم الكفر، بل القضاة مسلمون. (الفتاوى التاتارخانية لابن العلاء الدهلوي، كتاب السير، الفصل الرابع والعشرون، نوع في الأحكام التي تتعلق ببلاد الكفار ١٣٥/٧، النهر الفائق لسراج الدين ابن نجيم، كتاب القضاء، ٦٠٤/٣)

"যে সকল অঞ্চল কাফেরদের দখলে রয়েছে, নিঃসন্দেহে সেগুলো দারুল ইসলাম, দারুল হারব নয়। কেননা সেগুলো দারুল হারব সংলগ্ন নয় এবং তারা তাতে কুফরের বিধান জারি করেনি, বরং বিচারকরা মুসলমান।" (তাতারখানিয়া, ৭/১৩৫, আননাহরুল ফায়েক, ৩/৬০৪)

হাফেযুদ্দিন ইবনুল বাযযায আলকারদারি (মৃ: ৮২৭ হি:)

قال السيد الإمام: والبلاد التي في أيدي الكفرة اليوم، لا شك أنها بلاد الإسلام لعدم اتصالها ببلاد الحرب، ولم يظهروا فيها أحكام الكفر، بل القضاة مسلمون. (الفتاوي البزازية، كتاب السير، الفصل الثالث في الحظر والإباحة، بهامش الفتاوى الهندية، ٣١١/٦)

"যে সকল অঞ্চল বর্তমানে কাফেরদের দখলে রয়েছে, নিঃসন্দেহে সেগুলো দারুল ইসলাম। কেননা সেগুলো দারুল হারবের সঙ্গে মিলিত নয় এবং তারা তাতে কুফরের বিধান জারি করেনি, বরং বিচারকরা মুসলমান।" (বাযযাযিয়া, -হিন্দিয়ার পার্শ্ব টীকা- ৬/৩১১)

শামসুদ্দিন আলকুহুস্তানি (মৃ: ৯৫০ হি:/৯৬২ হিজরির পূর্বে)

أحدها: إجراء أحكام الكفر اشتهاراً بأن يحكم الحاكم بحكمهم ولا يرجعون إلى قضاة المسلمين. (جامع الرموز للقهستاني، كتاب الجهاد، ٦٦٣/٤)

"একটি শর্ত হচ্ছে, প্রকাশ্যে 'আহকামুল কুফর' জারি করা। অর্থাৎ হাকেম তাদের বিধান মতে ফয়সালা করে এবং মুসলমানদের বিচারকদের দ্বারস্থ হয় না।" (জামেউর রুমুয, ৪/৬৬৩)

أحدها: إجراء أحكام الكفار على سبيل الاشتهار، وأن لا يحكم فيها بحكم الإسلام.
(الفتاوى الهندية، كتاب السير، الباب الخامس في استيلاء الكفار، ٢/٢٣٢)

"একটি শর্ত হচ্ছে, প্রকাশ্যে কাফেরদের আহকাম জারি করা এবং সে ভূখণ্ডে ইসলামি আইন-কানুন অনুযায়ী ফয়সালা না করা।'' (হিন্দিয়া, ২/২৩২)

শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবি (মৃ: ১২৩৯ হি:)

اور احکام کفر کے جاری ہونے سے مراد ہے کہ مقدمات انتظام سلطنت اور بندوبست رعایا وتحصیل خراج اور باج وعشر اموال تجارت میں حکام بطور خود حاکم ہوں، اور ڈاکوؤں اور چوروں کی سزا اور رعایا کے باہمی معاملات اور جرموں کی سزا کے مقدمات میں کفار کا حکم جاری ہو، اگرچہ بعض احکام اسلام مثلاجمعہ وعیدین اور اذان اور گاؤکشی میں کفار تعرض نہ کریں۔ (فتاوی عزیزی -اردو- باب الفقہ، دار الاسلام منقلب بدار الحرب ہو سکتا ہے، ص ۴۵۴)

"আহকামে কুফর জারি হওয়া' দ্বারা উদ্দেশ্য রাষ্ট্রীয় বিচারব্যবস্থা, জনসাধারণের নিয়ম-নীতি, ব্যবসায়িক পণ্যে খারাজ, কর, উশর আদায়ে শাসক স্বনীতিতে শাসক হওয়া এবং ডাকাত-চোরদের শাস্তি ও জনগণের পারস্পরিক লেন-দেন ও অপরাধের শাস্তির বিচারের ক্ষেত্রে কাফেরদের আইন-কানুন জারি হওয়া। যদিও ইসলামের কিছু বিধান যেমন- জুমআ, ঈদ, আযান এবং গরু জবাইয়ের ক্ষেত্রে কাফেররা আপত্তি না করে।" (ফাতাওয়া আযিযি, -উর্দু- পৃ: ৪৫৪)

রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি (মৃ: ১৩২৩ হি:)

পূর্বে উদ্ধৃত বাযযাযিয়ার ইবারত উল্লেখ করে তিনি বলেন-

پس باید کہ دلیل بودن بر آں بلاد اسلام می آرد بقولہ "بل القضاۃ المسلمون"، کہ حکم احکام اسلام بر طور اول باقیست، ونمی گوید "لأن الناس یصلون ویجمعون"، چرا کہ مراد از اجرائے حکم اجرائے حکم بطور شوکت وغلبہ است، نہ ادائے مراسم دین خود برضاء حاکم غالب۔ (تالیفات رشیدیہ، فیصلۃ الاعلام فی دار الحرب ودار الاسلام، ص ٦٢٦)

“তো বুঝা উচিত, ওই সকল অঞ্চল দারুল ইসলাম হওয়ার উপর দলিল হিসেবে পেশ করা হয়েছে ‘সেখানের বিচারকরা মুসলমান’। ফলে ইসলামের বিধি-বিধান সে সকল অঞ্চলে পূর্বের ন্যায় বিদ্যমান আছে। দলিল হিসেবে একথা বলা হয়নি, ‘মানুষরা সেখানে সালাত ও জুমআ আদায় করতে পারে।’ কেননা ‘বিধি-বিধান জারি করা’র অর্থ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সহিত বিধি-বিধান জারি করা। ক্ষমতাশীল কাফের শাসকের সম্মতিতে স্বধর্মীয় রীতি-নীতি পালন করার নাম নয়।” (তালিফাতে রশিদিয়া, পৃ: ৬৬৬)

এখানে শুধু এ শর্তের ব্যাখ্যায় বলা কিছু ফিকহি ইবারত উল্লেখ করেছি। অন্যথায় পাঠক যদি আমাদের সঙ্গে এই গ্রন্থের শেষ পর্যন্ত থাকেন এবং সামনে উদ্ধৃত ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যগুলো একটু গভীর মনোযোগে অধ্যয়ন করেন; তাহলেও স্পষ্ট হয়ে যাবে, ফুকাহায়ে কেরাম সাধারণত ‘আহকামুল ইসলাম’ ও ‘আহকামুল কুফর’ দ্বারা কী উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন।

এখানে একটি কথা বলে রাখা উচিত; দুয়েকজন ফকিহ ‘আহকামুল ইসলাম’র ব্যাখ্যা জুমআ ও ঈদ দ্বারা করেছেন। মূল আলোচনার শেষে একটি পুস্তিকার পর্যালোচনায় বিষয়টির ব্যাখ্যা স্পষ্ট করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

“

فقیہ النفس رشید احمد گنگوہی رح نے فرمایا: الحاصل: غرض ازیں شروط ثلاثہ نزد امام واز یک شرط کہ اجرائے حکم اسلام است نزد صاحبین ہمون وجود غلبہ وقوت مراد است اگر ببعض وجوہ باشد، وہیچ اہل فقہ نمی گوید کہ در ملک کفار اگر کسے باذن ایشاں صراحۃً یا دلالۃً اظہار شعائر اسلام کند، آں ملک دار الاسلام می شود، حاشا وکلا کہ ایں دور از تفقہ است۔ (تالیفات رشیدیہ، فیصلۃ الاعلام فی دار الحرب ودار الاسلام، ص ٦٦٧)

”

-দুই-

দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার জন্য ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত অতিরিক্ত শর্তদুটি সম্পর্কে কয়েকটি কথা

ক) অতিরিক্ত শর্ত আরোপের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ. একক

অতিরিক্ত শর্ত দুটি আরোপ করার ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ইমামদের মাঝে ইমাম আবু হানিফা রহ. একক।

ওয়াহবা আযযুহাইলি আশশাফেয়ির (মৃঃ ১৪৩৬ হি:) বক্তব্য

দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন-

وفيه اختلف الفقهاء: فقال أبو حنيفة والزيدية: لا يتحقق اختلاف الدارين إلا بتوافر شروط ثلاثة هي:........ **وقال الصاحبان وجمهور الفقهاء:** ينقلب وصف الدار أو يتحول من دار إسلام إلى دار حرب بإجراء أحكام الشرك فقط. (الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي، القسم الخامس الفقه العام، الباب السادس، الفصل الرابع، المبحث الخامس، المطلب الثاني زوال الدولة الإسلامية، ٥٣٧/٨)

"এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রহ. ও যাইদিয়া (শিয়া) সম্প্রদায়ের মতে তিনটি শর্তের উপস্থিতি ব্যতীত 'দার'র পরিবর্তন সাব্যস্ত হয় না। আর তা হচ্ছে.........................। **কিন্তু সাহেবাইন ও জুমহুর ফুকাহায়ে কেরামের মতে** শুধু কুফর-শিরকের

আইন-কানুন জারি করার মাধ্যমেই 'দার'র পরিচয় পরিবর্তন হয়ে যায়, বা দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হয়ে যায়।" (আলফিকহুল ইসলামি ওয়াআদিল্লাতুহু, ৮/৫৩৭)

খ) তারজিহ (প্রাধান্য)

পূর্বের ও পরের একাধিক হানাফি ইমাম সাহেবাইনের মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

ইমাম তহাবি (মৃ: ৩২১ হি:)

وكل أرض ارتد أهلها جميعاً، فلم يبق فيها من المسلمين ولا من أهل ذمتهم إلا من قد غلب عليه المرتدون، وجرت عليه أحكامهم، فإنها قد صارت بذلك أرض حرب، اتصلت بدار الحرب أو لم تتصل، وهذا قول أبي يوسف ومُحَمَّد رضي الله عنهما، **وبه نأخذ**. وأما أبو حنيفة ﷺ فقال:..... (مختصر الطحاوي، كتاب السير والجهاد، أرض ارتد أهلها وغلبوا عليها وجرت فيها أحكامهم، ص٢٩٤)

"যে অঞ্চলের অধিবাসীরা সকলে মুরতাদ হয়ে প্রত্যেক মুসলমান ও 'যিম্মি'র উপর ক্ষমতাশীল হয়ে যায় এবং তাদের ক্ষেত্রে মুরতাদদের আইন-কানুন জারি হয়; এর দ্বারাই তা দারুল হারবে পরিণত হয়ে যায়। চাই তা দারুল হারবের সঙ্গে মিলিত থাকুক বা না থাকুক। এটি ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতামত। **আমরা এটিকেই গ্রহণ করছি**। আর ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন............।" (মুখতাসারুত তহাবি, পৃ: ২৯৪)

আবু বকর আলজাসসাস (মৃ: ৩৭০ হি:)

قال أحمد (الجصاص): والذي أظن أنَّ أبا حنيفة إنما قال ذلك على حسب الحال التي كانت في زمانه من جهاد المسلمين أهل الشرك، فامتنع عنده أن تكون دار حرب في وسط دار المسلمين، يرتد أهلها فيبقون ممتنعين دون إحاطة الجيوش بهم من جهة السلطان، ومطوِّعة الرعية.

فأما لو شاهد ما قد حدث في هذا الزمان، من تقاعد الناس عن الجهاد وتخاذلهم، وفساد من يتولى أمورهم، وعداوته للإسلام وأهله، واستهانته بأمر الجهاد وما يجب فيه، لقال في مثل بلد

القِرْمطي بمثل قول أبي يوسف ومُحَمَّد، بل في كثير من البلدان التي هذه سبيلها، مما نكره ذكره في هذا الموضع. (شرح مختصر الطحاوي للجصاص، كتاب السير والجهاد، مسألة: بيان المراد بدار الحرب ودار الإسلام، ٢١٨/٧)

"আবু বকর আহমাদ ইবনে আলি আলজাসসাস বলেন, আমার ধারণামতে ইমাম আবু হানিফা রহ. সমকালীন অবস্থা তথা কাফের-মুশরিকদের সঙ্গে মুসলমানদের জিহাদের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকার প্রেক্ষিতে এরূপ বলেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে এটি অসম্ভব ছিলো যে, মুসলমানদের অধিকৃত অঞ্চলের মাঝে একটি দারুল হারব থাকবে; যার অধিবাসীরা মুরতাদ হয়েও খলিফার পক্ষ হতে সৈন্যদল ও অনুগত প্রজা কর্তৃক ঘেরাও না হয়ে নিরাপদে থাকবে।

কিন্তু যদি তিনি বর্তমানের অবস্থা তথা মানুষদের জিহাদ থেকে বিরত থাকা ও নিস্তেজ হয়ে পড়া, দায়িত্বশীলের নষ্ট মানসিকতা, ইসলাম ও মুসলমানদের সঙ্গে শত্রুতা, জিহাদ ও জিহাদ সংশ্লিষ্ট বিষয়কে হেয় প্রতিপন্ন করার মতো দৃশ্যগুলো দেখতেন, তাহলে তিনিও 'কারামিতা' মুলহিদদের অধিকৃত অঞ্চল (যা দারুল ইসলাম কর্তৃক পরিবেষ্টিত), বরং এ জাতীয় বহু অঞ্চলের ক্ষেত্রে সাহেবাইনের ন্যায় মতামত পোষণ করতেন। এখানে যে সকল অঞ্চলের আলোচনা করাও আমি অপছন্দ করছি।" (শারহু মুখতাসারিত তহাবি, ৭/২১৮)

ইমাম আবু বকর আলজাসসাসের উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে 'তালিবে হক' আহলে ইলম ও আহলে ফিকরের গ্রহণ করার মতো বহু উপকরণ রয়েছে। প্রয়োজন শুধু সত্য গ্রহণের মানসিকতা। আমার মনে হয়, আলোচ্য মাসআলার সমাধানে পৌঁছার জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট; যদিও এখনো মাসআলার প্রারম্ভিক কথাগুলোই চলছে।

আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া

إنما تصير دار الإسلام دار الحرب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بشروط ثلاثة:..........، وقال أبو يوسف ومُحَمَّد رحمهما الله تعالى: بشرط واحد لا غير، وهو إظهار أحكام الكفر، **وهو القياس**. (الفتاوى الهندية، كتاب السير، الباب الخامس في استيلاء الكفار، ٢٣٢/٢)

“ইমাম আবু হানিফার রহ. মতে তিন শর্তে দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হয়................। আর সাহেবাইন বলেন, শুধু এক শর্তে; আর তা হচ্ছে, কুফরের আইন-কানুন প্রকাশ করা। **সাহেবাইনের মতটিই যুক্তিসঙ্গত।**” (হিন্দিয়া, ২/২৩২)

রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি (মৃ: ১৩২৩ হি:)

وہر مقامے کہ دار الاسلام بود کفار بر آں غلبہ کردند، اگر غلبہ اسلام بالکلیہ رفع شد آں را حکم دار حرب شد، واگر غلبہ کفار شد مگر ببعض وجوہ غلبہ اسلام ہم باقی ماندہ باشد، آں رادار الاسلام خواہند داشت نہ دار حرب، دریں مسئلہ اتفاق ہست، اما ایں کہ غلبہ اسلام بالکلیہ رفع شدن چہ حد است، درآں خلاف شد در میان آئمہ ما علیہم الرحمۃ، ہر چہ صاحبین علیہما الرحمۃ می فرمائید کہ اجراء احکام الکفر علی الاعلان والاشتہار غلبہ اسلام رابالکلیہ رفع می کند، البتہ اگر ہر فریق احکام خود را جاری باعلان کردہ باشند غلبہ اسلام ہم باقیست، ورنہ در صورت اعلان احکام کفار وعدم قدرت اہل اسلام بر اجرائے احکام خود بغلبہ خود الا باذن کفار غلبہ اسلام ہیچ قدر باقی نمی ماند، <u>وہو القیاس</u>۔ چرا کہ ہر گاہ کفار چناں مسلط گشتند کہ احکام کفر علی اعلان والغلبہ جاری کردند، واہل اسلام آں قدر عاجز مغلوب شدند کہ احکام خود جاری کردن نمی توانند ورد کفر را کہ شین وعار اسلام ست قدرت ندارند، پس کدام درجہ اسلام باقیست کہ آں رادار الاسلام گفتہ شود، بلکہ تسلط وغلبہ بکمال بکفار راشد ودار حرب گشت بالفعل، بعد ازاں ہر چہ خواہد شد خواہد شد، مگر الحال در دار حرب ومغلوب کفار بودن بظاہر ہیچ دقیقہ باقی نماندہ، ومثل دار حرب قدیم مسلط غلبہ کفار شدہ، کما ہو الظاہر۔ (تالیفات رشیدیہ، فیصلۃ الاعلام فی دار الحرب ودار الاسلام، ص۶۵۸)

“যে অঞ্চল দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত ছিলো, পরবর্তীতে কাফেররা তা দখল করে নিয়েছে; যদি ইসলামের দাপট পরিপূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়, তা দারুল হারবের হুকুমে হয়ে যাবে। আর যদি কাফেররা দখল করেছে ঠিকই, কিন্তু অন্যান্য বিবেচনায় ইসলামের দাপট এখনো অবশিষ্ট আছে, সেটিকে দারুল ইসলামই বলা হবে, দারুল হারব নয়। এতোটুকুর উপর সকলেই একমত। তবে ইসলামের দাপট পরিপূর্ণ নিঃশেষ হওয়ার সীমা কী? সে ব্যাপারে আমাদের ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য হয়েছে। সাহেবাইন বলছেন, প্রকাশ্যে কুফরের আইন-কানুন জারি করাই ইসলামের দাপটকে পরিপূর্ণ নিঃশেষ করে দেয়। হাঁ! মুসলমান ও কাফের প্রত্যেকে যদি নিজেদের আইন-কানুন প্রকাশ্যে জারি করে,

তাহলে ইসলামের দাপট অবশিষ্ট থাকাও প্রমাণিত হয়। কিন্তু এর বিপরীতে যদি কাফেররা তাদের আইন-কানুন প্রকাশ্যে জারি করে, আর মুসলমানরা তাদের সম্মতি ব্যতীত নিজেদের দাপটে নিজেদের আইন-কানুন জারি করতে সক্ষম না হয়, তাহলে ইসলামের কোনো দাপটই অবশিষ্ট থাকে না। **আর এটিই যুক্তিসঙ্গত**। কেননা যে অঞ্চলে কাফেররা এমনভাবে ক্ষমতাশীল হয় যে, তারা দাপটের সহিত প্রকাশ্যে তাদের আইন-কানুন জারি করে, আর মুসলমানরা এ পর্যায়ের অক্ষম ও পরাস্ত হয় যে, তারা তাদের আইন-কানুন জারি করতে পারে না এবং ইসলামের জন্য লজ্জাকর কুফরি বিধান দূর করতে সক্ষম নয়, তাহলে ইসলামের আর কোন স্তর অবশিষ্ট থাকে, যার ভিত্তিতে সেটিকে দারুল ইসলাম বলা হবে! বরং তখন তো কাফেরদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পূর্ণতায় পৌঁছে গেছে এবং তা এখন দারুল হারবে পরিণত হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে যা হওয়ার হবে, তবে এখন তা বাহ্যত দারুল হারব ও কাফেরদের করতলগত হওয়ার ব্যাপারে কোনো অস্পষ্টতা থাকেনি। প্রাচীন দারুল হারবের ন্যায় তা কাফেরদের কর্তৃত্বাধীন হয়ে গেছে, যা একেবারেই স্পষ্ট।" (তালিফাতে রশিদিয়া, পৃ: ৬৫৯)

'তারজিহ' প্রাধান্যের আলোচনায় ওয়াহবা আযযুহাইলি আশশাফেয়ির (মৃ: ১৪৩৬ হি:) আলোচনাটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন-

نحن نميل إلى رأي الصاحبين في عدم اعتبار شرط المتاخمة، لا سيما في مثل ظروف اليوم، حيث قربت وسائل النقل الحديثة البعيد من المسافات، فلا يبقى هناك أثر لمتاخمة الدار لدار الحرب حتى تكون دار حرب، ويكفي بحسب الظاهر سيادة الأحكام مع وجود السلطة حتى يتغير وصف الدار. وأما الأمن: فهو متوفر اليوم في أغلب بلاد العالم لأي مواطن، فالمسلم في باريس يستطيع إقامة شعائر الدين دون أن يخاف فتنة في دينه، وقد ذهب إلى هذا الرأي جمهور الفقهاء من مالكية وشافعية، فاعتبروا إقامة شعائر الإسلام هي التي تجعل الدار دار إسلام، فإذا انقطعت إقامة الشعائر وزال سلطان المسلمين، أصبحت الدار دار حرب. (آثار الحرب لوهبة الزحيلي، الباب الأول، الفصل الأول، المبحث الأول، صـ١٧٣)

"আমরা দারুল হারবের সংলগ্ন হওয়ার শর্তকে বিবেচনা না করার ক্ষেত্রে সাহেবাইনের মতকেই গ্রহণ করছি; বিশেষকরে বর্তমান প্রেক্ষাপটে। কেননা

স্থানান্তরের আধুনিক ব্যবস্থাপনা দূরবর্তী ব্যবধানকেও নিকটবর্তী করে দিয়েছে। সুতরাং দারুল হারব হওয়ার জন্য কোনো অঞ্চল দারুল হারব সংলগ্ন হওয়ার কোনো প্রভাব বাকি থাকেনি। বরং 'দার'র পরিচয় পরিবর্তন হওয়ার জন্য বাহ্যত ক্ষমতাবান হয়ে আইন-কানুনের কর্তৃত্বই যথেষ্ট। আর 'আমান' নিরাপত্তার বিষয়; সেটি তো বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রে যেকোনো অঞ্চলের জন্য পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আছে। একজন মুসলমান প্যারিসেও নিজের দ্বীনের ব্যাপারে কোনো ধরনের আশঙ্কা ছাড়াই দ্বীনের বিধানাবলী আদায় করতে পারে। মালেকি, শাফেয়ি তথা জুমহুর ফুকাহায়ে কেরাম এ (সাহেবাইনের) মতটিকেই গ্রহণ করেছেন। তারা এটিই গ্রহণ করেছেন যে, ইসলামি বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করাই কোনো অঞ্চলকে দারুল ইসলামে পরিণত করে দেয়। যখন বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করার অবসান ঘটে এবং মুসলমানদের কর্তৃত্ব নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন অঞ্চলটি দারুল হারবে পরিণত হয়ে যায়।" (আসারুল হারব পৃ: ১৭৩)

গ) তাতবিক (সামঞ্জস্য)

ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহেবাইন সকলের উদ্দেশ্য দারুল ইসলাম দারুল হারব সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ইসলামের দাপট নিঃশেষ হয়ে কুফরের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা হওয়া জরুরি। তবে সাহেবাইন মনে করেন, কুফরের আইন জারি হলেই ইসলামের দাপট নিঃশেষ হয়ে যায়, আর ইমাম আবু হানিফা রহ. আরো দুটি শর্তের উপস্থিতি জরুরি মনে করেন।

সমকালীন প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে ইমাম আবু হানিফার রহ. শর্তদুটির ব্যাখ্যায় ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য সামনে রাখলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দুটির কোনো একটির অনুপস্থিতিতে ইসলামের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা শেষ হওয়া প্রমাণিত হয় না, বরং মুসলমানদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় সে অঞ্চলে ইসলামের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের ঘুরে দাঁড়ানো ও কাফেরদের হাত থেকে তা উদ্ধার করার বিষয়টা অনেকটা নিশ্চিত থাকে। তাই এই সাময়িক সময়ের জন্য সে অঞ্চলকে দারুল হারবের হুকুম দিয়ে তা থেকে হিজরত করাসহ আনুষঙ্গিক মাসআলা প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই।

ইমাম আবু হানিফার রহ. সমকালীন অবস্থা মাথায় রেখে শর্তদুটির ব্যাখ্যায় ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যগুলো একটু গভীর মনোযোগে পড়লে আশা করি

আমাদের অনুধাবন করতে সহজ হবে যে, ইমাম আবু হানিফার রহ. উদ্দেশ্য কি শুধুই শর্তের শব্দগুলো নাকি বাস্তব প্রেক্ষাপট তথা মুসলমানদের দাপট ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিঃশেষ না হওয়াকে আমলে নেওয়া! কয়েকজন ফকিহের আলোচনা আমরা অধ্যয়ন করতে পারি।

আবু বকর আলজাসসাস (মৃঃ ৩৭০ হিঃ)

ইমাম আবু বকর আলজাসসাস প্রথমে সাহেবাইনের কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন-

قال أحمد: وذلك في نحو بلد القرمطي، أنه دار حرب وإن كان حواليه دار الإسلام في قولهما؛ لأن حكم الكفر قد ظهر فيه، لما أظهروا فيه من دين المجوس، وعبادة النيران، وشتم الرسول مُحَمَّد ﷺ، فلو أن إماماً عادلاً ظهر عليهم: جاز له استغراق أهله بالقتل، وسبي النساء والذرية، بمنزلة سائر دور الحرب.

ووجه هذا القول: أنَّ حكم الدار إنما يتعلق بالظهور والغلبة، وإجراء حكم الدين بها، والدليل على صحة ذلك: أنا متى غلبنا على دار الحرب، وأجرينا أحكامنا فيها: صارت دار إسلام، سواء كانت متاخمة لدار الإسلام أو لم تكن، فكذلك البلد من دار الإسلام، إذا غلب عليه أهل الكفر وجرى فيه حكمهم، وجب أن يكون من دار الحرب، ولا معنى لاعتبار بقاء ذمي أو مسلم آمناً على نفسه؛ لأن المسلم قد يأمن في دار الحرب، ولا يسلبه ذلك حكم دار الحرب، ولا يوجب أن يكون من دار الإسلام. (شرح مختصر الطحاوي، كتاب السير والجهاد، مسألة: بيان المراد بدار الحرب ودار الإسلام، ٢١٦/٧)

“আর তা ‘কারামিতা’ মুলহিদদের অধিকৃত অঞ্চলের ন্যায়। সাহেবাইনের মতানুযায়ী তা দারুল হারব, যদিও তা দারুল ইসলাম কর্তৃক বেষ্টিত। কেননা কুফরের বিধান তাতে প্রকাশ পেয়েছে। কারণ তারা তাতে ‘মাজুসি’ অগ্নিপূজকদের ধর্ম, আগুনের উপাসনা ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবমাননা প্রকাশ করেছে। সুতরাং কোনো নিষ্ঠাবান খলিফা যদি সেটি দখল করতে পারে, তাহলে অন্যান্য দারুল হারবের ন্যায় এ অঞ্চলের

অধিবাসীদের ব্যাপকভাবে হত্যা করা এবং মহিলা ও বাচ্চাদেরকে বন্দি করা তার জন্য জায়েয হবে।

এ মতের মূল কারণ হলো, 'দার'র হুকুমের সম্পৃক্ততা হচ্ছে দাপুটে ও ক্ষমতাশীল হওয়া ও তাতে দ্বীনের বিধি-বিধান জারি করার সঙ্গে। এটি সহিহ হওয়ার দলিল হচ্ছে, আমরা যখন কোনো দারুল হারব দখল করে তাতে আমাদের আইন-কানুন জারি করে দেই, তখন তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যায়; চাই তা দারুল ইসলামের সংলগ্ন হোক বা না হোক। ঠিক একইভাবে কাফেররা কোনো দারুল ইসলাম দখল করে তাতে তাদের আইন-কানুন জারি করলে তা দারুল হারবে পরিণত হওয়া প্রমাণিত হয়। মুসলমান বা 'যিম্মি'র নিরাপত্তা বহাল থাকাকে হিসেবে আনার কোনো অর্থ হয় না। কেননা মুসলমান তো কখনো দারুল হারবেও নিরাপদে থাকে। অথচ তা দারুল হারবের হুকুম বিলুপ্ত করে দারুল ইসলামে পরিণত হওয়াকে সাব্যস্ত করে না।" (শারহু মুখতাসারিত তহাবি, ৭/২১৬)

অতঃপর তিনি ইমাম আবু হানিফার রহ. কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন-

وأما وجه قول أبي حنيفة في اعتباره ما وصفنا من الخلال الثلاث: فهو أنها إذا لم تكن متاخمة لأرض الحرب، وحواليها دار الإسلام، فلا حكم لتلك الغلبة، **لأنها بعدُ في منعة المسلمين،** فهو بمنزلة سرية من أهل الحرب، لو التجؤوا إلى حصن من حصون المسلمين وأحاط به جيش المسلمين، فلا يوجب حصولهم في الحصن أن يصير الحصن من دار الحرب مع إحاطة جيوش الإسلام، فكذلك المدينة العظيمة إذا ارتد أهلها أو غلب عليها أهلها، وحواليها مدن الإسلام، **فمعلوم أنَّ منعة الإسلام باقية هناك، لإحاطتهم بها.**

واعتبر أيضاً جريان الحكم، لأن الموضع الذي تحصل فيه السرية من بقاع دار الإسلام وإن كانت متصلة بأرض الحرب، لا تصير من دار الحرب، لأنهم غير متمكنين لإجراء الحكم، وكذلك سرية المسلمين إذا دخلت دار الحرب، لا تصير البقاع التي حصلوا فيها من دار الإسلام، ما لم يتمكنوا فيها لإجراء أحكامهم.

واعتبر أيضاً: أن لا يكون هناك مسلم أو ذمي آمناً على نفسه، لأن كونه آمناً على نفسه، يبقي الموضع في حكم دار الإسلام على ما كان عليه، وذلك يمنع من انتقاله إلى

حكم دار الحرب. (شرح مختصر الطحاوي، كتاب السير والجهاد، مسألة: بيان المراد بدار الحرب ودار الإسلام، ٢١٧/٧)

“ইমাম আবু হানিফা রহ. যে তিনটি শর্ত গ্রহণ করেছেন তার কারণ হলো, যখন ওই অঞ্চলটি দারুল হারব সংলগ্ন না হয়ে দারুল ইসলাম কর্তৃক পরিবেষ্টিত হবে, তখন তাদের ওই ক্ষমতাশীল হওয়াকে হুকুমের আওতায় আনার প্রয়োজন নেই। **কেননা অঞ্চলটি এখনো মুসলমানদের প্রতিরক্ষায় রয়েছে**। এটির দৃষ্টান্ত হলো এমন যে, হারবিদের একটি সৈন্যদল মুসলমানদের একটি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, আর মুসলমানদের সৈন্যদল তা ঘিরে ফেলেছে। তো ইসলামের সৈন্যদের বেষ্টনীতে দুর্গের ভেতরে তাদের অবস্থান দুর্গকে দারুল হারবে পরিণত হওয়া সাব্যস্ত করে না। একইভাবে কোনো বড়ো শহরের অধিবাসীরা যদি মুরতাদ হয়ে যায় বা তা দখল করে নেয়, আর তার চতুষ্পার্শ্বে দারুল ইসলাম থাকে, **তাহলে জানা কথা যে, পরিবেষ্টিত হওয়ায় তাতে ইসলামের প্রতিরক্ষা বহাল আছে।**

এবং তিনি হুকুম জারি হওয়ার শর্ত করেছেন। কেননা দারুল ইসলামের যে অংশে সৈন্যদল রয়েছে, তা দারুল হারবের সংলগ্ন হলেও দারুল হারবে পরিণত হবে না। কারণ কাফেররা তাতে আইন-কানুন জারি করতে সক্ষম নয়। তেমনিভাবে মুসলমানদের সৈন্যদল যখন দারুল হারবে প্রবেশ করে, শুধু তাদের দখলে আসাতেই তা দারুল ইসলাম হয়ে যাবে না, যতোক্ষণ না তারা তাতে বিধি-বিধান জারি করতে সক্ষম হয়।

এবং তিনি কোনো মুসলমান বা ‘যিম্মি’ নিজের ব্যাপারে নিরাপদ না থাকারও শর্ত করেছেন। কেননা নিরাপদে থাকা স্থানকে পূর্বের ন্যায় দারুল ইসলামে থাকার হুকুম বহাল রাখে। আর তা দারুল হারবের হুকুমে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক।” (শারহু মুখতাসারিত তহাবি, ৭/২১৭)

শামসুদ্দিন আসসারাখসি (মৃ: ৪৯০ হি:)

ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহেবাইনের মতানৈক্য উল্লেখ করার পর ইমাম সারাখসি বলেন-

لأن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة، فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين، فكانت دار حرب، وكل موضع كان الظاهر فيه

حكم الإسلام فالقوة فيه للمسلمين.

ولكن أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعتبر تمام القهر والقوة، لأن هذه البلدة كانت من دار الإسلام محرزة للمسلمين، فلا يبطل ذلك الإحراز إلا بتمام القهر من المشركين، وذلك باستجماع الشرائط الثلاث، **لأنها إذا لم تكن متصلة بالشرك فأهلها مقهورون بإحاطة المسلمين بهم من كل جانب، فكذلك إن بقي فيها مسلم أو ذمي آمن، فذلك دليل عدم تمام القهر منهم.**

وهو نظير ما لو أخذوا مال المسلم في دار الإسلام، لا يملكونه قبل الإحراز بدارهم لعدم تمام القهر، ثم ما بقي شيء من آثار الأصل فالحكم له دون العارض، كالمحلة إذا بقي فيها واحد من أصحاب الخطة فالحكم له دون السكان والمشترين، وهذه الدار كانت دار إسلام في الأصل فإذا بقي فيها مسلم أو ذمي فقد بقي أثر من آثار الأصل فيبقى ذلك الحكم، وهذا أصل لأبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى قال: إذا اشتد العصير ولم يقذف بالزبد لا يصير خمراً لبقاء صفة السكون.

وكذلك حكم كل موضع معتبر بما حوله، فإذا كان ما حول هذه البلدة كله دار إسلام لا يعطى لها حكم دار الحرب كما لو لم يظهر حكم الشرك فيها، **وإنما استولى المرتدون عليها ساعة من نهار.** (كتاب المبسوط للسرخسي، كتاب السير، باب المرتدين، ١٠/١١٤)

“কেননা কোনো ভূখণ্ড আমাদের দিকে বা কাফেরদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হবে শক্তি ও ক্ষমতার ভিত্তিতে। সুতরাং যে অঞ্চলে কুফর-শিরকের আইন-কানুন প্রকাশ পাবে ওই অঞ্চলের ক্ষমতা মুশরিকদের, তাই তা দারুল হারব সাব্যস্ত হবে। আর যে অঞ্চলে ইসলামের আইন-কানুন প্রকাশ্য থাকবে, তাতে মুসলমানদের ক্ষমতা প্রমাণিত হবে।

কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহ. পূর্ণ ক্ষমতা ও পরাক্রমশালী হওয়া বিবেচনায় নিয়েছেন। কেননা এই অঞ্চলটি মুসলমানদের সংরক্ষণে থেকে দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। সুতরাং মুশরিকদের ক্ষমতার পূর্ণতা ব্যতীত ওই সংরক্ষণ বাতিল হবে না। আর তা শর্ত তিনটির উপস্থিতিতেই সাব্যস্ত হবে। **কারণ, যখন তা দারুল হারব সংলগ্ন হবে না, তখন তার অধিবাসীরা**

চতুর্দিক থেকে মুসলমানদের বেষ্টনীতে পরাভূত হয়ে থাকবে। একই কথা যখন মুসলমান ও 'যিম্মি'রা তাতে নিরাপদে থাকবে। আর এটিই তাদের (কাফেরদের) ক্ষমতার অপূর্ণতার দলিল।

তার দৃষ্টান্ত হলো, কাফেররা যদি দারুল ইসলামে মুসলমানের মাল নিয়ে নেয়, তাহলে দারুল হারবে সংরক্ষণের আগ পর্যন্ত কর্তৃত্বের অপূর্ণতার কারণে তাদের মালিকানা সাব্যস্ত হবে না। এছাড়াও যতোক্ষণ পর্যন্ত মূলের কোনো নিদর্শন অবশিষ্ট থাকবে, হুকুম তারই হবে, পরে আসা বিষয়ের নয়।[২৯] যেমন কোনো মহল্লার মূল ভূমির মালিকদের যদি একজনও অবশিষ্ট থাকে, তাহলে হুকুম তার হবে, বসবাসকারী ও ক্রেতাদের নয়। এ অঞ্চলটি মূলত দারুল ইসলাম ছিলো। সুতরাং মুসলমান বা 'যিম্মি' (নিরাপদে) থাকার অর্থ তাতে মূলের প্রভাব অবশিষ্ট আছে, তাই সে হুকুম বহাল থাকবে। এটি ইমাম আবু হানিফার রহ. একটি মূলনীতি। তাই আঙ্গুরের রস যদি গাঢ় হয়ে যায় কিন্তু তাতে ফেনা উথলে না উঠে, তা 'খমর' মদ সাব্যস্ত হবে না। কেননা তাতে স্থিরতার বিশেষণ অবশিষ্ট আছে।

এভাবেই প্রত্যেক অঞ্চলের হুকুম ধর্তব্য হবে তার আশপাশ হিসেবে। তাই এই অঞ্চলের চারদিকে যেহেতু দারুল ইসলাম, সুতরাং তাকে দারুল হারবের হুকুম দেয়া হবে না। যেমনিভাবে যদি তারা তাতে কুফর-শিরকের বিধান প্রকাশ না করে। **মনে করতে হবে মুরতাদরা দিনের কিছু সময়ের জন্য তা দখল করেছে।"** (কিতাবুল মাবসুত, ১০/১১৪)

আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে উমর আলআত্তাবি (মৃঃ ৫৮৫ হিঃ)

ইমাম আবু হানিফার রহ. শর্তগুলো উল্লেখ করার পর ইমাম আহমাদ আলআত্তাবি বলেন-

فشرط هذه الشرائط لتكون عَلَماً على تمام القهر والاستيلاء. (شرح الزيادات للعتابي – المخطوطة– كتاب السير، باب من السير ما يغلب عليه من أرض المسلمين أو المرتدون ثم

---

২৯. মূল তথা দারুল ইসলাম যেহেতু দারুল ইসলাম হয়েছে ইসলামের কর্তৃত্বের কারণে, সুতরাং 'মূলের কোনো নিদর্শন' বলে সারাখসি রহ. কর্তৃত্বের নিদর্শনই বুঝাতে চেয়েছেন; যা তার পুরো আলোচনার আলোকে স্পষ্ট। তাই বাহ্যিক শব্দ ও উদাহরণের কারণে প্রতারিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

يظهر عليهم الإمام، صـ١٢١)

"তিনি এই শর্তগুলো আরোপ করেছেন, যেনো তা পূর্ণ কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার প্রমাণ বহন করে।" (শারহুয যিয়াদাত, -পাণ্ডুলিপি- পৃ: ১২১)

আলাউদ্দিন আলকাসানি (মৃ: ৫৮৭ হি:)

ইমাম আলাউদ্দিন কাসানি প্রথমে সাহেবাইনের কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন-

وجه قولهما: أن قولنا دار الإسلام ودار الكفر إضافة دار إلى الإسلام وإلى الكفر، وإنما تضاف الدار إلى الإسلام أو إلى الكفر لظهور الإسلام أو الكفر فيها، كما تسمى الجنة دار السلام والنار دار البوار لوجود السلامة في الجنة والبوار في النار، وظهور الإسلام والكفر بظهور أحكامهما، فإذا ظهر أحكام الكفر في دار فقد صارت دار كفر فصحت الإضافة، ولهذا صارت الدار دار الإسلام بظهور أحكام الإسلام فيها من غير شريطة أخرى، فكذا تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها. والله سبحانه وتعالى أعلم. (بدائع الصنائع للكاساني، كتاب السير، فصل وأما بيان الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين، ١٣٠/٧)

"সাহেবাইনের মতের কারণ হলো, আমরা দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর বলে 'দার'কে ইসলাম ও কুফরের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করছি। তো ইসলাম বা কুফরের প্রকাশের কারণেই ইসলাম বা কুফরের দিকে 'দার'কে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। যেমন জান্নাতে 'সালামাত'-শান্তি থাকায় জান্নাতকে 'দারুস সালাম' ও জাহান্নামে 'বাওয়ার'-ধ্বংস থাকায় জাহান্নামকে 'দারুল বাওয়ার' বলা হয়। আর ইসলাম বা কুফরের প্রকাশ উভয়টির আইন-কানুন প্রকাশের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। সুতরাং কোনো অঞ্চলে যখন কুফরি আইন-কানুন প্রকাশ পায়, তা দারুল কুফরে পরিণত হয়, ফলে সম্বন্ধযুক্ত করা সহিহ হয়। এ জন্যই কোনো শর্ত ছাড়া শুধু ইসলামের আইন-কানুন প্রকাশ পেলেই তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যায়। তেমনিভাবে কুফরি আইন-কানুন প্রকাশ পেলেই তা দারুল কুফরে পরিণত হয়ে যাবে।" (বাদায়েউস সানায়ে', ৭/১৩০)

অতঃপর তিনি ইমাম আবু হানিফার রহ. কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন-

وجه قول أبي حنيفة رحمه الله: أن المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام والكفر ليس هو عين الإسلام والكفر، وإنما المقصود هو الأمن والخوف، ومعناه: أن الأمان إن كان للمسلمين فيها على الإطلاق والخوف للكفرة على الإطلاق فهي دار الإسلام، وإن كان الأمان فيها للكفرة على الإطلاق والخوف للمسلمين على الإطلاق فهي دار الكفر، والأحكام مبنية على الأمان والخوف لا على الإسلام والكفر، فكان اعتبار الأمان والخوف أولى، فما لم تقع الحاجة للمسلمين إلى الاستئمان بقي الأمن الثابت فيها على الإطلاق فلا تصير دار الكفر.

وكذا الأمن الثابت على الإطلاق لا يزول إلا بالمتاخمة لدار الحرب، فتوقف صيرورتها دار الحرب على وجودهما.

مع ما إن إضافة الدار إلى الإسلام احتمل أن يكون لما قلتم واحتمل أن يكون لما قلنا وهو ثبوت الأمن فيها على الإطلاق للمسلمين، وإنما يثبت للكفرة بعارض الذمة والاستئمان، فإن كانت الإضافة لما قلتم تصير دار الكفر بما قلتم، وإن كانت الإضافة لما قلنا لا تصير دار الكفر إلا بما قلنا، فلا تصير ما به دار الإسلام بيقين دار الكفر بالشك والاحتمال على الأصل المعهود "إن الثابت بيقين لا يزول بالشك والاحتمال"، بخلاف دار الكفر حيث تصير دار الإسلام لظهور أحكام الإسلام فيها، لأن هناك الترجيح لجانب الإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام الإسلام يعلو ولا يعلى، فزال الشك.

على أن الإضافة إن كانت باعتبار ظهور الأحكام لكن لا تظهر أحكام الكفر إلا عند وجود هذين الشرطين، أعني المتاخمة وزوال الأمان الأول، **لأنها لا تظهر إلا بالمنعة ولا منعة إلا بهما**. والله سبحانه وتعالى أعلم. (بدائع الصنائع، كتاب السير، فصل وأما بيان الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين، ٧/١٣١)

"ইমাম আবু হানিফার রহ. মতের কারণ হলো, ইসলাম ও কুফরের দিকে 'দার'কে সম্বন্ধযুক্ত করা দ্বারা স্বয়ং ইসলাম ও কুফরই উদ্দেশ্য নয়, বরং তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'আমান ও খাওফ'-নিরাপত্তা ও শঙ্কা। অর্থাৎ যদি

সাধারণভাবে 'আমান'-নিরাপত্তা মুসলমানদের জন্য থাকে আর কাফেররা 'খাওফ'-শঙ্কায় থাকে, তাহলে তা দারুল ইসলাম। এর বিপরীতে যদি সাধারণভাবে 'আমান'-নিরাপত্তা কাফেরদের জন্য থাকে আর মুসলমানরা 'খাওফ'-শঙ্কায় থাকে, তাহলে তা দারুল কুফর। বিধি-বিধান ভিত্তি করে 'আমান ও খাওফ'র উপর, ইসলাম ও কুফরের উপর নয়। তাই সেটিকেই বিবেচনায় রাখা উত্তম। সুতরাং মুসলমানদের যদি 'আমান' গ্রহণের প্রয়োজন না হয়, তাহলে সে অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত 'আমান' সাধারণত বহাল থাকায় তা দারুল কুফরে পরিণত হবে না।

তেমনিভাবে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ 'আমান' দারুল কুফরের সংলগ্ন হওয়া ব্যতীত বিলুপ্ত হয় না। তাই শর্তদুটির (প্রতিষ্ঠিত 'আমান' সাধারণত বহাল থাকা ও দারুল হারব সংলগ্ন না হওয়া) উপস্থিতি সে অঞ্চলকে দারুল হারবে পরিণত হওয়া থেকে বিরত রাখে।

এছাড়াও ইসলামের দিকে 'দার'র সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার কারণ আপনারা যা বলেছেন তাও হতে পারে, আবার আমরা যা বলেছি তারও সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ সাধারণভাবে মুসলমানদের জন্য 'আমান' সাব্যস্ত হওয়া। আর কাফেরদের জন্য 'আমান' সাব্যস্ত হয়ে থাকে 'যিম্মা' চুক্তি বা 'আমান' গ্রহণ করার মাধ্যমে। যদি সম্বন্ধযুক্ত করার কারণ আপনারা যা বলেছেন তা হয়ে থাকে, তাহলে আপনাদের মতানুযায়ী দারুল কুফর হয়ে যাবে। আর যদি সম্বন্ধযুক্ত করার কারণ আমরা যা বলেছি তা হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের আরোপ করা শর্ত ব্যতীত দারুল কুফরে পরিণত হবে না। সুতরাং যে নিশ্চিত কারণে দারুল ইসলাম সাব্যস্ত হয়েছিলো, তা সন্দেহ ও সম্ভাবনার ভিত্তিতে দারুল কুফরে পরিণত হতে পারে না। কেননা প্রসিদ্ধ মূলনীতি রয়েছে, 'সুনিশ্চিত প্রমাণিত বিষয় সন্দেহ ও সম্ভাবনার ভিত্তিতে বিলুপ্ত হয় না।' কিন্তু এর বিপরীতে ইসলামের আইন-কানুন প্রকাশ হওয়ার দ্বারাই কোনো অঞ্চল দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যায়। কেননা সেক্ষেত্রে ইসলামের দিকের প্রাধান্য। কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইসলাম উঁচু থাকে নিচু হয় না। সুতরাং সন্দেহ দূর হয়ে গেছে।

আর যদি বলা হয়, সম্বন্ধযুক্ত হওয়া বিধি-বিধান প্রকাশ পাওয়ার বিবেচনায় হয়ে থাকে, (সেক্ষেত্রে আমরা বলবো,) এ দুটি শর্ত তথা দারুল হারব সংলগ্ন

হওয়া ও পূর্বের আমান বিলুপ্ত হওয়ার অনুপস্থিতিতে কুফরের বিধান প্রকাশ পাওয়া প্রমাণিত হয় না। **কেননা তাদের বিধি-বিধান প্রকাশ পাবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে, আর শর্তদু'টি ব্যতীত প্রতিরক্ষা সাব্যস্ত হয় না।"** (বাদায়েউস সানায়ে', ৭/১৩১)

ইমাম কাসানি রহ 'আমান ও খাওফ'-নিরাপত্তা ও শঙ্কাকে মূল ভিত্তি বানানো এবং তাঁর পূর্ব ও পরের অন্যান্য ফকিহের কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হওয়া না হওয়াকে মূল ভিত্তি বানানো; দুয়ের মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা একটি আরেকটির জন্য আবশ্যক। যদিও 'কর্তৃত্ব' শব্দের ব্যবহার বুঝার জন্য অধিক উপাদেয়।

হাসান ইবনে মানসুর কাযি খান (মৃ: ৫৯২ হি:)

ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহেবাইনের মতানৈক্য উল্লেখ করার পর ইমাম হাসান ইবনে মানসুর কাযি খান বলেন-

لهما: أن الدار إنما تنسب إلى الأصل باعتبار الولاية واليد، وإجراء الأحكام يدل على الولاية، فتثبت النسبة، ولهذا تصير دار الحرب دار الإسلام بمجرد إجراء الأحكام.

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الدار إنما تنسب إلى أهل الحرب عند ظهور قدرة أهل الحرب وغلبتهم وقوتهم، ولا يظهر إلا عند وجود هذه الشرائط كلها، أما عند عدم بعضها كانت الدلائل في حد التعارض، **لأنه إذا كان فيها مسلم آمن بإيمانه، أو ذمي آمن بأمانه الأول، فبقاؤه كذلك وامتناعه عن طلب الأمان لا يكون إلا بمنعة ظاهرة.**

وكذا إذا لم يكن متاخمة بأهل الحرب، لأن المسلمين إذا أحاطوا بها من كل جانب، يتوهم انقطاع يدهم عن ذلك المكان في كل ساعة وزمان، وتكون يد أهل الإسلام على هذا المكان قائمة معنىً، فإذا كانت الدلائل في حد التعارض، يبقى ما كان على ما كان، أو يترجح جانب الإسلام احتياطاً. (شرح الزيادات لقاضي خان، كتاب السير، باب من السير مما يغلب عليه المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون، ٢٠٢٢/٦)

"সাহেবাইনের দলিল হলো, মূল তথা ইসলাম বা কুফরের দিকে 'দার'র সম্বন্ধ হবে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ভিত্তিতে। আর আইন-কানুন জারি করা কর্তৃত্বের

প্রমাণ বহন করে। সুতরাং সেটির ভিত্তিতে সম্বন্ধযুক্ত হবে। তাই শুধু আইন-কানুন জারি করার মাধ্যমেই দারুল হারব দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যায়।

আর ইমাম আবু হানিফার রহ. দলিল হলো, হারবিদের দিকে 'দার'র সম্বন্ধ হবে তাদের ক্ষমতা, দাপট ও শক্তি প্রকাশ হলে। আর তা প্রকাশ হয় এই তিনটি শর্তের উপস্থিতিতেই। কোনো একটির অনুপস্থিতিতে কর্তৃত্বের প্রমাণ দ্বিমুখী হয়ে যায়। **কেননা মুসলমান তার ইমানের দাবিতে বা 'যিম্মি' তার পূর্বের 'আমান'র ভিত্তিতে নিরাপদ থাকা, তা বহাল থাকা ও তাদের নিকট 'আমান' চাওয়া থেকে বিরত থাকা প্রকাশ্য কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া হতে পারে না।**

তেমনিভাবে যখন তা দারুল হারব সংলগ্ন হবে না; কেননা মুসলমানরা যখন সে অঞ্চলকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রাখবে, তখন যে কোনো মুহূর্তে সে অঞ্চল থেকে তাদের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং নৈতিকভাবে সে অঞ্চলের উপর মুসলমানদের কর্তৃত্ব বহাল থাকে। তো কর্তৃত্বের প্রমাণ যেহেতু বিপরীতমুখী, তাই পূর্বের অবস্থার উপরই বহাল থাকবে, বা সতর্কতামূলক ইসলামের দিককে প্রাধান্য দেয়া হবে।" (শারহুয যিয়াদাত, ৬/২০২২)

বুরহানুদ্দিন মাহমুদ ইবনে আহমাদ আলবুখারি (মৃঃ ৬১৬ হিঃ)
ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহেবাইনের মতানৈক্য উল্লেখ করার পর ইমাম বুরহানুদ্দিন আলবুখারি বলেন-

فوجه قولهما في ذلك: أن الدار إنما تنسب إلى أهلها لثبوت يدهم عليها وقيام ولايتهم فيها، وإنما يعرف ثبوت اليد وقيام الولاية بإجراء الأحكام، فكانت العبرة لإجراء الأحكام، بهذا الطريق صارت دار الحرب دار الإسلام بمجرد إجراء أحكام الإسلام.

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الدار إنما تنسب إلى أهلها بظهور قوتهم وغلبتهم من كل وجه، وإنما تظهر قوة أهل الحرب وغلبتهم بالشرائط التي تقدمت، أما عند فقد شرط منها فالدلائل تكون معارضة، **لأنه إذا كان فيها أحد آمن بالأمان الأول فهو دلالة قوة أهل الأمان، لأن امتناع الإنسان لا يكون إلا بمنعة ظاهرة، وكذلك إذا لم تكن متاخمة بأرض الحرب، والمسلمون أحاطوا بها من جوانبها الأربع، فلا يكون لغلبة أهل الحرب وقوتهم قراراً لتوهم المدد للمسلمين من كل جانب.**

وإذا تعارضت الدلائل يبقى ما كان على ما كان، فلا يبطل حكم كونه دار الإسلام، أو يترجح كونه دار الإسلام لمرجح، وهو إعلاء كلمة الإسلام احتياطاً. (المحيط البرهاني للبرهان البخاري، كتاب السير، في الأرض التي يسلم عليها أهلها أو تفتح عنوة وما يغلب عليه المشركون من أرض المسلمين والمرتدون والناقضون للعهد ثم يغلب عليهم المسلمون، ٥/١١٤)

"সাহেবাইনের মতের কারণ হলো, কোনো 'দার' তার অধিবাসীদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয় তাতে তাদের ক্ষমতা প্রমাণিত হওয়া ও সেটির উপর তাদের কর্তৃত্ব বিদ্যমান থাকার কারণে। আর ক্ষমতার প্রমাণ ও কর্তৃত্ব বিদ্যমান থাকা বুঝা যায় আইন-কানুন জারি করার মাধ্যমে। সুতরাং আইন-কানুন জারি করাকেই হিসেবে আনা হবে। এই পদ্ধতিতেই শুধু ইসলামি আইন-কানুন জারি করার মাধ্যমে দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হয়ে যায়।

ইমাম আবু হানিফার রহ. দলিল হলো, কোনো 'দার'র সম্বন্ধ তার অধিবাসীদের দিকে হয় তাদের পূর্ণমাত্রায় শক্তি ও কর্তৃত্ব প্রকাশ হওয়ার মাধ্যমে। আর হারবি কাফেরদের শক্তি ও কর্তৃত্ব প্রকাশ হয় উল্লিখিত শর্তাবলী পাওয়া গেলে। কোনো একটির অনুপস্থিতিতে কর্তৃত্বের প্রমাণ দ্বিমুখী হয়ে যায়। **কেননা কেউ পূর্বের 'আমান'র ভিত্তিতে নিরাপদ থাকা নিরাপত্তাদাতাদের শক্তির প্রমাণ বহন করে। কারণ, কারো (অন্যের নিকট নিরাপত্তা চাওয়া থেকে) বিরত থাকা প্রকাশ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া হতে পারে না। তেমনিভাবে যখন তা দারুল হারব সংলগ্ন হয় না এবং মুসলমানরা চতুর্দিক থেকে সেটিকে পরিবেষ্টন করে রাখে, তখন হারবিদের কর্তৃত্ব ও শক্তির কোনো স্থায়িত্ব থাকে না। কেননা চতুর্দিক থেকে মুসলমানদের জন্য সাহায্য আসার সম্ভাবনা রয়েছে।**

তো কর্তৃত্বের প্রমাণ যেহেতু বিপরীতমুখী, তাই পূর্বের অবস্থার উপরই বহাল থাকবে এবং দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত থাকার হুকুম বাতিল হবে না বা সতর্কতামূলক ইসলামের দিককে প্রাধান্য দেয়া হবে। কেননা প্রাধান্য দেয়ার কারণ রয়েছে, আর তা হচ্ছে 'ইসলামের কালেমাকে সমুন্নত রাখা।" (আলমুহিতুল বুরহানি, ৫/১১৪)

শামসুদ্দিন আলকুহুস্তানি (মৃ: ৯৫০ হি:/৯৬২ হিজরির পূর্বে)

আল্লামা কুহুস্তানি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্তটি এভাবে উল্লেখ করেন-

والثاني: الاتصال بدار الحرب بحيث لا يكون بينهما بلدة من بلاد الإسلام **يلحقهم المدد منها**، والثالث: زوال الأمان الأول، أي لم يبق مسلم أو ذمي فيها آمناً إلا بأمان الكفار، أو لم يبق الأمان الذي كان للمسلم بإسلامه وللذمي بعقد الذمة قبل استيلاء الكفرة.

(جامع الرموز للقهستاني، كتاب الجهاد، ٤/٦٦٣)

"দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, এমনভাবে দারুল হারব সংলগ্ন হওয়া যে, উভয় অঞ্চলের মাঝে এমন কোনো দারুল ইসলাম না থাকা, **যা থেকে তাদের নিকট সাহায্য পৌঁছাতে পারে**। তৃতীয় শর্ত হচ্ছে, পূর্বের 'আমান' বিলুপ্ত হওয়া; অর্থাৎ মুসলমান বা 'যিম্মি' কাফেরদের দেয়া 'আমান' ব্যতীত নিরাপদ না থাকা, অথবা কাফেরদের কর্তৃত্বের পূর্বে মুসলমানের ইসলামের দাবিতে এবং 'যিম্মি'র 'যিম্মা' চুক্তির ভিত্তিতে যে 'আমান' ছিলো তা বহাল না থাকা।" (জামেউর রুমুয, ৪/৬৬৩)

ইবনে আবেদিন আশশামি (মৃ: ১২৫২ হি:)

আল্লামা ইবনে আবেদিন শামি শর্তের আলোকে উদাহরণ দিয়ে বুঝাতে গিয়ে বলেন-

قلت: وبهذا ظهر أن ما في الشام من "جبل تيم الله" المسمى بجبل الدُّرُوز وبعض البلاد التابعة كلها دار إسلام، لأنها وإن كانت لها حكام دروز أو نصارى، ولهم قضاة على دينهم وبعضهم يعلنون بشتم الإسلام والمسلمين، **لكنهم تحت حكم ولاة أمورنا، وبلاد الإسلام محيطة ببلادهم من كل جانب وإذا أراد ولي الأمر تنفيذ أحكامنا فيهم نفذها**.

(رد المحتار، كتاب الجهاد، الباب الثالث باب المستأمن، مطلب فيما تصير به دار الإسلام دار حرب وبالعكس، ٦/٢١٥)

"আমি (ইবনে আবেদিন শামি) বলছি, এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, শামের 'জাবালে তাইমিল্লাহ' যেটিকে 'জাবালে দুরুয' বলা হয় এবং কিছু অধীনস্থ অঞ্চল; সবই দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত। কেননা যদিও তাতে 'দুরুয' বা খৃস্টান শাসক রয়েছে, তাদের ধর্মীয় বিচারক রয়েছে এবং কেউ কেউ প্রকাশ্যে

ইসলাম ও মুসলমানদের অবমাননা করে, **কিন্তু তারা আমাদের শাসকদের হুকুমের অধীনে, চতুর্দিক থেকে দারুল ইসলাম তাদের অঞ্চলকে ঘিরে রেখেছে এবং আমাদের শাসক তাদের ক্ষেত্রে আমাদের আইন-কানুন বাস্তবায়ন করতে চাইলে বাস্তবায়ন করতে পারবে।** (রদ্দুল মুহতার, ৬/২১৫)

রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি (মৃ: ১৩২৩ হি:)

রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রহ. কর্তৃক সাহেবাইনের মতকে প্রাধান্য দেয়া ও সে পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করার আলোচনা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। অতঃপর তিনি ইমাম আবু হানিফার রহ. অতিরিক্ত শর্তদু'টির 'তাতবিকি' সামঞ্জস্যমূলক আলোচনা করতে গিয়ে বলেন-

واما ابو حنیفہ بنظر خفی واستحسان فرمودہ ودار اسلام را بحکم دار کفر دادن احتیاط کردہ، تا چیزے از آثار غلبہ یافتہ شود یا در استیلاء کفار وہن محسوس گردد کہ رفع بر مسلمان سخت بنماید حکم بدار کفر نباید کرد، پس دو شرط دیگر زائد فرمود۔ یکے آں کہ آں دیہ وبلد مستولی علیہ الکفار متصل بدار کفر گردد، چنانچہ در میان ایں قریہ مستولی علیہا ودار حرب موضع از دار اسلام حائل نمائد کہ بایں اتصال وانقطاع از دار اسلام بآں پیدا می شود کہ باحد از کفار درآمد وغلبہ وقہر کفار بقوۃ باشد واستخلاص آں از دست کفرۃ دشوار گردید ومقہوریت مسلمین سکان آنجا بکمال رسید.............، پس حاصل ایں شرط ہم ہمون غلبہ کفار ومغلوبیت اہل اسلام کہ اصل کلی اولاً بیان کردہ شد۔

شرط دوم۔ شرط دوم آنکہ امانے کہ حاکم اسلام بسبب غلبہ حکومت خود مسلمانان را بسبب اسلام وکفار رعایا را بوجہ عقد ذمہ دادہ بود مرتفع گردد، کہ بآں امان کس بر نفس وجان ومال مامون نماند، یعنی چنانکہ بسبب امن دادن حاکم اسلام ہمہ مامون شدہ بودند کہ کس را بسبب خوف حاکم آں مجال نبود کہ تعرض بجان ومال مسلم وذمی نماید، وایں نبود مگر بسبب غلبہ قوت وشوکت حاکم مسلم، پس ایں امان باقی نماند کہ کس بوجہ ایں امان بے خدشہ از تعرض جان ومال خود مامون نبود، بلکہ ایں امان بے کار محض گردد، وامانے کہ مشرکین مستولین دہند موجب امن گردد۔ پس ظاہر است کہ تا بسبب امن حاکم مسلم خوف موذی رفع خواہد بود غلبہ وشوکت آمن مسلم بنوعے باقی خواہد ماند، وہر گاہ کہ درآں چیزے نماند بلکہ امن مشرک تسلط محط نظر گردید، امان اول رفع شد۔ پس نزد امام علیہ الرحمۃ ہر گاہ کہ بعد اجرائے حکم کفر علی الاشتہار ایں دو شرط ہم یافتہ شد غلبہ کفر من کل الوجوہ ثابت شد وغلبہ

اسلام من کل الوجوہ رفع گردید، اکنوں بدار حرب ناچار حکم خواہد شد۔

اہل دانش را از یں ہم معلوم می شود کہ مدار ایں قول ہم بر قہر و غلبہ است وبس کہ اول در اصل کلی واضح کردہ شد۔

(تالیفات رشیدیہ، فیصلۃ الاعلام فی دار الحرب ودار الاسلام، ص ٦٧٠)

"কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহ. সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এবং দারুল কুফরের হুকুম দেয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে বলেছেন যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের দাপটের কোনো প্রভাব অবশিষ্ট থাকবে এবং কাফেরদের কর্তৃত্বে দুর্বলতা অনুভূত হবে, যার ফলে সে কর্তৃত্ব হটিয়ে দেয়া মুসলমানদের জন্য জটিল হবে না, ততোক্ষণ পর্যন্ত সে অঞ্চলকে দারুল কুফরের হুকুম না দেয়া চাই। এ জন্য ইমাম আবু হানিফা রহ. দু'টি অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করেছেন। একটি হচ্ছে, কাফেরদের দখলকৃত অঞ্চল দারুল কুফর সংলগ্ন হওয়া এবং উভয়ের মাঝে কোনো দারুল ইসলাম প্রতিবন্ধক না হওয়া। কেননা দারুল হারব সংলগ্ন হওয়া আর দারুল ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রমাণ করে যে, এ অঞ্চল এখন পূর্ণমাত্রায় কাফেরদের দখলে চলে গেছে, তাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা পাকাপোক্ত হয়ে গেছে, তাদের দখল থেকে তা উদ্ধার করা জটিল হয়ে পড়েছে এবং সেখানে বসবাসরত মুসলমানদের পরাভূত হওয়া পূর্ণমাত্রায় সাব্যস্ত হয়ে গেছে......................। এ শর্তেরও সারকথা সেই কাফেরদের কর্তৃত্ব ও মুসলমানদের পরাস্ত হওয়া; যা প্রথমেই মূলনীতি হিসেবে বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, ইসলামের শাসক নিজের শাসনের ক্ষমতাবলে মুসলমানদেরকে ইসলামের কারণে এবং কাফের প্রজাদেরকে 'যিম্মা' চুক্তির ভিত্তিতে যে 'আমান' নিরাপত্তা দিয়েছিলেন তা উঠে যাওয়া যে, কেউ পূর্বের 'আমান'র ভিত্তিতে নিজের জান-মালের ব্যাপারে নিরাপদ নয়। অর্থাৎ মুসলিম শাসকের নিরাপত্তা প্রদানের কারণে এমন নিরাপদে ছিলো যে, শাসকের ভয়ে কোনো মুসলামান বা 'যিম্মি'র জান-মালে হস্তক্ষেপ করার মতো সাহস কারো ছিলো না। আর এটি মুসলিম শাসকের শক্তি ও ক্ষমতার দাপটেই সম্ভব। এ 'আমান' আর অবশিষ্ট থাকেনি যে, কেউ তার জান-মালে হস্তক্ষেপ না হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্তে থাকবে। বরং এ 'আমান' এখন অনর্থক হয়ে গেছে এবং ক্ষমতাশীল মুশরিকদের দেয়া 'আমান'ই নিরাপত্তার কারণ হয়েছে। সুতরাং এটিই স্পষ্ট যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম শাসকের 'আমান'র কারণে

অনিষ্টকরের শঙ্কামুক্ত থাকবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম শাসকের এক প্রকারের কর্তৃত্ব ও দাপট প্রমাণিত হবে। আর যখন তাও অবশিষ্ট থাকবে না, বরং ক্ষমতাশীল মুশরিকের নিরাপত্তার দিকেই দৃষ্টি থাকবে, তখন পূর্বের 'আমান' শেষ হয়ে যাওয়া প্রমাণিত হয়ে যাবে। তো ইমাম আবু হানিফার রহ. মতে যে অঞ্চলে কুফরের বিধান প্রকাশ্যে জারি করার সঙ্গে সঙ্গে এ দু'টি শর্তও পাওয়া যাবে, সেখানে কুফরের দাপট পরিপূর্ণভাবে সাব্যস্ত হবে এবং ইসলামের দাপট পরিপূর্ণভাবে নিঃশেষ হওয়া প্রমাণিত হবে। এখন আর এ অঞ্চলকে দারুল হারবের হুকুম না দিয়ে উপায় নেই।

বিবেকবানদের নিকট স্পষ্ট হয়ে গেছে, এ শর্তের ভিত্তিও কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার উপর, যা প্রথমেই মূলনীতি হিসেবে বলা হয়েছে।" (তালিফাতে রশিদিয়া, পৃ: ৬৬০)

অতঃপর গাঙ্গুহি রহ. ফুকাহায়ে কেরামের কিছু বক্তব্য উল্লেখ করে আবারও স্পষ্ট করে বলেছেন-

الحاصل: غرض ازیں شروط ثلاثہ نزد امام واز یک شرط کہ اجرائے حکم اسلام است نزد صاحبین ہمون وجود غلبہ وقوت مراد است اگر ببعض وجوہ باشد، وہیچ اہل فقہ نمی گوید کہ در ملک کفار اگر کسے باذن ایشاں صراحۃً یا دلالۃً اظہار شعائر اسلام کند، آں ملک دار الاسلام می شود، حاشا وکلا کہ ایں دور از تفقہ است۔ (تالیفات رشیدیہ، فیصلۃ الاعلام فی دار الحرب ودار الاسلام، ص٦٦٧)

"সারকথা, ইমাম আবু হানিফার রহ. তিন শর্ত ও সাহেবাইনের এক শর্ত তথা ইসলামের আইন-কানুন জারি করা; উভয়টার উদ্দেশ্য একই, অর্থাৎ কর্তৃত্ব ও দাপট বিদ্যমান থাকা। চাই তা কিছু দিকের বিবেচনায় হোক না কেনো। কোনো ফকিহ এ কথা বলেননি, কুফরি রাষ্ট্রে তাদের স্পষ্ট সম্মতিতে বা তাদের পক্ষ হতে ছাড় দেয়ার কারণে কেউ যদি 'শাআয়েরে ইসলাম' ইসলামের মৌলিক নিদর্শন প্রকাশ করতে পারে, ওই রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হয়ে যাবে। এটি কখনো হতে পারে না। এ ধরনের ধারণা করাও তো 'তাফাক্কুহ' বহির্ভূত।" (তালিফাতে রশিদিয়া, পৃ: ৬৬৭)

এ অঞ্চলের একটি উদাহরণ

ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত অতিরিক্ত শর্তদু'টির ব্যাখ্যায় ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য ও উদাহরণের আলোকে এ অঞ্চলের একটি উদাহরণ পেশ করলে বিষয়টি অনুধাবন করতে সহজ হবে, ইনশাআল্লাহ।

উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডটি একটি দারুল ইসলাম যা কেন্দ্রীয় খিলাফতের অধীনে রয়েছে। (আল্লাহ তাআলা এ ভূখণ্ডকে দারুল ইসলামে পরিণত করে দিন। আমিন।) কিন্তু এর মধ্যখানে টাঙ্গাইল অঞ্চলের সকলে মুরতাদ হয়ে গেছে, বা তারা চুক্তিবদ্ধ কাফের ছিলো, এখন চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলেছে, বা অন্য হারবিরা তা দখল করে নিয়েছে। তো এ অঞ্চলকে বাস্তবেই দারুল ইসলাম থেকে বহির্ভূত মনে করার প্রয়োজন নেই। কেননা বুঝাই যাচ্ছে, এটা তাদের হাতে একেবারেই সাময়িক, বরং তারা তাদের আইন-কানুন জারি করতেও সাহস পাবে না।

অথবা উদাহরণস্বরূপ, উপর্যুক্ত বিবরণসমৃদ্ধ টাঙ্গাইল সংলগ্ন প্রাচীন দারুল হারব ময়মনসিংহ রয়েছে। যদিও টাঙ্গাইল তখন দারুল ইসলাম কর্তৃক বেষ্টিত নয়, কিন্তু সেখানের মুসলমান বা 'যিম্মি' যদি পূর্বের 'আমান' সাধারণত বহাল থাকার ভিত্তিতে নিরাপদ থাকে, তাহলে তখনো সেটিকে দারুল ইসলাম বহির্ভূত মনে করার প্রয়োজন নেই। কেননা, তখনো স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, কাফেরদের ক্ষমতা একেবারেই দুর্বল, এবং মুসলমানদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় যেকোনো মুহূর্তে তাদের হাত থেকে তা উদ্ধার করা সম্ভব।

তো ইমাম আবু হানিফার রহ. সমকালীন অবস্থার বিবেচনায় অতিরিক্ত শর্ত আরোপে কোনো অস্পষ্টতা নেই। কিন্তু ইমাম আবু বকর আলজাসসাস জিহাদের ব্যাপারে চতুর্থ শতকের মুসলমানদের যে অবস্থা তুলে ধরে সাহেবাইনের মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন, সে অবনতি দিন দিন কোন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, তা মনে হয় চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর প্রয়োজন নেই। বিশেষকরে যখন জিহাদবিদ্বেষী আলেম নামধারী 'মুলহিদ'দের বিশাল কাফেলা তৈরি হয়ে গেছে। এ পর্যায়ে এসে ইমাম আবু হানিফার রহ. শর্তের উদ্দেশ্য অনুভব না করা বা সাহেবাইনের মতের প্রাধান্যের ব্যাপারে সংশয়ে পড়া সত্য ও বাস্তবতাকে ধামাচাপা দেয়ার নামান্তর।

পূর্বের ন্যায় পাঠকদের নিকট আবারও আবেদন করছি; তারজিহের আলোচনায় উল্লিখিত ইমাম আবু বকর আলজাসসাসের কথাগুলো ও ইমাম আবু হানিফার রহ. সমকালীন অবস্থা মাথায় রেখে আমরা ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যগুলো আবারও পড়ি, মোটা হরফে লেখা অংশগুলো বারবার পড়ি এবং বিশেষকরে তাতবিকের আলোচনায় উল্লিখিত আবু বকর আলজাসসাস, কাযি

খান ও বুরহানুদ্দিন আলবুখারির আলোচনাটি গভীর মনোযোগে পড়ি। তাহলে স্পষ্ট হয়ে যাবে, ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত অতিরিক্ত শর্তদুটি দ্বারা শর্তের শব্দগুলো উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, শর্তদুটির উপস্থিতিতে কুফরের কর্তৃত্ব পূর্ণমাত্রায় সাব্যস্ত হয় এবং মুসলমানদের এমনভাবে পরাস্ত হওয়া প্রমাণিত হয় যে, আপাতদৃষ্টিতে তাদের কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেখা যায় না। কিন্তু কোনো একটির অনুপস্থিতিতে মুসলমানদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকা প্রমাণিত হয়, যার ফলে যেকোনো মুহূর্তে কুফরি শক্তির হাত থেকে তা উদ্ধার করতে পারার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। যেমনটি রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহির কথা থেকে স্পষ্ট যে, ইমাম আবু হানিফার তিন শর্ত ও সাহেবাইনের এক শর্ত; উভয়টার উদ্দেশ্য একই। অর্থাৎ কুফরের কর্তৃত্ব ও দাপট পূর্ণমাত্রায় সাব্যস্ত হওয়া এবং ইসলামের কর্তৃত্ব পূর্ণমাত্রায় পরাভূত হওয়া।

সুতরাং যে সকল অঞ্চলে ইসলামি খিলাফতকে বিলুপ্ত করে, আল্লাহ প্রদত্ত সংবিধানের কবর রচনা করে মানবরচিত আইনকে সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, ইসলামি আইন বাস্তবায়ন করার কোনো সুযোগ রাখা হয়নি এবং এ অবস্থার উপর যুগের পর যুগ, শতকের পর শতক পার হয়ে চলছে; এ সকল অঞ্চলে কুফরের কর্তৃত্ব পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত ও ইসলামের দাপট পরিপূর্ণ নিঃশেষ হওয়ায় ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহেবাইন সকলের মতে সূচনালগ্নেই তা দারুল হারব সাব্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এতো যুগ পরে কর্তৃত্বের বিষয়টি আরো স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যারা ইমাম আবু হানিফার রহ. শর্তের ধুয়ো তুলে এ সকল অঞ্চলের ব্যাপারে সংশয়ে আছেন ও সংশয় সৃষ্টি করছেন, তাদের অবস্থান বাস্তবেই দুঃখজনক। وابك على ذلك -إن استطعت- دماً।

উপর্যুক্ত বক্তব্যগুলোর আলোকে প্রমাণিত কয়েকটি কথা

এ পর্যন্ত উল্লিখিত ফুকাহায়ে কেরামের আলোচনা থেকে আরো কিছু বিষয় প্রমাণিত হয়; তৃতীয় বিষয়ের আলোচনার পূর্বে কথাগুলো স্পষ্ট করা জরুরি মনে করছি।

ক) দারুল হারব দারুল ইসলামে পরিণত হওয়ার পদ্ধতি একটিই; আর তা হচ্ছে, সেখানে ইসলামি আইন-কানুন জারি হওয়া। এ ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই।

এর দ্বারা যারা দাবি করেন যে, 'পূর্বের ফুকাহায়ে কেরামের সংজ্ঞা অনুযায়ী তো এখন আমেরিকাকেও দারুল হারব বলা যাবে না। কেননা সেখানেও একজন মুসলমান দাবি করে যে, আমি আমার অধিকার আদায়ের জন্য কথা বলতে পারি।' তা যথাযথ না হওয়া প্রমাণিত হয়ে যায়। কেননা পূর্বের ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য অনুযায়ীই আমেরিকা দারুল ইসলামে পরিণত হওয়ার পদ্ধতি একটিই; আর তা হচ্ছে, সেখানে ইসলামি আইন-কানুন জারি হওয়া। কোনো ফকিহ এ কথা বলেননি যে, অধিকার আদায়ের কথা বলতে পারলেই দারুল হারব দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যায়। সুতরাং পূর্বের ফুকাহায়ে কেরামের সংজ্ঞা অনুযায়ী আমেরিকা আগেও দারুল হারব ছিলো, এখনো দারুল হারব এবং সেখানে ইসলামি আইন-কানুন জারি হওয়ার আগ পর্যন্ত দারুল হারবই থাকবে।

খ) ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত অতিরিক্ত শর্তদু'টির সম্পর্ক দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার সঙ্গে। ইসলামি আইন-কানুন জারি হয়ে যে অঞ্চল কখনো দারুল ইসলামে পরিণত হয়নি, সেই প্রাচীন দারুল হারবের সঙ্গে শর্তকেন্দ্রিক এ আলোচনার কোনো সম্পর্ক নেই।

আমার মনে হয়, কারে কারো ভুল বোঝাবুঝি এখান থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তারা হয়তো শর্তগুলোকে ব্যাপকভাবে দারুল হারব সাব্যস্ত হওয়ার জন্য প্রযোজ্য মনে করেছেন; তাও আবার শর্তের বাহ্যত শব্দের ভিত্তিতে। কিন্তু বাস্তবতার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

গ) কোনো দারুল ইসলাম কাফেরদের দখলে যাওয়ার পরও দারুল হারবে পরিণত হওয়ার জন্য ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত শর্তগুলোর কোনো একটির অনুপস্থিতিতে তা দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকার অর্থ এই নয় যে, সে অঞ্চলের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করা যাবে না। বরং তা দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকার সম্পর্ক সেখান থেকে হিজরত করা জরুরি নয় এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক মাসআলার সঙ্গে। কেননা ওই অঞ্চল দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকার কারণ তো বলাই হয়েছে, মুসলমানরা যেকোনো মুহূর্তে সেখানের কর্তৃত্ব গ্রহণ করার সম্ভাবনা থাকা। আর তা অবশ্য যুদ্ধ পরিচালনা করা ছাড়া হবে না। এজন্যই ইমাম আবু বকর আলজাসসাস সাহেবাইনের মতকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে জিহাদের বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

আমরা ফুকাহায়ে কেরাম বিশেষকরে জাসসাস ও কাযি খানের বক্তব্যটি আবারও পড়তে পারি।

এ কথাটি স্পষ্ট করে বলার কারণ হলো; অনেকেই মনে করেন, 'ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত শর্তগুলোর কোনো একটির অনুপস্থিতিতে দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকার অর্থ, সে অঞ্চলের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করা যাবে না।' অথচ এ ধারণাটি ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত।

আর যদি কেউ বলেন, আমাদের দৃষ্টিতে শর্তের অনুপস্থিতির কারণে যদিও আমরা ওই অঞ্চলগুলোকে দারুল ইসলাম মনে করি, তবে সে অঞ্চলের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করা যাবে না; এমনটি আমরা মনে করি না। এমনটি কারো দৃষ্টিভঙ্গি হলে আলোচ্য মাসআলায় তার সঙ্গে মতানৈক্য আশা করি অনেকটা কমে আসবে।إذا عزَّ القوت فتمرة للجائع صبرة।

“

قال أبو زيد الدبوسي الحنفي: الأصل عندنا أن الدنيا كلها داران: دار الإسلام ودار الحرب. (تأسيس النظر، صـ١١٩)

”

-তিন-

কুরআন-সুন্নাহ ও চার মাযহাবের খিলাফত পতনের পূর্ব ও পরের ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পরিচয় নির্ধারণ

আমাদের এ পর্যন্ত আলোচনা থেকেও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কোনো ভূখণ্ড দারুল ইসলাম বা দারুল হারব হওয়ার মূল মাপকাঠি হচ্ছে, সে ভূখণ্ডে বাস্তবায়িত আইন-কানুন। ইসলামি আইন-কানুন জারি করা হলে সেটি হবে দারুল ইসলাম, আর মানবরচিত তথা কুফরি আইন-কানুন জারি করা হলে সেটি হবে দারুল হারব।

দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের এই পরিচয়কে বর্তমান সময়ের কেউ কেউ শুধুই 'কিয়াস'নির্ভর মনে করেছেন। তাই তাদের মুখে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের নতুন সংজ্ঞার অস্পষ্ট সুর শোনা যায়। অথচ দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের এই পরিচয় কুরআন-সুন্নাহর আলোকে গৃহীত; যদিও ফুকাহায়ে কেরাম পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে তা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেননি। এ জন্যই দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের মৌলিক ধারণায় ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে বিশেষ কোনো মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয় না।

যেহেতু সংশয় সৃষ্টি হয়েছে, তাই আমরা প্রথমে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পরিচয় প্রদান করে পরবর্তীতে ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য উল্লেখ করছি।

আলকুরআনুল কারিম

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ.

(سورة البقرة، الآية: ١٩٣)

"আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যে পর্যন্ত না ফিতনা খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। সুতরাং তারা যদি বিরত হয়, তাহলে যালিমরা ছাড়া (কারো উপর) কোনো কঠোরতা নেই।" (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৯৩)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
(سورة الأنفال، الآية: ٣٩)

"আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতোক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। তবে যদি তারা বিরত হয় তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তারা যা করে তার সম্যক দ্রষ্টা।" (সুরা আনফাল, আয়াত: ৩৯)

আয়াতদ্বয়ের অর্থ ও ব্যাখ্যা স্পষ্ট। মুফাসসিরিনে কেরামের বিভিন্ন বক্তব্যের সারাংশ প্রায় একই। তবে আলোচনার সুবিধার্থে একটু বিস্তারিত ও স্পষ্ট হওয়ায় দু'জন মুফাসসিরের তাফসিরের কিছু অংশ উল্লেখ করছি-

ফখরুদ্দিন রাযির (মৃ: ৬০৬ হি:) বক্তব্য

فإن قيل: كيف يقال (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ) مع علمنا بأن قتالهم لا يزيل الكفر وليس يلزم من هذا أن خبر الله لا يكون حقاً.

قلنا الجواب من وجهين: الأول: أن هذا محمول على الأغلب، لأن الأغلب عند قتالهم زوال الكفر والشرك، لأن من قتل فقد زال كفره، ومن لا يقتل يخاف منه الثبات على الكفر، فإذا كان هذا هو الأغلب جاز أن يقال ذلك.

الجواب الثاني: أن المراد قاتلوهم قصداً منكم إلى زوال الكفر، لأن الواجب على المقاتل للكفار أن يكون مراده هذا، ولذلك متى ظن أن من يقاتله يقلع عن الكفر بغير القتال وجب عليه العدول عنه.

أما قوله تعالى: (وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ) فهذا يدل على حمل الفتنة على الشرك، لأنه ليس بين الشرك وبين أن يكون الدين كله لله واسطة، **والمراد منه أن يكون تعالى هو المعبود المطاع دون سائر ما يعبد ويطاع غيره، فصار التقدير كأنه تعالى قال: وقاتلوهم حتى يزول**

الكفر ويثبت الإسلام، وحتى يزول ما يؤدي إلى العقاب ويحصل ما يؤدي إلى الثواب.

(التفسير الكبير للرازي، سورة البقرة -الآية: ١٩٣-، ١٤٣/٥)

"যদি প্রশ্ন জাগে, কীভাবে 'আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতোক্ষণ না ফিতনার (কুফর) অবসান হয়' বলা হলো, অথচ আমরা জানি যে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কুফরকে নিঃশেষ করে দেবে না এবং এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার বার্তা সত্য না হওয়া প্রমাণিত হয় না?

আমরা বলবো, এটির উত্তর দু'ভাবে দেয়া যায়। এক. তা আধিক্যের ভিত্তিতে বলা হয়েছে। কেননা কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হলে কুফর ও শিরক নিঃশেষ হওয়া অধিকতর। কারণ, যে নিহত হয়েছে তার কুফর নিঃশেষ হয়ে গেছে, আর যে নিহত হয়নি তার কুফরের উপর অবিচল থাকার আশঙ্কা আছে। যেহেতু যুদ্ধের মাধ্যমে নিহত হওয়াই অধিকতর, সুতরাং এভাবে বলা যথাযথ হয়েছে।

দুই. তা দ্বারা উদ্দেশ্য, তোমরা কুফর নিঃশেষ করার উদ্দেশ্যেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। কেননা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধার উদ্দেশ্য একমাত্র এটিই হওয়া আবশ্যক। এ জন্যই যার সঙ্গে যুদ্ধ করা হয় তার থেকে যুদ্ধ ব্যতীত কুফর দূর করার কোনো সম্ভাবনা তৈরি হলে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

আর আল্লাহ তাআলার বাণী 'এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়' অংশটি আয়াতে উল্লিখিত 'ফিতনা' দ্বারা শিরক উদ্দেশ্য হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কেননা শিরক এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হওয়ার মাঝে তৃতীয় কোনো স্তর নেই। **আর 'দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হওয়া' দ্বারা উদ্দেশ্য, অন্য সকল উপাস্য ও অনুসরণীয় বর্জিত হয়ে আল্লাহ তাআলাই একমাত্র মা'বুদ ও অনুসরণীয় হওয়া। তো কেমন যেনো আল্লাহ তাআলা এটিই বলেছেন, কুফর দূর হয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা এবং শাস্তিযোগ্য বিষয় দুর হয়ে সওয়াব আবশ্যকীয় বিষয় অর্জিত হওয়া পর্যন্ত তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।"** (আততাফসিরুল কাবির, ৫/১৪৩, সুরা বাকারা, আয়াত: ১৯৩)

আবু আব্দুল্লাহ আলকুরতুবির (মৃ: ৬৭১ হি:) বক্তব্য

فدلت الآية والحديث على أن سبب القتال هو الكفر، لأنه قال: "حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ" أي كفر، فجعل الغاية عدم الكفر، وهذا ظاهر. قال ابن عباس وقتادة والربيع والسدي وغيرهم: الفتنة هناك الشرك وما تابعه من أذى المؤمنين.........

الثانية: قوله تعالى: "فَإِنِ انْتَهَوْا" أي عن الكفر، إما بالإسلام كما تقدم في الآية قبل، أو بأداء الجزية في حق أهل الكتاب، على ما يأتي بيانه في"براءة" (تفسير القرطبي، سورة البقرة—الآية: ١٩٣-، ٢/٣٥٤)

“আয়াত ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, কিতালের সবব-কারণ হচ্ছে কুফর। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ফিতনা তথা কুফরের অবসান হওয়া পর্যন্ত। আল্লাহ তাআলা কুফর নিঃশেষ হওয়াকে শেষ সীমা নির্ধারণ করেছেন। বিষয়টি স্পষ্ট। ইবনে আব্বাস, কাতাদা, রবি‘ ও সুদ্দি প্রমুখ বলেছেন, আয়াতে ফিতনা দ্বারা শিরক ও মুমিনদের কষ্ট দেয়াসহ শিরক সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি উদ্দেশ্য...................।

দুই. আল্লাহ তাআলার বাণী ‘যদি তারা বিরত হয়’ অর্থাৎ কুফর থেকে; হয়তো ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে, যেমনটি পূর্বে আয়াতে উল্লেখ হয়েছে, অথবা আহলে কিতাবিরা ‘জিযয়া’ গ্রহণের মাধ্যমে, যার বিবরণ সুরা বারাআতের তাফসিরে আসবে।” (তাফসিরে কুরতুবি, ২/৩৫৪, সুরা বাকারা, আয়াত: ১৯৩)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার (মৃ: ৭২৮ হি:) বক্তব্য

তাতারিদের ব্যাপারে উত্থাপিত এক প্রশ্নের উত্তরে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার আলোচনার কিছু অংশ এখানে উল্লেখযোগ্য-

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: **فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال**، فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة، فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب.

فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال **والخمر والزنا** والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو **عن التزام جهاد الكفار** أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته -التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها- التي يكفر الجاحد لوجوبها، **فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها. وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء.** (مجموع الفتاوى، السياسة الشرعية، ما تقول في هؤلاء التتار، ٢٨/٥٠٢)

"বুঝা গেলো, ইসলামের বিধি-বিধান আঁকড়ে না ধরে শুধু ইসলাম গ্রহণ কিতাল-জিহাদের বিধানকে বিয়োজন করে না। সুতরাং ফিতনা (কুফর) নিঃশেষ হয়ে দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হওয়া পর্যন্ত কিতাল ওয়াজিব। যতোক্ষণ পর্যন্ত দ্বীন 'গাইরুল্লাহ'র জন্য থাকবে ততোক্ষণ পর্যন্ত কিতাল ওয়াজিব।

তো যে সম্প্রদায় কোনো ফরয সালাত, সাওম ও হজ্ব থেকে বিরত থাকে বা অন্যের জান-মাল, **'খামার'-মদ, 'যিনা'-ব্যভিচার,** জুয়া ও 'মাহরাম'র (যাদের সঙ্গে বিবাহ হারাম) সঙ্গে বিবাহ হারাম হওয়া গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে অথবা **কাফেরদের সঙ্গে জিহাদ** বা 'আহলে কিতাব' ইহুদি-খৃস্টানদের উপর 'জিযয়া' আরোপ করা ইত্যাদি দ্বীনের ওয়াজিব ও হারাম বিষয়াদি গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে; যেগুলো অস্বীকার ও বর্জন করার ক্ষেত্রে কারো 'ওযর' গ্রহণযোগ্য নয় এবং যেগুলোর 'উজুব' আবশ্যকীয়তা অস্বীকারকারীকে কাফের আখ্যা দেয়া হয়; **এই নিবৃত্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে কিতাল-জিহাদ করা হবে, যদিও সেগুলোকে স্বীকার করে। আর এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মাঝে কোনো মতানৈক্য আছে বলে আমার জানা নেই।"** (মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৮/৫০২)

আয়াতের তাফসির সামনে আসার পর আমরা এখন সহজেই বুঝতে পারি যে, কুফরের দাপট নিঃশেষ হয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হওয়া পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট। সুতরাং যে অঞ্চলে দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়নি তথা আল্লাহ প্রদত্ত আইন-কানুন জারি না হয়ে মানবরচিত কুফরি আইন-কানুন জারি হয়েছে, আল্লাহ তাআলা একমাত্র মা'বুদ বা অনুসরণীয় না হয়ে মানবসৃষ্ট কুফরি মতবাদ অনুসরণীয় হয়েছে, সে অঞ্চলে কুফর নিঃশেষ হয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়নি; তাই সে অঞ্চলের বিরুদ্ধে হারব-যুদ্ধ করতে হবে এবং তা দারুল হারব।

আর যে অঞ্চলে কাফের-মুরতাদরা ইসলাম গ্রহণ করায় আল্লাহ তাআলা একমাত্র মা'বুদ হয়েছেন বা কাফেররা 'জিযয়া' গ্রহণ করায় আল্লাহ তাআলা অনুসরণীয় হয়েছেন তথা আল্লাহ প্রদত্ত আইন-আহকামুল ইসলাম জারি হয়েছে, তাতে কুফরের দাপট নিঃশেষ হয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; তাই সে অঞ্চল দারুল ইসলাম।

কুরআনে কারিমের আয়াতের আলোকেই দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পরিচয় নির্ধারিত হয়েছে যে, আহকামুল ইসলাম জারি হয়ে দ্বীন পূর্ণরূপে

আল্লাহর জন্য হলে তা দারুল ইসলাম আর আহকামুল কুফর জারি হয়ে কুফর প্রতিষ্ঠিত থাকলে তা দারুল হারব।

সুন্নাহ

এ বিষয়টি আমাদের জানা আছে যে, কোনো অঞ্চলের কাফেররা (ইমামগণের মতানৈক্য হিসেবে শুধু আহলে কিতাব বা যে কোনো কাফের) যদি ইসলামি খিলাফতকে 'জিযয়া' দিয়ে থাকতে সম্মত হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা হয় না এবং সে অঞ্চলে 'আহকামুল ইসলাম' ইসলামের আইন-কানুন জারি থাকে। এ জন্যই "حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ" (যতোক্ষণ না তারা হীনতার সাথে নিজ হাতে জিযয়া দেয়।) আয়াতাংশের 'হীনতা'র ব্যাখ্যায় ইমাম শাফেয়ি (মৃ: ২০৪ হি:) আহলে ইলমের এক জামাআত থেকে 'তাদের উপর ইসলামের আইন-কানুন জারি হওয়া'র উল্লেখ করে সেটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন-

قال الشافعي رحمه الله: وسمعت عدداً من أهل العلم يقولون: الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وما أشبه ما قالوا بما قالوا لامتناعهم من الإسلام، فإذا جرى عليهم حكمه، فقد أصغروا بما يجري عليهم منه. (الأم للشافعي، كتاب الجهاد والجزية، الصغار مع الجزية، ٤١٥/٥، أحكام القرآن للشافعي -جمع البيهقي- مايؤثر عنه في السير والجهاد وغير ذلك، الكلام عن آية الجزية، ٦٠/٢، فتح الباري للعسقلاني، كتاب الجزية، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، ٤٧٤/٩)

"ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, আমি একাধিক আহলে ইলমকে বলতে শুনেছি, 'সাগার' হীনতা হচ্ছে তাদের উপর ইসলামের আইন-কানুন জারি হওয়া। ইমাম শাফেয়ি বলেন, তাদের ব্যাখ্যাটি কতোইনা যথাযথ হয়েছে। কেননা তারা ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে, যখন তাদের উপর ইসলামের আইন-কানুন জারি হলো, তো যে ইসলাম গ্রহণ করা থেকে তারা বিরত ছিলো সে ইসলামের আইন-কানুন তাদের উপর জারি করে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে।" (আলউম্ম, ৫/৪১৫, আহকামুল কুরআন, ২/৬০, ফাতহুল বারি, ৯/৪৭৪)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়কাল থেকেই এ ধারা জারি ছিলো যে, মুসলমানরা কাফেরদের কোনো অঞ্চল বিজয় করলে সেখানের কাফেররা

‘যিম্মি’ হিসেবে থাকতে চাইলে থাকতে পারতো, অথবা যুদ্ধের পূর্বেই ‘জিযয়া’ দিতে সম্মত হলে তাদের সঙ্গে আর যুদ্ধ করা হতো না। তবে ইসলামি আইন-কানুন ওই সকল অঞ্চলে জারি হতো, খিলাফতের পক্ষ হতে সেখানে ‘আমেল’ গভর্নর নিযুক্ত করা হতো এবং তা দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতো। যেমন খাইবার, নাজরান জাতীয় অঞ্চলগুলো। এর বিপরীতে যদি কোনো অঞ্চলের কাফেরদের সঙ্গে সাময়িক যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি হতো (এ ধরনের অঞ্চলকে ‘দারুল মুওয়াদাআ’ বলা হয়), অথবা কোনো অঞ্চলের কাফেররা যদি ‘জিযয়া’ দিতে সম্মত হতো, কিন্তু সেখানে ইসলামি আইন-কানুন জারি হওয়াকে মেনে না নিতো; প্রথমত তাদের এ প্রস্তাব অগ্রহণযোগ্য হতো। আর যদি বিশেষ প্রয়োজনে তা মেনে নেওয়া হতো, তাহলে সে অঞ্চলে এবং ‘দারুল মুওয়াদাআ’য় ইসলামি আইন-কানুন জারি না হওয়ায় তা দারুল হারবেরই অন্তর্ভুক্ত থাকতো।

ফুকাহায়ে কেরামের এ সংক্রান্ত বক্তব্যগুলো আমরা দেখতে পারি-

ইমাম আবু ইউসুফের (মৃ: ১৮২ হি:) বক্তব্য

قال أبو يوسف: إنها حين افتتحها صارت دار إسلام وعاملهم على النخل. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السير، باب قسمة الغنيمة في دار الحرب، ٥٦/٩)

“ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খাইবার বিজয় করলেন, তখন তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে গেছে এবং তাদের (ইহুদি) সঙ্গে খেজুর বাগানের উপর চুক্তি করেছেন।” (সুনানে কুবরা, বায়হাকি, ৯/৫৬)

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশশাইবানির (মৃ: ১৮৯ হি:) বক্তব্য

فأما خيبر فإنه افتتح الأرض وجرى حكمه عليها، فكانت القسمة في المدينة، فقسم رسول الله ﷺ فيها قبل أن يخرج منها، وقسم غنائم بني المصطلق في بلادهم وكان قد افتتحها. (الأصل لمحمد الشيباني، كتاب السير في أرض الحرب، ٤٢٦/٧)

ইমাম মুহাম্মাদের বক্তব্যটি ইমাম সারাখসি এভাবে উল্লেখ করেছেন-

(قال): وأما خيبر فإنه افتتح الأرض وجرى فيها حكمه، فكانت القسمة فيها بمنزلة القسمة في المدينة، وقسم الغنائم فيها قبل أن يخرج منها..........................

(قال): "وقسم غنائم بني المصطلق في ديارهم وكان قد افتتحها" يعني صيرها دار الإسلام. (المبسوط للسرخسي، كتاب السير ١٩/١٠، ويراجع أيضاً الكافي للحاكم الشهيد - المخطوطة- كتاب السير، ٢٠٨/١)

“ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, খাইবারের ভূখণ্ড বিজয়ের পর যখন সেখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আইন-কানুন জারি হয়ে গেছে, তখন সেখানে গনিমতের মাল বণ্টন করা মদিনা মুনাওয়ারায় বণ্টন করার ন্যায় হয়ে গেছে। তিনি খাইবার থেকে বের হওয়ার পূর্বেই গনিমতের মাল বণ্টন করেছেন ....। ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, ‘রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনি মুসতালিক থেকে প্রাপ্ত গনিমত তাদের ভূখণ্ডেই বণ্টন করেছেন; ইতোপূর্বে তিনি সেটিকে বিজয় করেছিলেন’ অর্থাৎ দারুল ইসলামে পরিণত করেছিলেন।” (কিতাবুল আসল, ৭/৪২৬, মাবসুতে সারাখসি, ১০/১৯, আরো দেখুন: আলকাফি -পাণ্ডুলিপি-, ১/২০৮)

‘যিম্মি’রা ইসলামি আইন-কানুন মেনে নেওয়া সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন-

وإن طلبوا أن يكونوا ذمة لهم يجري عليهم حكمهم ويأخذون منهم في السنة خراجاً معلوماً ولم يكن المسلمون ظهروا عليهم قبل ذلك، فهذه دار الإسلام. (شرح كتاب السير الكبير للسرخسي، باب -٢٠٦-: باب من الخمس في المعدن والركاز يصاب في دار الحرب ودار الموادعة وما يلحق الذمي من ذلك والعبد والمستأمن، ٢٩٧/٥)

“ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, যদি কাফেররা তাদের উপর ইসলামি আইন-কানুন জারি হওয়াকে গ্রহণ করে ‘যিম্মি’ হতে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং মুসলমানরা তাদের থেকে বৎসরে নির্দিষ্ট পরিমাণ ‘খারাজ’ গ্রহণ করে; আর মুসলমানরা এর পূর্বে ওই অঞ্চলের উপর বিজয়ী হয়নি, তবুও এটি দারুল ইসলাম হিসেবে সাব্যস্ত হবে।” (শারহু কিতাবিস সিয়ারিল কাবির, ৫/২৯৭)

শামসুদ্দিন আসসারাখসির (মৃ: ৪৯০ হি:) বক্তব্য

ইমাম সারাখসি ইমাম মুহাম্মাদের প্রথমে উদ্ধৃত বক্তব্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরো স্পষ্ট করে বলেন-

ففي هذا دليل أن الإمام إذا افتتح بلدة وصيرها دار إسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها، فإنه يجوز له أن يقسم الغنائم فيها. وقد طال مقام رسول الله ﷺ بخيبر بعد الفتح وأجرى أحكام الإسلام فيها، فكانت من دار الإسلام، القسمة فيها كالقسمة في غيرها من بقاع دار الإسلام. (المبسوط للسرخسي، كتاب السير، ١٠/١٩)

"এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, ইমামুল মুসলিমিন যদি কোনো শহর বিজয় করে তাতে ইসলামি আইন-কানুন জারি করার মাধ্যমে সেটিকে দারুল ইসলামে পরিণত করে নেয়, তাহলে তার জন্য তাতে গনিমত বণ্টন করা জায়েয আছে। খাইবার বিজয়ের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ সময় তাতে অবস্থান করেছেন এবং ইসলামি আইন-কানুন জারি করেছেন, ফলে তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে গেছে। সুতরাং সেখানে গনিমতের বণ্টন দারুল ইসলামের অন্যান্য ভূখণ্ডে বণ্টনের ন্যায় হয়েছে।" (মাবসুতে সারাখসি, ১০/১৯)

কোনো অঞ্চলের কাফেররা যদি তাদের উপর ইসলামি আইন-কানুন জারি হওয়া ও 'জিযয়া' আদায় করতে সম্মত হয় তখন ইমামুল মুসলিমিনের জন্য তা গ্রহণ করা আবশ্যক। এর দলিল হিসেবে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. আহলে নাজরান থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তা গ্রহণ করার ঘটনা উল্লেখ করে যখন ফাতওয়া দিয়েছেন-

فإن أراد المسلمون أن يتخذوا مصراً في الموات من تلك الأراضي التي لا يملكها أحد فلا بأس بذلك

"ওই সকল ভূখণ্ড থেকে কারো মালিকানাধীন নয় এমন কোনো অনাবাদ জমিনে যদি মুসলমানরা শহর গড়তে চায়, তাতে কোনো সমস্যা নেই।"

তখন কারণ হিসেবে ইমাম সারাখসি রহ. বলেন-

لأنه ليس في هذا تعرض لشيء من أملاكهم، وقد صارت ديارهم من جملة ديار الإسلام بظهور أحكام الإسلام فيها، فالرأي إلى الإمام في الموات من الأراضي في دار الإسلام. (شرح كتاب السير الكبير للسرخسي، باب -١٥٣-: ما لا يكون لأهل الحرب من إحداث الكنائس والبيع وبيع الخمور، ٤/٤٢٢-٤٢٣)

“কেননা এতে তাদের মালিকানাধীন সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে না। যেহেতু তাদের অঞ্চলে ইসলামি আইন-কানুন প্রকাশ পাওয়ায় তা দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, সুতরাং দারুল ইসলামের অনাবাদ জমিনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ইমামুল মুসলিমিনের হাতে ন্যস্ত।” (শারহু কিতাবিস সিয়ারিল কাবির, ৪/৪২২-৪২৩)

অপর এক স্থানে ইমাম সারাখসি রহ. সুন্নাহ থেকে ‘জিযয়া’র বিধান সাব্যস্ত করতে গিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আহলে নাজরান থেকে তা গ্রহণের কথা উল্লেখ করার পর কোনো কোনো ‘মুলহিদ’র আপত্তির জবাবে ‘জিযয়া’র যৌক্তিকতা বুঝাতে গিয়ে বলেন-

ثم يأخذ المسلمون الجزية منه خلفاً عن النصرة التي فاتت بإصراره على الكفر، لأن من هو من أهل دار الإسلام فعليه القيام بنصرة الدار......(المبسوط للسرخسي، كتاب السير، باب توظيف الخراج، ٧٨/١٠)

“অতঃপর তার কুফরের উপর অবিচল থাকার কারণে সহযোগিতার যে দিকটি ছুটে যায়, সেটির পরিবর্তে মুসলমানরা তার থেকে ‘জিযয়া’ গ্রহণ করে। কেননা যে দারুল ইসলামের অধিবাসী হবে, তাকে অবশ্যই সে ‘দার’র সহযোগিতা আঞ্জাম দিতে হবে। (মাবসুতে সারাখসি, ১০/৭৮)

কাফেররা ‘জিযয়া’ প্রদানে সম্মত হলে তাদের থেকে তা গ্রহণ করা হবে; এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম সারাখসি বলেন-

لأن الأمير يجري عليهم حكم المسلمين، وبإجراء الحكم عليهم يصيرون ذمة ومدينتهم تصير مدينة الإسلام، فيقبل ذلك منهم. (شرح كتاب السير الكبير للسرخسي، باب - ٢٠٧-: باب من له من الأمراء أن يقبل وأن يقسم وأن يجعل الأرض أرض خراج وأن يقبل الخراج، ٣١٤/٥).

“কেননা আমির তাদের ক্ষেত্রে মুসলমানদের আইন-কানুন জারি করবে। আর তাদের ক্ষেত্রে আইন-কানুন জারি করায় তারা ‘যিম্মি’ হিসেবে সাব্যস্ত হবে এবং তাদের অঞ্চল দারুল ইসলাম হিসেবে পরিণত হবে। সুতরাং তাদের থেকে তা গ্রহণ করা হবে।” (শারহু কিতাবিস সিয়ারিল কাবির, ৫/৩১৪)

আলাউদ্দিন আলকাসানির (মৃ: ৫৮৭ হি:) বক্তব্য

فأما غنائم خيبر وأوطاس والمصطلق فإنما قسمها رسول الله في تلك الديار، لأنه افتتحها فصارت ديار الإسلام. (بدائع الصنائع للكاساني، كتاب السير، فصل وأما بيان حكم الغنائم وما يتصل بها، مطلب وأما بيان قسمة الغنائم، ١٢١/٧)

“খাইবার, আওতাস ও মুসতালিকের গনিমতের মাল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানেই বণ্টন করেছেন। কেননা সে সকল অঞ্চল বিজয়ের পর দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে গেছে।” (বাদায়েউস সানায়ে‘, ৭/১২১)

বুঝা গেলো, কোনো ভূখণ্ডের অধিবাসীরা অমুসলিম হলেও যদি সেখানে ইসলামি আইন-কানুন জারি হয়, তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যায়। খাইবারের অধিবাসীরা ছিলো ইহুদি আর নাজরানের অধিবাসীরা ছিলো নাসারা-খৃস্টান। কিন্তু ইসলামি আইন-কানুন জারি হওয়ায় সেগুলো দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে গেছে।

এর বিপরীতে যদি ইসলামি আইন-কানুন জারি না হয়, তাহলে তা দারুল হারব হিসেবে পরিগণিত হয়। আমরা ফকিহগণের বক্তব্যগুলো দেখতে পারি।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশশাইবানির (মৃ: ১৮৯ হি:) বক্তব্য

وإذا كانت دار من دور أهل الحرب قد وادع المسلمون أهلها على أن يؤدوا إلى المسلمين شيئاً معلوماً في كل سنة، على ألا يجري عليهم المسلمون أحكامهم فهذه دار الحرب. (شرح كتاب السير الكبير للسرخسي، باب -٢٠٦-: باب من الخمس في المعدن والركاز يصاب في دار الحرب ودار الموادعة وما يلحق الذمي من ذلك والعبد والمستأمن، ٢٩٦/٥)

“আহলে হারবের কোনো অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে যদি মুসলমানদের এ মর্মে চুক্তি হয় যে, তারা প্রত্যেক বৎসর মুসলমানদেরকে নির্দিষ্ট কিছু সম্পদ প্রদান করবে, তবে তাদের ক্ষেত্রে মুসলমানরা মুসলমানদের আইন-কানুন জারি করবে না, তাহলে এটি দারুল হারব হিসেবে পরিগণিত হবে।” (শারহু কিতাবিস সিয়ারিল কাবির, ৫/২৯৬)

শামসুদ্দিন আসসারাখসির (মৃঃ ৪৯০ হিঃ) বক্তব্য

ইমাম মুহাম্মাদের উপর্যুক্ত ফাতওয়ার কারণ হিসেবে ইমাম সারাখসি বলেন-

لأن الدار إنما تصير دار الإسلام بإجراء حكم المسلمين فيها، وحكم المسلمين غير جار، فكانت هذه دار حرب. (شرح كتاب السير الكبير للسرخسي، باب -٢٠٦-: باب من الخمس في المعدن والركاز يصاب في دار الحرب ودار الموادعة وما يلحق الذمي من ذلك والعبد والمستأمن، ٢٩٧/٥، المبسوط للسرخسي، كتاب السير، باب صلح الملوك والموادعة، ٨٧/١٠)

"কেননা মুসলমানদের আইন-কানুন জারি করলেই কোনো অঞ্চল দারুল ইসলামে পরিণত হয়। উক্ত অঞ্চলে মুসলমানদের আইন-কানুন জারি হয়নি, তাই তা দারুল হারবে পরিগণিত হবে।" (শারহু কিতাবিস সিয়ারিল কাবির, ৫/২৯৭, মাবসুতে সারাখসি, ১০/৮৭)

ইমাম সারাখসি অপর এক স্থানে বলেন-

لأنهم بالموادعة ما خرجوا من أن يكونوا أهل حرب حين لم ينقادوا لحكم الإسلام ....، لأنهم أهل حرب وإن كانوا موادعين. (المبسوط للسرخسي، كتاب السير، باب صلح الملوك والموادعة، ٨٨/١٠)

"ইসলামি আইনের বশ্যতা স্বীকার না করে শুধু চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ায় তারা আহলে হারব থেকে বিয়োজিত হবে না.........। কেননা তারা আহলে হারব, যদিও তারা চুক্তিতে আবদ্ধ।" (মাবসুতে সারাখসি, ১০/৮৮)

فإن دار الموادعين دار الحرب، لا يجري فيها حكم المسلمين. (شرح كتاب السير الكبير للسرخسي، باب -١٧٣-: باب ما يجب على المسلمين نصرتهم وما لا يكون فيئاً إذا أخذ من دارنا أو من غيرها، ١٣٢/٥)

"দারুল মুওয়াদিয়িন' চুক্তিবদ্ধদের অঞ্চল দারুল হারবই, তাতে মুসলমানদের আইন-কানুন জারি হয় না।" (শারহু কিতাবিস সিয়ারিল কাবির, ৫/১৩২)

ودخول المسلم والذمي دار الموادعة بمنزلة دخولهما دار الحرب ليس بين أهلها وبين المسلمين موادعة سواء؛ لأنه لم تصر دار الإسلام بتلك الموادعة؛ لعدم جريان حكم

الإسلام. (شرح كتاب السير الكبير للسرخسي، باب -٢٠٥-: باب عشور أهل الحرب والمسلمين وأهل الذمة، ٥/٢٩٢)

“মুসলিম ও ‘যিম্মি’র ‘দারুল মুওয়াদাআ’ চুক্তিবদ্ধ অঞ্চলে প্রবেশ করা এবং দারুল হারব যার অধিবাসী ও মুসলমানদের মাঝে কোনো চুক্তি নেই; তাতে প্রবেশ করার একই হুকুম। কেননা ওই চুক্তির মাধ্যমে তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়নি, কারণ তাতে ইসলামের আইন-কানুন জারি হয়নি।” (শারহু কিতাবিস সিয়ারিল কাবির, ৫/২৯২)

সুতরাং প্রমাণিত হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকেই কোনো ভূখণ্ড দারুল ইসলাম বা দারুল হারব হওয়ার মাপকাঠি ছিলো সেখানে বাস্তবায়িত আইন-কানুন। ইসলামি আইন-কানুন জারি হলে তা দারুল ইসলামে পরিণত হতো, যদিও সকল বা সিংহভাগ অধিবাসী অমুসলিম থাকতো। আর ইসলামি আইন-কানুন জারি না হলে তা দারুল হারবে পরিগণিত হতো, যদিও মুসলমানরা তাতে সাময়িক নিরাপদে থাকতো। দারুল ইসলাম বা দারুল হারব সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সংখ্যার আধিক্য ও নিরাপদে থাকার কোনো প্রভাব ছিলো না।

আর ইহুদি-খৃস্টান বসতিতে ‘আহকামুল ইসলাম’ জারি হওয়ার কী অর্থ, তা মনে হয় নতুন করে বুঝানোর প্রয়োজন নেই।

চার মাযহাবের খিলাফত পতনের পূর্ব ও পরের ফুকাহায়ে কেরাম

আমরা পূর্বেই বলেছি, চার মাযহাবের খিলাফত পতনের পূর্ব ও পরের ফুকাহায়ে কেরাম সাধারণত কোনো ভূখণ্ড দারুল ইসলাম বা দারুল হারব হওয়ার মাপকাঠি হিসেবে বুঝতেন, সে ভূখণ্ডে বাস্তবায়িত আইন-কানুন। ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য উল্লেখ করার পূর্বে আমাদেরকে দুটি কথা মনে রাখতে হবে-

ক) যে সকল ফকিহের বক্তব্য উল্লেখ করবো, তাঁরা সকলেই যে দারুল ইসলাম বা দারুল হারবের সংজ্ঞা হিসেবে উল্লেখ করেছেন; ব্যাপারটি এমন নয়। কেউ কেউ তো সংজ্ঞা হিসেবে উল্লেখ করেছেন, আবার কারো কারো বিভিন্ন মাসআলার আলোচনা থেকে দারুল ইসলাম বা দারুল হারবের

পরিচয়ের ব্যাপারে তাঁদের অবস্থান স্পষ্ট হয়েছে। আমরা এখানে উভয় প্রকারের বক্তব্য উল্লেখ করবো।

খ) 'আহকামুল ইসলাম', 'আহকামুল মুসলিমিন', 'হুকমু ইমামিল মুসলিমিন' ও 'তাহতা আইদিল মুসলিমিন'; সবগুলোর উদ্দেশ্য একই। একেক ফকিহের বক্তব্যে একেকটি ব্যবহার হয়েছে। শব্দের বিভিন্নতায় প্রতারিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ-

কুফরি আইন মুসলমানের আইন হতে পারে না এবং মুসলমানরা কুফরি আইন বিধিবদ্ধ করলে মুসলমান থাকে না।

তেমনিভাবে মুসলমানদের খলিফা কুফরি আইন বিধিবদ্ধ করতে পারে না এবং যে শাসক কুফরি আইন বিধিবদ্ধ করে সে 'ইমামুল মুসলিমিন' হতে পারে না বা ওই কুফরি আইন 'হুকমু ইমামিল মুসলিমিন' হতে পারে না।

ঠিক তেমনিভাবে যে অঞ্চলে মুসলমানরা তাদের ইসলামি আইন-কানুন জারি করতে পারে না, বরং কুফরি আইন-কানুন সেখানে বাস্তবায়িত এবং ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়ন করার সকল দরজা বন্ধ; সেটিকে 'তাহতা আইদিল মুসলিমিন' মুসলমানদের হস্তগত বলা যেতে পারে না। আর যে অঞ্চল 'তাহতা আইদিল মুসলিমিন' মুসলমানদের হস্তগত তাতে কুফরি আইন বিধিবদ্ধ হতে পারে না এবং ইসলামি আইনের দরজা বন্ধ হতে পারে না।

আর দারুল ইসলাম ও দারুল মুসলিমিনের অর্থ যেমন একই, তেমনিভাবে দারুল হারব, দারুল কুফর ও দারুশ শিরকের অর্থও একই।

খিলাফত পতনের (১৩৪৩ হিঃ মোতাবেক ১৯২৪ খৃঃ) পূর্বে

ফিকহে হানাফি

ইমাম আবু হানিফা (মৃঃ ১৫০ হিঃ)

'দারুল ইসলাম কখন দারুল হারবে পরিণত হয়' এই মাসআলায় যদিও ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহেবাইনের মাঝে শাব্দিক মতানৈক্য হয়েছে, কিন্তু দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের মূল পরিচয়ে কোনো মতানৈক্য নেই। ইমাম আলাউদ্দিন কাসানির শব্দে পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে-

لا خلاف بين أصحابنا في أن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها. (بدائع الصنائع، كتاب السير، فصل وأما بيان الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين، ١٣٠/٧)

"আমাদের ইমামগণের মাঝে এ ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই যে, ইসলামি আইন-কানুন প্রকাশ পাওয়ার মাধ্যমেই একটি দারুল কুফর দারুল ইসলামে পরিণত হয়।" (বাদায়েউস সানায়ে', ৭/১৩০)

দারুল ইসলামে আশ্রিত হারবি যখন আবার দারুল হারবে ফিরে গিয়ে নিহত হয়; উভয় ভূখণ্ডে তার লেন-দেন সম্পর্কে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. কর্তৃক করা এক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ইমাম আবু হানিফা রহ. এক পর্যায়ে বলেন-[৩০]

وأما الودائع فهي كلها فيء للمسلمين إلا الرقيق الذي دبره في دار الإسلام، فهم أحرار لا سبيل عليهم؛ لأنه أعتقهم **حيث يجري عليه وعليهم أحكام المسلمين**. (الأصل لمحمد

---

৩০. الدكتور محمد بوينوكالن এর তাহকিকে দারু ইবনে হাযম কর্তৃক 'কিতাবুল আসল'র মুদ্রিত নুসখার বর্ণনাধারার আলোকে আমাদের নিকট প্রশ্নোত্তরগুলো 'শাইখাইনের' পারস্পরিক প্রশ্নোত্তর মনে হয়েছে। কারো নিকট যদি ভিন্নটি প্রমাণিত হয়, তাহলে আমাদেরকে অবহিত করলে আল্লাহ তাআলা তাকে 'জাযায়ে খায়র' দান করুন। আমিন।

الشيباني، كتاب السير في أرض الحرب، باب ما يترك المستأمن إذا دخل أرض الحرب فيدعه في دار الإسلام أو يموت في دار الإسلام، ٤٧٥/٧)

"তার সকল 'অদিআত' আমানতের মাল মুসলমানদের জন্য গনিমত হিসেবে সাব্যস্ত হবে। কিন্তু যে সকল গোলামকে সে দারুল ইসলামে 'মুদাব্বার' (মুনিবের মৃত্যুর পর মুক্ত গোলাম) বানিয়েছিলো, সেগুলো আযাদ হয়ে যাবে। সেগুলোর উপর মুসলমানরা হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কেননা সে তাদেরকে এমন স্থানে আযাদ করেছে, **যেখানে তার (মুনিব) উপর ও তাদের (গোলাম) উপর মুসলমানদের আইন-কানুন জারি হয়।"** (কিতাবুল আসল, ৭/৪৭৫)

উপর্যুক্ত মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা রহ. প্রথমে দারুল ইসলাম বলে পরে দারুল ইসলামের পরিচায়ক বাক্য 'যেখানে তার উপর ও তাদের উপর মুসলমানদের আইন-কানুন জারি হয়' দিয়ে মাসআলার কারণ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফের মাঝে দারুল হারবে মুসলমান ও হারবির পারস্পরিক হত্যা ও আঘাতের 'কিসাস' বাতিল হওয়া সংক্রান্ত প্রশ্ন-উত্তর এভাবে উল্লেখ হয়েছে-

قلت: وكذلك ما كان بينهم من قتل أو جراحات في أرض الحرب؟ قال: نعم! ذلك كله باطل. قلت: ولم؟ قال: لأنهم فعلوا ذلك **حيث لا تجري عليهم أحكام المسلمين.**

(الأصل لمحمد الشيباني، كتاب السير في أرض الحرب، باب إقامة الحدود، ٤٧٩/٧)

"আমি বললাম, তেমনিভাবে দারুল হারবে মুসলমান ও হারবির পারস্পরিক হত্যা বা আঘাত? তিনি বললেন, হ্যাঁ! সবগুলোই বাতিল। আমি বললাম, কেনো? তিনি বললেন, কেননা তারা সেটি এমন স্থানে করেছে **যেখানে তাদের উপর মুসলমানদের আইন-কানুন জারি হয় না।** (কিতাবুল আসল, ৭/৪৭৯)

উপর্যুক্ত মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা রহ. দারুল হারবের পরিচায়ক বাক্য 'যেখানে তাদের উপর মুসলমানদের আইন-কানুন জারি হয় না' দিয়ে মাসআলার কারণ বর্ণনা করেছেন।

আরেকটি প্রশ্ন-উত্তর-

قلت: أرأيت القوم من المسلمين يكونون مستأمنين في دار الحرب فيغير عليهم قوم آخرون من أهل الحرب أيحل لمن ثم من المسلمين أن يقاتلوا معهم؟ قال: لا! قلت: لم؟ قال: **لأن**

أحكام أهل الشرك ظاهرة غالبة، لأن المسلمين لا يستطيعون أن يحكموا بأحكام أهل الإسلام. (الأصل لمحمد الشيباني، كتاب السير في أرض الحرب، باب القوم يكونون مستأمنين في دار الحرب، ٧/٤٩١)

"আমি বললাম, মুসলমানদের যারা দারুল হারবে নিরাপত্তা নিয়ে অবস্থান করে; সে দারুল হারবে যদি অন্য কোনো আহলে হারব আক্রমণ করে বসে, তাহলে সেখানে অবস্থানরত মুসলমানদের জন্য যুদ্ধের ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গ দেয়া কি বৈধ হবে? তিনি বললেন, না! আমি বললাম, কেনো? তিনি বললেন, **কেননা কুফর-শিরকের আইন-কানুন তাতে প্রকাশ্য ও কর্তৃত্বসম্পন্ন। কারণ মুসলমানরা তাদের আইন-কানুন বাস্তবায়ন করতে সক্ষম নয়।"** (কিতাবুল আসল, ৭/৪৯১)

উক্ত মাসআলায় মুসলমানরা নিরাপদে থাকা সত্ত্বেও দারুল হারবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে নিষেধাজ্ঞার কারণ হিসেবে ইমাম আবু হানিফা রহ. দারুল হারবের পরিচায়ক বাক্য 'কুফর-শিরকের আইন-কানুন তাতে প্রকাশ্য ও প্রভাবশালী, কারণ মুসলমানরা তাদের আইন-কানুন বাস্তবায়ন করতে সক্ষম নয়' ব্যবহার করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে এরূপ আরো ইবারত বর্ণিত হয়েছে। যা দ্বারা স্পষ্ট যে, ইমাম আবু হানিফার মতেও দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পার্থক্যের মূল মাপকাঠি বাস্তবায়িত আইন-কানুন।

ইমাম আবু ইউসুফ (মৃ: ১৮২ হি:), ইমাম মুহাম্মাদ (মৃ: ১৮৯ হি:)

সাহেবাইনের কোনো বক্তব্য এখানে নতুন করে উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করছি না। দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার আলোচনায় সাহেবাইনের মাযহাব ও সুন্নাহ থেকে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পরিচয় নির্ধারণের আলোচনায় ইমাম মুহাম্মাদের উদ্ধৃত বক্তব্যগুলোর আলোকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, তাঁদের মতে সর্বাবস্থায় দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের মাপকাঠি হচ্ছে বাস্তবায়িত আইন-কানুন।

ইমাম তহাবি (মৃ: ৩২১ হি:)

দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার মাসআলায় সাহেবাইনের মতের 'তারজিহ' প্রাধান্যের আলোচনায় মুখতাসারুত তহাবি (পৃ: ২৯৪) থেকে ইমাম

তহাবির বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি সাহেবাইনের মতকেই গ্রহণ করেছেন। সুতরাং তাঁর দৃষ্টিতে দারুল ইসলাম ও দারুল হারব নির্ধারণের মাপকাঠি হচ্ছে তাতে বাস্তবায়িত আইন-কানুন।

হাকেম শাহিদ (৩৪৪ হি:)

(قال الحاكم الشهيد في الكافي): إن المراد بدار الإسلام بلاد يجري فيها حكم إمام المسلمين ويكون تحت قهره، وبدار الحرب بلاد يجري فيها أمر عظيمها وتكون تحت قهره.

(فتاوی عزیزی-اردو-باب الفقہ، دار الاسلام منقلب بدار الحرب ہو سکتا ہے، ص ۴۵۴)۔

"দারুল ইসলাম দ্বারা উদ্দেশ্য ওই সকল অঞ্চল যাতে ইমামুল মুসলিমিনের আইন-কানুন জারি হয় এবং তার কর্তৃত্বাধীন থাকে। আর দারুল হারব দ্বারা উদ্দেশ্য ওই সকল অঞ্চল যাতে সেখানকার শাসকের আইন-কানুন চলে এবং তার ক্ষমতাধীন থাকে।" (ফাতাওয়া আযিযি -উর্দু-, পৃ: ৪৫৪)

'জামেউর রুমুয' কিতাবে 'কাফি'র ইবারতটি এভাবে উল্লেখ হয়েছে-

ودار الإسلام ما يجري فيه حكم إمام المسلمين، ودار الحرب ما يجري فيه أمور رئيس الكافرين، كما في الكافي. (جامع الرموز للقهستاني، كتاب الجهاد، ٦٦٣/٤)

"দারুল ইসলাম যাতে ইমামুল মুসলিমিনের আইন-কানুন জারি হয়, আর দারুল হারব যাতে কাফের প্রধানের আইন-কানুন জারি হয়। যেমনটি 'কাফি' নামক কিতাবে রয়েছে।" (জামেউর রুমুয, ৪/৬৬৩)[৩১]

মূলত উভয় ইবারতে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা ইমামুল মুসলিমিনের আইন-কানুন দ্বারা যেমনিভাবে ইসলামি আইন-কানুন উদ্দেশ্য; পূর্বে যে

---

৩১. 'জামেউর রুমুয' ও 'ফাতাওয়া আযিযি'তে বক্তব্যটি 'কাফি'র সূত্রে উদ্ধৃত হয়েছে। আর 'কাফি' বলতে সাধারণত হাকেম শহিদের 'কাফি'ই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তাই হাকেম শহিদের দিকে নিসবত করে বক্তব্যটি উল্লেখ করেছি। অন্যথায় হাকেম শহিদের 'কাফি'র যে পাণ্ডুলিপি আমার সংরক্ষণে রয়েছে, তাতে সম্ভাব্য স্থানে তালাশ করে বক্তব্যটি আমি পাইনি।

এছাড়াও 'মি'রাযুদ দিরায়া' থেকে কিওয়ামুদ্দিন আলকাকির যে বক্তব্য সামনে উদ্ধৃত হয়েছে, সেটির শব্দও অনেকটা এরূপ। তো 'কাকি'র স্থানে 'কাফি' হয়ে গেছে কি না; তা নিশ্চিত বলতে পারছি না।

ব্যাপারে আমরা ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি। তার বিপরীতে ঠিক তেমনিভাবে শাসক বা কাফের প্রধানের আইন-কানুন দ্বারা কুফরি আইন-কানুন উদ্দেশ্য। কারণ, ইসলামি আইনের বিপরীতে শাসক বা কাফের প্রধানের আইন ইসলামি আইন হতে পারে না এবং যে শাসক ইসলামি আইনের বিপরীতে নিজের বানানো আইন বা কাফেরদের রচিত আইন বিধিবদ্ধ করে দেয় সে মুসলমান হতে পারে না। সুতরাং উক্ত ইবারত দ্বারা প্রতারিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

পারস্যের উপর রোমের বিজয় লাভ করা সংক্রান্ত আবু বকর রাযি. কুরাইশের মুশরিকদের সঙ্গে যে বাজি ধরেছিলেন; রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সেটির অনুমতি প্রদানের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে হাকেম শাহিদ রহ. বলেন-

وذلك أنه كان بمكة في دار الشرك، حيث لا تجري أحكام المسلمين. (الكافي للحاكم الشهيد -المخطوطة- كتاب الصرف، باب الصرف في دار الحرب، ٢٥١/١)

"কেননা কাজটি মক্কা তথা দারুশ শিরক-দারুল কুফরে ছিলো, যেখানে মুসলমানদের আইন-কানুন জারি হয় না।" (কাফি -পাণ্ডুলিপি-, ১/২৫১)

হাকেম শাহিদ রহ. দারুল কুফরের পরিচায়ক বাক্য ব্যবহার করেছেন, তাতে মুসলমানদের আইন-কানুন জারি হয় না।

আবু বকর আলজাসসাস (মৃ: ৩৭০ হি:)

ইমাম তহাবির ন্যায় ইমাম আবু বকর আলাজাসসাসের বক্তব্যও শরহু মুখতাসারিত তহাবি (৭/২১৮) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি সাহেবাইনের মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর দৃষ্টিতে দারুল ইসলাম ও দারুল হারব নির্ধারণের মাপকাঠি হচ্ছে তাতে বাস্তবায়িত আইন-কানুন।

আবু যায়েদ আদদাবুসি (মৃ: ৪৩০ হি:)

ما قال أصحابنا إن دار الحرب تمنع وجوب ما يندرئ بالشبهة، لأن أحكامنا لا تجري في دارهم وحكم دارهم مخالف لحكم دارنا. (تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي، القول في القسم الذي فيه الخلاف بيننا وبين الإمام القرشي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، صـ١٢١)

“আমাদের (হানাফি) ইমামগণের মতানুযায়ী অনিশ্চয়তার কারণে যে সকল হুকুম স্থগিত হয়ে যায়, সেগুলো আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে দারুল হারব প্রতিবন্ধক। কেননা কাফেরদের অঞ্চলে (দারুল হারব) আমাদের আইন-কানুন জারি হয় না, আর তাদের অঞ্চলের (দারুল হারব) আইন-কানুন আমাদের অঞ্চলের (দারুল ইসলাম) আইন-কানুনের বিপরীত।” (তাসিসুন নাযার, পৃ: ১২১)

ইমাম আবু যায়েদ আদদাবুসির কথা থেকে স্পষ্ট, তার দৃষ্টিতে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পার্থক্যরেখাই হচ্ছে বাস্তবায়িত আইন-কানুন।

শামসুদ্দিন আসসারাখসি (মৃ: ৪৯০ হি:)

সুন্নাহ থেকে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পরিচয় নির্ধারণের আলোচনায় ইমাম সারাখসির উদ্ধৃত বক্তব্যগুলোর আলোকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, তাঁর মতে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের মাপকাঠি হচ্ছে বাস্তবায়িত আইন-কানুন। এ সংক্রান্ত উল্লেখ করার মতো তাঁর বহু ইবারত রয়েছে। এখানে নমুনা হিসেবে কয়েকটি উল্লেখ করছি-

لأن دار الشرك إنما تصير دار الإسلام بإجراء حكم المسلمين فيها، وأهل الشرك إنما يصيرون أهل الذمة بإجراء حكم المسلمين عليهم. (شرح كتاب السير الكبير للسرخسي، باب -٢٠٧-: باب من له من الأمراء أن يقبل وأن يقسم وأن يجعل الأرض أرض خراج وأن يقبل الخراج، ٥/٣١٤)

“কেননা দারুশ শিরক-দারুল কুফরে মুসলমানদের আইন-কানুন জারি করলে তা দারুল ইসলামে পরিণত হয় এবং কাফের-মুশরিকদের উপর মুসলমানদের আইন-কানুন জারি করলে তারা ‘যিম্মি’ সাব্যস্ত হয়।” (শারহু কিতাবিস সিয়ারিল কাবির, ৫/৩১৪)

والدار تصير دار المسلمين بإجراء أحكام المسلمين. (شرح كتاب السير الكبير للسرخسي، باب -٢٠٧-: باب من له من الأمراء أن يقبل وأن يقسم وأن يجعل الأرض أرض خراج وأن يقبل الخراج، ٥/٣١٧)

“মুসলমানদের আইন-কানুন জারি করলেই কোনো অঞ্চল দারুল মুসলিমিন-দারুল ইসলামে পরিণত হয়।” (শারহু কিতাবিস সিয়ারিল কাবির, ৫/৩১৭)

لأن الدار صارت دار الإسلام يجري فيها حكم المسلمين. (شرح كتاب السير الكبير للسرخسي، باب -١٩٣-: باب ما يصدق فيه الرجل إذا أقر أنه استهلك من مال أهل الحرب أو ما أقر به من الجناية عليه، ٢٣٢/٥)

"যেহেতু অঞ্চলটি দারুল ইসলামে পরিণত হয়েছে, তাই তাতে মুসলমানদের আইন-কানুন জারি হবে।" (শারহু কিতাবিস সিয়ারিল কাবির, ৫/২৩২)

وبمجرد الفتح قبل إجراء أحكام الإسلام لا تصير دار إسلام. (المبسوط للسرخسي، كتاب السير، ٢٣/١٠)

"ইসলামি আইন-কানুন জারি করার পূর্বে শুধু বিজয়ের মাধ্যমে কোনো অঞ্চল দারুল ইসলামে পরিণত হয় না।" (মাবসুতে সারাখসি, ১০/২৩)

আলাউদ্দিন আলকাসানি (মৃ: ৫৮৭ হি:)

ولو دخل الحربي إلينا بأمان ففعل شيئاً من ذلك نفذ كله، لأنه لما دخل بأمان فقد **لزمه أحكام الإسلام ما دام في دار الإسلام.** (بدائع الصنائع للكاساني، كتاب السير، فصل وأما الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين فأنواع، ١٣٣/٧)

"যদি হারবি কাফের আমাদের (মুসলমান) অঞ্চলে 'আমান' নিয়ে প্রবেশ করে পূর্বোল্লিখিত কোনো কাজ করে, তাহলে সবগুলোই কার্যকর হবে। কেননা যখন সে 'আমান' নিয়ে প্রবেশ করেছে, **তাহলে যতোদিন সে দারুল ইসলামে অবস্থান করবে ততোদিন তার জন্য ইসলামের আইন-কানুন আবশ্যক হবে।"** (বাদায়েউস সানায়ে', ৭/১৩৩)

ইমাম কাসানির আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, ইসলামি আইন-কানুন কার্যকর হওয়া ব্যতীত কোনো দারুল ইসলামের ধারণা তাঁদের মনের আশেপাশেও ছিলো না।

বুরহানুদ্দিন মাহমুদ ইবনে আহমাদ আলবুখারি (মৃ: ৬১৬ হি:)

ولو أن عسكرا دخلوا دار الحرب، وقاتلوا أهل مدينة من مدائنهم وقهروا أهلها، واستولوا عليها وفتحوها، **وأظهروا فيها أحكام الإسلام حتى صارت المدينة دار إسلام،** فلم يقسموا الغنائم حتى لحقهم المدد، لا يشاركونهم فيها. (المحيط البرهاني لبرهان الدين محمود

بن أحمد البخاري، كتاب السير، فصل في الشركة مع أهل العسكر في الغنيمة في دار الإسلام وفي دار الحرب، ٢١٧/٥، الفتاوى التاتارخانية لابن العلاء الدهلوي، كتاب السير، الفصل التاسع والثلاثون في الشركة مع أهل العسكر في الغنيمة في دار الإسلام وفي دار الحرب، ٢١١/٧)

"যদি (মুসলমানদের) কোনো সৈন্যদল দারুল হারবে প্রবেশের পর কাফেরদের অধিকৃত শহরগুলোর কোনো শহরবাসীর সঙ্গে যুদ্ধ করে সেটির অধিবাসীদের পরাভূত করে, তাদের উপর কর্তৃত্ব লাভ করে ও সেটিকে বিজয় করে **সেখানে ইসলামের আইন-কানুন প্রকাশ করার ফলে ওই শহরটি দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যায়;** তখন গনিমত বণ্টনের পূর্বে যদি কোনো সাহায্যকারী সৈন্যদল পৌঁছায়, তাহলে ওই সাহায্যকারী সৈন্যদল পূর্বের সৈন্যদলের সঙ্গে গনিমতের অংশীদার হবে না।" (আলমুহিতুল বুরহানি, ৫/২১৭, তাতারখানিয়া, ৭/২১১)

ইমাম বুরহানুদ্দিন আলবুখারি শহরটি দারুল ইসলামে পরিণত হওয়ার জন্য সর্বশেষ কর্ম হিসেবে উল্লেখ করেছেন তাতে ইসলামের আইন-কানুন প্রকাশ করা। বুঝা গেলো, কোনো ভূখণ্ড শুধু বিজয়ের মাধ্যমেও দারুল ইসলামে পরিণত হয় না যতোক্ষণ না তাতে ইসলামি আইন-কানুন জারি করা হয়। যেমনটি পূর্বে ইমাম সারাখসির শব্দেও উল্লেখ হয়েছে।

কিওয়ামুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আলকাকি (মৃ: ৭৪৯ হি:)

وقلنا: المراد بدار الإسلام بلاد يجري فيها أحكام الإسلام ويكون تحت قهر سلطانهم، وبدار الحرب بلاد يجري فيها أمر عظيمهم ويكون تحت قهره. (معراج الدراية شرح الهداية للكاكي -المخطوطة- كتاب السير، باب المستأمن، ٢٤١/٢)

"আমাদের বক্তব্য, দারুল ইসলাম দ্বারা উদ্দেশ্য ওই সকল অঞ্চল যাতে ইসলামি আইন-কানুন চলে এবং যা মুসলমানদের শাসকের কর্তৃত্বাধীন থাকে। আর দারুল হারব দ্বারা উদ্দেশ্য যাতে তাদের প্রধানের আইন-কানুন চলে এবং তার কর্তৃত্বাধীন থাকে।" (মি'রাজুদ দিরায়া -পাণ্ডুলিপি, ২/২৪১)

ইবনুল হুমাম (মৃ: ৮৬১ হি:)

ولو ظهر أهل البغي على أهل العدل فألجأوهم إلى دار الشرك لم يحل لهم أن يقاتلوا البغاة

مع أهل الشرك لأن حكم أهل الشرك ظاهر عليهم. (فتح القدير لابن الهمام، كتاب السير، باب البغاة، ٤/٤١٦)

"আহলে বাগি'-বিদ্রোহীরা যদি 'আহলে আদল' ন্যায়সঙ্গতদের উপর বিজয়ী হয়ে তাদেরকে দারুশ শিরক-দারুল হারবের দিকে যেতে বাধ্য করে, তখন 'আহলে আদল' মুসলমানদের জন্য মুশরিকদের সঙ্গে মিলে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জায়েয হবে না। কেননা মুশরিকদের আইন-কানুন তাদের (আহলে আদল) উপর কর্তৃত্বসম্পন্ন।" (ফাতহুল কাদির, ৪/৪১৬)

ইবনুল হুমাম রহ. প্রথমে শুধু বলেছেন, তাদেরকে দারুশ শিরক-দারুল হারবে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। পরবর্তীতে মাসআলার কারণ হিসেবে তাদের উপর মুশরিকদের আইন-কানুন কর্তৃত্বসম্পন্ন হওয়াকে উল্লেখ করেছেন। বুঝা যাচ্ছে, ইবনুল হুমামের দৃষ্টিতে দারুশ শিরক-দারুল হারব মানেই সেখানে কুফরি আইন-কানুন বাস্তবায়িত। আর কুফরের কর্তৃত্বাধীন হয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ করা জায়েয হবে না।

ফাতহুল কাদিরের আরেকটি ইবারত-

قيل: وفي البلاد التي استولى عليها التتر وأجروا أحكامهم فيها وأبقوا المسلمين كما وقع في خوارزم وغيرها، إذا استولى عليها الزوج بعد الردة ملكها لأنها صارت دار حرب في الظاهر. (فتح القدير، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ٤/٣٨٨)

"কেউ কেউ বলেছেন, যে সকল অঞ্চলের উপর তাতারিরা কর্তৃত্বসম্পন্ন হয়ে তাদের আইন-কানুন জারি করেছে এবং মুসলমানদেরকে সেখানে থাকতে দিয়েছে, যেমনটি খুওয়ারিযমসহ বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছে; তো মুরতাদ হওয়া মহিলাকে যদি স্বামী পাকড়াও করতে পারে, তাহলে 'জাহেরি রেওয়ায়াত' অনুযায়ী সে তার মালিক হয়ে যাবে। কেননা সে অঞ্চল দারুল হারবে পরিণত হয়ে গেছে।" (ফাতহুল কাদির, ৪/৩৮৮)

উপর্যুক্ত ইবারত থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, মুসলমানদের অঞ্চলগুলো তাতারিরা দখল করে তাদের কুফরি আইন-কানুন জারি করায় তা দারুল হারবে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো।

শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আলবুখারি (মৃঃ ৮৭০ হিঃ)

قال بعض المتأخرين: إذا تحققت تلك الأمور الثلاثة في مصر المسلمين، ثم حصل لأهله الأمان، ونصب فيه قاض مسلم ينفذ أحكام الإسلام، عاد إلى دار الإسلام. (غرر الأذكار في شرح درر البحار لمحمد البخاري -المخطوطة- كتاب السير ص٢٨٦، رد المحتار، كتاب الجهاد، الباب الثالث باب المستأمن، مطلب فيما تصير به دار الإسلام دار حرب وبالعكس، ٦/٢١٥)

"পরবর্তী কোনো কোনো ফকিহ বলেছেন, যদি ওই তিনটি বিষয় (ইমাম আবু হানিফা কর্তৃক আরোপিত তিনটি শর্ত) মুসলমানদের কোনো শহরে পাওয়া যায়, অতঃপর তাতে পুনরায় 'আমান' ফিরে আসে এবং এমন বিচারক নিযুক্ত করা হয় যে ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়ন করে, তাহলে তা আবার দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" (গুরারুল আযকার ফি শারহি দুরারিল বিহার -পাণ্ডুলিপি-, পৃঃ ২৮৬, রদ্দুল মুহতার, ৬/২১৫)

উপর্যুক্ত ইবারত থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, দারুল ইসলাম হতে হলে তাতে শেষ পর্যন্ত ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়ন হতেই হবে।

আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া

দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার মাসআলায় সাহেবাইনের মতের 'তারজিহ' প্রাধান্যের আলোচনায় আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া (২/২৩২) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে যে, তাতে সাহেবাইনের মতকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। বুঝা গেলো, আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া সংকলনে সংশ্লিষ্ট উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে দারুল ইসলাম ও দারুল হারব নির্ধারণের মাপকাঠি হচ্ছে তাতে বাস্তবায়িত আইন-কানুন।

ইবনে আবেদিন আশশামি (মৃঃ ১২৫২ হিঃ)

দারুল হারবে আশ্রিত মুসলমানের জন্য হারবি কাফেরের সঙ্গে 'আকদে ফাসেদ'র মাধ্যমে সম্পদ গ্রহণ করা জায়েয, কিন্তু দারুল ইসলামে আশ্রিত কাফেরের সঙ্গে মুসলমানের জন্য তা জায়েয না হওয়ার কারণ হিসেবে আল্লামা শামি বলেন-

لأن دارنا محل إجراء الأحكام الشرعية. (رد المحتار لابن عابدين الشامي، كتاب الجهاد، الباب الثالث باب المستأمن، مطلب ما يؤخذ من النصارى زوار بيت المقدس لا يجوز، ٦/٢٠٩)

"কেননা আমাদের অঞ্চল (দারুল ইসলাম) শরয়ি আইন-কানুন জারি করার স্থান।" (রদ্দুল মুহতার, ৬/২০৯)

বুঝা যাচ্ছে, শরয়ি আইন-কানুন জারি করা ব্যতীত দারুল ইসলামের কোনো ধারণা আল্লামা শামির দৃষ্টিতে নেই।

রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি (মৃ: ১৩২৩ হি:)

দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার মাসআলায় সাহেবাইনের মতের 'তারজিহ' প্রাধান্যের আলোচনায় তালিফাতে রশিদিয়া (পৃ: ৬৫৯) থেকে রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহির বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি সাহেবাইনের মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বুঝা গেলো, তাঁর দৃষ্টিতে দারুল ইসলাম ও দারুল হারব নির্ধারণের মাপকাঠি হচ্ছে তাতে বাস্তবায়িত আইন-কানুন। তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেন-

باید دانست کہ مدار بودن بلدۂ وملکے دار الاسلام ودار الحرب بر غلبۂ اسلام وغلبۂ کفار است وبس، لہذا ہر موضع کہ مقہور تحت حکم مسلمین است آں رابلاد اسلام گفتہ خواہد شد۔ (تالیفات رشیدیہ، فیصلۃ الاعلام فی دار الحرب ودار الاسلام، ص ٦٥٥)۔

"জেনে রাখা উচিত, কোনো অঞ্চল ও রাষ্ট্র দারুল ইসলাম বা দারুল হারব হওয়া শুধু ইসলাম বা কাফেরদের কর্তৃত্বের উপর নির্ভর করে। সুতরাং যে অঞ্চল মুসলমানদের আইন-কানুনের অধীনে থাকবে, সেটিকে দারুল ইসলাম বলা হবে।" (তালিফাতে রশিদিয়া, পৃ: ৬৫৫)

অতঃপর তিনি তাঁর দাবির পক্ষে ফিকহের ইবারত উল্লেখ করে শুধু মুসলমানদের বসবাস বা কাফেরদের সম্মতিতে ইসলামের নিদর্শন পালন করতে সক্ষম হওয়ার উপর দারুল ইসলামের ভিত্তি নয়; দলিলের আলোকে প্রমাণ করার পর আবারো বলেন-

الحاصل: ایں اصل کلی وقاعدۂ کلیہ ہست کہ دار حرب مقہور کفر است ودار الاسلام مقہور اہل اسلام، اگرچہ دریک دار دیگر فریق ہم موجود باشد بلا غلبہ وقہر۔ (تالیفات رشیدیہ، فیصلۃ الاعلام فی دار الحرب ودار الاسلام، ص ٦٥٧)۔

"মোটকথা, এটিই হলো মূলনীতি, দারুল হারব হলো কুফরের কর্তৃত্বাধীন আর দারুল ইসলাম হলো মুসলমানদের কর্তৃত্বাধীন। যদিও একের অঞ্চলে অপর পক্ষ দাপটহীন বসবাস করে।" (তালিফাতে রশিদিয়া, পৃ: ৬৫৭)

পূর্বে বলে আসা কথাটি এখানে আবারো স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি যে, মুসলমানরা যদি ইসলামি আইন-কানুন জারি করতে না পারে, তাহলে এটিকে মুসলমানদের কর্তৃত্ব বলা হয় না।

ফিকহে মালেকি

আব্দুর রহমান ইবনুল কাসেম (মৃ: ১৯১ হি:)

একটি মাসআলার আলোচনায় মক্কা সম্পর্কে ইমাম ইবনুল কাসেম বলেন-

وكانت الدار يومئذ دار الحرب، لأن أحكام الجاهلية كانت ظاهرة يومئذ (المدونة الكبرى رواية سحنون عن ابن القاسم عن الإمام مالك، كتاب الجهاد، في عبيد أهل الحرب يسلمون في دار الحرب أيسقط عنهم ملك ساداتهم أم لا، ١/٥١١)

"অঞ্চলটি (মক্কা) তখন দারুল হারব ছিলো, কেননা তখন তাতে জাহেলি-কুফরি বিধি-বিধান প্রকাশ্য ছিলো।" (আলমুদাওয়ানাতুল কুবরা, ১/৫১১)

ইমাম ইবনুল কাসেমের মাসআলার আলোচনা ও দলিল যথাযথ হয়েছে কি না তা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। আমাদের এখানে দেখানোর বিষয় হচ্ছে, ইমাম ইবনুল কাসেমের নিকট কোনো অঞ্চল দারুল হারব হওয়ার ভিত্তি হলো তাতে কুফরি বিধি-বিধান প্রকাশ থাকা।

ইবনে আব্দুল বার আলকুরতুবি (মৃ: ৪৬৩ হি:)

لا يحل لمسلم أن يقيم في دار الكفر وهو قادر على الخروج عنها، ولا ينبغي له أن ينكح حربية ويقيم بدار يجري عليه فيها حكم الكفر. (الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر المالكي، كتاب الجهاد، باب مقام المسلم في دار الكفر وفدائه من أيدي العدو، صـ٢١٠)

"কোনো মুসলমানের জন্য দারুল কুফর-দারুল হারব থেকে বের হয়ে যাওয়ার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাতে অবস্থান করা বৈধ নয় এবং তার জন্য উচিত নয়

কোনো হারবি মহিলাকে বিয়ে করা ও এমন অঞ্চলে অবস্থান করা যেখানে তার উপর কুফরের আইন-কানুন চলে।" (আলকাফি, পৃ: ২১০)

ইমাম ইবনে আব্দুল বার প্রথমে দারুল কুফর থেকে হিজরতের কথা বলে পরে সেটির কারণের দিকে ইঙ্গিত করতেই দারুল কুফর-দারুল হারবের পরিচায়ক বাক্য ব্যবহার করেছেন যে, তাতে কুফরের আইন-কানুন জারি হয়।

আবুল ওলিদ ইবনে রুশদ আলজাদ্দ (মৃ: ৫২০ হি:)

একটি মাসআলার আলোচনায় যুদ্ধবিরতির সন্ধি ও 'জিযয়া' আদায়ের ভিত্তিতে সন্ধি; উভয়ের মাঝে পার্থক্য বুঝাতে গিয়ে ইবনে রুশদ বলেন-

لأن من صالح منهم على هدنة فليسوا بأهل ذمة، لأنهم بائنون بدارهم لا تجري أحكامنا عليهم ، ومن صالح منهم على أداء الجزية فهم أهل ذمة تجري أحكامنا عليهم. (البيان والتحصيل لابن رشد الجد، كتاب الجهاد الثاني، ٢٤/٣)

"কেননা কাফেরদের যারা যুদ্ধবিরতির সন্ধি করে তারা 'যিম্মি' নয়। কারণ, তারা তাদের অঞ্চল নিয়ে পৃথক; যেখানে তাদের উপর আমাদের আইন-কানুন জারি হয় না। আর কাফেরদের যারা 'জিযয়া' আদায়ের ভিত্তিতে সন্ধি করে তারা 'যিম্মি', তাদের উপর আমাদের আইন-কানুন জারি হয়।" (আলবায়ান ওয়াততাহসিল, ৩/২৪)

ইমাম ইবনে রুশদ কাফেরদের অঞ্চলের পরিচায়ক বাক্য ব্যবহার করেছেন 'তাদের উপর আমাদের আইন-কানুন জারি হয় না'। তার বিপরীতে 'জিযয়া' আদায় করতে সম্মত হলে তাদের উপর আমাদের আইন-কানুন জারি হয়, আর তা আমাদের অঞ্চলে পরিণত হয়ে যায়।

কাযি ইয়ায (মৃ: ৫৪৪ হি:)

'আলমুদাওয়ানাতুল কুবরা'র একটি ইবারত উল্লেখ করার পর দারুল হারবের মুসলমান ব্যবসায়ীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে কি না; এ সংক্রান্ত কাযি ইয়ায বলেন-

ظاهره جواز شهادة التجار إلى أرض الحرب وأنها ليس بجَرحة، وسحنون يراها جرحة، وهو الصحيح لدخولهم حيث تجري أحكام الكفر عليهم. (التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة لقاضي عياض، كتاب الولاء والمواريث، ٩٧٩/٢)

“বাহ্যিক ইবারত থেকে দারুল হারবের ব্যবসায়ীদের সাক্ষ্য প্রদানের বৈধতা বুঝা যায় এবং তা দোষের বিষয় নয়। কিন্তু সুহনুন সেটিকে দোষের বিষয় মনে করেন। এটিই সহিহ কথা। কেননা তারা এমন স্থানে প্রবেশ করেছে যেখানে তাদের উপর কুফরের আইন-কানুন জারি হয়।” (আততামবিহাতুল মুসতাম্বাতা, ২/৯৭৯)

কাযি ইয়ায ইমাম সুহনুনের কথা সহিহ হওয়ার কারণ হিসেবে দারুল হারবের পরিচায়ক বাক্য ‘যেখানে তাদের উপর কুফরের আইন-কানুন জারি হয়’ ব্যবহার করেছেন।

ফিকহে শাফেয়ি

ইমাম শাফেয়ি (মৃ: ২০৪ হি:)

وأحب إذا غزا المسلمون بلاد الحرب وكانت غزاتهم غارة، أو كان عدوهم كثيراً ومتحصناً ممتنعاً لا يغلب عليهم أن تصير دارهم دار الإسلام ولا دار عهد يجري عليها الحكم، أن يقطعوا ويحرقوا ويخربوا ما قدروا عليه من ثمارهم وشجرهم. .... وإذا كان الأغلب عليهم أنها ستصير دار الإسلام أو دار عهد يجري عليهم الحكم اخترت لهم الكف عن أموالهم ليغنموها، إن شاء الله تعالى. (الأم للشافعي، كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي، العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب، ٥/٦٣٠)

“মুসলমানরা যখন দারুল হারবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তখন তাদের যুদ্ধের ধরন যদি হয় শুধুই হঠাৎ হঠাৎ আক্রমণ করা বা শত্রুদের সংখ্যা যদি অধিক হয় এবং তারা এমনভাবে সুরক্ষিত ও নিরাপদ থাকে যে তাদের উপর বিজয়ী হয়ে সেটিকে দারুল ইসলাম বা দারুল আহদ বানানো যাবে না; যাতে (ইসলামি) আইন-কানুন জারি হবে,[৩২] তাহলে তাদের ফলমূল ও গাছপালা থেকে যা

---

৩২. ইমাম শাফেয়ি রহ. এখানে যেটির জন্য ‘দারুল আহদ’ ব্যবহার করেছেন তা অন্যান্যদের ব্যবহারে দারুল ইসলাম। কেননা ইসলামি আইন-কানুন জারি হলে তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যায়। এ সকল অঞ্চলের সঙ্গে সাধারণত ‘জিযয়া’র চুক্তি থাকায় হয়তো ইমাম শাফেয়ি রহ. ‘দারুল আহদ’ ব্যবহার করেছেন।

সম্ভব তা কাটা, জ্বালিয়ে দেয়া ও বিনষ্ট করাকে আমি পছন্দ করি। .... আর যদি প্রবল ধারণা হয় যে, তা দারুল ইসলাম বা দারুল আহদ হয়ে যাবে; যাতে (ইসলামি) আইন-কানুন জারি হবে, তাহলে তাদের সম্পদকে নষ্ট করা থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্তকেই আমি মুসলমানদের জন্য গ্রহণ করবো; যেনো তারা সেগুলোকে গনিমত হিসেবে গ্রহণ করতে পারে, ইনশাআল্লাহ।" (আলউম্ম, ৫/৬৩০)

ইমাম শাফেয়ি দারুল ইসলাম বলে সেটির পরিচায়ক বাক্যকে বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন যে, যাতে ইসলামি আইন-কানুন জারি হয়।

قال ابن قدامة المقدسي: فصل: ومتى ارتد أهل بلد، وجرت فيه أحكامهم، صاروا دار حرب. .... **وبهذا قال الشافعي**. وقال أبو حنيفة: لا تصير دار حرب حتى تجمع فيها ثلاثة أشياء.......... (المغني للموفق ابن قدامة المقدسي، كتاب المرتد، فصل متى ارتد أهل بلد صاروا أهل حرب، ٩٦/٨)

"যদি কোনো অঞ্চলের অধিবাসীরা মুরতাদ হয়ে যায় এবং সেখানে তাদের আইন-কানুন জারি হয়, তাহলে তারা দারুল হারবের অধিবাসীতে পরিণত হয়ে যায়। .... **ইমাম শাফেয়ি এমনটিই বলেছেন**। আর ইমাম আবু হানিফা বলেন, তিনটি শর্তের উপস্থিতি ব্যতীত তা দারুল হারবে পরিণত হবে না ....।" (আলমুগনি, ৮/৯৬)

আবুল হাসান আলমাওয়ারদি (মৃ: ৪৫০)

والضرب الثالث: أن تكون دار الإسلام قد تفرد أهل الذمة بسكناها حتى لا يساكنهم فيها مسلم ولا يدخلها مثل بلد من بلاد الشرك، فتحه المسلمون صلحاً أو عنوةً فأقروا أهله فيه على أن لا يخالطهم غيرهم، فإذا التقط المنبوذ فيه كان كافراً في الظاهر، لأن أهل الدار كفار، وإن كانت يد المسلمين عليهم غالبة وأحكام الإسلام فيهم جارية. (الحاوي الكبير للماوردي، كتاب اللقطة، باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء، ٤٣/٨)

"তৃতীয় প্রকার: এমন দারুল ইসলাম যাতে শুধু 'যিম্মি'রাই বসবাস করে, সেখানে তাদের সঙ্গে কোনো মুসলমান বসবাস করে না এবং দারুশ শিরক-দারুল হারবে মুসলমানরা যে নীতিতে প্রবেশ করে সে অঞ্চলে সে নীতিতে

প্রবেশ করে না। মুসলমানরা সেটিকে সন্ধি বা যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় করেছে এবং তাদেরকে সেখানে থাকতে দিয়েছে যে, সেখানে অন্য কেউ তাদের সঙ্গে বসবাস করবে না। সেখানে যদি কোনো নিক্ষিপ্ত বাচ্চা কুড়িয়ে পাওয়া যায়, তাহলে বাহ্যত তাকে কাফের সাব্যস্ত করা হবে। কেননা সে অঞ্চলের অধিবাসীরা কাফের, যদিও মুসলমানরা তাদের উপর কর্তৃত্বসম্পন্ন এবং ইসলামে আইন-কানুন সেখানে বাস্তবায়িত।" (আলহাবিল কাবির, ৮/৪৩)[৩৩]

ইমাম মাওয়ারদির আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, কোনো অঞ্চলের সকল অধিবাসী কাফের হলেও যদি সেখানে ইসলামি আইন-কানুন জারি হয়, তাহলে তা দারুল ইসলাম।

আবু ইসহাক আশশিরাযি (মৃঃ ৪৭৬ হিঃ)

وإن طلبت امرأة من دار الحرب أن تعقد لها الذمة وتقيم فى دار الإسلام من غير جزية جاز لانه لا جزية عليها ولكن يشترط عليها أن تجرى عليها أحكام الإسلام. (المهذب للشيرازي، كتاب السير، باب الجزية، فصل: عدم الجزية على المرأة ٣٢١/٥، المجموع شرح المهذب للنووي، كتاب السير، باب الجزية، ٣١٢/٢١)

"যদি দারুল হারবের কোনো মহিলা 'জিযয়া' প্রদান করা ব্যতীত 'যিম্মি' হয়ে দারুল ইসলামে বসবাস করার কামনা করে, তা জায়েয আছে। কেননা মহিলার উপর 'জিযয়া' নেই। তবে শর্ত হলো, তার ক্ষেত্রে ইসলামি আইন-কানুন জারি হবে।" (আলমুহাযযাব, ৫/৩২১, আলমাজমু', ২১/৩১২)

বুঝা যাচ্ছে, ইসলামি আইন-কানুন জারি হওয়া ব্যতীত কোনো দারুল ইসলামের ধারণা ইমাম শিরাযির দৃষ্টিতে নেই।

তকিউদ্দিন আসসুবকি (মৃঃ ৭৫৬ হিঃ)

قلت: لكن الأصحاب عدوها في باب اللقيط دار الإسلام لجريان أحكام الإسلام عليها. (فتاوى السبكي، كتاب الجهاد، باب ما قال الفقهاء في ذلك -بعد باب في شروط عمر ﷺ على أهل الذمة تحت باب عقد الذمة-، ٤١٣/٢)

---

৩৩. দারুল ইসলাম ও দারুল হারব সংক্রান্ত আল্লামা মাওয়ারদির কিছু 'শায' কথা আছে, যা উলামায়ে কেরাম প্রত্যাখ্যান করেছেন।

"আমি (সুবকি) বলছি, কিন্তু মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম 'লাকিত'র অধ্যায়ে অঞ্চলটিকে দারুল ইসলাম হিসেবে পরিগণনা করেছেন। কেননা তাতে ইসলামি আইন-কানুন জারি আছে।" (ফাতাওয়াস সুবকি, ২/৪১৩)

আল্লামা তকিউদ্দিন সুবকি দারুল ইসলাম হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, তাতে ইসলামি আইন-কানুন জারি আছে। বুঝা গেলো, ইসলামি আইন-কানুন জারি হওয়াই দারুল ইসলাম হওয়ার মানদণ্ড।

ফিকহে হাম্বলি

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (মৃ: ২৪১ হি:)

٩١٣- حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن مُحَمَّد بن حنبل قال: سألت أبي هل ترى قوماً في سعة من السكنى في بلد بينهم وبين مددهم من المسلمين بحر، وعدوهم في جزيرة إلا أنهم ظاهرون عليهم؟

فقال أبي: إن كانت أحكام أهل الإسلام ظاهرة عليهم وكانوا هم أقوى، فأرجو أن لا يكون بذلك بأس، وإذا لم يكونوا كذلك فلا يسكن بين ظهراني قوم يحكمون بغير حكم الإسلام. (مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله بن أحمد، كتاب السير، سئل عن فضل الغزو والسكنى بين اهل الحرب، ص٢٤٦)

"আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ বলেন, আমি আমার পিতাকে (আহমাদ ইবনে হাম্বল) জিজ্ঞাসা করেছি, কোনো সম্প্রদায়ের জন্য কি এমন অঞ্চলে বসবাস করার সুযোগ রয়েছে যার মাঝে ও মুসলমানদের সহযোগিতা পৌঁছার মাঝে সমুদ্রের প্রতিবন্ধকতা আছে এবং সমুদ্রের উপদ্বীপে শত্রুদের অবস্থান রয়েছে ঠিক, কিন্তু তারা শত্রুদের উপর কর্তৃত্বসম্পন্ন?

আমার পিতা (আহমাদ ইবনে হাম্বল) বললেন, যদি মুসলমানদের আইন-কানুন তাদের উপর কর্তৃত্বসম্পন্ন হয় এবং তারাই শক্তিশালী থাকে, তাহলে আশা করি তাতে কোনো সমস্যা নেই। আর যদি এমনটি না হয়, তাহলে এমন সম্প্রদায়ের মাঝে অবস্থান করবে না যারা অনৈসলামিক আইনে ফয়সালা করে।" (মাসায়েলুল ইমাম আহমাদ, পৃ: ২৪৬)

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ইসলামি আইন কর্তৃত্বসম্পন্ন হওয়া না হওয়াকে বসবাস করা বৈধ হওয়া না হওয়ার মাপকাঠি স্থির করেছেন। বুঝা গেলো, ইমাম আহমাদের দৃষ্টিতে ইসলামি আইন কর্তৃত্বসম্পন্ন হলে তা দারুল ইসলাম, তাই তাতে বসবাস করা বৈধ। আর ইসলামি আইন কর্তৃত্বসম্পন্ন না হলে তা দারুল হারব, তাই তাতে বসবাস করা বৈধ নয়।

কাযি আবু ইয়া'লা ইবনুল ফাররা (মৃ: ৪৫৮ হি:)

وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الإسلام دون أحكام الكفر فهي دار الإسلام، وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار الكفر، خلافاً للقدرية في قولهم: إن كل دار كانت الغلبة فيها للفساق دون المسلمين والكفار، فإنها ليست بدار كفر ولا دار إسلام بل هي دار فسق، وهذا بناء على أصلهم في القول بالمنزلة بين المنزلتين، .... ولا يجوز كون مكلف ليس بمؤمن ولا كافر، **وكذلك الدار أيضاً لا يخلو من أن تكون دار كفر أو دار إسلام**. (المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ابن الفراء، فصل -٤٨٧-، صـ٢٧٦)

"যে অঞ্চলে কুফরি আইন নয় বরং ইসলামি আইন-কানুন কর্তৃত্বসম্পন্ন তা দারুল ইসলাম, আর যে অঞ্চলে ইসলামি আইন নয় বরং কুফরি আইন-কানুন কর্তৃত্বসম্পন্ন তা দারুল কুফর। 'কাদারিয়্যাহ' সম্প্রদায় ভিন্ন মতামত পোষণ করে। তাদের মতে যে অঞ্চলে মুসলমান ও কাফেরদের নয় বরং ফাসেকদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত, তা দারুল ইসলামও নয় এবং দারুল কুফরও নয়; বরং তা দারুল ফিসক। এটি মূলত তাদের ইমান-কুফর দুই স্তরের মাঝে তৃতীয় স্তরের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে। .... শরিআতের কোনো 'মুকাল্লাফ'-ভারার্পিত ব্যক্তি মুমিনও নয় আবার কাফেরও নয় তা হতে পারে না। **তেমনিভাবে 'দার'র ক্ষেত্রেও তা দারুল ইসলাম বা দারুল কুফর; কোনো একটি না হয়ে থাকতে পারে না।**" (আলমু'তামাদ, পৃ: ২৭৬)

মুওয়াফফাকুদ্দিন ইবনে কুদামা আলমাকদেসি (মৃ: ৬২০ হি:)

فصل: ومتى ارتد أهل بلد، وجرت فيه أحكامهم، صاروا دار حرب. ....، وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تصير دار حرب حتى تجمع فيها ثلاثة أشياء........،

ولنا: أنها دار كفار فيها أحكامهم، فكانت دار حرب كما لو اجتمع فيها هذه الخصال، أو دار الكفرة الأصليين. (المغني للموفق ابن قدامة المقدسي، كتاب المرتد، فصل متى ارتد أهل بلد صاروا أهل حرب، ٩٦/٨)

"যদি কোনো অঞ্চলের অধিবাসীরা মুরতাদ হয়ে যায় এবং সেখানে তাদের আইন-কানুন জারি হয়, তাহলে তারা দারুল হারবের অধিবাসীতে পরিণত হয়ে যায়। .... ইমাম শাফেয়ি এমনটিই বলেছেন। আর ইমাম আবু হানিফা বলেন, তিনটি শর্তের উপস্থিতি ব্যতীত তা দারুল হারবে পরিণত হবে না .... ।

আমাদের দলিল হচ্ছে, সেটি কাফেরদের অঞ্চল তাতে তাদের আইন-কানুন চলছে। সুতরাং শর্ত তিনটি পাওয়া গেলে বা জন্মগত কাফেরদের অঞ্চল যেমনিভাবে দারুল হারব, এটিও তেমনিভাবে দারুল হারব হিসেবে পরিগণিত হবে।" (আলমুগনি, ৮/৯৬)

ইবনে কুদামা আলমাকদেসির বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট যে, সাহেবাইনের মতামতের ন্যায় শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবেও শুধু কুফরি আইন-কানুন জারি হওয়ার মাধ্যমে কোনো অঞ্চল দারুল হারবে পরিণত হয়ে যায়।

শামসুদ্দিন ইবনে কুদামা আলমাকদেসি (মৃ: ৬৮২ হি:)

وإن بذلت الجزية لتصير إلى دار الاسلام مكنت من ذلك بغير شيء، ولكن يشترط عليها التزام أحكام الاسلام. (الشرح الكبير على المقنع للشمس ابن قدامة المقدسي، كتاب الجهاد، باب عقد الذمة، مسألة -١٥٠٨-: ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا زمن ولا....، فصل: فإن بذلت المرأة الجزية....، ٤١٥/١٠)

"মহিলা যদি 'জিযয়া' প্রদান করে দারুল ইসলামে অবস্থান করতে চায়, তাহলে কোনো কিছু গ্রহণ করা ছাড়াই তাকে সে সুযোগ দেয়া হবে। তবে ইসলামি আইন-কানুন মেনে চলার শর্ত করা হবে।" (আশশারহুল কাবির, ১০/৪১৫)

বুঝা যাচ্ছে, দারুল ইসলাম হওয়া মানেই তাতে ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়িত।

ইবনুল কাইয়িম (মৃ: ৭৫১ হি:)

قال الجمهور: دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام، وما لم تجر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن لاصقها، فهذه الطائف قريبة إلى مكة جداً ولم تصر دار إسلام بفتح مكة، وكذلك الساحل. (أحكام أهل الذمة لابن القيم، فصل-١٢١-: اختلاف الدارين لا يوقع الفرقة، ٧٢٨/٢)

"জুমহুর ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, দারুল ইসলাম হলো যাতে মুসলমানদের আগমন ঘটে এবং তাতে ইসলামি আইন-কানুন জারি হয়। আর যাতে ইসলামি আইন-কানুন জারি হয়নি তা দারুল ইসলাম নয়; যদিও তা দারুল ইসলাম সংলগ্ন হয়। এই যে তায়েফ; মক্কার এতোটা নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও মক্কা বিজয়ের কারণে তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়নি, তেমনিভাবে উপকূলীয় অঞ্চল।" (আহকামু আহলিয যিম্মাহ, ২/৭২৮)

মুহাম্মাদ ইবনে মুফলিহ আলমাকদেসি (মৃ: ৭৬৩ হি:)

فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار الإسلام، وإن غلب عليها أحكام الكفار فدار الكفر، **ولا دار لغيرهما**. (الآداب الشرعية لابن مفلح، فصل في تحقيق دار الإسلام ودار الحرب، ٢١١/١)

"যে অঞ্চলে মুসলমানদের আইন-কানুন কর্তৃত্বসম্পন্ন হয় তা দারুল ইসলাম। আর যদি তাতে কাফেরদের আইন-কানুন কর্তৃত্বসম্পন্ন হয় তা দারুল কুফর। **এই দুই 'দার' ব্যতীত আর কোনো 'দার' নেই।"** (আলআদাবুশ শারইয়্যাহ, ১/২১১)

আলাউদ্দিন আবুল হাসান আলমারদাবি (মৃ: ৮৮৫ হি:)

ودار الحرب ما يغلب فيها حكم الكفر. (الإنصاف للمرداوي، كتاب الجهاد، ١٢١/٤)

"আর দারুল হারব হলো যাতে কুফরি আইন-কানুন কর্তৃত্বসম্পন্ন থাকে।" (আলইনসাফ, ৪/১২১)

শারাফুদ্দিন আলহাজ্জাবি (মৃ: ৯৬৮ হি:)

وتجب على من يعجز عن إظهار دينه بدار الحرب، وهي ما يغلب فيها حكم الكفر.

(الإقناع لطالب الانتفاع للحجَّاوي، كتاب الجهاد، ٢/٦٨، كشاف القناع عن الإقناع للبُهوتي، كتاب الجهاد، ٧/٣٤)

"দারুল হারবে যে তার দ্বীন প্রকাশে অক্ষম, তার জন্য হিজরত করা ওয়াজিব। আর দারুল হারব হলো, যাতে কুফরি আইন-কানুন কর্তৃত্বসম্পন্ন।" (আলইকনা', ২/৬৮, কাশশাফুল কিনা', ৭/৩৪)

খিলাফত পতনের (১৩৪৩ হিঃ মোতাবেক ১৯২৪ খৃঃ) পর

আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি আলহানাফি (মৃঃ ১৩৫২ হিঃ)

وأما دار الحرب: فهي التي تكون فيها فصل الأمور -أي الخصومات- في أيدي الكفار، وليس الاصطلاح أنها هي التي يمنع فيها المسلمون من أداء الفرض من الصوم والصلاة، كما زعم بعض الناس فإنه لا أصل لهذا التعريف. (العرف الشذي شرح سنن الترمذي للكشميري، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة العسل، ٢/١١٠)

"দারুল হারব হলো, যেখানের বিচারকার্য কাফেরদের হাতে থাকে। দারুল হারবের পরিভাষা এটি নয় যে, যাতে মুসলমানদেরকে সালাত-সাওম ইত্যাদি ফরয আদায় করার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করা হয়; যেমনটি কেউ কেউ ধারণা করেছে। কিন্তু এই সংজ্ঞার কোনো ভিত্তি নেই।" (আলআরফুশ শাযি, ২/১১০)[৩৪]

---

৩৪. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরির এর পরবর্তী বক্তেব্যের কারণে কেউ আবার সংশয়ের শিকার হতে পারে, তাই বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়া জরুরি মনে করছি। কাশ্মিরি রহ. এরপর বলেন-

وأما دار يمن (يمكن) فيها للمسلمين أن يجعلوا فصل الأمور أي الخصومات في أيديهم وقادرون على هذا فهو دار الإسلام، ويكون الناس آثمين على عدم جعلهم الخصومات في أيديهم، مثل مملكة كابل.

"আর যে অঞ্চলে মুসলমানদের জন্য বিচারকার্য নিজেদের হাতে রাখা সম্ভব এবং তারা সেটির সক্ষমতা রাখে, তা দারুল ইসলাম। তবে মানুষরা বিচারকার্য নিজেদের হাতে না রাখায় গোনাহগার হবে। যেমনটি 'কাবুল' রাজ্য।"

কাবুলের উপমা পেশ করায় কাশ্মিরির রহ. উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে গেছে। কেননা কাবুলে তখন কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোনো কুফরি মতবাদ ও আইন সংবিধিবদ্ধ করা হয়নি এবং ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়নের পথ রুদ্ধ করা হয়নি। বরং

পূর্বে ব্যাখ্যা করে আসা কথাটি আবার স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি যে, মুসলমানের বিচারের আইন-কানুন কুফরি হতে পারে না, আর যে কুফরি আইনে বিচার করে সে মুসলমান থাকতে পারে না। সুতরাং কাফেরদের হাতে থাকার অর্থ কুফরি আইনে পরিচালিত হওয়া।

এ জন্যই মাওলানা মুহাম্মাদ আকেল সাহারানপুরি সুনানে আবু দাউদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আদ্দুররুল মানদুদ' কিতাবে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরির বক্তব্য এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন-

دار الحرب وہ مقام ہے کہ جس میں فصل الامور یعنی خصومات و مقدمات کا فیصلہ کفار کے ہاتھ میں ہو (یعنی کفار کے قانون کے موافق چاہے فیصلہ کرنے والے مسلمان ہوں)۔ (الدر المنضود، کتاب الخراج والفئ والامارۃ، باب ما جاء فی حکم ارض خیبر، مولانا انور شاہ صاحب کی رائے، ۵/۱۵۴)۔

"দারুল হারব ওই স্থানকে বলে, যেখানে মামলা-মকদ্দমার ফয়সালা কাফেরদের হাতে থাকে। অর্থাৎ কাফেরদের আইন-কানুন অনুযায়ী হয়; চাই বিচারক (নামে) মুসলমান হোক।" (আদ্দুররুল মানদুদ, ৫/১৫৪)

সাইয়েদ কুতুব (মৃ: ১৩৮৫ হি:)[৩৫]

ولا بد من بيان ما تعنيه الشريعة بدار الإسلام:

ينقسم العالم في نظر الإسلام وفي اعتبار المسلم إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما:

الأول دار الإسلام: وتشمل كل بلد تطبق فيه أحكام الإسلام، وتحكمه شريعة الإسلام، سواء كان أهله كلهم مسلمين، أو كان أهله مسلمين وذميين، أو كان أهله كلهم ذميين

খিলাফত পতনের আগ পর্যন্ত যেমন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে কখনো ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়ন হয়েছে আবার গাফলতের কারণে কখনো বাস্তবায়ন হয়নি; কাবুলের অবস্থা এর ব্যতিক্রম কিছু ছিলো না। কাশ্মিরি রহ. সে ধরনের অবস্থার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। সুতরাং এর দ্বারা প্রতারিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

৩৫. বর্তমান সময় হিসেবে সাইয়েদ কুতুবের আলোচনাটি একটু স্পষ্ট হওয়ায় তা উল্লেখ করেছি। এখান থেকে তাঁর সকল আদর্শ ও বিশ্বাসের প্রতি সমর্থনের ইঙ্গিত বের করা মূর্খতা প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই হবে না। অপবাদ ও মিথ্যা প্রচারের যে হিড়িক চলছে, তাই বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়া জরুরি মনে করেছি।

ولكن حكامه مسلمون يطبقون فيه أحكام الإسلام، ويحكمونه بشريعة الإسلام، أو كانوا مسلمين، أو مسلمين وذميين ولكن غلب على بلادهم حربيون، غير أن أهل البلد يطبقون أحكام الإسلام ويقضون بينهم حسب شريعة الإسلام، فالمدار كله في اعتبار بلد ما "دار إسلام" هو تطبيقه لأحكام الإسلام وحكمه بشريعة الإسلام.

الثاني دار الحرب: وتشمل كل بلد لا تطبق فيه أحكام الإسلام، ولا يحكم بشريعة الإسلام كائناً أهله ما كانوا، سواء قالوا: إنهم مسلمون، أو إنهم أهل كتاب، أو إنهم كفار، فالمدار كله في اعتبار بلد ما "دار حرب" هو عدم تطبيقه لأحكام الإسلام وعدم حكمه بشريعة الإسلام، وهو يعتبر "دار حرب" بالقياس للمسلم وللجماعة المسلمة. (في ظلال القرآن لسيد قطب، سورة المائدة -الآية: ٢٧-، ٥/٧٠)

“শরিআত দারুল ইসলাম বলতে কী বুঝায়, সেটির ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন-

ইসলামের দৃষ্টিতে এবং মুসলমানের বিবেচনায় পুরো বিশ্ব দু'ভাগে বিভক্ত, তৃতীয় কোনো প্রকার নেই-

প্রথমটি দারুল ইসলাম: তা প্রত্যেক ওই অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করে, যাতে ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়িত এবং যেটিকে ইসলামি শরিআত পরিচালনা করে। চাই সেখানের অধিবাসী সকলেই মুসলমান, বা মুসলমান ও 'যিম্মি'র সংমিশ্রণ, অথবা সকলেই 'যিম্মি' কিন্তু সেখানের হাকেমরা মুসলমান; যারা সেখানে ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়ন করে এবং ইসলামি শরিআতে পরিচালনা করে, অথবা অধিবাসীরা মুসলমান বা মুসলমান ও 'যিম্মি' ছিলো; কিন্তু তাদের অঞ্চলের উপর হারবি কাফেররা ক্ষমতাবান হয়েছে ঠিকই, তবে সে অঞ্চলের অধিবাসীরা ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়ন করে এবং নিজেদের মাঝে ইসলামি শরিআত অনুযায়ী ফয়সালা করে। মোটকথা, কোনো অঞ্চল দারুল ইসলাম হিসেবে পরিগণিত হওয়ার পূর্ণ মাপকাঠি হচ্ছে, ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়ন হওয়া এবং ইসলামি শরিআতে পরিচালিত হওয়া।

দ্বিতীয়টি দারুল হারব: তা প্রত্যেক ওই অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করে, যাতে ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়িত নয় এবং যাতে ইসলামি শরিআত অনুযায়ী ফয়সালা করা হয় না; সেখানের অধিবাসী যারাই হোক না কেনো। তারা

নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করছে নাকি আহলে কিতাব নাকি কাফের দাবি করছে; কোনো পার্থক্য নেই। মোটকথা, কোনো অঞ্চল দারুল হারব হওয়ার পূর্ণ মাপকাঠি হচ্ছে, ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়িত না হওয়া এবং ইসলামি শরিআতে ফয়সালা না করা। মুসলমান ও মুসলমান জামাআতের বিবেচনায় সেটি দারুল হারব হিসেবে গৃহীত।" (ফি যিলালিল কুরআন, ৫/৭০)

মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহিম আলে শাইখ আলহাম্বলি (মৃঃ ১৩৮৯ হিঃ)

البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام، تجب الهجرة منها، وكذلك إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غيرت فتجب الهجرة، فالكفر بفشو الكفر وظهوره هذه بلد كفر. (فتاوى ورسائل لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحسبة، -١٤٥١- هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون، ١٨٨/٦)

"যে অঞ্চলে 'কানুন'-মানবরচিত আইনে ফয়সালা করা হয়, সেটি দারুল ইসলাম নয়; সেখান থেকে হিজরত করা ওয়াজিব। তেমনিভাবে পৌত্তলিকতা যদি নির্দ্বিধায় প্রকাশ পায় এবং তা পরিবর্তন করা না হয়, তাহলেও হিজরত ওয়াজিব। সুতরাং কুফর ব্যাপক ও প্রকাশ্যে হওয়ায় এটি দারুল কুফর।" (ফাতাওয়া ওয়ারাসায়েল, ৬/১৮৮)

ইদরিস কান্ধলবি আলহানাফি (মৃঃ ১৩৯৪ হিঃ)

خلاصۂ کلام یہ کہ دار الحرب اور دار الاسلام میں فرق یہی ہے کہ جس حکومت میں اسلام حاکم ہو اور قانون شریعت کو برتری اور بالا دستی حاصل ہو اور اس کے فرامین اور قوانین کی عزت اور سربلندی کو خاص طور پر ملحوظ رکھا گیا ہو وہ دار الاسلام ہے، اور جس حکومت میں غیر اسلامی مسلک کی برتری کو ملحوظ رکھا گیا ہو وہ دار الحرب ہے۔(عقائد الاسلام، دار الحرب اور دار الاسلام میں فرق، ۱/۱۹۱)۔

"মোটকথা, দারুল হারব ও দারুল ইসলামের মাঝে পার্থক্য হলো, যে রাষ্ট্রে ইসলাম হাকেম-পরিচালক হবে, শরয়ি আইন-কানুনের শ্রেষ্ঠত্ব ও ক্ষমতা অর্জিত থাকবে এবং সেটির ফরমান ও কানুনের সম্মান ও মাহাত্ম্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়, সেটি দারুল ইসলাম। আর যে রাষ্ট্রে অনৈসলামিক মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রণিধানযোগ্য হয়, সেটি দারুল হারব।" (আকায়েদুল ইসলাম, ১/১৯১)

ইউসুফ বানুরি আলহানাফি (মৃ: ১৩৯৭ হি:)

کسی ملک کے دار الاسلام بننے کا مدار کس چیز پر ہے؟

تمام علماء امت کا اتفاق ہے کہ کسی خطۂ زمین کے دار الاسلام بننے کا مدار اس بات پر نہیں کہ وہاں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب کیا ہے، بلکہ اس کا مدار قانون اسلام کے نفاذ پر ہے۔ جس ملک میں برسر اقتدار طبقہ کی جانب سے عوام کو اسلامی قانون کے فیوض وبرکات سے مستفید ہونے کا موقعہ نہ دیا جائے، جہاں کفر اور جاہلیت کا آئین وقانون مسلط ہو اور جہاں کے بے بس عوام مسلسل احتجاج کے باوجود خدائی قانون کے بجائے طاغوتی قانون کے مطابق اپنے مقدمات فیصل کرانے پر مجبور ہوں، اسے ہزار بار مسلمانوں کا ملک کہہ لیجئے، لیکن اسے حقیقی معنی میں اسلامی مملکت اور دار الاسلام کہتے ہوئے حیا آتی ہے۔ "اسلام کے گھر" میں بھی اگر اسلام کو قدم ٹکانے کی اجازت نہ ہو تو وہ مسلمانوں کا گھر تو ہو سکتا ہے، لیکن کیا دنیا کا کوئی عقلمند اسے "اسلام کا گھر" مانیگا؟(بصائر وعبر، ۲/۲۰)۔

"কোনো রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হওয়ার মাপকাঠি কী?

সমস্ত উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, কোনো ভূখণ্ড দারুল ইসলাম হওয়ার মাপকাঠি এটি নয় যে, সেখানে মুসলিম জনসংখ্যার হার কতো। বরং দারুল ইসলাম হওয়ার ভিত্তি হলো ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়নের উপর। যে রাষ্ট্রে শাসকশ্রেণির পক্ষ হতে জনগণকে ইসলামি আইন-কানুনের 'ফয়েয-বরকত' দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ দেয়া হয় না, যেখানে কুফরি ও জাহেলি আইন-কানুন কর্তৃত্বসম্পন্ন এবং যেখানের অসহায় জনগণ ধারাবাহিক বিরোধিতা করা সত্ত্বেও আল্লাহ প্রদত্ত আইন-কানুনের পরিবর্তে 'তাগুতি'-কুফরি আইনে নিজেদের মামলা-মকদ্দমা ফয়সালা করাতে বাধ্য; সেটিকে হাজারবার মুসলমানদের রাষ্ট্র বলা হোক, কিন্তু সেটিকে বাস্তবিক অর্থে ইসলামি রাষ্ট্র ও দারুল ইসলাম বলতে লজ্জা লাগে। 'ইসলামের ঘরেও যদি ইসলামের পা রাখার অনুমতি না থাকে; তো সেটি মুসলমানদের ঘর তো হতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর কোনো বিচক্ষণ ব্যক্তি কি সেটিকে 'ইসলামের ঘর' হিসেবে মেনে নেবে?" (বাসায়ের ওয়াইবার, ২/২০)

কারি মুহাম্মাদ তাইয়িব আলহানাফি (মৃ: ১৪০৩ হি:)

(قانون سازی غیر اللہ کا حق نہیں)......... پس وہ سلطنت کبھی بھی اسلامی سلطنت نہیں کہی جا سکتی جس میں قانون سازی انسان کا حق تسلیم کی گئی ہو اور اس طرح حکمرانی کا منصب انسانوں کو دیا جا رہا ہو۔(فطری حکومت، ۲/۷۰)۔

“(আইন প্রণয়ন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো অধিকার নয়)..... সুতরাং ওই রাষ্ট্র কখনই ইসলামি রাষ্ট্র হতে পারে না, যে রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন মানুষের অধিকার হিসেবে মেনে নিয়েছে এবং স্বতন্ত্র নীতিতে রাজ্য পরিচালনার পদ মানুষদেরকে দিয়ে দিয়েছে।”(ফিতরি হুকুমত, ২/৬০)

ইউসুফ লুধিয়ানবি শহিদ আলহানাফি (মৃ: ১৪২১ হি:)

جس ملک میں اسلام کے احکام جاری ہوں وہ دار الاسلام ہے، اور جہاں اسلام کے احکام جاری نہ ہوں وہ مسلمانوں کا ملک تو ہو سکتا ہے مگر شرعاً دار الاسلام نہیں۔ (آپ کے مسائل اور ان کا حل، متفرق مسائل، دار الاسلام کی تعریف۸/۳۹۵)۔

“যে রাষ্ট্রে ইসলামি আইন-কানুন জারি আছে তা দারুল ইসলাম, আর যেখানে ইসলামি আইন-কানুন জারি নেই; সেটিকে মুসলমানদের রাষ্ট্র বলা যেতে পারে, কিন্তু শরিআতের দৃষ্টিতে তা দারুল ইসলাম নয়।” (আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল, ৮/৩৯৫)

ওয়াহবা আযযুহাইলি আশশাফেয়ি (মৃ: ১৪৩৬ হি:)

دار الإسلام: نجد في تحديد هذه الدار أربعة آراء للعلماء، نختار منها الرأي الأول، لأنه أقرب الآراء إلى نصوص جمهور الفقهاء، وهو أن كل ما دخل من البلاد في محيط سلطان الإسلام، ونفذت فيها أحكامه وأقيمت شعائره، قد صار من دار الإسلام...........

ودار الحرب: هي الدار التي لا تطبق فيها أحكام الإسلام الدينية والسياسية لوجودها خارج نطاق السيادة الإسلامية......................

يظهر من تعريف كل من الدارين أن المعول في تمييز الدار هو وجود السلطة وسريان الأحكام، فإذا كانت إسلامية كانت الدار دار إسلام، وإذا كانت غير إسلامية كانت الدار دار حرب. (آثار الحرب لوهبة الزحيلي، الباب الأول، الفصل الأول، المبحث الأول، ص١٦٩-١٧١)

"দারুল ইসলামের সংজ্ঞায় আমরা উলামায়ে কেরামের চারটি মতামত পাই। তা থেকে আমরা প্রথমটি গ্রহণ করছি। কেননা সেটি জুমহুর ফুকাহায়ে কেরামের রায়ের অধিক নিকটতর। আর তা হচ্ছে, ইসলামের কর্তৃত্বের অধীনে যে সকল অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তাতে ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়ন হয় ও ইসলামের নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করা হয়, তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়।.......................

আর যে অঞ্চল ইসলামি কর্তৃত্বের পরিধির বাইরে অবস্থিত হওয়ায় তাতে ইসলামের দ্বীনি ও রাজনৈতিক বিধি-বিধান বাস্তবায়িত হয় না, তা দারুল হারব।..

উভয় 'দার'র সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট যে, 'দার'র পার্থক্য নির্ভর করে কর্তৃত্বের উপস্থিতি ও আইন-কানুন বাস্তবায়নের উপর। যদি আইন-কানুন ইসলামি হয় তাহলে দারুল ইসলাম, আর যদি ইসলামি না হয় তাহলে দারুল হারব।" (আসারুল হারব, পৃ: ১৬৯-১৭১)

মুফতি আব্দুস সালাম চাটগামি আলহানাফি (মৃ-১৪৪৩ হি.)

'কেননা, ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচয় হল, সে রাষ্ট্রে ইসলামী আইন-কানুন তথা কুরআন-হাদীসের বিধান প্রতিষ্ঠিত থাকবে। রাষ্ট্রের শাসকবর্গ থেকে শুরু করে প্রজাবর্গ পর্যন্ত সবাই উক্ত আইনের পাবন্দী করবে। তারপর এ রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য হওয়ার উপযুক্ত এবং ওখানকার শাসকবর্গ মুসলমানদের শাসনকর্তা এবং ওখানকার প্রজা মুসলিম প্রজা হিসেবে গণ্য হওয়ার উপযুক্ত হবে।

যদি মুসলিম শাসকদের তরফ থেকে মুসলিম দেশে ইসলামী আইন জারি না করা হয়, বরং কুফর ও খোদাদ্রোহী আইন প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং একে আরও উন্নতি প্রদান করা হয়। তখন ঐ দেশসমূহ ইসলামী দেশ হিসেবে কখনো গণ্য হওয়ার উপযুক্ত নয়, বরং, সেগুলোকে অমুসলিম দেশ হিসেবে সাব্যস্ত করা হবে। কেননা, ইসলামী দেশের পরিচয় ইসলামী আইন প্রয়োগের দ্বারা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, কাফেরদের দেশসমূহ দেখা যেতে পারে- যে দেশে সাম্যবাদ প্রচলিত সে দেশকে কমিউনিস্ট দেশ বলা হয়। কেননা, কমিউনিজম হল রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি। গণতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক নিয়ম প্রচলিত থাকে। এ কারণে সেটিকে গণতান্ত্রিক দেশ বলা হয়। যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বিদ্যমান

সেটাকে ধর্ম-নিরপেক্ষ দেশ বলে। সুতরাং কোন ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকবর্গ যদি ইসলামী আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা না করে তবে দেশকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করার উপযুক্ততা থাকে না। এভাবে কোন ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসীরা না ইসলামী আইন চায়, না সে আইনের প্রতি সন্তুষ্ট, বরং অনৈসলামিক আইনের বাস্তবায়ন চায় এবং সে আইনের প্রতি খুশি, তাহলে এদের মুসলমান বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্যতা নেই। বরং এমন লোক কাফের উপাধী পাওয়ার উপযুক্ত।' (মাকালাতে চাটগামী, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য, পৃ: ১৬৮)

আলমাউসুআতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যাহ

دار الإسلام هي: كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة............

دار الحرب هي: كل بقعة تكون فيها أحكام الكفر ظاهرة. (الموسوعة الفقهية الكويتية، المادة: دار الإسلام، ٢٠/٢٠١)

"দারুল ইসলাম: প্রত্যেক ওই ভূখণ্ড যাতে ইসলামি আইন-কানুন প্রকাশ্য।
দারুল হারব: প্রত্যেক ওই ভূখণ্ড যাতে কুফরি আইন-কানুন প্রকাশ্য।" (আলমাউসুআতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যাহ, ২০/২০১)[৩৬]

আললাজনাতুদ দায়েমাহ লিলবুহুসিল ইলমিয়্যাহ ওয়ালইফতা

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٦٣٥)

س١: ما الشروط الواجب توفرها في بلد حتى تكون دار حرب أو دار كفر؟

ج١: كل بلاد أو ديار يقيم حكامها وذوو السلطان فيها حدود الله، ويحكمون رعيتها بشريعة الإسلام، وتستطيع فيها الرعية أن تقوم بما أوجبته الشريعة الإسلامية عليها؛ فهي دار إسلام.................................

وكل بلاد أو ديار لا يقيم حكامها وذوو السلطان فيها حدود الله، ولا يحكمون في الرعية بحكم الإسلام، ولا يقوى المسلم فيها على القيام بما وجب عليه من شعائر الإسلام؛ فهي

---

৩৬. 'আলমাউসুআতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যাহ'তে শাফেয়ি মাযহাবের দিকে নিসবত করে কিছু কথা বলা হয়েছে, যা যথাযথ হয়নি।

دار كفر، وذلك مثل مكة المكرمة قبل الفتح، فإنها كانت دار كفر، وكذا البلاد التي ينتسب أهلها إلى الإسلام، ويحكم ذوو السلطان فيها بغير ما أنزل الله، ولا يقوى المسلمون فيها على إقامة شعائر دينهم. (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، كتاب الجهاد وما يتعلق به، الهجرة، ١٢/٥١-٥٢)

"প্রশ্ন: কোনো অঞ্চল দারুল হারব বা দারুল কুফর হওয়ার জন্য কী কী শর্তের উপস্থিতি আবশ্যক?

উত্তর: যে সকল দেশ বা অঞ্চলের হাকেম ও ক্ষমতাবানরা তাতে আল্লাহর 'হুদুদ'-দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করে ও ইসলামি শরিআহ অনুযায়ী প্রজাদের মাঝে ফয়সালা করে এবং জনসাধারণ ইসলামি শরিআহ কর্তৃক তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব আদায় করতে সক্ষম; সেটি দারুল ইসলাম।...........

আর যে সকল দেশ বা অঞ্চলের হাকেম ও ক্ষমতাবানরা তাতে আল্লাহর 'হুদুদ'-দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করে না ও ইসলামি শরিআহ অনুযায়ী প্রজাদের মাঝে ফয়সালা করে না এবং মুসলমান তার উপর অর্পিত সকল ইসলামি বিধি-বিধান আদায় করতে সক্ষম না হয়; সেটি দারুল কুফর। যেমন বিজয়ের পূর্বে মক্কা মুকাররমা, তখন সেটি দারুল কুফর ছিলো। তেমনিভাবে ওই সকল অঞ্চল, যার অধিবাসীরা ইসলামের দিকে সম্বন্ধযুক্ত; কিন্তু শাসকশ্রেণি মানবরচিত আইনে ফয়সালা করে এবং মুসলমানরা তাদের দ্বীনের সকল নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম নয়।" (ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়েমাহ লিলবুহুসিল ইলমিয়্যাহ ওয়ালইফতা, ১২/৫১-৫২)

এখানে আমি আমার অধ্যয়নের পরিধিতে আসা কিছু 'নুসুস' উল্লেখ করেছি। অন্যথায় বিষয়টি মাথায় রেখে তালিবে হক উলামায়ে কেরাম ফিকহি কিতাবাদি অধ্যয়ন করলে আরো বহু 'নুসুস' পেয়ে যাবেন, ইনশাআল্লাহ।

উপর্যুক্ত সকল 'নুসুস'র আলোকে প্রমাণিত কয়েকটি কথা

কুরআন-সুন্নাহ ও খিলাফত পতনের পূর্ব ও পরের ফুকাহায়ে কেরামের 'নুসুস'র আলোকে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে-

ক) 'দার'র পার্থক্যের ভিত্তি

'দার'র পার্থক্য নির্ভর করে আইন-কানুন বাস্তবায়নের উপর। যদি ইসলামি

আইন-কানুন বাস্তবায়িত হয় তাহলে দারুল ইসলাম, আর যদি কুফরি আইন-কানুন বাস্তবায়িত হয় তাহলে দারুল কুফর-দারুল হারব। বা বর্তমান পৃথিবীর রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবে বলা যায়; যে রাষ্ট্র কুরআন-সুন্নাহকে সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করবে তা দারুল ইসলাম, আর যে রাষ্ট্র কুফরি মতবাদ বা মানবরচিত কুফরি আইন-কানুনকে সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করেছে তা দারুল কুফর-দারুল হারব।

খ) স্বতন্ত্র 'দার' দুটিই; 'দারুল আমান' বলতে স্বতন্ত্র কোনো 'দার' নেই

স্বতন্ত্র 'দার' বলতে দু'টিই; দারুল ইসলাম ও দারুল হারব। তৃতীয় কোনো স্বতন্ত্র 'দার'র অস্তিত্ব নেই। কয়েকজন ফকিহের ইবারতে তা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ হয়েছে। হানাফিদের একটি মূলনীতিই হলো পুরো পৃথিবী দুটি 'দার'; দারুল ইসলাম ও দারুল হারব। ফিকহে হানাফিতে এভাবেই উল্লেখ হয়েছে-

আবু যায়েদ আদদাবুসি আলাহানাফির (মৃ: ৪৩০ হি:) বক্তব্য

الأصل عندنا أن الدنيا كلها داران: دار الإسلام ودار الحرب. (تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي الحنفي، القول في القسم الذي فيه الخلاف بيننا وبين الإمام القرشي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، ص١١٩)

"আমাদের (হানাফি) একটি মূলনীতি হলো, পুরো পৃথিবী দুটি 'দার'; দারুল ইসলাম ও দারুল হারব।" (তাসিসুন নাযার, পৃ: ১১৯)

কিওয়ামুদ্দিন আলকাকি আলহানাফির (মৃ: ৭৪৯ হি:) বক্তব্য

قيل: الدار داران عندنا: دار الإسلام ودار الحرب. (معراج الدراية شرح الهداية للكاكي - المخطوطة- كتاب السير، باب المستأمن، ٢٤١/٢)

"বলা হয়, আমাদের (হানাফি) দৃষ্টিতে 'দার' দু'টিই: দারুল ইসলাম ও দারুল হারব।" (মি'রাজুদ দিরায়া -পাণ্ডুলিপি-, ২/২৪১)

হ্যাঁ! দারুল হারবের সঙ্গে যদি দারুল ইসলামের যুদ্ধ বিরতির সন্ধি হয়; তাহলে ওই যুদ্ধ বিরতির সময়কালে দারুল হারবের জন্য ফুকাহায়ে কেরাম 'দারুল মুওয়াদাআ' ব্যবহার করেছেন। তবে এটিও বলে দিয়েছেন যে, 'দারুল মুওয়াদাআ' দারুল হারবেরই অন্তর্ভুক্ত। শুধু সন্ধির কারণে তা দারুল হারবের

বহির্ভূত হয়ে যায় না। দারুল হারব থেকে বের হতে হলে সেখানে ইসলামি আইন-কানুন জারি হতে হবে। যেটির বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

দারুল হারবের এই সাময়িক অবস্থা 'দারুল মুওয়াদাআ'কে কেউ 'দারুল আহদ' নামকরণ করেছেন, আবার চাইলে কেউ 'দারুল আমান'ও বলতে পারেন। যে যাই বলুন না কেনো; এটি শুধু দারুল হারবের কিছু সাময়িক অবস্থার নাম, মর্মের পার্থক্য নয়। সর্বাবস্থায় তা দারুল হারবেরই অন্তর্ভুক্ত।

যেমন ইমাম শাফেয়ি রহ. ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়িত 'জিযয়া' প্রদানকারী কাফেরদের অঞ্চলের জন্য 'দারুল আহদ' ব্যবহার করেছেন; যেমনটি ইতোপূর্বে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পরিচয়ে তাঁর থেকে বর্ণিত ইবারত থেকে বুঝে আসে। অথচ তা সকলের ঐক্যমত্যে দারুল ইসলাম।

তেমনিভাবে তিনি 'দারুল মুওয়াদাআ'র জন্য 'দারুল আমান' ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন-

وتمنع الدار من الغارة إذا كانت دار إسلام أو دار أمان بعقد عقده المسلمون، لا يكون لأحد أن يغير عليها. (الأم للشافعي، كتاب سير الأوزاعي، حال المسلمين يقاتلون العدو وفيهم أطفالهم، ٢٢٣/٩)

"কোনো অঞ্চলে আক্রমণ করা নিষেধ হয় যদি তা দারুল ইসলাম বা চুক্তির কারণে 'দারুল আমান' হয়, যে চুক্তি মুসলমানরা সম্পন্ন করেছে। কারো জন্য সেখানে আক্রমণ করার অনুমতি নেই।" (আলউম্ম, ৯/২২৩)

বুঝা গেলো, দারুল মুওয়াদাআ, দারুল আমান শুধুই দারুল হারবের কিছু সাময়িক অবস্থার নাম। বাস্তবতা একই; সবই দারুল হারবের অন্তর্ভুক্ত।

এক্ষেত্রে কেউ কেউ আবার দারুল হারবকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন; 'দারুল খাওফ' ও 'দারুল আমান'। নিজের ইমান নিয়ে যদি টিকে থাকা সম্ভব না হয় তাহলে 'দারুল খাওফ', আর যদি ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের উপর চলতে প্রতিবন্ধকতা না আসে তাহলে 'দারুল আমান'।

এ ভাগ ও ব্যাখ্যার প্রবক্তাদের দৃষ্টিতেও 'দারুল আমান' স্বতন্ত্র কোনো 'দার'র নাম নয়, বরং দারুল হারবেরই একটি অবস্থা মাত্র।

তবে উভয় ব্যবহারের পার্থক্য স্পষ্ট। 'দারুল মুওয়াদাআ'র অর্থে 'দারুল আমান'র ক্ষেত্রে দারুল ইসলামের সঙ্গে যুদ্ধ বিরতির চুক্তির বিষয় রয়েছে। তাই সন্ধির সময়কালে তাতে আক্রমণ না করাসহ কিছু বিশেষ মাসআলা রয়েছে। কিন্তু 'দারুল খাওফ'র মোকাবেলায় 'দারুল আমান'র ব্যবহারে এ ধরনের কোনো সন্ধির বিষয় নেই। তাই মূলত তা দারুল হারব হওয়ায় এ 'দারুল আমান'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাসহ দারুল হারবের মৌলিক অকাট্য বিধানের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন আসবে না। তবে হিজরত করা ওয়াজিব হওয়ার মতো আনুষঙ্গিক ও মতবিরোধপূর্ণ মাসআলায় কারো নিকট যুক্তিযুক্ত মনে হলে ওয়াজিব না হওয়ার কথা বলতে পারেন।

এখানে আরেকটি বিষয় আমাদের লক্ষ্য করা উচিত। শেষের অর্থে 'দারুল আমান'র ব্যবহার একেবারেই আপেক্ষিক। একজনের জন্য নিরাপদ হবে তো অন্যজনের জন্য নয়। একসময় নিরাপদ হবে তো অন্যসময় নয়। যারা তাগুতি সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ইসলামের শাখাগুলোর কথা বলবে তাদের জন্য হবে 'দারুল খাওফ'। আর যারা তাগুতি সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় এমন শাখাগুলো পালন করাকেই যথেষ্ট মনে করবে এবং বাকিগুলোর ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করবে, বিভিন্ন ব্যাখ্যা-অপব্যাখ্যার মাধ্যমে কুফরকে ইমান বানানোর চেষ্টা করবে এবং তাগুতরা যাদের নিকট মাননীয় হবে; তাদের জন্য হবে 'দারুল আমান'।

বুঝা যাচ্ছে, 'দারুল আমান'র শেষোক্ত ব্যবহারটি খুবই দুর্বল। তাই পূর্ববর্তী ফুকাহায়ে কেরামের আলোচনায় এটি অনেকটাই অনুপস্থিত।

মোটকথা, স্বতন্ত্র 'দার' বলতে দুটিই; দারুল ইসলাম ও দারুল হারব। 'দারুল আমান' বলতে তৃতীয় কোনো স্বতন্ত্র 'দার'র অস্তিত্ব নেই; বরং তা দারুল হারবের একটি সাময়িক অবস্থা। এ জন্যই তো ফুকাহায়ে কেরাম "الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين" শিরোনামে মাসআলা বর্ণনা করেছেন, কিন্তু কোনো ফিকহের কিতাবে "الأحكام التي تختلف باختلاف الدور الثلاث" নামে শিরোনাম দেয়া হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

গ) দারুল ইসলামের বিপরীতে দারুল হারবের ব্যবহার শতভাগ যথার্থ

দারুল কুফর ও দারুল হারবের মর্মার্থ একই। তাই দারুল ইসলামের বিপরীতে দারুল হারবের ব্যবহার শতভাগ যুক্তিযুক্ত। কেননা দারুল কুফর দারুল হারবই। 'হারব' থেকে মুক্ত হওয়ার একটি পদ্ধতি হচ্ছে, 'জিযয়া' প্রদান করে ইসলামি আইন-কানুন মেনে নেওয়া। তখন সেটিকে কেউ আর দারুল কুফর বলে না, বরং দারুল ইসলামই বলে। আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে, যুদ্ধ বিরতির সন্ধি করা। তখন যদিও সেটির জন্য 'দারুল মুওয়াদাআ' শব্দ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফুকাহায়ে কেরাম এটিও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই সন্ধির কারণে তা দারুল হারবের বহির্ভূত হয় না; যে সকল 'নুসুস' পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। এ জন্যই দেখা যায়; একই মর্মে কেউ দারুল কুফর ব্যবহার করেন, আবার কেউ দারুল হারব ব্যবহার করেন। বরং একই ফকিহ তার রচনায় একই মর্মে কখনো দারুল কুফর ব্যবহার করেন, কখনো দারুল হারব ব্যবহার করেন। বলতে গেলে দুটি সমার্থক শব্দ। আমরা প্রয়োজনে এ পর্যন্ত উল্লিখিত ইবারতগুলোতে দ্বিতীয়বার নযর বুলিয়ে আসতে পারি।

এ বিষয়টি স্পষ্ট করে বলার কারণ হলো, দারুল ইসলাম ও দারুল হারব সংক্রান্ত একটি উর্দু পুস্তিকার (যে পুস্তিকার পর্যালোচনা সামনে আসবে, ইনশাআল্লাহ।) অনুবাদক শুরুতে বলেছেন-

"উস্তাজে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের জবানে যেমনটা শুনেছি, তাতে মনে হয়েছে, দারুল ইসলামের বিপরীতে দারুল হারবের ব্যবহার যথার্থ নয়, বরং দারুল ইসলামের বিপরীতে যথার্থ শব্দ হলো দারুল কুফর। আর দারুল হারবের বিপরীতে যথার্থ হলো দারুল আমন বা দারুল আহদ।"

এ বক্তব্যের ব্যাপারে আমাদের একেবারেই সংক্ষিপ্ত কথা হচ্ছে, আমরা মনে করি, এটি অনুবাদকের বুঝের ভুল। অন্যথায় উস্তাযে মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক -হাফিযাহুল্লাহ- এর যে পরিমাণ মুতালাআ-অধ্যয়নের বিস্তৃতি ও গভীরতা রয়েছে; তিনি এমনটি বলার কথা নয়। চৌদ্দশত বছর ধরে আইম্মায়ে মুজতাহিদিন, ফুকাহা ও উলামায়ে কেরাম একটি অযথার্থ ব্যবহার করে আসছেন বলে মনে হয় না। বরং তাঁদের ব্যবহার শতভাগ যথার্থ।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, অনুবাদক যে পুস্তিকার অনুবাদের শুরুতে এমন দাবি করেছেন, সে মূল পুস্তিকায় এই দাবির বিপক্ষে সুস্পষ্ট অবস্থান রয়েছে। অনুবাদক মনে হয় শুধু ততোটুকুই পড়েছেন যতোটুকুর অনুবাদ করেছেন, বাকি অংশ অধ্যয়ন করার সুযোগ হয়নি। মূল পুস্তিকায় বলা হয়েছে-

اصل غلط فہمی کا منشا یہ ہے کہ آپ دار الحرب میں لفظ حرب کو لغوی معنی میں سمجھ رہے ہیں، حالانکہ دار الحرب ایک فقہی اصطلاح ہے، اس کے اصطلاحی معنی کے لحاظ سے اس میں اور دار الامن میں کوئی تضاد نہیں، اور بالکل یہی بات دار العہد کے باب میں بھی ہے کہ اس پر بھی دار الحرب کی تعریف صادق ہے لہذا وہ بھی اسی کی ایک قسم ہے۔(دار الاسلام اور دار الحرب، ص ۴۰)۔

"ভুল বোঝাবুঝির মূল কারণ হলো, আপনি দারুল হারবের 'হারব' শব্দকে শাব্দিক অর্থে বুঝেছেন। অন্যথায় দারুল হারব একটি ফিকহি পরিভাষা। সেটির পারিভাষিক অর্থ হিসেবে তার মাঝে ও 'দারুল আমন'র মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। এবং হুবহু একই কথা 'দারুল আহদ'র ক্ষেত্রেও। সেটির ক্ষেত্রেও দারুল হারবের সংজ্ঞা প্রযোজ্য। সুতরাং তাও দারুল হারবেরই একটি প্রকার।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃ: ৪০)।

এছাড়াও ওই অনুবাদকই তার অনুবাদের শেষের দিকে 'কিতাবের বিভিন্ন স্থান হতে কিছু ফাওয়ায়েদ' শিরোনামের অধীনে প্রথম কথাই লিখেছেন, 'দারুল হারবের 'হারব' শব্দের কারণে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, একটি দেশ হারবের দেশ হওয়ার সাথে সাথে 'দারুল আমান' ও 'দারুল আহদ' হবে কিভাবে ....।'

অনুবাদক কি তার অনুবাদের শুরুর দাবি আর শেষের কথা মিলিয়ে দেখবেন!

“

مفتی محمود حسن گنگوہی رح نے فرمایا: (انگریز کے زمانہ میں ہندوستان) ہمارے نزدیک دار الحرب تھا ان وجوہ کی بناء پر جن کو حضرت گنگوہی رح اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رح نے تحریر فرمایا ہے، اور ابھی تک ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں ہوا، یعنی جمہوری حکومت کی وجہ سے دار الاسلام نہیں بنا۔ (فتاوی محمودیہ، ۲۰/۳۶۰)

”

-চার-

বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ পুরো ভারত উপমহাদেশ দারুল হারব হওয়ার যৌক্তিকতা ও দারুল হারব হওয়া সংক্রান্ত খিলাফত পতনের পূর্ব ও পরের উলামায়ে কেরামের সুস্পষ্ট বক্তব্য

শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবির ফাতওয়া

এটা জানা কথা যে, ১২১৮ হিজরি মোতাবেক ১৮০৩ খৃস্টাব্দে ইংরেজরা যখন ভারতবর্ষ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আইনে চলার ঘোষণা দিয়েছিলো, তখন শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. (মৃ: ১২৩৯ হি:) ভারতবর্ষকে দারুল হারব হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। সাইয়েদ হুসাইন আহমাদ মাদানি রহ. (মৃ: ১৩৭৭ হি:) বলেন-

۱۸۰۳ء میں جب کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نمائندہ نے بادشاہ دہلی سے ملکی انتظام کا پروانہ جابرانہ طریقہ پر لکھوا کر ملک میں اعلان کرا دیا کہ:-

"خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، حکم کمپنی بہادر کا" تو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے دار الحرب ہونے کا فتویٰ دیا۔ (نقش حیات، تحریک استخلاص وطن کی ابتدا، ۲/۴۱۰)

“১৮০৩ খৃস্টাব্দে যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি দিল্লির সম্রাট থেকে জোরপূর্বক রাষ্ট্রব্যবস্থার ফরমান এই মর্মে লিখিয়ে নিয়ে ঘোষণা দিয়েছিলো- ‘সৃষ্টি খোদার, সাম্রাজ্য সম্রাটের, আর আইন-কানুন চলবে কোম্পানীর’; তখন হযরত শাহ আব্দুল আযিয সাহেব রহ. হিন্দুস্তান দারুল হারবে পরিণত হওয়ার ফাতওয়া প্রদান করেন।” (নকশে হায়াত, ২/৪১০)

শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবির এই ফাতওয়া পুরো ভারতবর্ষের হক্কানি উলামায়ে কেরাম এক বাক্যে গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং কর্মক্ষেত্রে তার প্রভাব বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। এই ফাতওয়ার বিরোধিতা যদি কেউ করে থাকে; তো তা করেছে কাদিয়ানি, বেরেলবি ও তথাকথিত আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের মতো ইংরেজদের তল্পিবাহকরা। হক্কানি আলেমদের থেকে পরবর্তীতে দুয়েকজন বলতে একেবারে দুয়েকজনই এই ফাতওয়ার সঠিকতার উপর আপত্তি করেছেন; যাঁদের না ছিলো হালত-পরিস্থিতির উপলব্ধি, না ছিলো এ বিষয়ক ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যের যথাযথ অধ্যয়ন, বা বলা যেতে পারে; যাঁরা ছিলেন আঞ্চলিকতা ও পরিস্থিতির শিকার।

ইমাম আবু হানিফা ও সাহেবাইন; সকলের মতানুযায়ী ফাতওয়ার সঠিকতা

এই আলোচনাটি বুঝার সুবিধার্থে গ্রন্থের শুরুতে শর্তের ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহেবাইনের মতানৈক্যের ক্ষেত্রে 'তারজিহ' ও 'তাতবিক'র আলোচনাটি আরো একবার পড়ে নিতে আমি পাঠকদের নিকট অনুরোধ জানাবো।

প্রণিধানযোগ্য মত তথা সাহেবাইন ও জুমহুরের মত, 'তাতবিক'র আলোচনা ও ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত শর্তের বাহ্যিক শব্দ; প্রত্যেকটির আলোকে শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবির ফাতওয়ার সঠিকতা প্রমাণিত।

প্রথমত: সাহেবাইন ও জুমহুরের মতের ভিত্তিতে

সাহেবাইন ও জুমহুরের মতানুযায়ী শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবি কর্তৃক ভারতবর্ষকে দারুল হারব ঘোষণা দেয়ার ফাতওয়াটির সঠিকতা স্পষ্ট। কারণ, তাঁদের দৃষ্টিতে কুফরি আইন-কানুন জারি করার মাধ্যমেই কোনো ভূখণ্ড দারুল হারবে পরিণত হয়ে যায়। তো সর্বোচ্চ ক্ষমতার পক্ষ হতে যখন ঘোষণা এসে গেছে যে, এখন থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তথা খৃস্টানদের কুফরি আইনে দেশ চলবে, তখন জুমহুরের মতানুযায়ী ভারতবর্ষ দারুল হারবে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা অবশিষ্ট থাকেনি।

দ্বিতীয়ত: 'তাতবিক'র আলোচনার ভিত্তিতে

'তাতবিক'র আলোচনায় ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক অতিরিক্ত দুটি শর্ত তথা দারুল হারব সংলগ্ন

হওয়া ও মুসলমানদের ইমানের দাবিতে প্রাপ্য 'আমান' নিরাপত্তা সাধারণত অবশিষ্ট না থাকা; কোনো একটির অনুপস্থিতিতে ইসলামের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা শেষ হওয়া প্রমাণিত হয় না, বরং মুসলমানদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় সে অঞ্চলে ইসলামের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের ঘুরে দাঁড়ানো ও কাফেরদের হাত থেকে তা উদ্ধার করার বিষয়টা অনেকটা নিশ্চিত থাকে।

ভারতবর্ষ একে তো ইতোপূর্বে কেন্দ্রীয় খিলাফতের অধীনে না থাকায় কেন্দ্রীয় খিলাফতের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের সাহায্যের আশা ছিলো না, নিজেদের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থাও ছিলো ভঙ্গুর, আর এছাড়াও ইংরেজদের দীর্ঘদিনের অবস্থান ও চক্রান্তের ফলে সাধারণ মুসলমানদের অন্তর থেকে জিহাদি চেতনা তো বটেই; সাধারণ ইমানি চেতনাও ছিলো বিলুপ্তির পথে।

তাই ইংরেজদের ঘোষণার মাধ্যমে বলতে গেলে ইসলামের কর্তৃত্ব নিঃশেষ করে দেয়া হয়েছে এবং অবস্থাদৃষ্টে মুসলমানরা সহসা ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ঘুরে দাঁড়ানো এবং তাদের হাত থেকে তা উদ্ধার করা ছিলো অনেকটা আকাশ-কুসুম ভাবনা। পরবর্তীতে তা আরো দৃঢ় হয়েছে যে, আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়নি এবং ইসলামি আইন-কানুনের ক্ষমতা সাব্যস্ত করা যায়নি।

সুতরাং ইমাম আবু হানিফার শর্ত আরোপের মূল উদ্দেশ্যের ভিত্তিতেও শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবির ফাতওয়ার সঠিকতার ব্যাপারে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা নেই।

তৃতীয়তঃ শর্তের বাহ্যিক শব্দের ভিত্তিতে

ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত শর্তগুলোর শুধু বাহ্যিক শব্দই উদ্দেশ্য নয়; উদ্দেশ্য হচ্ছে বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করা। তবুও যদি আমরা বাহ্যিক শব্দকেই ভিত্তি বানাই, তখনো শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবির ফাতওয়ার সঠিকতা প্রমাণিত। আমরা প্রতিটি শর্ত ও ভারতবর্ষের বাস্তব অবস্থা মিলিয়ে দেখি-

ইমাম আবু হানিফা রহ. দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত করেছেন 'কুফরি আইন-কানুন জারি করা'। সেটি 'সৃষ্টি খোদার, সাম্রাজ্য সম্রাটের, আর আইন-কানুন চলবে কোম্পানীর'; ঘোষণার মাধ্যমে জারি হয়েছে।

দ্বিতীয় শর্ত করেছেন, 'দারুল হারব সংলগ্ন হওয়া'। এ শর্তটিও বিদ্যমান ছিলো চীনের মতো প্রাচীন দারুল হারব হিন্দুস্তান সংলগ্ন হওয়ায়।

তৃতীয় শর্ত করেছেন, মুসলমান তার ইমানের দাবিতে প্রাপ্য 'আমান' বা পূর্বের 'আমান' সাধারণত বিদ্যমান থাকা। তো ইতিহাস যাদের অধ্যয়নে রয়েছে, তাদেরকে মনে হয় বিষয়টি হাতে-কলমে বুঝিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। মুসলমানদের ইমানের দাবিতে প্রাপ্য 'আমান' সাধারণত বহাল ছিলো কি না; তা ভারতবর্ষে ইংরেজদের আধিপত্যের ইতিহাস বিষয়ক আকাবিরে দেওবন্দ কর্তৃক রচিত কয়েকটি কিতাব পড়ে নিলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। এখানে সে ইতিহাস তুলে ধরা অযথা গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছুই হবে না। মুসলমানদের একজন শাসক থেকে যে জোরপূর্বক একটি কুফরি ফরমান তথা 'আইন-কানুন চলবে কোম্পানীর' লিখিয়ে নিলো; তা থেকে কি অনুভব করা যায় না যে, 'আমান' সাধারণত বহাল ছিলো কি না!

শর্তগুলোর উপস্থিতি সংক্রান্ত কয়েকজন আকাবিরের বক্তব্য

সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, ভারতবর্ষ দারুল হারব বিষয়ে যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা কিন্তু শুধু সাহেবাইনের মতের ভিত্তিতে বলেননি। বরং তাঁরা ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত শর্তগুলোর উপস্থিতির ভিত্তিতে দারুল হারব হওয়ার কথা বলেছেন। আমরা কয়েকজন আকাবিরের বক্তব্য দেখতে পারি-

শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবি (মৃ: ১২৩৯ হি:)

اس شہر میں مسلمانوں کے امام کا حکم ہرگز جاری نہیں، نصاری کے حکام کا حکم بے دغدغہ جاری ہے۔ اور احکام کفر کے جاری ہونے سے مراد ہے کہ مقدمات انتظام سلطنت اور بندوبست رعایا و تحصیل خراج اور باج و عشر اموال تجارت میں حکام بطور خود حاکم ہوں، اور ڈاکوؤں اور چوروں کی سزا اور رعایا کے باہمی معاملات اور جرموں کی سزا کے مقدمات میں کفار کا حکم جاری ہو، اگرچہ بعض احکام اسلام مثلا جمعہ و عیدین اور اذان اور گاؤکشی میں کفار تعرض نہ کریں، لیکن ان چیزوں کا اصل اصول ان کے نزدیک بے فائدہ ہے، کیونکہ مسجدوں کو بے تکلف منہدم کرتے ہیں......... (فتاوی عزیزی-اردو-باب الفقہ، دار الاسلام منقلب بدار الحرب ہو سکتا ہے، ص ۴۵۴)

"এই অঞ্চলে মুসলমানদের শাসকের আইন-কানুন একেবারেই বাস্তবায়িত হচ্ছে না। খৃস্টান শাসকদের আইন-কানুন নির্ভয়ে চলছে। আর আহকামে

কুফর জারি হওয়া’ দ্বারা উদ্দেশ্য রাষ্ট্রীয় বিচারব্যবস্থা, জনসাধারণের নিয়ম-নীতি, ব্যবসায়িক পণ্যে খারাজ, কর, উশর আদায়ে শাসক স্বনীতিতে শাসক হওয়া এবং ডাকাত-চোরদের শাস্তি ও জনগণের পারস্পরিক লেন-দেন ও অপরাধের শাস্তির বিচারের ক্ষেত্রে কাফেরদের আইন-কানুন জারি হওয়া। যদিও ইসলামের কিছু বিধান যেমন- জুমআ, ঈদ, আযান এবং গরু জবাইয়ের ক্ষেত্রে কাফেররা আপত্তি না করে। কিন্তু এ সকল বিষয়ের মূল বিষয় তাদের দৃষ্টিতে অনর্থক। **কেননা তারা মসজিদগুলোকে নির্দ্বিধায় ধ্বংস করে দিচ্ছে,** ....।” (ফাতাওয়া আযিযি -উর্দু-, পৃ: ৪৫৪)

আব্দুল হাই বুড়হানবি (মৃ: ১২৪৩ হি:)

ان میں سے دو فتوے یعنی ایک تو شمس الہند مولوی شاہ عبد العزیز صاحب، اور دوسرا انکے بھتیجے مولوی عبد الحی صاحب کا سب سے زیادہ اہم ہے.............

مولوی عبد الحی صاحب جو مولانا شاہ عبد العزیز صاحب کے بعد ہوئے صاف طور پر حکم لگاتے ہیں: "عیسائیوں کی پوری سلطنت کلکتہ سے لیکر دہلی اور ہندوستان خاص سے ملحقہ ممالک (یعنی شمالی مغربی سرحدی صوبے) تک سب کی سب دار الحرب ہے۔ کیونکہ کفر اور شرک ہر جگہ رواج پا چکا ہے اور ہمارے شرعی قوانین کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ جس ملک میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں وہ دار الحرب ہے۔ یہاں ان تمام شرائط کا بیان کرنا طوالت کا باعث ہو گا جن کے ماتحت جملہ فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ کلکتہ اور اس کے ملحقات دار الحرب ہیں۔ (نقش حیات، تحریک استخلاص وطن کی ابتدا، حاشیہ نمبر ۱، ۲/۴۱۰)

“এর মধ্যে দু’টি ফাতওয়া সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো; একটি শামসুল হিন্দ শাহ আব্দুল আযিয সাহেবের, আরেকটি তাঁর ভাতিজা[৩৭] আব্দুল হাই সাহেবের।

শাহ আব্দুল আযিয সাহেবের পর মাওলানা আব্দুল হাই সাহেব স্পষ্টভাবে বলছেন, কলিকাতা থেকে দিল্লি এবং হিন্দুস্তানের সঙ্গে সম্পৃক্ত অঙ্গরাজ্য (দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশ) পর্যন্ত খৃস্টানদের পুরো সাম্রাজ্য দারুল হারব। কেননা কুফর-

---

৩৭. আব্দুল হাই বুড়হানবি শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবির স্ত্রীর ভাতিজা ছিলেন।

শিরকের প্রচলন সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক হয়ে গেছে এবং আমাদের শরয়ি আইন-কানুনের কোনো তোয়াক্কা করা হচ্ছে না। যে দেশে এমন অবস্থা তৈরি হয়ে যায়, তা দারুল হারব। **এখানে ওই সকল শর্ত উল্লেখ করে অতিদীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন নেই; যেগুলোর আলোকে সমস্ত ফুকাহায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, কলিকাতা ও তার অঙ্গরাজ্য দারুল হারব।**" (নকশে হায়াত, টীকা ১, ২/৪১০)

রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি (মৃ: ১৩২৩ হি:)

چوں ایں مسئلہ محقق شد اکنوں حال ہند را خود غور فرمائید کہ اجرائے احکام کفار نصاری در ایں جا چہ قوت و غلبہ ہست کہ اگر ادنی کلکٹر حکم کرد کہ در مساجد جماعت ادا نکنید ہیچ کس از امیر و غریب قدرت ندارد کہ ادائے آں نماید۔

وایں ادائے جمعہ و عیدین و حکم بقواعد فقہ کہ می شود محض بقانون ایشاں است کہ در رعایا حکم جاری کردہ اند کہ ہر کس حسب دین خود است سرکار را بوئے مزاحمت نیست۔

وامن سلاطین اسلام کہ بود، اذاں نامے ونشانے نماندہ، کدام عاقل خواہد گفت کہ امنے کہ شاہ عالم دادہ بود واکنوں بہموں امن ماموں نشستہ ایم، بلکہ امن جدید از کفار حاصل شدہ، بہموں امن نصاری جملہ رعایا قیام ہند می کنند۔(تالیفات رشیدیہ، فیصلۃ الاعلام فی دار الحرب ودار الاسلام، ص٦٦٧)

"যখন মাসআলাটি স্পষ্ট হয়ে গেছে, এখন নিজেই হিন্দুস্তানের ব্যাপারে চিন্তা করে দেখুন; এখানে খৃস্টান কাফেরদের আইন-কানুন কীভাবে শক্তি ও কর্তৃত্বের সঙ্গে জারি আছে। **সাধারণ একজন ডেপুটি কমিশনারও যদি আদেশ করে যে মসজিদে জামাআত করো না, তাহলে ধনী-গরিব কেউই তা আদায় করে দেখাতে সক্ষম নয়।**

আর এই যে জুমআ, দুই ঈদ ও কিছু ফিকহি মাসআলা অনুযায়ী আমল চলছে; তাও শুধু তাদের আইনের কারণে। তারা প্রজাদের জন্য ফরমান জারি করেছে যে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের ধর্ম অনুযায়ী চলবে, সরকার তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না।

ইসলামের শাসকদের প্রদান করা 'আমান'-নিরাপত্তার নাম-নিশানাও নেই। বোধসম্পন্ন কে বলতে পারবে; যে 'আমান'-নিরাপত্তা শাহ আলম দিয়েছিলো, আমরা এখনো সে 'আমান'-নিরাপত্তায় নিশ্চিন্তে বসবাস করছি। বরং নতুন 'আমান' নিরাপত্তা কাফেরদের পক্ষ থেকে অর্জিত হয়েছে এবং খৃস্টানদের দেয়া

এই ‘আমান’-নিরাপত্তায় সকল প্রজা হিন্দুস্তানে বসবাস করছে।” (তালিফাতে রশিদিয়া, পৃ: ৬৬৭)

সাইয়েদ হুসাইন আহমাদ মাদানি (মৃ: ১৩৭৭ হি:)

ہندوستان دار الحرب ہے، وہ اس وقت تک دار الحرب باقی رہے گا جب تک اس میں کفر کو غلبہ حاصل رہے گا، اور دار الحرب کی جس قدر تعریفات کی گئی ہیں اور جو شروط بیان کی گئی ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ (مکتوبات شیخ الاسلام، مکتوب نمبر-۳۳، ۲/۱۱۵)

“হিন্দুস্তান দারুল হারব এবং তা ততোদিন পর্যন্ত দারুল হারব হিসেবে পরিগণিত হবে যতোদিন তাতে কুফরের কর্তৃত্ব বিদ্যমান থাকবে। **আর দারুল হারবের যতো ধরনের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এবং যতো শর্তের কথা বলা হয়েছে, সবগুলোই এই হিন্দুস্তানে বিদ্যমান।”** (মাকতুবাতে শাইখুল ইসলাম, ২/১১৫)

‘আমান’র শর্ত দ্বারা "چشم پوشی" এড়িয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য নয়

এখানে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন। একটি ‘আমান’ হচ্ছে, মুসলমানদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপস্থিতিতে কর্তৃত্ব ও দাপটের প্রভাব থাকায় কাফেররা তাদের ব্যক্তিগত শরয়ি জীবনে হস্তক্ষেপ করতে সাহস না পাওয়ার কারণে অর্জিত ‘আমান’। আরেকটি ‘আমান’ হচ্ছে, তাদের আইন-কানুন ও সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হওয়ায় এড়িয়ে যাওয়ার কারণে অর্জিত আমান। ‘তাতবিক’র আলোচনায় ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে স্পষ্ট যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক মুসলমান তার ইমানের দাবিতে প্রাপ্য ‘আমান’ বা পূর্বের ‘আমান’ বহাল থাকা না থাকা দ্বারা প্রথমটিই উদ্দেশ্য। বিশেষকরে কাযি খান ও বুরহানুদ্দিন আলবুখারির বক্তব্যে তা সুস্পষ্ট হয়েছে।

ভারতবর্ষে মুসলমানরা যে জুমআ, ঈদ ও ব্যক্তিগত কিছু শরয়ি বিধানমতে চলতে পারতো তা ছিলো ইংরেজদের এড়িয়ে যাওয়ার কারণে। একদিকে তারা মসজিদগুলো ধ্বংস করছে, অপরদিকে জুমআ পড়তে বাধা দিচ্ছে না। চাইলেই যেকোনো ইসলামি রীতি-নীতির উপর হস্তক্ষেপ করলে বাধা দেয়ার মতো কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছিলো না। তো এটিকে কি কোনো বিবেকবান মুসলমানদের ইমানের দাবিতে প্রাপ্য ‘আমান’ বা পূর্বের ‘আমান’ বলবে! শাহ

আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবি ও রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহির বক্তব্যে সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। গাঙ্গুহি রহ. আরো স্পষ্ট করে বলেন-

রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহির (মৃ ১৩২৩ হি:) বক্তব্য

باز واضح کرده می شود که اگر ایں دخول واظہار اسلام بغلبہ نشده باشد ہیچ تغیرے دو دار حربیت نخواہد شد۔ ورنہ جرمن وروس وفرانس وچین جملہ ممالک نصاری دار الاسلام می شوند ونشانی از دار الحرب در دنیا نخواہد شد، چرا کہ در جملہ ممالک کفار اہل اسلام باذن کفار احکام اسلام جاری می نمایند، وہذا ظاہر البطلان۔ (تالیفات رشیدیہ، فیصلۃ الاعلام فی دار الحرب ودار الاسلام، ص۶۵۹)

"অতঃপর এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়া প্রয়োজন যে, যদি মুসলমানদের এ অবস্থান ও ইসলামি বিধি-বিধানের প্রকাশ দাপটের সঙ্গে না হয়, তাহলে সে রাষ্ট্র দারুল হারব হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের পরিবর্তন আসবে না। অন্যথায় জার্মানি, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীনসহ খৃস্টানদের সকল রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হিসেবে পরিগণিত হবে। পুরো পৃথিবীতে দারুল হারবের চিহ্নও অবশিষ্ট থাকবে না। কেননা কাফেরদের সকল রাষ্ট্রে মুসলমানরা কাফেরদের সম্মতিতে ইসলামি বিধি-বিধান পালন করতে পারে। আর এটি সুস্পষ্ট একটি বাতিল-অসার দাবি।" (তালিফাতে রশিদিয়া, পৃ: ৬৫৯)

ইদরিস কান্ধলবির (মৃ: ১৩৯৪ হি:) বক্তব্য

فتح مکہ سے پہلے مکہ مکرمہ دار الحرب تھا، اس لئے کہ مسلمان اس وقت اگرچہ کچھ شعائر اسلام بجالاتے تھے مگر وہ بجا آوری کفار کی اجازت پر موقوف تھی، اپنی قوت اور غلبہ اور قہر کے بنا پر نہ تھی۔ کفر قاہر اور غالب تھا اور اسلام مقہور اور مغلوب تھا، محض کافروں کی اجازت سے احکام اسلام کی بجا آوری دار الاسلام ہونے کے لئے کافی نہیں۔ جیسے آج کل امریکہ اور بریطانیہ میں رہنے والے مسلمان حکومت کی اجازت سے احکام اسلام بجالاتے ہیں، بغیر ان کی اجازت کے بعد احکام اسلام بجالانے پر قادر نہیں، تو امریکہ اور بریطانیہ کی حکومت دار الحرب ہوگی۔ (عقائد الاسلام، دار الحرب اور دار الاسلام میں فرق، ۱/۱۹۰)

"মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কা মুকাররমা দারুল হারব ছিলো। কেননা মুসলমান যদিও তখন কিছু ইসলামি বিধি-বিধান পালন করতো, কিন্তু তা ছিলো

কাফেরদের অনুমতির উপর নির্ভর। নিজেদের শক্তি, কর্তৃত্ব ও দাপটের ভিত্তিতে ছিলো না। কুফর ছিলো বিজয়ী ও কর্তৃত্বসম্পন্ন আর ইসলাম ছিলো পরাস্ত ও অধীনস্ত। কাফেরদের সম্মতিতে ইসলামি রীতি-নীতি পালন করতে পারা দারুল ইসলাম হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। যেমন বর্তমানে আমেরিকা ও বৃটেনে বসবাসকারী মুসলমানরা রাষ্ট্রের অনুমতিতে ইসলামি বিধি-বিধান পালন করে। তাদের সম্মতি ব্যতীত ইসলামি বিধি-বিধান পালন করতে সক্ষম নয়। সুতরাং আমেরিকা ও বৃটেন দারুল হারবের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (আকায়েদুল ইসলাম, ১/১৯০)

বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ পুরো ভারত উপমহাদেশ দারুল হারব হওয়া সংক্রান্ত খিলাফত পতনের পূর্ব ও পরের উলামায়ে কেরামের সুস্পষ্ট বক্তব্য

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে হিন্দুস্তান তথা বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ পুরো ভারত উপমহাদেশ ইংরেজদের আমল থেকে দারুল হারব হওয়ার যৌক্তিকতা স্পষ্ট হয়েছে। এখানে আমরা উসমানি খিলাফত পতনের পূর্ব ও পরের কয়েকজন আকাবিরের উদ্ধৃতি উল্লেখ করবো, যাদের থেকে সুনির্দিষ্টভাবে ভারত উপমহাদেশকে দারুল হারব আখ্যায়িত করা প্রমাণিত। অন্যথায় এ দাবির পক্ষে তো হাজার হাজার আলেমের কর্মই সাক্ষ্য দিয়েছিলো।

শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবি (মৃ: ১২৩৯ হি:)

اور باعتبار اس قول ثالث کے عملداری انگریز کی اور ان کے مانند دوسرے غیر اہل اسلام کی عمل داری بلاشبہ دار الحرب ہے۔(فتاوی عزیزی-اردو- مسائل سود، کیا امام صاحب کا دار الحرب میں سود کا جائز فرمانا خلاف شرع وائمہ ہے، ص۵۸۵)

"এই তৃতীয় মতানুযায়ী ইংরেজদের রাজত্ব এবং তাদের ন্যায় অন্যান্য অমুসলিমদের রাজত্ব নিঃসন্দেহে দারুল হারব। (ফাতাওয়া আযিযি, -উর্দু- পৃ: ৫৮৫)

সাইয়েদ হুসাইন আহমাদ মাদানি রহ. (মৃ: ১৩৭৭ হি:) বলেন-

۱۸۰۳ء میں جب کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نمائندہ نے بادشاہ دہلی سے ملکی انتظام کا پروانہ جابرانہ طریقہ پر لکھوا کر ملک میں اعلان کرادیا کہ:-

"خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، حکم کمپنی بہادر کا" تو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے دار الحرب ہونے کا فتویٰ دیا۔ (نقش حیات، تحریک استخلاص وطن کی ابتدا، ۲/۴۱۰)

“১৮০৩ খৃস্টাব্দে যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি দিল্লির সম্রাট থেকে জোরপূর্বক রাষ্ট্রব্যবস্থার ফরমান এই মর্মে লিখিয়ে নিয়ে ঘোষণা দিয়েছিলো- ‘সৃষ্টি খোদার, সাম্রাজ্য সম্রাটের, আর আইন-কানুন চলবে কোম্পানীর’; **তখন হযরত শাহ আব্দুল আযিয সাহেব রহ. হিন্দুস্তান দারুল হারবে পরিণত হওয়ার ফাতওয়া প্রদান করেন।**” (নকশে হায়াত, ২/৪১০)

আব্দুল হাই বুড়হানবি (মৃ: ১২৪৩ হি:)

مولوی عبد الحی صاحب جو مولانا شاہ عبد العزیز صاحب کے بعد ہوئے صاف طور پر حکم لگاتے ہیں: "عیسائیوں کی پوری سلطنت کلکتہ سے لیکر دہلی اور ہندوستان خاص سے ملحقہ ممالک (یعنی شمالی مغربی سرحدی صوبے) تک سب کی سب دار الحرب ہے۔ (نقش حیات، تحریک استخلاص وطن کی ابتدا، حاشیہ نمبر ۱، ۲/۴۱۰)

শাহ আব্দুল আযিয সাহেবের পর মাওলানা আব্দুল হাই সাহেব স্পষ্টভাবে বলছেন, **কলিকাতা থেকে দিল্লি এবং হিন্দুস্তানের সঙ্গে সম্পৃক্ত অঙ্গরাজ্য (দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশ) পর্যন্ত খৃস্টানদের পুরো সাম্রাজ্য দারুল হারব।** (নকশে হায়াত, টীকা ১, ২/৪১০)

শাহ ইসমাইল শহিদ (মৃ: ১২৪৬ হি:)

بلکہ ہندوستان کے اس وقت یعنی ۱۲۳۳ ہجری کے حال کو کہ اس کا اکثر حصہ حرب بن چکا ہے.....(صراط مستقیم -شاہ اسماعیل شہید- دوسرا باب، چوتھی فصل ادائے اطاعات کے طریقوں کے بیان میں، پانچواں افادہ ،ص ۱۶۵، فتاوی محمودیہ، ۲۰/۳۶۸)

“বরং হিন্দুস্তান বর্তমান অর্থাৎ ১২৩৩ হিজরির অবস্থাকে; **যখন সেটির সিংহভাগ দারুল হারবে পরিণত হয়ে গেছে ....।**” (সিরাতে মুসতাকিম, পৃ: ১৬৫, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ২০/৩৬৮)

হাজি শরিআতুল্লাহ (মৃ: ১২৫৬ হি:)

“শাহ আব্দুল আযীয রাহ. ও সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. এর আন্দোলনের ধারা অনুসরণ করে **তিনি (হাজি শরিআতুল্লাহ) বঙ্গ দেশকে ‘দারুল হরব’ বা শত্রু**

কবলিত দেশ বলে ঘোষণা দেন। যেহেতু দারুল হরবে জুমা ও ঈদের নামায আদায়ের বিধান নেই; একারণে তিনি এদেশে ঈদ ও জুমার নামায বিধি সম্মত নয় বলে ফতওয়া প্রদান করেন।" (দেওবন্দ আন্দোলন: ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান, দ্বিতীয় অধ্যায়, হাজী শরীয়তুল্লার আন্দেলন, পৃ: ১৩৭)

ফযলে হক খায়রাবাদি (মৃ: ১২৭৮ হি:)

সাইয়েদ হুসাইন আহমাদ মাদানি রহ. (মৃ: ১৩৭৭ হি:) বলেন-

ہندوستان دار الحرب ہے، وہ اس وقت تک دار الحرب باقی رہے گا جب تک اس میں کفر کو غلبہ حاصل رہے گا، اور دار الحرب کی جس قدر تعریفات کی گئی ہیں اور جو شروط بیان کی گئی ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں، اس سلسلہ میں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی، حضرت مولانا فضل حق صاحب خیر آبادی، اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ اسرارہم نے اپنے فتاوی میں اس موضوع پر بحثیں فرمائی ہیں، ان پر کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ (مکتوبات شیخ الاسلام، مکتوب نمبر-۳۳، ۲/۱۱۵)

"হিন্দুস্তান দারুল হারব এবং তা ততোদিন পর্যন্ত দারুল হারব হিসেবে পরিগণিত হবে যতোদিন তাতে কুফরের কর্তৃত্ব বিদ্যমান থাকবে। আর দারুল হারবের যতো ধরনের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এবং যতো শর্তের কথা বলা হয়েছে, সবগুলোই এই হিন্দুস্তানে বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে হযরত শাহ আব্দুল আযিয সাহেব মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ., **হযরত মাওলানা ফযলে হক সাহেব খায়রাবাদি রহ.** এবং হযরত মাওলানা রশিদ আহমাদ সাহেব গাঙ্গুহি রহ. নিজ নিজ ফাতাওয়ায় এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন; ওই সকল আলোচনার সঙ্গে সংযোজনের আর কিছু নেই।" (মাকতুবাতে শাইখুল ইসলাম, ২/১১৫)

কাসেম নানুতবি (মৃ: ১২৯৭ হি:)

خلاصۂ مطلب ایں است کہ اول در دار الحرب بودن ہندوستان کلام، چنانچہ از مطالعہ روایات منقولہ دریافتہ باشی، اگر چہ نزد ہیچمدآں ہمیں باشد کہ ہندوستان دار الحرب است۔ (قاسم العلوم، خلاصۂ مرام در عہد برطانیہ ہندوستان نزد قاسم العلوم راجح اینکہ دار الحرب است، ص ۳۷)

"মোটকথা, প্রথমত হিন্দুস্তান দারুল হারব হওয়ার ব্যাপারে কিছুটা খটকা আছে, যেমনটি উপর্যুক্ত বর্ণনাগুলো অধ্যয়নে বুঝে আসে।[৩৮] **যদিও এই**

---

৩৮. বিষয়টি সামনে একটি পুস্তিকার পর্যালোচনায় স্পষ্ট করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

নগণ্যের দৃষ্টিতে হিন্দুস্তান দারুল হারব হওয়াটাই প্রণিধানযোগ্য।" (কাসেমুল উলুম, পৃ: ৩৭১)

রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি (মৃ: ১৩২৩ হি:)

سب ہندوستان بندہ کے نزدیک دار الحرب ہے، اور یہاں کی کافرات حربیہ ہیں اور ستر کرنا مسلمات کو ان سے ضروری ہے۔ (فتاوی رشیدیہ کامل، کتاب جواز و حرمت کے مسائل، ہندوستان کی کافرات کا حکم، ص ۵۹۳)

"আমার দৃষ্টিতে পুরো হিন্দুস্তান-ভারতবর্ষ দারুল হারব। এখানের কাফের মহিলারা হারবি, তাই মুসলমান মহিলাদের জন্য তাদের সঙ্গে পর্দা করা আবশ্যক।" (ফাতাওয়া রশিদিয়া, পৃ: ৫৯৩)

আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি (মৃ: ১৩৫২ হি:)

واعلم أن أراضينا في هذا العصر -أي أراضي الهند- لا عشر فيها في شيء، **لأنها أراضي دار الحرب.** وهكذا حصل لي من كتب الفقه، وقال مولانا المرحوم الگنگوهي أيضاً: بأن أراضينا أراضي دار الحرب. (العرف الشذي شرح سنن الترمذي للكشميري، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة العسل، ٢/١١٠)

"জেনে রাখা উচিত, বর্তমানে আমাদের জমিন তথা হিন্দুস্তানের জমিনে কোনো কিছুতেই 'উশর' নেই। **কেননা তা দারুল হারবের জমিন।** ফিকহের কিতাবাদি থেকে আমার নিকট এটিই প্রতীয়মান হয়েছে। মরহুম মাওলানা গাঙ্গুহিও বলেছেন, আমাদের জমিন দারুল হারবের জমিন।" (আলআরফুশ শাযি, ২/১১০)

আশরাফ আলি থানবি (মৃ: ১৩৬২ হি:)

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں (تھانوی رح نے) فرمایا: کہ دار الحرب کے معنی دار الکفر ہیں، لیکن پھر اس دار الحرب کی دو قسمیں ہیں: ایک دار الامن ایک دار الخوف، دار الامن میں بہت احکام مثل دار الاسلام کے ہوتے ہیں۔ سو ہندوستان دار الحرب ہے لیکن ہے دار الامن، اس لئے زیادہ تر معاملات میں یہاں دار الاسلام ہی کے احکام پر عمل در آمد ہو گا۔ (ملفوظات حکیم الامت، -۲۵۳- دار الحرب کی دو قسمیں، ۸/۲۲۸)

"এক মৌলবি সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে (থানবি রহ.) বলেন, দারুল হারবের অর্থ দারুল কুফর। কিন্তু এই দারুল হারব আবার দুই প্রকার: দারুল আমান ও দারুল খাওফ। দারুল আমানের বহু বিধান দারুল ইসলামের ন্যায় হয়ে থাকে। **তো হিন্দুস্তান দারুল হারব** ঠিক; তবে দারুল আমান। এ জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখানে দারুল ইসলামের বিধান অনুযায়ী আমল করা হবে।" (মালফুযাতে হাকিমুল উম্মত, ৮/২২৮)[৩৯]

সাইয়েদ হুসাইন আহমাদ মাদানি (মৃ: ১৩৭৭ হি:)

<u>ہندوستان دار الحرب ہے، وہ اس وقت تک دار الحرب باقی رہے گا جب تک اس میں کفر کو غلبہ حاصل رہے گا،</u> اور دار الحرب کی جس قدر تعریفات کی گئی ہیں اور جو شروط بیان کی گئی ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں، اس سلسلہ میں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی، حضرت مولانا فضل حق صاحب خیر آبادی، اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ اسرار ہم نے اپنے فتاوی میں اس موضوع پر بحثیں فرمائی ہیں، ان پر کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ (مکتوبات شیخ الاسلام، مکتوب نمبر-۳۳، ۲/ ۱۱۵)

"**হিন্দুস্তান দারুল হারব এবং তা ততোদিন পর্যন্ত দারুল হারব হিসেবে পরিগণিত হবে যতোদিন তাতে কুফরের কর্তৃত্ব বিদ্যমান থাকবে।** আর দারুল হারবের যতো ধরনের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এবং যতো শর্তের কথা বলা

---

৩৯. হাকিমুল উম্মাহ আশরাফ আলি থানবির রহ. উপর্যুক্ত বক্তব্যের ব্যাপারে কয়েকটি কথা-

ক) কেউ কেউ থানবি রহ. থেকে বিপরীত রায়ও উল্লেখ করেছেন। তবে হিন্দুস্তানকে দারুল হারব আখ্যা দেয়া যেহেতু ফুকাহায়ে কেরামের ইবারত ও জুমহুর উলামায়ে কেরামের ফাতওয়া অনুযায়ী হয়েছে, তাই আমরা সেটিই উল্লেখ করেছি।

খ) থানবি রহ. যে অর্থে এখানে 'দারুল আমান' ব্যবহার করেছেন; আমরা পূর্বেই স্পষ্ট করে এসেছি যে, তা একেবারেই দুর্বল ও আপেক্ষিক ব্যবহার।

গ) থানবি রহ. যে বলেছেন, 'অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখানে দারুল ইসলামের বিধান অনুযায়ী আমল করা হবে'; তা দ্বারা যদি আনুষঙ্গিক ও মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে বেশি একটা জটিলতা নেই। আর যদি দারুল হারবের মৌলিক বিধান উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে এর পক্ষে মনে হয় ফিকহের কিতাবাদির কোনো সমর্থন পাওয়া যাবে না।

হয়েছে, সবগুলোই এই হিন্দুস্তানে বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে হযরত শাহ আব্দুল আযিয সাহেব মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ., হযরত মাওলানা ফযলে হক সাহেব খায়রাবাদি রহ. এবং হযরত মাওলানা রশিদ আহমাদ সাহেব গাঙ্গুহি রহ. নিজ নিজ ফাতাওয়ায় এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন; ওই সকল আলোচনার সঙ্গে সংযোজনের আর কিছু নেই।” (মাকতুবাতে শাইখুল ইসলাম, ২/১১৫)[৪০]

মুফতি মুহাম্মাদ শফি (মৃ: ১৩৯৩ হি:)

۱۸۵۷ء کے بعد ہندوستان پر انگریزوں کے مکمل تسلط اور اسلامی حکومت کے آثار کالعدم ہو جانے کے بعد ہندوستان کا دار الحرب ہونا جمہور علماء ہند کے نزدیک محقق ہو چکا تھا، فقیہ العصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس اللہ سرہ کا مستقل رسالہ اس موضوع پر شائع ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ تقسیم ملک کے بعد جو انقلاب آیا، اس میں بھی وہ حصہ جو بعد تقسیم غیروں کے اقتدار میں رہا اس کے احکام انگریزی عہد سے کچھ مختلف نہیں ہو سکتے، اس لئے موجودہ حصہ کی صورت حال بھی شرعاً واضح ہے۔ (جواہر الفقہ، عشر و خراج کے احکام، برطانوی دور میں ہندوستان کے دار الحرب ہونے کی بناء پر ایک اشتباہ اور اس کا جواب، ۲/ ۲۶۳)

“১৮৫৭ খৃস্টাব্দের পর হিন্দুস্তানের উপর ইংরেজদের পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং ইসলামি শাসনের নিদর্শন প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে যাওয়ার পর জুমহুর উলামায়ে হিন্দের নিকট হিন্দুস্তান দারুল হারব হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো। এ বিষয়ে ফকিহুল আসর হযরত মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রহ. এর স্বতন্ত্র ‘রিসালাহ’ প্রকাশিত হয়েছে। **আর এটাই প্রকাশ্য যে, দেশ ভাগের পর যে পরিবর্তন এসেছে; তাতেও ওই অংশ যা ভাগের পর অন্যদের কর্তৃত্বে রয়েছে, সেটির হুকুম ইংরেজদের শাসনকালের থেকে সামান্যও পরিবর্তন হতে পারে না। এ জন্য শরিআতের দৃষ্টিতে সে অংশের অবস্থা স্পষ্ট।”** (জাওয়াহিরুল ফিকহ, ২/২৬৩)[৪১]

---

৪০. সাইয়েদ হুসাইন আহমাদ মাদানির রহ. ভিন্ন কোনো আনুষঙ্গিক কথাও থাকতে পারে। তবে এখানে তিনি ‘উসুলি’ মৌলিক কথা বলে দিয়েছেন।

৪১. ‘যা ভাগের পর অন্যদের কর্তৃত্বে রয়েছে’ বলে যদি মুফতি শফি রহ. পাকিস্তানকে পৃথক করে থাকেন, তাহলে তা যথাযথ দাবি করা জটিল। কেননা পাকিস্তানেও

মুফতি মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহি (মৃ: ১৪১৭ হি:)

মুফতি মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহিকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো-

(۷) انگریز کے زمانہ میں ہندوستان آپ حضرات کے نزدیک دار الحرب تھا یا نہیں؟ اگر تھا تو کیا شرائط پائی گئیں؟ اور اس حکومت میں اور انگریز حکومت میں کوئی فرق ہے؟ (فتاوی محمودیہ، ۲۰/۳۵۶)

"আপনাদের দৃষ্টিতে ইংরেজদের শাসনকালে হিন্দুস্তান কি দারুল হারবে পরিণত হয়েছিলো? যদি হয়ে থাকে তাহলে কোন কোন শর্ত বিদ্যমান ছিলো? আর বর্তমান শাসন ও ইংরেজদের শাসনের মাঝে কি কোনো পার্থক্য আছে।" (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ২০/৩৫৬)

তিনি উত্তরে বলেছিলেন-

(۷) ہمارے نزدیک دار الحرب تھا ان وجوہ کی بناء پر جن کو حضرت گنگوہی رح اور حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رح نے تحریر فرمایا ہے، اور ابھی تک ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں ہوا، یعنی جمہوری حکومت کی وجہ سے دار الاسلام نہیں بنا۔ (فتاوی محمودیہ، کتاب الجہاد والہجرۃ والسیاسۃ، باب اول، دار الحرب دار الاسلام انگریزی حکومت کانگریسی حکومت جمعہ عیدین ہجرت، سوال نمبر ۷۴۵۴، ۲۰/۳۶۰)

"**আমাদের দৃষ্টিতে দারুল হারব ছিলো;** ওই সকল কারণে যেগুলো হযরত গাঙ্গুহি রহ. ও হযরত শাহ আব্দুল আযিয সাহেব রহ. লিপিবদ্ধ করেছেন। **এবং আজ পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টিতে কোনো ধরনের ব্যবধান হয়নি। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক শাসনের কারণে তা দারুল ইসলাম হয়ে যায়নি।**" (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ২০/৩৬০)

বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ পুরো ভারত উপমহাদেশ আজো দারুল হারব

মুফতি মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহি রহ. একটি মৌলিক কথা বলে দিয়েছেন যে, 'গণতান্ত্রিক শাসনের কারণে তা দারুল ইসলাম হয়ে যায়নি'। পার্থক্য শুধু এতোটুকু হয়েছে যে, একটি দারুল হারবের মাঝে কয়েকটি সীমানা প্রাচীর তৈরি হয়েছে। অন্যথায় ইংরেজদের সময়কালেও কুফরি আইনে দেশ চলেছে,

---

যেহেতু কুরআন-সুন্নাহর পরিবর্তে কুফরি মতবাদ ও আইনকেই সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, সুতরাং পাকিস্তানও অন্যদের কর্তৃত্বেই রয়ে গেছে।

এক ভূখণ্ডের তিনটি নাম হওয়ার পরও কুফরি আইনে দেশ চলছে। ইংরেজদের করা আইনই এখনো বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের আদালতে বহাল আছে। ইংরেজদের আইনেও বলা ছিলো, ধর্মীয় রীতি-নীতি পালনে সরকার হস্তেক্ষেপ করবে না, যেমনটি রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রহ. উল্লেখ করেছেন; এখনো স্লোগান হচ্ছে, ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার।

পরিবর্তন যে হয়নি বরং আরো জটিল হয়েছে তা মুফতি মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহি রহ. অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্ট করে বলেছেন-

جن اسباب کے بناء پر دار الحرب قرار دیا گیا تھا، وہ اس وقت پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ موجود ہیں۔ جن اسباب کی وجہ سے دار الاسلام مانا گیا تھا وہ بھی مفقود نہیں ہوئے، (ہاں بعض ضرور ایسے ہو گئے ہیں کہ دار الاسلام ہونے کے اسباب وہاں قطعاً مفقود ہے، لیکن مجموعی ہند کی یہ حالت نہیں۔ (فتاوی محمودیہ، ۲۰/۳۵۵)

"যে সকল কারণে হিন্দুস্তানকে দারুল হারব সাব্যস্ত করা হয়েছিলো, তা বর্তমানে পূর্বের চেয়ে আরো কঠিনভাবে বিদ্যমান আছে। আবার যে সকল কারণে দারুল ইসলাম মনে করা হয়েছিলো, সেগুলোও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। (হাঁ! কিছু অঞ্চল অবশ্য এমন হয়ে গেছে যাতে দারুল ইসলাম হিসেবে বিদ্যমান থাকার কারণ পরিপূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে সামগ্রিকভাবে হিন্দুস্তানের অবস্থা এমন নয়)।" (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ২০/৩৫৫)

এ পর্যন্ত যা আলোচনা করা হয়েছে তা যদি আমাদের বুঝে এসে থাকে, তাহলে মনে হয় বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ইন্ডিয়া তথা ভারত উপমহাদেশ এখনো দারুল হারব হিসেবে বহাল থাকার বিষয়টি হাতে-কলমে বুঝানোর প্রয়োজন নেই।

প্রণিধানযোগ্য মত তথা সাহেবাইন ও জুমহুরের মতানুযায়ী একেবারেই স্পষ্ট। কেননা এই তিন ভূখণ্ডে কুফরি আইন জারি আছে। গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের মতো কুফরি মতবাদ তিন দেশেরই সংবিধানের প্রধান মূলনীতি। আর ধর্মনিরপেক্ষতার মতো ভয়ঙ্কর কুফরি মূলনীতি যদিও পাকিস্তানের সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে নেই এবং বাংলাদেশ ও ভারতের সংবিধানের একটি প্রধান মূলনীতি হিসেবে বিদ্যমান, কিন্তু পাকিস্তানেরও কর্যক্ষেত্রে সেই নীতিই বাস্তবায়িত। এছাড়াও প্রত্যেকটি দেশের আদালত এখনও ইংরেজদের করা আইনেই পরিচালিত হচ্ছে।

আর ইমাম আবু হানিফার রহ. শর্তের মূল উদ্দেশ্য হিসেবেও স্পষ্ট। কেননা ইসলামের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হওয়ার পর আজ পর্যন্ত ইসলামকে তিন ভূখণ্ডের কোনো ভূখণ্ডেই কর্তৃত্বের স্থানে আনা যায়নি। ভারতে তো নয়ই; এমনকি ইসলামের শিরোনামে জন্ম নেয়া পাকিস্তানেও ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। আর যে দেশ স্বাধীন হওয়ার দু'বছরের মাথায় সেটির সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ঠাঁই পেয়েছে এবং যে দেশের সংবিধানের বক্তব্য অনুযায়ী দেশ স্বাধীন করা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য; সে দেশে ইসলামকে কর্তৃত্বের স্থানে আনা আরো বেশী দুষ্কর। কারণ, দেশটি স্বাধীন হয়েছেই কুফরি মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য, তার মাঝে এবং ভারতের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। বন্ধু দেশের সকল আদর্শই বন্ধু গ্রহণ করেছে।[৪২]

আর যদি ইমাম আবু হানিফার রহ. শর্তের বাহ্যিক শব্দ বিবেচনা করা হয়, তবুও তাতে কোনো অস্পষ্টতা নেই। প্রথম দু'টি শর্ত তথা কুফরি আইন-কানুন জারি হওয়া ও দারুল হারব সংলগ্ন হওয়া স্পষ্ট বিদ্যমান। আর 'আমান' বহাল থাকার যে শর্ত করেছেন; তাও পূর্বের আলোচনার আলোকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এই তিন ভূখণ্ডে মুসলমানরা যা পালন করতে পারছে, তা শর্ত করা 'আমান'র উপস্থিতির কারণে নয়, বরং তা পারে কাফের-মুরতাদদের এড়িয়ে যাওয়ার কারণে এবং সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হওয়ার কারণে।

এ দাবির সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হলো, তারা কোনো কিছুতে হস্তক্ষেপ করলেও তিন ভূখণ্ডে অবস্থিত মুসলমানদের কিছুক্ষণ বক্তৃতার ময়দানে উত্তপ্ত বাক্যব্যয় বা পিচঢালা রাস্তায় পাদুকাজোড়া ক্ষয় করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। এটিও যে বাধাহীন করতে পারে তা নয়; সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে হয় 'আমরা সংবিধান ও আদালতকে সম্মান করেই কথা বলছি, সংবিধান ও আদালত অবমাননাকর কিছু বলছি না'।

আর যদি শাসকশ্রেণি কোনোমতে একবার রাস্তায় ফেলে গণহত্যা বা গণপিটুনি দিতে পারে, তখন সাউন্ড গ্রেনেডের শব্দে অন্তর থেকে 'জযবা' উধাও হওয়ার সাথে সাথে নিজেদের ইমানি আদর্শও বিদায় নেয়, ফলে ওই খুনিদের আবার

৪২. বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার জন্য প্রথম পর্ব থেকে বাংলাদেশের সংবিধানের কুফরি ধারাগুলো আমরা পড়ে নিতে পারি।

বুকে জড়িয়ে নিতে হয় এবং আদর্শ থেকে বিচ্যুত করার প্রতিদান হিসেবে 'শুকরিয়া' আদায় করতে হয়।

আবার এই শাসকশ্রেণিই একশ' ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে পরবর্তীতে সংবিধান পরিপন্থী নয় এমন এক ক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে এই নির্বোধ জাতিকে সান্ত্বনা দেয়, তখন এ অবলা লোকগুলো বাকি নিরান্নব্বইটি ভুলে যায় এবং মনে করতে থাকে আমরা 'দারুল আমানে বসবাস করছি; যেহেতু আমাদের দাবি মেনে নিয়েছে। আর অপরদিকে তাদের নিরান্নব্বইটি হস্তক্ষেপের বৈধতা সাব্যস্ত হয়ে যায়।

দেশ তিনটির অবস্থার পর্যালোচনা

আমরা দেশ তিনটির অবস্থা একটু পর্যালোচনা করে দেখি-

ভারত

ইংরেজদের শাসনকাল ও ইংরেজ পরবর্তী শাসনকালে ভারতে কোন পরিবর্তনটা এসেছে? ওই সময় যদি মসজিদ ধ্বংস করা হয়ে থাকে পরবর্তীতেও মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে। বরং শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবির বক্তব্য অনুযায়ী তখন গরু জবাইয়ের ক্ষেত্রে বাধা দেয়া হতো না। আর এখন গোহত্যা আইনে গরু জবাই করা নিষেধ এবং প্রায়ই গরু জবাইয়ের অপবাদে মুসলমানদেরকে হত্যার সংবাদ প্রচারিত হয়। সেই সময় যদি ইংরেজরা কৌশলে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিতো, পরবর্তীতেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে ক্ষমতাসীনদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগিতায় মুসলিম-নিধন অভিযান চলছে। সে সময় যদি সাধারণ একজন ডেপুটি কমিশনার জামাআত নিষেধ করলে কারো করার কিছু ছিলো না, এখনো তিন তালাক বেআইনি ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিল পাশ হলে, হিজাব নিষিদ্ধ করা হলে এবং দারুল উলুম দেওবন্দসহ তিনশতাধিক মাদরাসাকে অবৈধ ঘোষণা করলেও কেউ কিছুই করতে পারছে না।

এটিই ইংরেজদের সুকৌশলে বুনে যাওয়া বীজ। সময় ও স্থানের ব্যবধানে পদ্ধতির ব্যবধান হবে; তবে ইসলাম ও মুসলমান সবসময় পর্যুদস্তই থাকবে, আবার মনে করতে থাকবে যে তারা দারুল আমানে বসবাস করছে।

ইংরেজদের শাসনকালের পর থেকে ভারতে কী কী চলেছে, তা দেখাতে ভিন্ন একটি রচনার প্রয়োজন। বিষয়টি চক্ষুষ্মান ও বিবেকবানদের নিকট স্পষ্ট

হওয়ায় সেদিকে যাচ্ছি না। শুধু লক্ষণীয় কয়েকটি বিষয় থাকায় দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত একদিনের একটি সংবাদ তুলে ধরছি-

এক বাছুরের মৃত্যুতে শাস্তির খড়্গ মুসলমানদের উপর

একটি বকনা বাছুরের মৃত্যুর ঘটনায় ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের তিতোলি গ্রামের সংখ্যালঘু মুসলমানদের ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের শাস্তির খড়্গ নেমেছে। তাদের দাড়ি রাখা, ঘরের বাইরে প্রকাশ্য স্থানে নামাজ পড়া বা সন্তানদের মুসলিম নাম রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গ্রামের এক মুসলিম বালক একটি বকনা বাছুর মেরে ফেলার কথিত অভিযোগে গ্রামের প্রবীণদের পরিষদ বা পঞ্চায়েত তাদের উপর এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। সে সাথে অভিযুক্ত ছেলেটিকে আজীবন গ্রামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বুধবার হিন্দু প্রধান তিতোলি গ্রামের পঞ্চায়েত সভায় বলা হয়, এ গ্রামের ইয়ামিন নামের একটি ছেলে একটি বকনা বাছুর মেরে ফেলেছে। সে অপরাধের শাস্তি হিসেবে এখন থেকে গ্রামের মুসলমানরা ঘরের বাইরে আর নামাজ পড়তে পারবে না। শুধু তাই নয়, তারা দাড়ি রাখতে পারবে না, তাদের কোনো সন্তানের মুসলিম নাম রাখা যাবে না। আর অভিযুক্ত ছেলেটি আর এ গ্রামে থাকতে পারবে না। এ সভায় গ্রামের সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষ উপস্থিত ছিল বলে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুরেশ নম্বরদার জানান। কিন্তু বাছুরটি কিভাবে ও কেন মারা গেল তা স্পষ্ট নয়।

উল্লেখ্য, তিতোলি গ্রামে মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ৮শ'। বকনা বাছুরটিকে মেরে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ এনে গত মাসে এক দল হিন্দু গ্রামের এক মুসলমানের বাড়িতে হামলা চালায়। গোহত্যা আইনে ১৯৫৫ -এর আওতায় দু' ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। এদিকে হরিয়ানার বিধানসভা সদস্যরা বলেছেন, মুসলমানরা তাদের উপর আরোপিত শাস্তি মেনে চলছে বলে তারা জানতে পেরেছেন। তারা বিষয়টি দেখবেন। রোহতাকের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট রাকেশ কুমার দি হিন্দু সংবাদপত্রকে বলেন, এটা অসাংবিধানিক। এ ব্যাপারে আমি গ্রাম প্রধানের সাথে কথা বলব। স্থানীয় মুসলিম নেতা রাজবীর বলেন, গোলমাল এড়াতে মুসলিমরা পঞ্চায়েতের নিষেধাজ্ঞা মেনে চলছে। তারা বোঝাতে চায় যে, তারা কোনোভাবেই উগ্রপন্থী নয়। তিনি বলেন, ভারত বিভাগের পর থেকেই আমরা সন্তানদের হিন্দু নাম রাখছি। আমরা মাথায় টুপি

পরি না বা দাড়ি রাখি না। আমাদের গ্রামে কোনো মসজিদ নেই। তাই আমরা জুমআর নামাজ বা ঈদের নামাজ পড়ার জন্য ৮-১০ কিলোমিটার দূরের রোহতাক শহরে যাই।

সুরেশ বলেন, মুসলমানদের ঘরের বাইরে নামাজ পড়া ও ছেলেটিকে গ্রামে থাকতে না দেয়ার সিদ্ধান্তের সাথে পঞ্চায়েত আরো সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, গ্রামের মধ্যখানে মুসলমানদের যে গোরস্তানটি রয়েছে তা পঞ্চায়েতের দখলে নেয়া হবে। আর মুসলমানদের কবরের স্থান হিসেবে গ্রামের বাইরে একটা জায়গা দেয়া হবে। তবে গ্রাম পঞ্চায়েত মুসলমানদের যাকাত দেয়া বা রোজা রাখার ব্যাপারে এখনো কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি।

সুরেশ দাবি করেন, এ গ্রামে কয়েক প্রজন্ম ধরে হিন্দু ও মুসলমানরা সম্প্রীতিতে বাস করে আসছে। তিনি বলেন, উত্তর প্রদেশ থেকে আসা বসতি স্থাপনকারীরা শান্তি বিনষ্ট করছে। এদিকে ধর্মনিরপেক্ষ গ্রুপ একতা মঞ্চ পঞ্চায়েতের মুসলিম বিরোধী সিদ্ধান্তের নিন্দা করেছে। মঞ্চের সভাপতি শাহজাদ খান বলেন, এসব নিষেধাজ্ঞা সংবিধান বিরোধী। মুসলিমরা প্রতিশোধ নেয়ার ভয়ে তাদের দুর্ভাগ্য মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার যশ গার্গ বলেন যে, গ্রামে কোনো সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বা সমাজের লোকদের মধ্যে কোনো অসন্তোষ নেই। তিনি বলেন, গ্রাম পঞ্চায়েত এ ধরনের কোনো অসাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে আমরা তা দেখব ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করব।" (দৈনিক ইনকিলাব ২৩-০৯-২০১৮)।

এই হলো ভারতের মতো দারুল ইসলাম বা দারুল আমানের (?) চিত্র। বাস্তবেও বসবাসকারীরা 'আমান'ই মনে করছে এবং বিরোধিতা করাকে উগ্রপন্থা বা সম্প্রীতি বিনষ্ট করা মনে করছে। এটি এমন এক শক্তিশালী 'আমান'; ইমান ছেড়ে দিতে বাধ্য করলে প্রয়োজনে ইমান ছেড়ে দেবে, তবে কোনোভাবেই উগ্রপন্থী হয়ে বা সম্প্রীতি বিনষ্ট করে 'আমান' পরিপন্থী কাজ করা যাবে না। অপরদিকে মোড়লরা অসাংবিধানিক হয়েছে বলে বিবৃতির ধারাও অব্যাহত রাখবে। ব্যস! সরকার কর্তৃক হস্তক্ষেপ করা প্রমাণিত নয়; তাই তা 'দারুল আমান' হতে কোনো সমস্যা নেই!?!?!?!?

ভারতের এই অবস্থা একদিনের বা এক স্থানের নয়। এ অবস্থা বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন স্থানের। তবে প্রকাশ হয় একটি আর গোপন থাকে হাজারটি। ভারতের

করুণ পরিস্থিতি তুলে ধরতে নিজের কাছেও কেমন বোকামো বোকামো লাগছে। পাঠকশ্রেণি হয়তো ভাবছেন; এমন একটি স্পষ্ট বিষয় এতো করে বুঝানোর কী প্রয়োজন? প্রয়োজনটা বুঝে আসবে সামনে একটি পুস্তিকা ও সে পুস্তিকা সম্পর্কে কারো কারো ইতিবাচক মন্তব্য তুলে ধরার পর।

পাকিস্তান

এবার পাকিস্তানের কথা বলি। পাকিস্তানেও মুসলমানরা ইসলামের যে সকল রীতি-নীতি পালন করতে পারছে, তা নিজেদের দাপটের কারণে পারছে এমনটি নয়। বরং তা পারছে গণতান্ত্রিক কুফরি সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হওয়ার কারণে। কোনো ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণি হস্তক্ষেপ করলে তাদেরও প্রতিরোধ করার মতো ক্ষমতা থাকে না।

এটির সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হলো; পাকিস্তানে যখন নারী-নীতি বাস্তবায়ন হয়েছে, তখন মুসলমানরা কী করতে পেরেছে? এখন কেউ যদি তার ব্যক্তিজীবনে ইসলামি নীতি অনুযায়ী আমল করে যা ওই নারী-নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক, আর নারী যদি আদালতে মামলা দায়ের করে দেয়, তাহলে কিন্তু ইসলামি নীতি অনুযায়ী ব্যক্তিজীবনে আমল করা ওই মুসলমান অভিযুক্ত সাব্যস্ত হবে। এটিই কি ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক শর্ত করা 'আমান'র অর্থ?

এছাড়াও যখন পাকিস্তানের মুরতাদ শাসকের সহযোগিতায় পাকিস্তানকে ব্যবহার করে 'ইমারতে ইসলামি আফগানিস্তান'র শাসনব্যবস্থা ধ্বংস করা হয়েছিলো; তখন দাপটের দাবিদারগণ কী করতে পেরেছেন? না কি দেশপ্রেমে বুঁদ হয়ে থাকা ব্যক্তিবর্গ ভেবেছেন; সেটি তো আমাদের দেশ নয়, তা ধ্বংস হলে কী আসে-যায়!

ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়নের চেষ্টা করায় লাল মসজিদ ও জামিআ হাফসায় যখন তাগুত পারভেজ মোশারফের মুরতাদ বাহিনী হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিলো, তখন দারুল ইসলামে (?) বসবাসকারীগণ মুখে কিছু নিন্দা বাক্য আওড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে কোন দাপটের জোরে এ কথাও বলে দেয়া জরুরি মনে করেছেন যে, গাযি আব্দুর রশিদ শহিদের পদ্ধতি সহিহ ছিলো না?

কিছুদিন পূর্বে যখন 'গুস্তাখে রাসুল' ও ইসলাম অবমাননাকারী 'আসিয়া বিবি'র মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করে দেয়া হলো, তখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দারুল ইসলামে (?) বসবাসকারীগণ দাপটের সঙ্গে 'আমানে থাকার কী প্রভাব দেখিয়েছিলেন?

পাকিস্তানের সংবিধানের ভূমিকায় 'হাকেমে মুতলাক' আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা' আর মূল ধারা ও কার্যক্ষেত্রে সেটির আশপাশেও না ঘেঁষা; এবং ইংরেজদের ঘোষণায় 'সৃষ্টি স্রষ্টার' স্বীকার করে নিয়ে আইন তাদের হাতে রাখা; দুই ধোঁকার মাঝে পার্থক্য কোথায়?

এই শ্রেষ্ঠ দারুল ইসলামের (?) জনগণ ও নেতাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লামা ইউসুফ বানুরি রহ. (মৃঃ ১৩৯৭ হিঃ) কেনো এতো করুণ সুরে বলছেন যে, 'দয়া করে এখানে ইসলামকে একটু পা রাখার জায়গা দিন'! তিনি বলেন-

پاکستان اگر واقعی "دار الاسلام" اسلام کا گھر ہے، تو یہاں کے دس گیارہ کروڑ فرزندان اسلام اور اس کے قائدین سے اپیل بے جانہ ہوگی کہ خدا کے لئے اس گھر میں اسلام کو قدم رکھنے کی جگہ دیجئے اور اسے اپنے گھر کی اصلاح کرنے دیجئے۔ (بصائر و عبر، ۲/ ۲۰)

"পাকিস্তান যদি বাস্তবেই দারুল ইসলাম বা ইসলামের ঘর হয়ে থাকে, তাহলে এখানের দশ-এগারো কোটি ইসলামের সন্তান ও এখানের শাসকদের নিকট এই অনুরোধ করা অযথা হওয়ার কথা নয় যে, আল্লাহর ওয়াস্তে এই ঘরে ইসলামকে পা রাখার জায়গা দিন এবং ইসলামকে তার ঘর সংশোধন করতে দিন।" (বাসায়ের ওয়াইবার, ২/২০)

তবে যেহেতু তা দারুল ইসলাম নয় তাই অনুরোধ অনুরোধই থেকে গেছে; এটিই স্বাভাবিক। আল্লামা বানুরি রহ. এর পাকিস্তানকে দারুল ইসলাম বলতে লজ্জা লাগলে কী হবে, তাঁর পরবর্তী কারো কারো নিকট এখন তা শ্রেষ্ঠ দারুল ইসলাম। তাগুতি আইনে শাসিত পাকিস্তানকে নিয়ে যে পরিমাণ গৌরব ও মাতামাতি হয়, তা দেখলে লজ্জায় বানুরি রহ. এর নাক প্রবাদে নয় বাস্তবেই কাটা যেতো।

বাংলাদেশ

এবার বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আসা যাক। বাংলাদেশের অবস্থাও কোনো অংশে ব্যতিক্রম নয়, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবস্থা আরো করুণ। এখানেও মুসলমানরা ইসলামের যে সকল রীতি-নীতি পালন করতে পারছে, তা নিজেদের দাপটের কারণে পারছে এমনটি নয়। বরং তা পারছে গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ কুফরি সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হওয়ার কারণে। কোনো

ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণি হস্তক্ষেপ করলে এখানেও মুসলমানদের প্রতিরোধ করার মতো ক্ষমতা থাকে না।

বাংলাদেশ সম্পর্কে আলোচনা পড়ার পূর্বে প্রথম পর্ব থেকে বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনের বিভিন্ন ধারা এবং সে সংক্রান্ত আলোচনাগুলো পড়ে নেয়ার জন্য পাঠকদের নিকট অনুরোধ থাকবে। তাহলে আলোচনাটি বুঝতে সহজ হবে।

বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনের সকল ধারা-উপধারা সামনে রেখে উদাহরণ পেশ করতে গেলে স্বতন্ত্র একটি পুস্তিকা তৈরি হয়ে যাবে। তাই আমরা সেদিকে যাচ্ছি না; বিবেকবান ও সচেতন পাঠকদের জন্য নমুনাস্বরূপ কয়েকটি মৌলিক কথা বলে দেয়াই যথেষ্ট মনে করছি। বাকি অবস্থা তো সকলের সামনেই আছে।

শাসকশ্রেণি হস্তক্ষেপ করলে যে প্রতিরোধ করার কোনো ক্ষমতা থাকে না, বরং তারা যা চায় তাই হয়; এর সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হলো, শাসকশ্রেণি যখন ফাতওয়া দেয়া নিষিদ্ধ করার ইচ্ছে করেছে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। তখন উলামায়ে কেরাম কঠিন আন্দোলন করেও কিছু করতে পারেনি। এরপর যখন ধোঁকা দেয়ার জন্য ফাতওয়ার বৈধতা দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করেছে, তখন কোনো টু-শব্দ ছাড়াই নিজেরাই ইস্যু তৈরি করে ফাতওয়ার বৈধতা দিয়ে দিয়েছে; আর আমরা দারুল ইসলাম বা দারুল আমানের (?) বাসিন্দা হওয়ায় তৃপ্তির ঢেকুর তুলেছি।

আমরা যদি ফাতওয়া বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ রায়টি বুঝে-শুনে পড়ে দেখতাম, তাহলেও বুঝতে পারতাম যে, আমরা ইমানের দাবিতে প্রাপ্য 'আমানে বসবাস করছি কি না। ফাতওয়া বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ রায়ে বলা আছে- **'দেশের প্রচলিত আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় এমন কোনো ফতোয়া দেয়া যাবে না। কোনো ব্যক্তির অধিকার, মর্যাদা বা সম্মান বিনষ্ট করে ফতোয়া দেয়া যাবে না'**। (দৈনিক ইনকিলাব, ২৮ জানুয়ারি, বুধবার ২০১৫ ইং)।

সুতরাং কেউ যদি আপনার নিকট 'ইস্তিফতা' করে, ইসলামই কি একমাত্র সঠিক ধর্ম, অন্যান্য ধর্ম কি ভ্রান্ত? আপনি কুরআন হাদিসের আলোকে যদি এ ফাতওয়া প্রদান করেন, 'ইসলামই একমাত্র সঠিক ধর্ম এবং অন্যান্য সকল ধর্ম বাতিল ও অসার'। তাহলে এ ফাতওয়া সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও এতে

করে অন্য ধর্মাবলম্বীদের মর্যাদা ও সম্মান বিনষ্ট হওয়ায় অন্য ধর্মাবলম্বীরা আপনার বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার রাখে এবং মামলা করলে আপনি অভিযুক্ত সাব্যস্ত হবেন।

আপনি যদি শুধু এতোটুকুও ফাতওয়া প্রদান করেন, 'মানবরচিত আইনে ফয়সালা করা জায়েয নেই এবং যে করবে সে ফাসেক'। তাহলে এ ফাতওয়া সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও এতে করে ব্যক্তির মর্যাদা ও সম্মান বিনষ্ট হওয়ায় মানবরচিত আইনে ফয়সালাদাতা আপনার বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার রাখে এবং মামলা করলে আপনি অভিযুক্ত সাব্যস্ত হবেন।

আপনি যদি কুরআন-হাদিসের আলোকে ফাতওয়া প্রদান করেন, 'বাংলাদেশের হিন্দুরা আমার জাতি ও বন্ধু নয়, কিন্তু পাকিস্তানের প্রতিটি মুসলমান আমার জাতি ও বন্ধু'। তাহলে এ ফাতওয়া সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও এতে করে অন্য ধর্মাবলম্বীদের মর্যাদা ও সম্মান বিনষ্ট হওয়ায় অন্য ধর্মাবলম্বীরা আপনার বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার রাখে এবং মামলা করলে আপনি অভিযুক্ত সাব্যস্ত হবেন।

আপনার নিকট যদি কেউ 'ইস্তিফতা' করে, আমাদের এলাকায় এক চোরের চুরি প্রমাণিত হয়েছে, এক্ষেত্রে চোরের শাস্তি কী? আপনি যদি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শুধু ফাতওয়া প্রদান করেন, চোরের শাস্তি হাত কেটে দেয়া। তাহলে এ ফাতওয়া প্রচলিত আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও এতে করে চোরের মর্যাদা ও সম্মান বিনষ্ট হওয়ায় চোর আপনার বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার রাখে এবং মামলা করলে আপনি অভিযুক্ত সাব্যস্ত হবেন।

আপনার নিকট যদি কেউ 'ইস্তিফতা' করে, আমাদের এলাকায় দুই পুরুষ-মহিলার ব্যভিচার প্রমাণিত হয়েছে, এক্ষেত্রে তাদের শাস্তি কী? আপনি যদি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শুধু ফাতওয়া প্রদান করেন, বিবাহিত ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর শাস্তি প্রকাশ্যে পস্তরাঘাত করে হত্যা করা এবং অবিবাহিত ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর শাস্তি প্রকাশ্যে 'দোররা' মারা। তাহলে এ ফাতওয়া প্রচলিত আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও এতে করে ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর মর্যাদা ও সম্মান বিনষ্ট হওয়ায় ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী আপনার বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার রাখে এবং মামলা করলে আপনি অভিযুক্ত সাব্যস্ত হবেন।

এ রকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই। এগুলো কি শুধুই কাল্পনিক? দারুল ইফতার যিম্মাদারগণ কি জানেন না, এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার ভয়ে কতো 'ইস্তিফতা' তাঁদেরকে এড়িয়ে যেতে হয়! বিশেষকরে যাঁরা পত্রিকা বা অনলাইনে উত্তর দিয়ে থাকেন; তাঁদেরকে কতো প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, 'আপনি সরাসরি সাক্ষাত করেন'! ইমাম আবু হানিফা রহ. কি এ ধরনের 'আমান'র কথা বলেছেন? না কি 'আমান' প্রমাণ করার জন্য কেউ যদি সত্যকে চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়ার চেষ্টা করেন তাহলে মনে রাখতে হবে, বাস্তবতাকে মিথ্যার চাদরে ঢেকে রাখা যায় না।

মুসলমানদের দাপটের কথা যদি বলতে যাই; তাহলে প্রথমেই বলতে হয়, এ দেশে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃস্টানরা তাদের সকল প্রথা, আচার, অনুষ্ঠান ও বিধি-নিষেধ বা বলতে গেলে তাদের সকল 'শাআয়ের' নিদর্শন পালনের ও অধিকারের কথা বলার নিরাপত্তা পায় কিন্তু মুসলমানরা তা পায় না। ঢাকার রামপুরায় প্রয়োজনে রাস্তা বাঁকা করা হয়, তবুও মন্দিরে হাত দেয়া যায় না। বিপরীতে ফেনীর মহিপালে প্রয়োজনে মসজিদ ভাঙ্গা হয়, তবুও রাস্তা সোজা হতে হয়। 'গোস্তাখে রাসুল' পূর্ণ 'আমান'র সহিত জামাই আদরে লালিত পালিত হয়, আর 'গোস্তাখে রাসুল'র শাস্তির দাবিদাররা প্রকাশ্য রাস্তায় পূর্ণ 'আমান'র (?) সহিত গণহত্যা ও গণপিটুনির শিকার হয়।

যখন সম্পূর্ণ কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী নারীনীতি ও নাস্তিকতায় ভরপুর ডক্টর কুদরত এ খুদা শিক্ষানীতির বিল পাশ করা হয়, তখনের দাপটের দাবিদাররা কী পরিমাণ দাপট দেখিয়ে তা প্রতিরোধ করেছিলেন?

দাপটের আলোচনা এখানে অনর্থক। ব্যক্তিজীবনে স্বাধীনভাবে আমরা সাধারণ সকল বিষয় পালন করতে পারি কি না; একটু দেখা যাক।

আপনি শরিআত কর্তৃক প্রদত্ত আপনার একান্ত ব্যক্তিগত অধিকার; পনের বছরের বালেগা মেয়েকে বিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পাচ্ছেন না। তাগুতি প্রশাসন কোনোভাবে জানতে পারলে আপনাকে শাস্তির আওতায় আসতে হবে এবং সকল সংবাদমাধ্যম বাল্যবিবাহের জিগির তুলে আপনার ইমেজের বারোটা বাজিয়ে দেবে। যেমনটি ইতোমধ্যে ঘটে চলছে।

আপনি আপনার স্ত্রীর অসম্মতিতে তার সঙ্গে সহবাস করতে পারবেন না। আপনার স্ত্রী মামলা দায়ের করলে আপনি ধর্ষক হিসেবে সাব্যস্ত হবেন।

তাই তো মাঝে-মধ্যে পত্রিকায় স্বামী কর্তৃত স্ত্রী ধর্ষিতা (?) হওয়ার সংবাদ প্রচারিত হয়।

আপনি আপনার পিতার মৃত্যুর পর কুরআনে কারিমের নির্দেশনা অনুযায়ী উত্তরাধিকার বণ্টনে স্বাধীনতা পাচ্ছেন না। আপনি যতোটুকু গ্রহণ করবেন আপনার বোনকেও ততোটুকু দিতে হবে। অন্যথায় আপনার বোন মামলা দায়ের করলে আপনিই অভিযুক্ত হবেন।

আপনার কোনো উত্তরাধিকারী মুরতাদ হয়ে গেলে অন্যান্য উত্তরাধিকারীরা শরিআতের বিধান অনুযায়ী তাকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার ক্ষেত্রে স্বাধীন নয়। কেননা সংবিধান অনুযায়ী যে কারো যে কোনো ধর্ম গ্রহণের অধিকার আছে। তাই তার মুরতাদ হওয়া অসাংবিধানিক হয়নি।

আপনি আপনার ১০-১২ বছরের সন্তানকে সালাত আদায়ের জন্য মারধর করতে পারবেন না। সন্তান মামলা করলে আপনি অভিযুক্ত হবেন। কেননা প্রচলিত আইনে ধর্মীয় কাজে কারো উপর চাপ প্রয়োগ করা নিষেধ।

আপনার মেয়ে স্বেচ্ছায় পতিতালয়ে গিয়ে অবৈধ কাজ করলে বাধা দেয়ার ক্ষেত্রে আপনার স্বাধীনতা নেই। বরং আপনার মেয়ে আপনার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলে আপনি প্রচলিত আইনে অভিযুক্ত সাব্যস্ত হবেন। ছেলে-মেয়ে সম্মতিতে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তা প্রচলিত আইনে অপরাধ নয়।

পূর্বেই বলেছি, এ ধরনের দৃষ্টান্ত পেশ করতে থাকলে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা তৈরি হয়ে যাবে। এ লেখাটি যেদিন আমি তৈরি করছিলাম, ঠিক সেদিনের একটি 'কারগুযারি'। আমরা বাংলাদেশকে দারুল হারব মনে করায় যারা আমাদের উপর খুব বেশি রাগান্বিত, তাদের একজনের সঙ্গে আরো কয়েকজনসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিলো। কথা প্রসঙ্গে মুহতারামের মুখ ফসকে বের হয়ে গেলো; 'এখন তো একটা (.....) দিতেও সরকারের অনুমতি নেয়া লাগে'।

এটিই হলো বাস্তবতা। এই অনুভূতি সকলেরই আছে। কিন্তু কথা তাই যা আমরা প্রথম পর্বে বলে এসেছি, 'আমরা বাঁচাতে চাই নাকি বাঁচতে চাই?' অন্যথায় আমাদের কার উপলব্ধিতে নেই যে, আমরা যা পালন করতে পারছি সেগুলোতে হস্তক্ষেপ করলেও আমাদের কিছুই করার থাকবে না। ইমানের

দাবিতে প্রাপ্য 'আমান' কি এটি বা ইমাম আবু হানিফা রহ. কি এই 'আমান'র কথা বলেছিলেন?

তবে আমরা বোকা হলেও তাগুতরা এতো বোকা নয়। আমরা নিরাপদ ও দাপটের সঙ্গে আছি; এই বুঝ জিইয়ে রাখার জন্য তারা মাঝে-মধ্যে দুয়েকটি দাবি মেনে নিয়ে মুলা ঝুলিয়ে দেয়। আমরা ঝুলানো মুলার পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে জীবন পার করে দেই।

তাদের যখন ইচ্ছে হয়েছে, 'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে' কথাটি উঠিয়ে দিয়েছে, তারাই আবার রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলামকে বহাল রেখেছে। আমরা প্রথমটা ভুলে গিয়ে দ্বিতীয়টার জন্য এতো বেশি বাহবা দিয়েছি; ভাবারও সময় পাইনি যে, বহাল রাখা না রাখার ফলাফল কী?

তারাই আদালত প্রাঙ্গণে গ্রীক দেবীর মূর্তি স্থাপন করেছে, আবার তারাই সেখান থেকে তা সরিয়ে নিয়ে অন্য ভবনের সামনে স্থাপন করেছে। আমরা এতো বেশি মিষ্টি বিতরণ করেছি; ভাবারও প্রয়োজন মনে করেনি যে, পার্থক্যটা কোথায়? আগে মনে হয়েছে অবৈধভাবে মাথার উপর ছিলো, এখন মাথার উপর থাকার বৈধতা প্রমাণ হয়ে গেছে। কেননা এখন আর কোনো আন্দোলন নেই। অথচ গ্রীক দেবীর মূর্তি আদালত প্রাঙ্গণে থাকাটাই যথাযথ ছিলো। মানবরচিত আইনের আদালত প্রাঙ্গণে মানবতৈরি মূর্তিই বেশি মানানসই। আমরা এতোটাই বোকা যে তাদের ফন্দি আঁচও করতে পারিনি। তাদের মিশন হলো বিভিন্ন স্থানে মূর্তি স্থাপন করা। কিন্তু প্রথমে যেখানেই স্থাপন করা হোক না কেনো আন্দোলন হবেই। সে আন্দোলন দমানো তাদের জন্য কঠিন কোনো কাজ নয়। তবে সব ক্ষেত্রে তারা এ পথ মাড়াতে চায় না। তাই প্রথমে সাধারণ দৃষ্টিতে একটি স্পর্শকাতর স্থানে সেটিকে স্থাপন করা হলো। খুব ঘটা করে আন্দোলন হলো। তারাও আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে এক স্থান থেকে সরিয়ে অন্য স্থানে স্থাপন করে দিলো। এক ঢিলে দুই শিকার; মূর্তিও স্থাপনের ব্যাপারে আর কোনো আপত্তি থাকলো না, অপরদিকে মুসলমানদের দাপট ও 'আমান'র সঙ্গে থাকার অলীক বুঝটি আরো পাকাপোক্ত হলো।

এই বিন্দুতে এসে আকাবিরে হিন্দের সঙ্গে আমাদের পার্থক্যরেখা স্পষ্ট হয়ে গেছে। ইংরেজরা আমাদের আকাবিরে আসলাফকে হুবহু এই টোপটি গেলাতেই 'আইন-কানুন চলবে কোম্পানীর' বলার পূর্বে 'সৃষ্টি খোদার ও

সাম্রাজ্য সম্রাটের' ব্যবহার করেছে। কিন্তু সে সময়ের আকাবিরে হিন্দ এই টোপ গেলেনি। তাঁরা তাঁদের দূরদর্শিতার প্রমাণ দিয়েছেন বলেই ঘোষণার প্রথমাংশের তোয়াক্কা না করে শেষাংশের ভিত্তিতে দারুল হারব হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। কারণ প্রথমাংশ ছিলো শুধুই ধোঁকা ও প্রবঞ্চনা।

কিন্তু যে টোপ ইংরেজরা আমাদের আকাবিরে আসলাফকে গেলাতে পারেনি, তাগুতের সে টোপেই পরবর্তীরা কাবু হয়ে গেছে। ইংরেজদের তুরুপের তাস ফসকে গেলেও তাদের বপন করা বীজ থেকে তৈরি বর্তমান তাগুতদের তুরুপের তাস ফসকে যায়নি, বরং তারা বিশেষ দানে পুরোই জয়ী হয়েছে। আমাদেরকে এই টোপ গেলাতে তাদের খুব একটা বেগ পেতে হয়নি।

আমরা কখনো ভেবে দেখিনি, গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী কুফরি সংবিধানের ভূমিকায় 'হাকেমে মুতলাক' আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা'[৪৩] বা গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী, সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ কুফরি সংবিধানে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতি দেয়া কি মূর্তির গলায় আল্লাহর নাম ঝুলিয়ে দেয়া নয়?

মূর্তির গলায় আল্লাহর নাম ঝুলিয়ে দেয়ার মানে তারা এ মূর্তিকেই আল্লাহ বলে মানুষদের ধোঁকা দিতে চাচ্ছে। আর আমরা বলছি, তবুও তো আল্লাহর নাম ব্যবহার করেছে; বুঝা যাচ্ছে কিছুটা হলেও আল্লাহর নামের প্রতি শ্রদ্ধা আছে। ঠিক তেমনিভাবে তারা মানুষদের ধোঁকা দেয়ার জন্য কুফরি আইনের সংবিধানের শুরুতে 'হাকেমে মুতলাক' আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে বা কুফরি মতবাদের সংবিধানে ইসলামকে স্বীকৃতি দিয়ে মূলত বুঝাতে চাচ্ছে, এগুলোই আল্লাহর আইন বা এটিই ইসলাম। আর আমরা ব্যাখ্যা করছি 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো'। কানা মামা যে সাধারণ মানুষের ইমানটা নষ্ট করে দিচ্ছে, সে অনুভূতি আমাদের নেই। এ জন্যই শয়তানের চেলা-চামুণ্ডা 'তাগুত'রা নির্দ্বিধায় ঘোষণা দেয় 'কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোনো আইন করা হবে না', আর কেউ কেউ এটিকে তাদের ইমানের দলিল হিসেবে ব্যবহার করেন। لا حول ولا قوة إلا بالله।

---

৪৩. যেমনটি পাকিস্তানের সংবিধানের ভূমিকায় রয়েছে।

দারুল ইসলাম হতে হলে তাতে ইসলামি আইন জারি হতে হবে

দ্বিতীয়ত: বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারত এখনো দারুল হারব হিসেবে বিদ্যমান থাকা বুঝানোর জন্য এতো দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন নেই। আলোচনাটি পেশ করেছি শুধুই বাস্তবতা তুলে ধরার জন্য। অন্যথায় যেহেতু ইংরেজদের শাসনকালে কুরআন-সুন্নাহ ও ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য এবং সমকালীন জুমহুর উলামায়ে কেরামের ফাতওয়ার ভিত্তিতে পুরো ভারতবর্ষ দারুল হারব হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। আর এ ধরনের দারুল হারব আবার দারুল ইসলামে পরিণত হওয়ার জন্য তাতে ইসলামি আইন-কানুন জারি হতে হয়; যেমনটি ইতোপূর্বে শারহু দুরারিল বিহার ও রদ্দুল মুহতারের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ হয়েছে-

قال بعض المتأخرين: إذا تحققت تلك الأمور الثلاثة في مصر المسلمين، ثم حصل لأهله الأمان، **ونصب فيه قاض مسلم ينفذ أحكام الإسلام، عاد إلى دار الإسلام.** (غرر الأذكار في شرح درر البحار لمحمد البخاري -المخطوطة- كتاب السير، ص٢٨٦، رد المحتار، كتاب الجهاد، الباب الثالث باب المستأمن، مطلب فيما تصير به دار الإسلام دار حرب وبالعكس، ٦/٢١٥)

“পরবর্তী কোনো কোনো ফকিহ বলেছেন, যদি ওই তিনটি বিষয় (ইমাম আবু হানিফা কর্তৃক আরোপিত তিনটি শর্ত) মুসলমানদের কোনো শহরে পাওয়া যায়, অতঃপর তাতে পুনরায় ‘আমান’ ফিরে আসে এবং **এমন বিচারক নিযুক্ত করা হয় যে ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়ন করে, তাহলে তা আবার দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।**” (গুরারুল আযকার ফি শারহি দুরারিল বিহার -পাণ্ডুলিপি-, পৃ: ২৮৬, রদ্দুল মুহতার, ৬/২১৫)

যেহেতু দারুল হারব প্রমাণিত হওয়ার পর থেকে এই তিন ভূখণ্ড তথা পুরো ভারত উপমাহাদেশে কোথাও ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়িত হয়নি, তাই নতুন ফাতওয়া নয়; বরং আকাবিরে আসলাফের ফাতওয়ার ভিত্তিতেই বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ পুরো ভারত উপমহাদেশ এখনো দারুল হারব হিসেবেই বিদ্যমান আছে।

কোনো ব্যক্তিত্বের ‘শায’ কথা বা ‘পদস্খলন’কে সে হিসেবে থাকতে দেয়াই তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্য নিরাপদ। কিন্তু সেটিকে যখন আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হবে বা প্রচার করা হবে, তখন যিনি দলিলের আলোকে তা প্রত্যাখ্যান করছেন; তিনি তো উম্মতের কল্যাণ কামনায় তার দায়িত্ব হিসেবেই যেভাবে প্রকাশ হয়েছে সেভাবেই সেটিকে প্রত্যাখ্যান করছেন। এর জন্য অপরাধী সেই যে এই ‘শায’ রায় বা ‘পদস্খলন’কে দলিল হিসেবে প্রচার করে।

-পাঁচ-

কিছু পুস্তিকা-ফাতওয়ার পর্যালোচনা

১. 'দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব'

মুহাদ্দিসে কাবির আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমি রহ. (মৃঃ ১৪১২ হিঃ)

মুহাদ্দিসে কাবির আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমি রহ. একজন স্বীকৃত মুহাদ্দিস ও ভারতবর্ষের একজন মহান ব্যক্তিত্ব। 'দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব' তাঁর রচিত একটি 'রিসালাহ'-পুস্তিকা। এ পুস্তিকায় তিনি জুমহুর উলামায়ে কেরামের ফাতওয়ার বিপক্ষে অবস্থান করে এবং শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবির ফাতওয়াকে ভুল আখ্যা দিয়ে ভারতবর্ষকে দারুল ইসলাম হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। আমরা তাঁর এই পুস্তিকার উপর সংক্ষিপ্ত একটি পর্যালোচনা পেশ করবো, ইনশাআল্লাহ।

পুস্তিকা বলতে পুরো পুস্তিকা উদ্দেশ্য নয়। শুধু প্রথম দিকের কিছু অংশ, যাতে তিনি দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পরিচয় নিয়ে আলোচনা করে ভারতকে দারুল ইসলাম হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। বাকি অংশ আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবির ফাতওয়া সম্পর্কে আ'যমির মন্তব্য

আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমি শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবির ফাতওয়া সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, বলতে গেলে তাতে শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবির দিকে অনেকটা 'খিয়ানত'র 'নিসবত'ই করা হয়েছে। আ'যমি রহ. বলেন-

تیسری شخصیت حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی کی ہے، انہوں نے بے شک یہ اقرار نہیں فرمایا کہ عبارت فقہاء سے اس کا دار الاسلام ہونا ثابت ہوتا ہے، بلکہ اس کے بر خلاف انہوں نے فقہاء کی عبارات کا مفہوم ایسا ظاہر فرمایا، جس کی رو سے ہندوستان پر دار الحرب کی تعریف صادق آتی ہے، مگر اوپر کی بحث میں ہم نے شاہ صاحب سے متقدم اور ان سے افقہ علماء کی ایسی تصریحات پیش کر دی ہیں جن سے عبارات فقہاء کا صحیح مفہوم واضح ہو جاتا ہے اور ان عبارات سے ہندوستان کا دار الاسلام ہی ہونا معلوم ہوتا ہے۔ (دار الاسلام اور دار الحرب، ص ۳۰)

"তৃতীয় ব্যক্তিত্ব শাহ আব্দুল আযিয দেহলবির সিদ্ধান্ত। তিনি অবশ্য এটি স্বীকার করেননি যে, ফুকাহায়ে কেরামের ইবারত দ্বারা হিন্দুস্তান দারুল ইসলাম হওয়া প্রমাণিত হয়। বরং এর বিপরীতে তিনি ফুকাহায়ে কেরামের ইবারতের এমন মর্মার্থ প্রকাশ করেছেন, যার আলোকে হিন্দুস্তানের ক্ষেত্রে দারুল হারবের সংজ্ঞা প্রযোজ্য হয়। কিন্তু পূর্বের আলোচনায় আমরা শাহ সাহেবের পূর্বের ও তাঁর চেয়ে অগ্রগণ্য ফকিহ উলামায়ে কেরামের এমন সুস্পষ্ট বক্তব্য উল্লেখ করেছি, যার দ্বারা ফুকাহায়ে কেরামের ইবারতের সঠিক মর্মার্থ স্পষ্ট হয়ে যায়। আর ওই সকল ইবারত দ্বারা হিন্দুস্তান দারুল ইসলাম হওয়াই বুঝে আসে।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃ: ৩০)।

দাগটানা অংশটুকু আমরা একটু গভীর মনে পড়ি। এটি কি শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবির দিকে 'খিয়ানত'র 'নিসবত' নয়? আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির দৃষ্টিতে যদি শাহ সাহেবের বুঝ সহিহ না হয়ে থাকে, তাহলে তিনি এভাবেও তো বলতে পারতেন- "بلکہ اس کے بر خلاف انہوں نے فقہاء کی عبارات کا مفہوم ایسا سمجھا، جس کی رو سے ہندوستان پر دار الحرب کی تعریف صادق آتی ہے" (বরং এর বিপরীতে তিনি ফুকাহায়ে কেরামের ইবারতের এমন মর্মার্থ বুঝেছেন, যার দ্বারা হিন্দুস্তান দারুল হারব প্রমাণিত হয়)। আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির বলার ভঙ্গিমা তথা "سمجھا" (বুঝেছেন) এর পরিবর্তে "ظاہر فرمایا" (প্রকাশ করেছেন) বলায় বুঝা যাচ্ছে, শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. ভারতবর্ষকে দারুল হারব প্রমাণ করার জন্য বুঝে-শুনেই এমন মর্মার্থ প্রকাশ করেছেন।

কথা হলো, ফুকাহায়ে কেরামের ইবারতের ভুল মর্মার্থ প্রকাশ করে ভারতবর্ষকে দারুল হারব প্রমাণের ক্ষেত্রে শাহ সাহেবের কী স্বার্থ নিহিত

থাকতে পারে? শাহ সাহেবও কি যুগে যুগে চাটুকারদের ন্যায় চাটুকারিতা করে ঝুঁকিমুক্ত জীবন কাটাতে পারতেন না? তবে সামনেই -ইনশাআল্লাহ- প্রমাণ হয়ে যাবে; কে ফুকাহায়ে কেরামের ভুল মর্মার্থ বুঝেছেন বা প্রকাশ করেছেন।

এখানে একটি কথা বলে রাখা উচিত; শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. কর্তৃক ভারতবর্ষকে দারুল হারব ঘোষণা দেয়া কুরআন-সুন্নাহ, ফুকাহায়ে কেরামের ইবারত ও সমকালীন জুমহুর উলামায়ে কেরামের মতানুযায়ী সঠিকতার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবে আমরা এ দাবি করছি না যে, শাহ সাহেব ফাতওয়ায় যে সকল দলিল উল্লেখ করেছেন বা যা বলেছেন সবই যথাযথ হয়েছে।

এই বাস্তবতা বাস্তব হওয়া সত্ত্বেও শাহ সাহেব সঠিক ফলাফলে পৌঁছার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ভুলের শিকার হননি। কেননা, দারুল হারব বা দারুল ইসলাম; এটি শুধুই ফিকহের ইবারতে নয়, বরং বাস্তবতার বিবেচনায় তা অনুভূতিতে আসার মতো একটি বিষয়।

আর এই অনুভূতি বা 'ফিকহে আম' ও 'তাফাক্কুহ' তাদেরই অর্জিত হয়; যারা হয় সাহসী, যাদের থাকে 'দ্বীনি গাইরত' আত্মমর্যাদাবোধ ও 'শরয়ি হায়া' লজ্জাবোধ এবং পরিবেশ ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যাদেরকে কাবু করতে পারে না। এই অনুভূতি বা 'ফিকহে আম' ও 'তাফাক্কুহ'র ত্রিসীমানাও ঘেঁষতে পারে না তারা; যারা হয় ভীতু প্রজাতির, যাদের থাকে না 'দ্বীনি গাইরত' আত্মমর্যাদাবোধ ও 'শরয়ি হায়া' লজ্জাবোধ এবং যারা পরিবেশ ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা আঞ্চলিকতার প্রেমে কাবু হয়ে থাকে।

এই অনুভূতি বা 'ফিকহে আম' ও 'তাফাক্কুহ' তাদেরই অর্জিত হয়; যারা ইলম চর্চা করে সে অনুযায়ী 'আমলি ময়দান'-বাস্তব প্রেক্ষাপটে কার্যকর করার জন্য এবং যাদের ইলম চর্চার সঙ্গে সঙ্গে আমলের প্রতি জযবা তৈরি হয়। এই অনুভূতি বা 'ফিকহে আম' ও 'তাফাক্কুহ' কখনই তাদের অর্জিত হয় না; যারা ইলম চর্চা করে শুধু মুখের ব্যায়াম ও মস্তিষ্কের বিলাসিতার জন্য এবং যারা আমলের প্রতি জযবা তৈরি হওয়ার ভয়ে আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে করতে আবেগ হারিয়ে বসে।

এই অনুভূতি বা 'ফিকহে আম' ও 'তাফাক্কুহ' তাদেরই অর্জিত হয়; যারা "بالليل رهبان وبالنهار فرسان" (রাতের পীর দিনের বীর)। এই অনুভূতি বা 'ফিকহে আম' ও 'তাফাক্কুহ' কখনই তাদের অর্জিত হতে পারে না; যারা 'ফারেস' অশ্বারোহী বীর হওয়া তো দূরের কথা 'ফারাস' অশ্বের হ্রেষাধ্বনি শুনলেও ভূত দেখার মতো চমকে উঠে।

আমাদের মনে রাখা উচিত, যেমনিভাবে শুধু ইফতা বিভাগে কিছু সময় ব্যয় করলেই প্রকৃত 'তাফাক্কুহ' অর্জিত হয় না, তেমনিভাবে শুধু কিতাবের পাতায় 'দাওয়াহ'র পদ্ধতি তালাশ করে দায়ী হওয়া যায় না। বরং প্রকৃত দা'য়ি হতে হলে 'তাগুত' থেকে পালিয়ে, বছরের পর বছর নিজ বাড়ি-ঘর ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পথ-ঘাট-প্রান্তর ও পাহাড়-মরুভূমি চষে বেড়াতে হয় এবং 'গরিব' মুসাফিরের জীবন কাটাতে হয়।

যে সকল কারণে আ'যমি রহ. ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন

ভারতবর্ষ বা আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির সমকালীন ভারতের মতো একটি দাজ্জালি রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম দাবি করে একটি 'মুনকার' পুস্তিকা রচনা করার ক্ষেত্রে আ'যমি রহ. 'তাফাক্কুহ' বা তাঁর সাধারণ নীতি পরিপন্থী যে সকল পন্থা অবলম্বন করায় ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, সেগুলোর কয়েকটি হচ্ছে-

ক) দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে আইম্মায়ে কেরামের মতানৈক্যের বিষয়টি বা প্রণিধানযোগ্য জুমহুরের সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে যাওয়া।

খ) পূর্ববর্তী হানাফি ইমামগণের 'তারজিহ' ও 'তাতবিক'র প্রতি সামান্যতম ভ্রুক্ষেপ না করে শুধুমাত্র ইমাম আবু হানিফার রহ. শর্তের বাহ্যিক শব্দ ও অসম্পূর্ণ বুঝের পেছনে ছুটে চলা।

গ) 'আহকামুল ইসলাম জারি করা' দ্বারা জুমআ, ঈদ আদায় করতে পারা বা ব্যক্তিজীবনে ইসলামের কিছু রীতি-নীতি পালন করতে পারা বুঝা।

ঘ) 'ইমানের দাবিতে প্রাপ্য বা পূর্বের 'আমান' বহাল থাকা' দ্বারা শুধু কাফেরদের থেকে নতুনকরে 'আমান' গ্রহণ করার প্রয়োজন না হওয়াকে বুঝা।

ঙ) ফুকাহায়ে কেরামের ইবারতের একমুখীরও আংশিক অধ্যয়ন এবং তাও যথাযথ উপলব্ধি করতে না পারা।

চ) মাসআলার মূল উৎস ও প্রচলিত উৎসগুলো এড়িয়ে ধার করা সীমিত কিছু উদ্ধৃতিকে কেন্দ্র করে পুরো মাসআলা সমাধানের চেষ্টা করা।

ছ) ভারতবর্ষের ব্যাপারে জুমহুরের সিদ্ধান্তকে খুব ছোটো আকারে দেখিয়ে 'শায' রায়কে খুব বড়ো করে দেখানো। বা বলা যেতে পারে, বর্তমান মিডিয়ার ন্যায় 'তালকে তিল ও তিলকে তাল বানানো'র চেষ্টা করা।

জ) সর্বোপরি নিজের রায়কে চূড়ান্ত পর্যায়ের সঠিক মনে করে অন্যান্য আকাবিরে আসলাফের আলোচনাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা।

আ'যমির রহ. বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির পুস্তিকার ব্যাপারে কেউ এ মন্তব্য করলেও অত্যুক্তি হবে না যে, পুস্তিকার প্রতিটি লাইন পর্যালোচনার দাবি রাখে। তবে আমরা সেদিকে অগ্রসর হয়ে অনর্থক সময় ব্যয় করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি না। এছাড়াও পুস্তিকার বিন্যাস বলতে গেলে জিরোর কোঠায়। না আছে আলোচনার 'তারতিব' বিন্যাস এবং না আছে কথার 'তানসিক' সমন্বয়। তাই পুস্তিকার মৌলিক কিছু বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করেই ইতি টানবো, ইনশাআল্লাহ।

আ'যমি রহ. কর্তৃক দারুল ইসলামের নতুন ভাগের প্রবর্তন

আ'যমি রহ. দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের নতুন এক 'তাকসিম' ভাগের প্রবর্তন করেছেন; হাকিকি দারুল ইসলাম ও হুকমি দারুল ইসলাম, হাকিকি দারুল হারব ও হুকমি দারুল হারব।

এই ভাগের ব্যাপারে দু'টি কথা

ক) তিনিই এই 'তাকসিম' ভাগের প্রবর্তক এবং তিনিই একমাত্র এর প্রবক্তা। আমাদের জানা মতে পূর্ব-পরের কোনো ফকিহ বা আলেম এমন ভাগ করেননি।

খ) এই ভাগের ফলাফল কী? দু'টির মাঝে যদি আহকামের কোনো পার্থক্য না থাকে, তাহলে এই ভাগ অনর্থক। আর যদি পার্থক্য থাকে, তাহলে সেগুলো কী? মূলত ভারতের মতো একটি দাজ্জালি রাষ্ট্রকে সরাসরি দারুল ইসলাম আখ্যা দিতে যে কোনো বিবেকবানের বিবেক বাধা দেয়ার কথা। তাই কিছুটা হালকা করার জন্য এই ভাগের প্রবর্তন।

শুরুতেই মারাত্মক দু'টি পদস্খলন

ক) আমাদের দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পরিচয়ের আলোচনায় 'কাফি'র উদ্ধৃতিতে উল্লিখিত ইবারতটি উল্লেখ করে আ'যমি রহ. বলেন-

وہ اس عبارت میں دار الاسلام ودار الحرب سے دار الاسلام حقیقی ودار الحرب حقیقی مراد لے رہا ہے، اس لئے کہ کوئی ملک محض اتنی بات سے کہ وہاں عظیم الکفار کا حکم جاری ہو جائے اور وہ اس کے تحت تصرف ہو، دار الحرب حکمی نہیں ہو جاتا۔ بلکہ امام محمد کی تصریح کے بموجب اس کے ساتھ تین شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، جیسا کہ آگے مفصل مذکور ہو گا۔ (دار الاسلام اور دار الحرب، ص ١٠)

"তিনি উক্ত ইবারতে দারুল ইসলাম ও দারুল হারব দ্বারা হাকিকি দারুল ইসলাম ও হাকিকি দারুল হারব উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কেননা কোনো রাষ্ট্র শুধুমাত্র কাফের শাসকের আইন-কানুন জারি হওয়া ও তার কর্তৃত্বাধীন হওয়াই হুকমি দারুল হারব হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। **বরং ইমাম মুহাম্মাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য অনুযায়ী তার সঙ্গে তিনটি শর্ত বিদ্যমান থাকা আবশ্যক**। যেমনটি সামনে বিস্তারিত আসবে।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃ: ১০)

ক) ইমাম মুহাম্মাদ কি তিন শর্তের কথা বলেন নাকি শুধু কুফরি আইন-কানুন জারি হলেই তাঁর মতে দারুল হারব হয়ে যায়! নাকি সামনে যেহেতু সাহেবাইনের মতামতকে এড়িয়ে যাওয়া হবে, তাই সূচনাপর্বেই ইমাম মুহাম্মাদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে বিষয়টিকে এমনভাবে উল্লেখ করা হলো, যাতে ভিন্ন কোনো রায় আছে বলে পাঠকের ধারণাই তৈরি না হয়।

খ) একটু সামনে গিয়ে তিনি বলেন-

اس تمہید سے میرا مقصد یہ ہے کہ دار الاسلام اور دار الحرب پر بحث کرنے کے وقت اس تفریق و تقسیم کو ذہن میں رکھنا نہایت ضروری ہے، ہمارے زمانہ کے بعض مفتیوں نے اس کو نظر انداز کر کے سخت غلطی کی ہے۔ (دار الاسلام اور دار الحرب، ص ١١)

"এই ভূমিকা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য, দারুল ইসলাম ও দারুল হারব বিষয়ে আলোচনার সময় এ পার্থক্য ও ভাগ মনে রাখা অত্যন্ত জরুরি। **আমাদের সময়ের কিছু মুফতি তা দৃষ্টির আড়ালে রেখে মারাত্মক ভুল করেছেন।**" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃ: ১১)

এ ভাগকে দৃষ্টির আড়ালে রেখে মারাত্মক ভুল করার যে অভিযোগ তিনি তাঁর সমকালীন কিছু মুফতির ব্যাপারে করেছেন; এই মারাত্মক অপরাধ কি শুধু তাঁর সমকালীন কিছু মুফতির? নাকি তা ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম তহাবি ও ইমাম আবু বকর আলজাসসাসসহ সকল মাযহাবের জুমহুর ফুকাহা ও উলামায়ে কেরামের। সকলেই তো শুধু কুফরি আইন-কানুন জারি হওয়ার মাধ্যমেই দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার কথা বলেছেন।

ফিকহের ইবারত বর্ণনা ও অনুবাদে অসঙ্গতি

এখানে একটি কথা বলে রাখা উচিত। দারুল ইসলাম কখন দারুল হারবে পরিণত হয়; এ ব্যাপারে যদিও পূর্ব-পরের একাধিক হানাফি ফকিহ সাহেবাইনের মতকে প্রধান্য দিয়েছেন (যেমনটি পূর্বে আলোচনা হয়েছে), তবে সাধারণত ফিকহের কিতাবাদিতে মুসান্নিফগণ কোনো মতের পক্ষে নিজেদের ঝোঁক প্রকাশ না করে ইমাম আবু হানিফা ও সাহেবাইনের মতামত উল্লেখ করে উভয় মতের পক্ষে প্রত্যেকে নিজেদের মতো করে কারণ বর্ণনা করেছেন।

এখন কেউ যদি এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মতানৈক্য উল্লেখ না করে এবং ক্ষেত্রবিশেষ ইমাম আবু হানিফারও নাম না নিয়ে ফিকহের বিভিন্ন কিতাব থেকে শুধু শর্তগুলো উল্লেখ করে দেয় বা ক্ষেত্রবিশেষ শর্তগুলোও উল্লেখ না করে শুধু ইমাম আবু হানিফার রহ. মতের পক্ষে পেশ করা নিজের পছন্দসই কারণগুলো উল্লেখ করে দেয়, তাহলে সাধারণ পাঠক এটিই বুঝে নেবে যে, সর্বসম্মতিক্রমে দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়া 'বহুত দূর কি বাত হ্যায়' বা বলতে গেলে দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হতেই পারে না।

এরই বিপরীতে যদি কেউ ফিকহের কিতাবাদি থেকে সাহেবাইনের নাম না নিয়ে শুধু তাঁদের মতটি উল্লেখ করে দেয় বা এ মতের পক্ষে বলা কারণগুলো উল্লেখ করে দেয়, তাহলে সাধারণ পাঠক বুঝে নেবে যে, সর্বসম্মতিক্রমে কুফরি আইন-কানুন জারি হলেই যেকোনো ভূখণ্ড দারুল হারবে পরিণত হয়ে যায়।

দুটিই সত্য গোপন করার মানসিকতা। মুহাদ্দিসে কাবির আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমি রহ. প্রথম কাজটিই করেছেন; যেটি আমরা কখনোই তাঁর মতো ব্যক্তিত্ব থেকে আশা করিনি। فلا حول ولا قوة إلا بالله।

আ'যমি রহ. নিজের দাবি প্রমাণ করতে প্রথমে ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত শর্তগুলো 'ফাতাওয়া হিন্দিয়া' ও 'ফাতাওয়া আযিযি'র সূত্রে উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি তিনটি অসুন্দর কাজ করেছেন-

ক) 'ফাতাওয়া হিন্দিয়া' থেকে শুধু ইমাম আবু হানিফার রহ. মতামত উল্লেখ করেছেন এবং সাহেবাইনের মতের দিকে ইঙ্গিত করারও প্রয়োজন বোধ করেননি। অথচ 'ফাতাওয়া হিন্দিয়া'তে সাহেবাইনের মতামত শুধু উল্লেখই করা হয়নি, বরং সেটিকে প্রাধান্যও দেয়া হয়েছে; যেমনটি আমাদের 'তারজিহ'র আলোচনায় উল্লেখ হয়েছে।

খ) 'ফাতাওয়া হিন্দিয়া'র ইবারত "أحدها إجراء أحكام الكفار على سبيل الاشتهار، وأن لا يحكم فيها بحكم الإسلام" (একটি হচ্ছে, কাফেরদের আইন-কানুন প্রকাশ্যে জারি করা এবং সে ভূখণ্ডে ইসলামি আইন-কানুন অনুযায়ী ফয়সালা না করা) এর স্বাভাবিক অর্থ না করে তিনি"وأن لا يحكم فيها بحكم الإسلام" এর অর্থ করেছেন, "اور اسلام کا حکم بالکل نہ چلے" (এবং ইসলামের হুকুম একেবারেই না চলা)।

আরবি ভাষার সাধারণ বাচনভঙ্গি সম্পর্কেও যাদের অবগতি আছে, তারাও এ বাক্যটির উর্দুতে অনুবাদ করলে এভাবে করবে- "اور اس میں بحکم اسلام فیصلہ نہ کیا جائے" (এবং সে ভূখণ্ডে ইসলামি আইন-কানুন অনুযায়ী ফয়সালা না করা)। কিন্তু বলা যায় তিনি স্বাভাবিক অর্থ থেকে খুব সূক্ষ্মভাবে সরে গিয়েছেন দুটি উদ্দেশ্যে-

একটি হচ্ছে, স্বাভাবিক অর্থ করা হলে 'আহকাম জারি করা' দ্বারা যে আইন-কানুন জারি করা উদ্দেশ্য, শুধু ব্যক্তিজীবনে সালাত-সাওম ইত্যাদি পালন করতে পারাই উদ্দেশ্য নয়; তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। আর তা তাঁর দাবির সম্পূর্ণ বিপরীত।

অপরটি হচ্ছে, তাঁর দাবি অনুযায়ী যেহেতু 'হুকুম' দ্বারা উদ্দেশ্য ব্যক্তিজীবনে ইসলামি বিধি-বিধান মেনে চলতে পারা। তাহলে তিনি যেভাবে অর্থ করেছেন সেটির মর্ম দাঁড়ায়, ব্যক্তিজীবনেও ইসলামি আদেশ-নিষেধ একেবারেই বন্ধ হয়ে যাওয়া। আর এ অর্থের ভিত্তিতে ভারতকে দারুল ইসলাম আখ্যা দেয়া

অস্বাভাবিক সহজ হয়ে গেলো। কেননা ভারতে ব্যক্তিজীবনে ইসলামি আদেশ-নিষেধ পালন করতে পারা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়নি।[৪৪]

গ) 'ফাতাওয়া হিন্দিয়া' থেকে শুধু ইমাম আবু হানিফার রহ. মতামত উল্লেখ করার পর তিনি বলেন-

اور قریب قریب اسی مفہوم کی عبارتیں بلکہ اس سے بھی واضح تر بدائع الصنائع، شرح زیادات للعتابی بحوالہ فتاوی لکھنوی، در مختار مع شامی، الدر المنتقی، فصول استروشنی، جامع الفصولین اور فتاوی بزازیہ میں موجود ہیں۔

ان تمام عبارتوں کا حاصل یہ ہے کہ جو ملک دار الاسلام رہ چکا ہے، اس میں جب تک مذکورہ بالا تینوں شرطیں بیک وقت موجود نہ ہوں گی وہ دار الحرب نہیں بن سکتا، بلکہ وہ دار الاسلام رہیگا۔ (دار الاسلام اور دار الحرب، ص ۱۲)

"এই মর্মার্থের কাছাকাছি ইবারত, বরং তার চেয়েও স্পষ্ট ইবারত বাদায়েউস সানায়ে', ফাতাওয়া লখনবির উদ্ধৃতিতে আত্তাবির শরহে যিয়াদাত, শামির সঙ্গে দুররে মুখতার, আদদুররুল মুনতাকা, ফুসুলে উসতারুশানি (উসরুশানি), জামেউল ফুসুলাইন এবং ফাতাওয়া বাযযাযিয়াতে রয়েছে।

ওই সকল ইবারতের সারাংশ হলো, যে রাষ্ট্র দারুল ইসলাম ছিলো; তাতে যতোক্ষণ পর্যন্ত উপর্যুক্ত তিনটি শর্ত একসঙ্গে পাওয়া যাবে না, তা দারুল হারব হতে পারে না। বরং তা দারুল ইসলাম হিসেবেই বহাল থাকবে।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃ: ১২)

আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির উপরিউক্ত বক্তব্য পড়লে যে কোনো সাধারণ পাঠক এটিই মনে করবে যে, তিন শর্তের উপস্থিতি ব্যতীত দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হতেই পারে না এবং ফিকহের ইবারতে এর কোনো অন্যথা নেই।

---

৪৪. আ'যমি রহ. এর আলোচ্য পুস্তিকার অনুবাদক বাক্যটির অনুবাদ করেছেন, 'এবং ইসলামের হুকুম ও আদেশ-নিষেধ বিলকুল বন্ধ হয়ে যাওয়া'। আবার এ অংশের নিচে দাগও টেনে দিয়েছেন। কেমন জানি তিনি একটি অস্বাভাবিক দলিল হাতে পেয়ে গেছেন।

আফসোস! ফিকহ পড়ুয়া এই ছেলেগুলোর হাতেই যদি ফিকহের ইবারত নিরাপদ না থাকে, তাহলে....................!!!!!!!!!!!!!!!!

কিন্তু বাস্তবতা কি এটিই? তিনি যে কিতাবগুলোর নাম উল্লেখ করেছেন সেগুলোতে কি ভিন্ন কথা নেই?

'বাদায়েউস সানায়ে' ও আত্তাবির 'শারহুয যিয়াদাত'র আলোচনা তো আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। উভয় কিতাবে ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহেবাইনের মতামত শুধু উল্লেখই করা হয়নি, বরং ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত শর্তগুলোর বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে এবং অনেকটা 'তাতবিক'র দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আলা আলহাসকাফির (মৃঃ ১০৮৮ হিঃ) 'আদদুররুল মুখতার' বরং মুহাম্মাদ আততুমুরতাশির (মৃঃ ১০০৪ হিঃ) 'তানবিরুল আবসার' কিতাবে যদিও শুধু শর্ত তিনটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তবে 'রদ্দুল মুহতার' তথা ফাতাওয়া শামিতে উভয় মতামত উল্লেখ করে 'ফাতাওয়া হিন্দিয়া' থেকে সাহেবাইনের মতামতকে প্রাধান্য দেয়ার বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে এবং একটি উদাহরণ পেশ করে ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক শর্তের বাস্তবতা বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

হাঁ! ইবরাহিম আলহালাবির (মৃঃ ৯৫৬ হিঃ) 'মুলতাকাল আবহুর'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ আলা আলহাসকাফির (মৃঃ ১০৮৮ হিঃ) 'আদদুররুল মুনতাকা' কিতাবে শুধু শর্ত তিনটির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও 'মুলতাকাল আবহুর'র আরেকটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ শাইখি যাদার (মৃঃ ১০৭৮ হিঃ) 'মাজমাউল আনহুর' কিতাবে উভয় মতামত উল্লেখ করা হয়েছে। (দেখুনঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত কর্তৃক তিন কিতাবের একসঙ্গে মুদ্রিত কপি, ২/৪৫৫-৪৫৬)

'ফুসুলে উসরুশানি' আমাদের সংগ্রহে নেই এবং সাধ্যানুযায়ী প্রচেষ্টার পরও তা 'মুরাজাআত' করতে পারিনি, তাই সে ব্যাপারে মন্তব্য করতে পারছি না।

'জামেউল ফুসুলাইন' কিতাবে উভয় মতামত উল্লেখ করা হয়েছে এবং উভয় মতামতের কারণও বলা হয়েছে। (দেখুন জামেউল ফুসুলাইন, ১/১৩)

আর 'ফাতাওয়া বাযযাযিয়া'তে শামসুল আইম্মা হালওয়ানির রহ. দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে শর্ত তিনটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (দেখুনঃ বাযযাযিয়া, -হিন্দিয়ার প্বার্শ টীকায়- ৬/৩১২)

তবে যেহেতু শামসুল আইম্মা হালওয়ানি কর্তৃক ইমাম মুহাম্মাদের রহ. 'কিতাবুয যিয়াদাত'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করা প্রমাণিত; তাই এটিই স্বাভাবিক যে, সেখানে উভয় মতামত উল্লেখ হয়েছে। আর 'বাযযাযিয়া'তে সেটিকে শামসুল আইম্মা হালওয়ানির দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে।

আ'যমি রহ. কর্তৃক উদ্ধৃত কিছু ফিকহি ইবারতের পর্যালোচনা

আ'যমি রহ. নিজের দাবিকে আরো পাকাপোক্ত করতে গিয়ে বলেন, "چنانچہ دار الاسلام باقی رہنے کی تصریح شیخ الاسلام اسبیجابی، اور صاحب ملتقط اور استروشنی وغیرہم نے کی ہے" (তেমনিভাবে দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকার ব্যাপারে স্পষ্ট কথা শাইখুল ইসলাম ইসবিজাবি, মুলতাকাত কিতাবের লেখক ও উসতারুশানি প্রমুখ বলেছেন)।

আমরা আ'যমি রহ. কর্তৃক উদ্ধৃত বক্তব্যগুলোর বাস্তবতা বুঝার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ। তবে পেছনের দু'টি বিষয় আমাদের স্মরণে রাখা জরুরি; এক. ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত শর্তগুলোর বাস্তবতা, যা বিশেষভাবে 'তাতবিক'র আলোচনায় উল্লেখ হয়েছে। দুই. আ'যমি রহ. কর্তৃক মতানৈক্য তো নয়ই, বরং শর্তগুলোও উল্লেখ না করে শুধু শর্তের পক্ষে বলা কারণটি উল্লেখ করে দেয়া।

ইসবিজাবির বক্তব্য

'ফুসুলে উসরুশানি'র সূত্রে শাইখুল ইসলাম আলি ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আলইসবিজাবির (মৃ: ৫৩৫ হি:) বক্তব্য উল্লেখ করতে গিয়ে আ'যমি রহ. বলেন-

اسبیجابی فرماتے ہیں:

إن دار الإسلام محكومة بكونها دار الإسلام، فيبقى هذا الحكم ببقاء حكم واحد فيها.

(دار الاسلام اور دار الحرب، ص ۱۳)

"ইসবিজাবি বলেন, দারুল ইসলামের ব্যাপারে যেহেতু এ হুকুম যে সেটি দারুল ইসলাম। সুতরাং একটি বিধান অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত এই হুকুমটি বহাল থাকবে।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃ: ১৩)

বক্তব্যের পর্যালোচনা

শাইখুল ইসলাম ইসবিজাবির এতোটুকু বক্তব্যের ফলাফল দাঁড়াবে, কোনো দারুল ইসলাম কাফেরদের কর্তৃত্বাধীন হওয়ার পর উদাহরণস্বরূপ যদি তাতে মুসলমানদের শুধু নিজেদের স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করার অনুমতি থাকে, এর বাইরে সালাত-সাওমসহ ব্যক্তিজীবনের কোনো বিধি-নিষেধ পালনের অনুমতি না থাকে; তবুও তা দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকবে। কেননা শুধু নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করতে পারা এবং পর-নারীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত না হওয়া ইসলামের একটি হুকুম। সুতরাং এই একটি বিধান অবশিষ্ট থাকলেই তা দারুল ইসলাম হিসেবে পরিগণিত হবে।

আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির বক্তব্যটির বাহ্যিক মর্ম খুব পছন্দ হয়েছে এবং বারবারই এ কথা বলেছেন যে, ফুকাহায়ে কেরামের ইবারত দ্বারা প্রমাণিত; 'একটি হুকুম অবশিষ্ট থাকলেও দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হবে না'। তিনি তাঁর দাবি প্রমাণে এতোটাই বিভোর ছিলেন যে, এমন একটি "ظاهر البطلان" স্পষ্টতই বাতিল বাহ্যিক মর্মকে দলিল হিসেবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সামান্যতম দ্বিধান্বিত হননি।

শাইখুল ইসলাম ইসবিজাবি কি বাস্তবেই এমন একটি স্পষ্টতই বাতিল মর্ম বুঝাতে চেয়েছেন। মূল উৎসে বক্তব্যটি দেখা গেলে বাস্তবতা বুঝতে সহজ হতো। তবে আমরা 'ফুসুলে ইমাদি', 'খিযানাতুল মুফতিন' ও 'হাশিয়াতুত তহতাবি আলাদ দুররিল মুখতার'র সূত্রে শাইখুল ইসলাম ইসবিজাবির পূর্ণ বক্তব্যটি উল্লেখ করছি; আশা করি বাস্তবতা বুঝতে কিছুটা সহজ হবে-

وذكر شيخ الإسلام الإسبيجابي في مبسوطه: أن دار الإسلام محكومة بكونها دار الإسلام، فيبقى هذا الحكم ببقاء حكم واحد فيها، ولا تصير دار الإسلام دار الحرب إلا بعد زوال القرائن، ودار الحرب تصير دار الإسلام بزوال بعض القرائن، وهو أن تجري فيها أحكام أهل الإسلام، فما بقي علقة من علائق الإسلام يترجح جانب الإسلام.[৪৫]

---

৪৫. দাগটানা অংশটি শুধু 'খিযানাতুল মুফতিন' কিতাবে আছে, অন্যান্য উদ্ধৃতিতে অংশটি নেই।

(الفصول العمادية لعبد الرحيم بن عماد الدين المرغيناني[٤٦] المتوفي بعد ٦٥١هـ - المخطوطة- الفصل الأول، صـ١٠، خزانة المفتين -المخطوطة- كتاب السير، صـ١٢٩، حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الجهاد، باب المستأمن، فصل في استئمان الكافر، ٢/٤٦١)

"শাইখুল ইসলাম আলইসবিজাবি তাঁর 'মাবসুত' কিতাবে বলেন, দারুল ইসলামের ব্যাপারে যেহেতু এ হুকুম যে সেটি দারুল ইসলাম। সুতরাং একটি বিধান অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত এই হুকুমটি বহাল থাকবে। এবং দারুল ইসলামের 'কারিনা' লক্ষণগুলো বিলুপ্ত হওয়া ব্যতীত তা দারুল হারবে পরিণত হয় না। বিপরীতে দারুল হারবের আংশিক লক্ষণ বিলুপ্ত হলেই তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যায়; আর তা হচ্ছে, সেখানে মুসলমানদের আইন-কানুন জারি হওয়া। সুতরাং ইসলামসম্পৃক্ত কোনো সম্বন্ধ অবশিষ্ট থাকলে ইসলামের দিকটিই প্রাধান্য পাবে।" (ফুসুলে ইমাদি -পাণ্ডুলিপি-, পৃ: ১০, খিযানাতুল মুফতিন -পাণ্ডুলিপি-, পৃ: ১২৯, হাশিয়াতুত তহতাবি আলাদ দুররিল মুখতার, ২/৪৬১)

শাইখুল ইসলাম ইসবিজাবির পূর্ণ বক্তব্য সামনে আসার পর বলা যেতে পারে যে, তিনি ভিন্ন কিছু বলেননি। বলা যায়, তিনিও ইমাম আবু হানিফার রহ. মতের কারণ বর্ণনা করতে সারখসি, কাযি খান ও বুরহানুদ্দিন আলবুখারি প্রমুখগণ যে বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, তার কাছাকাছি কথাই বলেছেন। অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত শর্তগুলোর উপস্থিতিতে কুফরের পূর্ণমাত্রায় দাপট প্রতিষ্ঠা হয়ে মুসলমানদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিঃশেষ হওয়া সাব্যস্ত হয়, আর কোনো একটির অনুপস্থিতিতে মুসলমানদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকার লক্ষণ বুঝে আসে। তাই সাময়িক সময়ের জন্য সেটিকে দারুল ইসলামের বহির্ভূত বলার প্রয়োজন নেই।

---

৪৬. আলমাকতাবাতুল আযহারিয়্যাহ কর্তৃক ইন্টারনেটে আপলোড করা এই কিতাবের পাণ্ডুলিপির প্রচ্ছদে লেখকের নাম দেয়া হয়েছে, 'মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুসতফা (আবুস সাউদ আলইমাদি)।' এটি স্পষ্টতই ভুল। 'ফুসুলি ইমাদি'র লেখক হচ্ছেন আব্দুর রহিম ইবনে ইমাদুদ্দিন আলমারগিনানি, যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি। আর আবুস সাউদ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুসতফা আলইমাদি; তিনিও একজন হানাফি ফকিহ ও প্রসিদ্ধ মুফাসসির। তাঁর মৃত্যু ৯৮২ হিজরিতে।

কারণ, ইসবিজাবি রহ. আংশিক 'কারিনা' লক্ষণ নির্ধারণ করেছেন 'ইসলামি আইন-কানুন জারি হওয়া'কে। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে, 'কারায়েন' লক্ষণগুলো বলে তিনি ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক শর্তগুলোর দিকেই ইঙ্গিত করেছেন এবং তা থেকে একটিরও অনুপস্থিতিতে দারুল ইসলামের লক্ষণগুলো নিঃশেষ না হওয়ার কথা বলেছেন। আর 'একটি হুকুম' বা 'একটি আলাকা' সম্বন্ধ বলে তিনি মূলত এটিই বুঝাতে চেয়েছেন। অন্যথায় তাঁর কথা স্পষ্টতই বাতিল হওয়া আবশ্যক হবে।

সাহেবে মুলতাকাতের বক্তব্য

'ফুসুলে উসরুশানি'র সূত্রে নাসিরুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আসসামারকান্দির (মৃঃ ৫৫৬ হিঃ) বক্তব্য উল্লেখ করতে গিয়ে আ'যমি রহ. বলেন-

اور صاحب ملتقط فرماتے ہیں:

إن البلاد التي في أيدي الكفار لا شك أنها بلاد الإسلام لا بلاد الحرب، لأنها غير متاخمة لبلاد الحرب، ولأنهم لم يظهروا فيها أحكام الكفار. (دار الاسلام اور دار الحرب، ص ۱۳)

"যে সকল অঞ্চল কাফেরদের দখলে রয়েছে, নিঃসন্দেহে সেগুলো দারুল ইসলাম, দারুল হারব নয়। কেননা সেগুলো দারুল হারব সংলগ্ন নয় এবং তারা তাতে কাফেরদের আইন-কানুন প্রকাশ করেনি।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃঃ ১৩)

বক্তব্যের পর্যালোচনা

নাসিরুদ্দিন সামারকান্দির বক্তব্যটি আমরা আমাদের রচনার শুরুর দিকে 'আহকামুল ইসলাম ও আহকামুল কুফর'র ব্যাখ্যায় মূল কিতাব 'মুলতাকাত' থেকেই উল্লেখ করেছি। তবে আ'যমি রহ. 'মুলতাকাত'র ইবারতের শেষাংশ "بل القضاة مسلمون" (বরং বিচারকরা মুসলমান) ইচ্ছাকৃতই বাদ দিয়েছেন নাকি 'ফুসুলে উসরুশানি'তে তা উল্লেখ হয়নি; বলতে পারছি না।

নাসিরুদ্দিন সামারকান্দির বক্তব্যটি আ'যমি রহ. বুঝে-শুনেই উল্লেখ করেছেন কি না! অন্যথায় এ বক্তব্য তাঁর বিপরীত মত প্রমাণ করে। কারণ, এ বক্তব্য দ্বারা জুমহুর উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্তই সমর্থিত হলো যে, 'দার'র

পরিচয়ের সম্পর্ক আইন-কানুনের সঙ্গে। এ জন্যই তো কাফেরদের কর্তৃত্বাধীন থাকা সত্ত্বেও যেহেতু তারা তাদের আইন-কানুন জারি করেনি এবং মুসলমান বিচারকরা ইসলামি আইনে ফয়সালা করে চলছে, তাই তা দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল আছে।

সঙ্গে সঙ্গে এটিও স্পষ্ট যে, নাসিরুদ্দিন সামারকান্দি ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহেবাইন; সকলের মতের প্রতি লক্ষ্য রেখেই কারণ বর্ণনা করেছেন। অন্যথায় শুধু 'সেগুলো দারুল হারব সংলগ্ন নয়' বলাই যথেষ্ট ছিলো। কারণ, এতোটুকু হলেও ইমাম আবু হানিফার রহ. মতে তা দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকে। কিন্তু নাসিরুদ্দিন সামারকান্দি 'এবং তারা তাতে কাফেরদের আইন-কানুন প্রকাশ করেনি বরং বিচারকরা মুসলমান' বলে সকলের মতে এ অঞ্চলগুলো দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকার প্রতি ইঙ্গিত করে দিয়েছেন।

এর দ্বারা এ বাস্তবতাও আমাদের সামনে এসে গেছে যে, যখন মুসলমানদের খিলাফত ব্যবস্থা শক্তিশালী বা মুসলমানদের ক্ষমতা ও দাপট বিদ্যমান ছিলো, তখন কোনো অঞ্চলের মুসলমানরা মুরতাদ হয়ে বা কাফেররা চুক্তিভঙ্গ করে অথবা অন্য কোনো দারুল হারবের কাফেররা তা দখল করে নিলেও তাদের আইন-কানুন জারি করার সাহস পেতো না। বিশেষকরে যখন তা দারুল ইসলাম কর্তৃক বেষ্টিত হতো বা মুসলমানদের 'আমান' সাধারণত বহাল থাকতো। ফলে তা সকলের দৃষ্টিতে দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত থাকতো এবং মতানৈক্যের কারণে ফলাফলের খুব একটা দূরত্ব হতো না।

কিন্তু যখন মুসলমানদের খিলাফত ব্যবস্থা ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে বা নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং মুসলমানদের ক্ষমতা ও দাপট বিলুপ্তপ্রায় হয়ে পড়েছে, তখন আর পূর্বের অবস্থা বাকি থাকেনি। বরং তারা কোনো অঞ্চল দখল করলেই তাতে তাদের আইন-কানুন জারি করে দিয়েছে। তখন শুধু কথিত মুসলিম রাষ্ট্র কর্তৃক বেষ্টিত হওয়া বা অলীক 'আমান'র ধুয়ো তুলে ইমাম আবু হানিফার রহ. শর্তের বাহ্যিক শব্দের পেছনে ছুটে চলা গবেষকের কাজ হতে পারে না। আমাদের রচনার শুরুতে 'তাতবিক'র আলোচনা যাদের স্মরণে আছে, আশা করি তাদের নিকট বিষয়টি একেবারেই স্পষ্ট।

উসরুশানির বক্তব্য

'ফুসুলে উসরুশানি' থেকে মাজদুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ ইবনে হুসাইন আলউসরুশানির (মৃ: ৬৩২ হি:) বক্তব্য উল্লেখ করতে গিয়ে আ'যমি রহ. বলেন-

اور استروشنی لکھتے ہیں:

وأبو حنيفة يقول: إن هذه البلدة صارت دار الإسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها، فما بقي شيء من أحكام الإسلام فيها تبقى دار الإسلام. (دار الاسلام اور دار الحرب، ص ١٣)

"উসতারুশানি লিখছেন, এবং আবু হানিফা বলেন, এই অঞ্চলগুলো দারুল ইসলামে পরিণত হয়েছে সেগুলোতে ইসলামি আইন-কানুন জারি করার মাধ্যমে। সুতরাং তাতে ইসলামি আইন-কানুনের কিছু একটা অবশিষ্ট থাকলে তা দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকবে।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃ: ১৩)

বক্তব্যের পর্যালোচনা

'ফুসুলে উসরুশানি' সামনে থাকলে বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারা সহজ হতো। আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির বর্ণনার উপর নির্ভর করা দুষ্কর। যা হোক, এই বক্তব্যের ব্যাপারে আমাদের দু'টি কথা-

ক) মাজদুদ্দিন উসরুশানি রহ. যদি ইমাম আবু হানিফার রহ. দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে এভাবে বলে থাকেন, তাহলে তা যথাযথ হয়নি। কেননা ইমাম আবু হানিফার রহ. বক্তব্যের মূল উৎসগুলোতে কেউ এভাবে তা উল্লেখ করেনি। বরং শর্তগুলো উল্লেখ করে প্রত্যেকে প্রত্যেকের মতো করে কারণ বর্ণনা করেছেন। হাঁ! হতে পারে অন্যান্যরা যেভাবে কারণ উল্লেখ করেছেন, তিনিও সেটিই এ আঙ্গিকে প্রকাশ করেছেন।

খ) উসরুশানির বক্তব্যের ব্যাখ্যাও তাই যা আমরা শাইখুল ইসলাম ইসবিজাবির বক্তব্যের ব্যাখ্যায় বিশ্লেষণ করেছি। অন্যথায় উসরুশানির কথা স্পষ্টতই বাতিল হওয়া আবশ্যক হবে।

জামেউল ফুসুলাইনের বক্তব্য

'জামেউল ফুসুলাইন' থেকে ইবনে কাযি সামাওয়ানার (মৃ: ৮২৩ হি:) বক্তব্য উল্লেখ করতে গিয়ে আ'যমি রহ. বলেন-

اور جامع الفصولین میں ہے:

فما بقي شيء من أحكامه وآثاره تبقى دار الإسلام. (دار الاسلام اور دار الحرب، ص ۱۳)

"সুতরাং যতোক্ষণ ইসলামের বিধি-বিধান ও নিদর্শন থেকে কিছু একটা অবশিষ্ট থাকবে, তা দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকবে।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃ: ১৩)

বক্তব্যের পর্যালোচনা

'জামেউল ফুসুলাইন' সামনে থাকা সত্ত্বেও আ'যমি রহ. যথারীতি শুধু ইমাম আবু হানিফার রহ. শর্তের কারণ হিসেবে বলা অংশেরও আংশিক উল্লেখ করেছেন। অথচ ইবনে কাযি সামাওয়ানা রহ. প্রথমে ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহেবাইন; সকলের মতামত উল্লেখ করার পর নিজের মতো করে উভয় মতের কারণ বর্ণনা করেছেন। প্রথমে সাহেবাইন ও পরে আবু হানিফার রহ. মতের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন-

لأن دار الحرب تصير دار الإسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها، ولو بقي فيها كافر أصلي ولم تكن متصلة بدار الحرب بأن كان بينهما مصر لأهل الحرب، فكذا عكسه، اعتباراً لإحداهما بالأخرى.

وله: أن الحكم إذا ثبت بعلة فما بقي شيء من العلة يبقى الحكم ببقاءه، فلما صارت البلدة دار الإسلام بإجراء أحكامه، فما بقي شيء من أحكامه وآثاره تبقى دار الإسلام.

(جامع الفصولين لابن قاضي سماونة، الفصل الأول، ١/١٣)

"(শুধু কুফরি আইন-কানুন জারি করলেই দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হয়ে যায়) কেননা দারুল হারব দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যায় তাতে ইসলামি আইন-কানুন জারি করার মাধ্যমে; যদিও তাতে আদিবাসী কাফেরের অবস্থান থাকে এবং তা দারুল ইসলাম সংলগ্ন নাও হয়, বরং সেটির মাঝে এবং অন্য দারুল ইসলামের মাঝে হারবিদের অঞ্চল থাকে। সুতরাং একটির বিবেচনায় অপরটির ক্ষেত্রেও একই রীতি প্রযোজ্য হবে (অর্থাৎ শুধু কুফরি আইন-কানুন জারি করলেই দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হয়ে যাবে, দারুল হারব সংলগ্ন হোক বা না হোক, পূর্বের 'আমান' বাকি থাকুক বা না থাকুক)।

ইমাম আবু হানিফার রহ. মতের কারণ হলো, হুকুম যখন কোনো 'ইল্লাত' কারণের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়; তো যতোক্ষণ সে 'ইল্লাত'র কিছু একটা অবশিষ্ট থাকে, তা অবশিষ্ট থাকায় হুকুমও বাকি থাকে। তো যেহেতু এই অঞ্চলটি ইসলামি আইন-কানুন জারি করায় দারুল ইসলামে পরিণত হয়েছে, সুতরাং যতোক্ষণ ইসলামের বিধি-বিধান ও নিদর্শন থেকে কিছু একটা অবশিষ্ট থাকবে, তা দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকবে।" (জামেউল ফুসুলাইন, ১/১৩)

পূর্ণ বক্তব্য সামনে আসার পর এখন আমরা বলতে পারি যে, ইবনে কাযি সামাওয়ানার কথার ব্যাখ্যাও তাই যা আমরা শাইখুল ইসলাম ইসবিজাবির কথার ব্যাখ্যায় বিস্তারিত উল্লেখ করেছি।

এখানে সূক্ষ্ম একটি বিষয় আমাদের বুঝা উচিত, ইসবিজাবি, উসরুশানি ও ইবনে কাযি সামাওয়ানা যে শব্দে কারণ বর্ণনা করেছেন, যদি তার বাহ্যিক অর্থই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক সাধারণ ধারণার বাইরে এতো গভীর থেকে তিনটি শর্ত আরোপ করার কী প্রয়োজন ছিলো? একটি কথাই যথেষ্ট ছিলো যে, দারুল ইসলাম দারুল হারব হতে হলে সেটির সমস্ত বিধি-বিধান বিলুপ্ত হতে হবে বা ইসলামের একটি বিধানও অবশিষ্ট থাকলে তা দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকবে। কিন্তু তিনটি শর্ত আরোপ করা এবং সেগুলোর বাস্তবতার আলোকেই বুঝা যাচ্ছে, এখানে উদ্দেশ্য মুসলমানদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকা এবং কর্তৃত্ব ও দাপট বহাল থাকার প্রতি ইঙ্গিত করা। যেটি জাসসাস, সারাখসি, আত্তাবি, কাসানি, কাযি খান ও বুরহানুদ্দিন বুখারি প্রমুখ যথাযথ অনুধাবন করে ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত শর্তের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁদের বক্তব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমনটি পূর্বে 'তাতবিক'র আলোচনায় উল্লেখ হয়েছে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, ইসবিজাবি, উসরুশানি ও ইবনে কাযি সামাওয়ানা প্রমুখ কর্তৃক কারণ বর্ণনার ক্ষেত্রে শব্দ চয়ন যথাযথ হয়নি। যদিও বলা যায়, মূল উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে কোনো ব্যবধান নেই।

শারহু সিয়ারিল আসলের বক্তব্য

'ফাতাওয়া আব্দুল হাই'র সূত্রে 'খিযানাতুল মুফতিন' থেকে 'শারহু সিয়ারিল আসল'র বক্তব্য উল্লেখ করতে গিয়ে আ'যমি রহ. বলেন-

نیز صاحب خزانۃ المفتین نے شرح سیر الاصل کے حوالہ سے لکھا ہے:

ودار الحرب تصير دار الإسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها، وإن زال غلبة أهل الإسلام.

(دار الاسلام اور دار الحرب، ص ۱۴)

“খিযানাতুল মুফতিন’র লেখক ‘শরহে সিয়ারুল আসল’র উদ্ধৃতিতে লিখেছেন, ইসলামি আইন-কানুন জারি করলেই দারুল হারব দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যায়; যদিও মুসলমানদের কর্তৃত্ব শেষ হয়ে যায়।” (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃ: ১৪)

বক্তব্যের পর্যালোচনা

আ’যমি রহ. বক্তব্যটি তাঁর পুস্তিকার ২৪ নম্বর পৃষ্ঠাতেও ‘খিযানাতুল মুফতিন’র উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি প্রথমে আবু হানিফা রহ. কর্তৃক শর্তগুলো উল্লেখ করার পর শূন্যস্থান রেখে পরবর্তীতে এখানে উল্লেখকৃত অংশটি উল্লেখ করেছেন। ‘ফাতাওয়া আব্দুল হাই’তে মূলত শূন্যস্থানে সাহেবাইনের মতের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু আ’যমি রহ. যথারীতি এখানেও সাহেবাইনের মতকে এড়িয়ে গেছেন।

যা হোক, এ ছিলো ‘ফাতাওয়া আব্দুল হাই’ থেকে ইবারত বর্ণনার ক্ষেত্রে অসঙ্গতি। বাকি ‘খিযানাতুল মুফতিন’ থেকে বর্ণনার ক্ষেত্রে যে ভুল স্বয়ং ‘ফাতাওয়া আব্দুল হাই’তে হয়েছে, তা তো এখানে থাকবেই।

এখানে উদ্ধৃত অংশটুকুর উপর সামান্য বিবেক খরচ করলেও বুঝা যায় যে, এ ইবারত বর্ণনায় কোনো সমস্যা হয়েছে। কেননা যে ভূখণ্ড এতোদিন দারুল হারব; মুসলমানদের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাতে ইসলামি আইন-কানুন জারি করার কথা বলা কি একেবারেই অযৌক্তিক নয়? এখানে মূলত এক-দেড় লাইনের মতো ইবারত বাদ পড়েছে। আ’যমি রহ. মূল ইবারত পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলে কিন্তু নিজের বুঝ অনুযায়ী দলিলকে আরো মজবুত করতে পারতেন। আমরা ‘খিযানাতুল মুফতিন’ থেকে পূর্ণ বক্তব্যটি তুলে দিচ্ছি। আর ‘খিযানাতুল মুফতিন’ কিতাবে ‘শারহু সিয়ারিল আসল’র পরিবর্তে ‘শারহুল আসল’ বলা হয়েছে।

হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন আসসামানকানি (মৃ: ৭৪৬ হি:) তাঁর ‘খিযানাতুল মুফতিন’ কিতাবে প্রথমে ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক

আরোপিত শর্তগুলো উল্লেখ করেছেন। অতঃপর সাহেবাইনের মতামত উল্লেখ করার পর বলেন-

ودار الحرب تصير دار الإسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها، وإن يبقى فيها كافر أصلي أو لم يكن متصلة بدار الإسلام بأن كان بينها وبين دار الإسلام مصر آخر لأهل الحرب. ودار الإسلام لا تصير دار الحرب إذا بقي شيء من أحكام أهل الإسلام، وإن زال غلبة أهل الإسلام. كذا في شرح الأصل. (خزانة المفتين لحسين بن محمد بن حسين السَمَنْقاني - المخطوطة- كتاب السير، ص١٢٩)

"দারুল হারব দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যায় তাতে ইসলামি আইন-কানুন জারি করার মাধ্যমে; যদিও তাতে আদিবাসী কাফেরের অবস্থান থাকে বা তা দারুল ইসলাম সংলগ্ন না হয়, বরং সেটির মাঝে এবং দারুল ইসলামের মাঝে হারবিদের অন্য অঞ্চল থাকে। আর মুসলমানদের কোনো বিধান অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হয় না, যদিও মুসলমানদের কর্তৃত্ব শেষ হয়ে যায়।" (খিযানাতুল মুফতিন -পাণ্ডুলিপি-, পৃ: ১২৯)

বাকি এ বক্তব্যের ব্যাপারেও আমাদের মন্তব্য তাই, যা আমরা ইসবিজাবি, উসরুশানি ও ইবনে কাযি সামাওয়ানার বক্তব্যের ব্যাখ্যায় বলে এসেছি।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়; এ সকল ফকিহের কারণ বর্ণনার প্রয়োগধারা কিন্তু প্রায় একই। মূল উৎস সামনে থাকলে হয়তো দেখা যেতো, একজনের কথাই সকলে বর্ণনা করছেন, অথবা একজনের অনুসরণে অপরজন বলে চলছেন।

শাহজাহানপুরির ব্যাপারে আ'যমির মন্তব্য

আ'যমি রহ. পূর্বোক্ত বক্তব্যগুলো উল্লেখ করে নিজের অসঙ্গত বর্ণনা ও বুঝের উপর নির্ভর করেই মুফতি মাহদি হাসান শাহজাহানপুরির (মৃ: ১৩৯৬ হি:) ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন-

پس جن لوگوں نے (جیسے مفتی مہدی حسن صاحب شاہجہاں پوری نے) کلیۃً اقتدار اعلی کو مدار حکم بنا کر یہ لکھ دیا کہ جن بلاد میں اقتدار اعلی کفار کے ہاتھ میں ہو، وہ بلاد دار الحرب ہیں، انہوں نے صریح غلطی کی ہے۔ (دار الاسلام اور دار الحرب، ص ۱۴)

"সুতরাং যারা (যেমন মুফতি মাহদি হাসান সাহেব শাহজাহানপুরি) পূর্ণমাত্রায় সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে হুকুমের ভিত্তি বানিয়ে এটি লিখে দিয়েছেন যে, 'যে সকল রাষ্ট্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতা কাফেরদের হাতে তা দারুল হারব', তারা সুস্পষ্ট ভুল করেছেন।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃ: ১৪)

মন্তব্যের পর্যালোচনা

আ'যমি রহ. মুফতি মাহদি হাসান শাহজাহানপুরির রহ. ব্যাপারে এ মন্তব্য করে নিজের ইতিহাস ও 'আহওয়াল' পরিস্থিতির ব্যাপারে অবগত না থাকার পরিচয় দিয়েছেন এবং আলোচ্য মাসআলায় মুফতি মাহদি হাসান শাহজাহানপুরির 'তাফাক্কুহ', সূক্ষ্মদৃষ্টি ও পরিস্থিতির ব্যাপারে সচেতনতা আঁচ করতে পারেননি।

আ'যমি রহ. যখন ফিকহের ইবারতে কোনো দারুল ইসলাম কাফেরদের দখলে আসা সত্ত্বেও মুসলিম বিচারকগণ ইসলামি আইন-কানুন জারি রাখায় তা দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকার কথা দেখেছেন, তখন ফিকহি ইবারতের বাস্তবতা এবং পরিস্থিতির ব্যবধানের বিষয়টি উপলব্ধি না করায় মুফতি মাহদি হাসান শাহজাহানপুরি রহ. প্রমুখ কর্তৃক সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে ভিত্তি বানানো তাঁর নিকট সুস্পষ্ট ভুল মনে হয়েছে।

অথচ আমরা পূর্বেই বলে এসেছি যে, যখন মুসলমানদের খিলাফত ব্যবস্থা শক্তিশালী বা মুসলমানদের ক্ষমতা ও দাপট বিদ্যমান ছিলো, তখন কোনো অঞ্চলের মুসলমানরা মুরতাদ হয়ে বা কাফেররা চুক্তিভঙ্গ করে অথবা অন্য কোনো দারুল হারবের কাফেররা তা দখল করে নিলেও তাদের আইন-কানুন জারি করার সাহস পেতো না। সে প্রেক্ষিতেই ফুকাহায়ে কেরাম মাসআলা বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু যখন মুসলমানদের খিলাফত ব্যবস্থা ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে বা নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং মুসলমানদের ক্ষমতা ও দাপট বিলুপ্তপ্রায় হয়ে পড়েছে, তখন আর পূর্বের অবস্থা বাকি থাকেনি। বরং তারা কোনো অঞ্চল দখল করলেই তাতে তাদের আইন-কানুন জারি করে দিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে ভিত্তি বানানো শতভাগ যথার্থ।

এ বিন্দুতে এসে মুফতি মাহদি হাসান শাহজাহানপুরি রহ. যে 'তাফাক্কুহ' ও সূক্ষ্মতার পরিচয় দিয়েছেন, তা আ'যমি রহ. অনুধাবন করতে পারেননি।

শাহজাহানপুরির সমকালীন প্রেক্ষাপটে কাফেরদের হাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকাকে দারুল হারবের পরিচয় হিসেবে উল্লেখ করা হুবহু প্রণিধানযোগ্য তথা সাহেবাইন ও জুমহুর উলামায়ে কেরামের রায়। এতে ভুলের লেশমাত্রও নেই। বরং সুস্পষ্ট অসঙ্গতি আ'যমি রহ. এর বক্তব্যে রয়েছে।

আ'যমি রহ. কর্তৃক উদ্ধৃত আরো কিছু ফিকহি ইবারতের পর্যালোচনা

আমরা পূর্বেও বলেছি, আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির পুস্তিকার বিন্যাস বলতে গেলে জিরোর কোঠায়। তিনি তাঁর দাবির পক্ষে বিক্ষিপ্তভাবে আরো কিছু ফিকহি ইবারত উল্লেখ করেছেন। আমরা সেগুলোর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পেশ করছি।

ফাতাওয়া বাযযাযিয়ার বক্তব্য

পূর্বের উদ্ধৃতিগুলো পেশ করে মুফতি মাহদি হাসান শাহজাহানপুরির উপর আপত্তি করার পর 'ফাতাওয়া বাযযাযিয়া' থেকে একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করতে গিয়ে আ'যমি রহ. বলেন-

اسی طرح ان عبارات میں سے دو میں بصراحت یہ مذکور ہے کہ جو بلاد اسلام کفار کے قبضہ میں چلے گئے ہیں، ان میں جب تک ایک حکم اسلام بھی باقی رہے گا اس وقت تک وہ دار الحرب نہیں ہو سکتے، اور بعینہ یہی بات صراحت کے ساتھ بزازیہ میں بھی مذکور ہے:

وأما البلاد التي عليها ولاة كفار فيجوز فيها (أيضاً) إقامة الجمع والأعياد، والقاضي قاض بتراضي المسلمين ...... وقد تقرر أن ببقاء شيء من العلة يبقى الحكم. (دار الاسلام اور دار الحرب، ص ۱۴-۱۵)

"তেমনিভাবে উপর্যুক্ত ইবারত থেকে দু'টি ইবারতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, যে সকল ইসলামি ভূখণ্ড কাফেরদের কর্তৃত্বাধীন হয়ে গেছে, সেগুলোতে যতোক্ষণ পর্যন্ত একটি ইসলামি বিধানও অবশিষ্ট থাকবে, তা দারুল হারব হতে পারে না। আর হুবহু এ কথাটিই সুস্পষ্টভাবে বাযযাযিয়াতে উল্লেখ হয়েছে-

এবং যে সকল অঞ্চলে কাফের শাসক রয়েছে, তাতেও জুমআ, ঈদ আদায় করা জায়েয আছে। যেহেতু বিচারক মুসলমানদের সন্তুষ্টিক্রমেই বিচারক ......। আর এটি স্বীকৃত কথা যে, 'ইল্লাত' কারণের কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকলে হুকুমও বিদ্যমান থাকে।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃঃ ১৪-১৫)

বক্তব্যের পর্যালোচনা

আ'যমি রহ. 'বাযযাযিয়া'র পূর্ণ বক্তব্যটি তাঁর পুস্তিকার ২৫ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। 'ফাতাওয়া বাযযাযিয়া'তে মূলত বক্তব্যটি 'মুলতাকাত' থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। 'মুলতাকাত'র বক্তব্য পূর্বেও উল্লেখ হয়েছে, 'যে সকল অঞ্চল কাফেরদের দখলে রয়েছে, নিঃসন্দেহে সেগুলো দারুল ইসলাম, দারুল হারব নয়। কেননা সেগুলো দারুল হারব সংলগ্ন নয় এবং তারা তাতে কাফেরদের আইন-কানুন প্রকাশ করেনি, বরং বিচারকরা মুসলমান।'

অতঃপর 'মুলতাকাত' কিতাবে কিছু মাসআলার আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলো 'বাযযাযিয়া'তেও উল্লেখ হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, 'যে সকল অঞ্চলে কাফেরদের পক্ষ হতে মুসলমান শাসক থাকে, সেখানে মুসলমানের কর্তৃত্ব বিদ্যমান থাকায় তাতে জুমআ, ঈদ আদায় করা, 'খারাজ' গ্রহণ করা, বিচারকদের অনুসরণ করা ও বিধবাদের বিয়ে দেয়া জায়েয আছে।'

আরেকটি মাসআলা হচ্ছে, যা আ'যমি রহ. এখানে উল্লেখ করেছেন। এবং এ মাসআলার শেষে আছে, 'মুসলমানদের জন্য একজন মুসলিম শাসক অনুসন্ধান করে নেয়া আবশ্যক।' (দেখুনঃ আলমুলতাকাত পৃঃ ২৫৫, বাযযাযিয়া, -হিন্দিয়ার পার্শ্ব টীকা- ৬/৩১১)।

ইবনুল বাযযায আলকারদারি রহ. 'মুলতাকাত' থেকে বিভিন্ন মাসআলা ও প্রাসঙ্গিক কথা উল্লেখ করার পর 'ফাতাওয়া বাযযাযিয়া'তে "وقد تقرر...." কথাটি উল্লেখ করেছেন। তো এটিই প্রকাশ্য যে, তিনি মূল মাসআলা তথা কাফেরদের দখলে থাকা সত্ত্বেও দারুল হারব সংলগ্ন না হওয়ায় এবং কাফেররা তাতে আইন-কানুন প্রকাশ না করায়, বরং বিচারকরা মুসলমান থাকায় তা দারুল ইসলাম হিসেবে বিদ্যমান থাকার কারণ বর্ণনা করেছেন। সুতরাং বলা যায় তিনি "شيء من العلة" বলে এ বিষয়গুলো বুঝাতে চেয়েছেন যা মুসলমানদের দাপট ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দিকে ইঙ্গিত বহন করে। যেমনটি আমরা ইসবিজাবির বক্তব্যের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছি।

আ'যমি রহ. বক্তব্যটি উল্লেখ করার পর এক বিস্ময়কর দাবি করেছেন। যা আমরা আ'যমি রহ. কর্তৃক 'আহকামুল ইসলাম জারি করা'র ব্যাখ্যার আলোচনায় উল্লেখ করবো, ইনশাআল্লাহ।

বাযযাযিয়ার আরেকটি বক্তব্য

'ফাতাওয়া বাযযাযিয়া' থেকে ইবনুল বাযযায আলকারদারির (মৃ: ৮২৭ হি:) বক্তব্য উল্লেখ করতে গিয়ে আ'যমি রহ. বলেন-

بزازیہ میں ہے:

وقد حكمنا بلا خلاف بأن هذه الديار قبل استيلاء التتار كانت من ديار الإسلام، وبعد استيلائهم إعلان الأذان أو الجمع والجماعات والحكم بمقتضى الشرع والفتوى والتدريس ذائع بلا نكير من ملوكهم، فالحكم بأنها من دار الحرب لا جهة له نظراً إلى الدراسة والدراية. (دار الاسلام اور دار الحرب، ص١٥)

"বাযযাযিয়াতে আছে, আমরা ঐক্যমত্যে এই মতামত প্রদান করেছি যে, এই অঞ্চলগুলো তাতারিদের কর্তৃত্বাধীন হওয়ার পূর্বে দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তাদের কর্তৃত্বাধীন হওয়ার পরও তাদের শাসক কর্তৃক হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্রকাশ্যে আযান বা জুমআ ও জামাআত, শরিআত অনুযায়ী ফয়সালা, ফাতওয়া এবং দরস-তাদরিস জারি আছে। সুতরাং ফিকহি গবেষণার দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলোকে দারুল হারবের অন্তর্ভুক্ত করার কোনো কারণ নেই।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃ: ১৫)

বক্তব্যের পর্যালোচনা

ইবনুল বাযযায আলকারদারির উপর্যুক্ত বক্তব্যে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা নেই। কিন্তু আ'যমি রহ. কী বুঝাতে চাচ্ছেন তা অস্পষ্ট। কেননা ইবনুল বাযযাযের বক্তব্যে স্পষ্টই আছে যে, তাতে শরিআত অনুযায়ী ফয়সালা জারি আছে। সুতরাং তা দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকার ক্ষেত্রে কারো দ্বিমত নেই। নাকি তিনি 'হুকুম' দ্বারা জুমআ ও ঈদ ইত্যাদি বুঝেছেন; সেটির স্বতন্ত্র উল্লেখ এর পূর্বে আছে। আর যদি 'হুকুম' দ্বারা ফাতওয়া দেয়া বুঝে থাকেন; সেটিরও স্বতন্ত্র উল্লেখ পরে আছে।

বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয় ইবনুল বাযযাযের বক্তব্যের পরবর্তী অংশ থেকে, যা আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমিও তাঁর পুস্তিকার ২৫ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। ইবনুল বাযযায বলেন-

وإعلان بيع الخمور وأخذ الضرائب والمكوس **والحكم من البعض برسم التتار** كإعلان بني قريظة بالتهود وطلب الحكم من الطاغوت في مقابلة محمد عليه الصلاة والسلام في عهده بالمدينة، ومع ذلك كانت بلدة الإسلام بلا ريب. (الفتاوي البزازية، كتاب السير، الفصل الثالث في الحظر والإباحة، بهامش الفتاوى الهندية، ٦/٣١٢)

"এবং প্রকাশ্যে মদ বিক্রয়, খাজনা ও কর আদায় করা এবং **কেউ কেউ তাতারিদের রীতি-নীতি অনুযায়ী ফয়সালা করা,** বনি কুরাইযার ইহুদি হওয়ার প্রকাশ ও নববি যুগে মদিনায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিপরীতে 'তাগুত' থেকে ফয়সালা কামনা করার ন্যায়।[৪৭] তবুও তা নিঃসন্দেহে দারুল ইসলাম ছিলো।" (বাযযাযিয়া, হিন্দিয়ার পার্শ্ব টীকা- ৬/৩১২)

উপর্যুক্ত বক্তব্যে 'কেউ কেউ তাতারিদের রীতি-নীতি অনুযায়ী ফয়সালা করা'; এ অংশ থেকেই স্পষ্ট যে, মৌলিকভাবে তাতে ইসলামি আইন-কানুনই জারি ছিলো। বনি কুরাইযার উপমা পেশ করায় তা আরো স্পষ্ট হয়েছে। এমন ভূখণ্ড দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকার ব্যাপারে কারোই কোনো দ্বিমত নেই।

এর বিপরীতে যেখানে তাতারিরা তাদের আইন-কানুন জারি করেছে, সেটিকে 'ফাতহুল কাদির' কিতাবে দারুল হারব আখ্যা দেয়া হয়েছে; যেমনটি আমরা দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পরিচয়ের আলোচনায় ইবনুল হুমামের শব্দে উল্লেখ করেছি।

শামসুল আইম্মা হালওয়ানির বক্তব্য

ইবনুল বাযযায আলকারদারির পূর্বোক্ত বক্তব্য উল্লেখ করার পর 'ফাতাওয়া বাযযাযিয়া' থেকে আব্দুল আযিয ইবনে আহমাদ ইবনে নাসর শামসুল আইম্মা আলহালওয়ানির (মৃ: ৪৪৮/৪৪৯ হি:) বক্তব্য উল্লেখ করতে গিয়ে আ'যমি রহ. বলেন-

---

৪৭. এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়। উল্লিখিত বক্তব্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিপরীতে যার থেকে ফয়সালা কামনা করা হয়েছে, তাকে 'তাগুত' আখ্যা দেয়া হয়েছে।

اور مذکورہ بالا عبارتوں میں تو اس سے بھی کم میں، یعنی صرف ایک حکم اسلامی باقی رہنے کی صورت میں بھی دار الاسلام باقی رہنے کا حکم لگایا گیا ہے، اور اسی کی تائید حلوانی وغیرہ کے کلام سے بھی ہوتی ہے، بزازیہ میں حلوانی سے منقول ہے:

إنما تصير دار الحرب بإجراء أحكام الكفر، وأن لا يحكم فيها بحكم من أحكام الإسلام.

(دار الاسلام اور دار الحرب، ص١٦)

"উপর্যুক্ত ইবারতগুলোতে তার চেয়েও কম অর্থাৎ শুধু একটি ইসলামি বিধান অবশিষ্ট থাকা অবস্থায়ও দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকার কথা বলা হয়েছে। হালওয়ানি প্রমুখগণের ভাষ্য দ্বারাও এটির সমর্থন হয়। 'বাযযাযিয়া'তে হালওয়ানির সূত্রে উদ্ধৃত হয়েছে-

এবং দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হয় কুফরি আইন-কানুন জারি করা এবং তাতে ইসলামি আইন-কানুন থেকে কোনো আইনে ফয়সালা না করার মাধ্যমে।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃ: ১৬)

বক্তব্যের পর্যালোচনা

উপর্যুক্ত বক্তব্যের ব্যাপারে আমাদের কয়েকটি কথা-

ক) আ'যমি রহ. কর্তৃক এখানেও অনুবাদের ক্ষেত্রে যথারীতি অসঙ্গতি হয়েছে। তিনি হালওয়ানির কথার অর্থ করেছেন, "کوئی ملک احکام کفر کے اجراء سے اس وقت دار الحرب ہو گا کہ اس میں احکام اسلام میں سے ایک حکم کا بھی اجراء نہ ہو" (কোনো রাষ্ট্র আহকামে কুফর জারি হওয়ায় তখন দারুল হারব হবে, যখন তাতে আহকামে ইসলাম থেকে একটি হুকুমও জারি থাকবে না)। অথচ বাহ্যত শব্দের স্বাভাবিক অর্থ যে কেউ এভাবে করবে- "اور دار الاسلام دار الحرب ہو جاتا ہے احکام کفر کے جاری کرنے سے اور اس میں احکام اسلام میں سے کسی حکم سے فیصلہ نہ کیا جائے" (এবং দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হয় কুফরি আইন-কানুন জারি করা এবং তাতে ইসলামি আইন-কানুন থেকে কোনো আইনে ফয়সালা না করার মাধ্যমে)। কিন্তু তিনি স্বাভাবিক অর্থ থেকে বারবার সূক্ষ্মভাবে কেনো সরে যান; সেটির প্রতি আমরা পূর্বেই ইঙ্গিত করে এসেছি।

খ) শামসুল আইম্মা হালওয়ানির পূর্ণ বক্তব্য 'বাযযাযিয়া'র সূত্রে আ'যমি রহ. নিজেও তাঁর পুস্তিকার ২৬ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। হালওয়ানি রহ. মূলত ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত শর্ত তিনটি উল্লেখ করতে গিয়ে প্রথম শর্ত তথা কুফরি আইন-কানুন জারি করাকে স্পষ্ট করতে 'আতফে তাফসিরি' হিসেবে এ কথাও বলেছেন যে, তাতে ইসলামি আইনে ফয়সালা না করা। এখানে ব্যবহারভঙ্গি তথা ইসলামি কোনো আইনে ফয়সালা না করা থেকে এ ফলাফল বের করা যে, একটি আইনে ফয়সালা করা হলেও বা একটি বিধান জারি থাকলেও তা দারুল হারবে পরিণত হবে না; সুস্পষ্ট ভুল। যদি তাই হতো, তাহলে তিন শর্তের প্রয়োজন ছিলো না, বরং এক শর্তেই সর্বযুগে সকল দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার সকল দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে। শামসুল আইম্মা হালওয়ানির মতো ব্যক্তিত্ব এমন 'শায' মতের প্রবক্তা হতে পারেন না।

বা বলা যায় "حكم" দ্বারা "حكم واحد" নয় বরং "جنس حكم" উদ্দেশ্য, আর "من" দ্বারা সে 'হুকুম'র বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তখন আর শামসুল আইম্মা হালওয়ানির কথার অস্পষ্টতার সুযোগ নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা করার অবকাশ থাকে না।

গ) বর্তমান সময় হিসেবে শামসুল আইম্মা হালওয়ানির বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করতেও কোনো সমস্যা নেই। কেননা বর্তমান সময়ে কুফরি সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার অর্থ ইসলামি কোনো আইন অনুযায়ী ফয়সালা না করা। যে সকল আইন বাহ্যত ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়; তা ইসলামের দাপটের কারণে ইসলামি আইন হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে এমন নয়, বরং তা গ্রহণ করা হয়েছে কুফরি আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হওয়ায় কুফরি আইন হিসেবে। সুতরাং কুফরি সংবিধানে পরিচালিত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য যে, তাতে কুফরি আইন-কানুন জারি করা হয়েছে এবং ইসলামি কোনো আইনে ফয়সালা করা হয় না।

ঘ) শামসুল আইম্মা হালওয়ানি রহ. শর্ত তিনটি উল্লেখ করার পর শর্ত তিনটির যৌক্তিকতা বুঝাতে গিয়ে বলেন-

فإذا وجدت الشرائط كلها صارت دار الحرب، وعند تعارض الدلائل والشرائط يبقى ما كان على ما كان، أو يترجح جانب الإسلام احتياطاً، ألا يرى أن دار الحرب تصير دار

الإسلام بمجرد إجراء أحكام الإسلام اجماعاً. (الفتاوي البزازية، كتاب السير، الفصل الثالث في الحظر والإباحة، بهامش الفتاوى الهندية، ٦/٣١٢)

"যখন সবগুলো শর্ত পাওয়া যাবে, তখন তা দারুল হারবে পরিণত হবে। আর দলিল-প্রমাণ ও শর্তাবলী বিপরীতমুখী হওয়ার ক্ষেত্রে পূর্বের অবস্থার উপরই বহাল থাকবে, বা সতর্কতামূলক ইসলামের দিক প্রাধান্য পাবে। এ জন্যই সর্বসম্মতিক্রমে শুধু ইসলামি আইন-কানুন জারি করার মাধ্যমেই দারুল হারব দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যায়।" (বাযযাযিয়া, -হিন্দিয়ার পার্শ্ব টীকায়- ৬/৩১২)

হালওয়ানি রহ. যে এখানে দলিলের 'তাআরুয' বিপরীতমুখীর কথা বলেছেন, তা কিসের দলিল? অবশ্যই কর্তৃত্বের দলিল। কোনো একটি শর্তের অনুপস্থিতিতে কর্তৃত্বের দলিল বিপরীতমুখী হয়ে যায়, তাই পূর্বের অবস্থায় বহাল রাখা বা ইসলামের দিককে প্রাধান্য দিয়ে দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত রাখা উচিত। যেমনটি ইসলামি আইন-কানুন জারি হলে কর্তৃত্বের দলিল সাব্যস্ত হওয়ায় ঐক্যমত্যে তা দারুল ইসলাম হয়ে যায়।

কিন্তু আ'যমি রহ. শামসুল আইম্মা হালওয়ানির কথার যে ব্যাখ্যা দেখাতে চাচ্ছেন; অর্থাৎ একটি বিধান বহাল থাকলেও তা দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকবে। এটিকে কি কোনো বিবেকবান কর্তৃত্বের দলিলের 'তাআরুয' বিপরীতমুখী বলবে যে, একদিকে কুফরি আইন-কানুন জারি হয়ে গেছে, আর অপরদিকে একটিমাত্র ইসলামি বিধান বহাল আছে?

রদ্দুল মুহতারের বক্তব্য

'রদ্দুল মুহতার'র বক্তব্য উল্লেখ করতে গিয়ে আ'যমি রহ. বলেন-

ردالمحتار میں ہے:

لو أجريت أحكام المسلمين وأحكام أهل الشرك لا تكون دار حرب. (دار الاسلام اور دار الحرب، ص٢٣)

"রদ্দুল মুহতারে আছে, যদি মুসলমানদের আইন-কানুন ও মুশরিকদের আইন-কানুন জারি করা হয়, তাহলে তা দারুল হারব হবে না।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃ: ২৩)

বক্তব্যের পর্যালোচনা

মূলত বক্তব্যটি আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল তহতাবির (মৃ: ১২৩১ হি:)। ইবনে আবেদিন শামি তা তহতাবির উদ্ধৃতিতেই উল্লেখ করেছেন এবং হাবিবুর রহমান আ'যমিও ৩৩ নম্বর পৃষ্ঠায় তহতাবি ও শামির সূত্রে উল্লেখ করেছেন। (দেখুন: হাশিয়াতুত তহতাবি আলাদ দুররিল মুখতার, ২/৪৬০, রদ্দুল মুহতার, ৬/২১৫)

আল্লামা তহতাবি ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত তিন শর্তের প্রথমটি উল্লেখ করার পর এ মাসআলাটি বর্ণনা করেছেন। এতে অস্পষ্টতার কিছুই নেই। কোনো দারুল ইসলাম কাফেরদের দখলে আসার পরও পূর্ণমাত্রায় তাদের আইন-কানুন জারি করতে না পারা বা না করা মুসলমানদের দাপট ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বহাল থাকার প্রমাণ বহন করে। সুতরাং সাময়িক সময়ের জন্য সেটিকে দারুল ইসলামের বহির্ভূত মনে করার প্রয়োজন নেই। যেমনটি পূর্বে 'ফাতাওয়া বাযযাযিয়া' থেকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাতারিদের দখলে আসার পরও যে সকল অঞ্চলে শরিআত অনুযায়ী ফয়সালা চলছে; তো কেউ কেউ তাতারিদের রীতি-নীতি অনুযায়ী ফয়সালা করা সত্ত্বেও তা দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। আল্লামা তহতাবি কর্তৃক বর্ণিত অবস্থার সারাংশও তাই।

আবুল ইউসরের বক্তব্য

'ফাতওয়া আব্দুল হাই', 'কাসেমুল উলুম' ও 'তহতাবি'র সূত্রে 'সিয়ারুল আসল' থেকে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল কারিম সাদরুল ইসলাম আবুল ইউসর আলবাযদাবির (মৃ: ৪৯৩ হি:) বক্তব্য আ'যমি রহ. এভাবে উল্লেখ করেছেন-

وفي سير الأصل لأبي اليسر: أن دار الإسلام لا تصير دار الحرب ما لم يبطل جميع ما صارت به دار الإسلام، لأن الحكم إذا ثبت بعلة فما بقي من العلة شيء يبقى ببقائه.

(دار الاسلام اور دار الحرب، ص ۲۴)

"আবুল ইউসরের সিয়ারুল আসলে রয়েছে, যতো কারণে দারুল ইসলাম দারুল ইসলামে পরিণত হয়েছে, সবগুলো বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত দারুল ইসলাম

দারুল হারবে পরিণত হবে না। কেননা হুকুম যখন কোনো 'ইল্লাত' কারণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়, তখন 'ইল্লাত' কারণের কিছু একটা অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত হুকুম বহাল থাকে।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃ: ২৪)

বক্তব্যের পর্যালোচনা

সাদরুল ইসলাম আবুল ইসরের বক্তব্যটি 'ফুসুলে ইমাদি' ও 'খিযানাতুল মুফতিন' কিতাবেও উল্লেখ হয়েছে। (দেখুন: ফুসুলে ইমাদি -পাণ্ডুলিপি-, পৃ: ১০, খিযানাতুল মুফতিন -পাণ্ডুলিপি-, পৃ: ১২৯)। 'তহতাবি'তে তা 'ফুসুলে উসরুশানি'র সূত্রে আর 'ফাতাওয়া আব্দুল হাই'তে 'খিযানাতুল মুফতিন'র সূত্রে এবং 'কাসেমুল উলুম' কিতাবে 'তহতাবি'র সূত্রে উদ্ধৃত হয়েছে। "لأن الحكم" থেকে শেষের অংশ শুধু 'খিযানাতুল মুফতিন' কিতাবে উল্লেখ হয়েছে, তাই 'ফাতাওয়া আব্দুল হাই'তেও সেভাবে আছে। অন্যান্য কিতাবে এ অংশটির উল্লেখ হয়নি। (দেখুন: তহতাবি, ২/৪৬১, কাসেমুল উলুম, পৃ: ৩৬০, ফাতাওয়া আব্দুল হাই, পৃ: ৪৭৯)।

যা হোক, সাদরুল ইসলাম আবুল ইসরের বক্তব্যের ব্যাখ্যাও তাই, যা আমরা পেছনে উল্লেখ করে এসেছি। এটিই স্বাভাবিক যে, সাদরুল ইসলাম আবুল ইসর ইমাম আবু হানিফার রহ. শর্তের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে এ কথা বলেছেন।

তো আমাদের মনে রাখা উচিত, দারুল ইসলাম একটি বিধান জারি হওয়ার মাধ্যমে দারুল ইসলাম হয়নি, বরং দাপট ও কর্তৃত্বের কারণে দারুল ইসলাম হয়েছে। সুতরাং সবগুলো বিলুপ্ত হওয়ার অর্থ দাপটের সকল প্রমাণ বিলুপ্ত হওয়া। আর কোনো একটি শর্তের অনুপস্থিতি কর্তৃত্ব ও দাপটের বিলুপ্তি প্রমাণ করে না। এই অর্থ নয় যে, ইসলামের একটি বিধান জারি থাকলেও তা দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকবে; যা একটি সুস্পষ্ট অসার দাবি।

মানশুর কিতাবের বক্তব্য

'ফাতওয়া আব্দুল হাই', 'কাসেমুল উলুম' ও 'তহতাবি'র সূত্রে 'মানশুর' কিতাব থেকে 'মানশুর' ও 'মুলতাকাত' কিতাবদ্বয়ের লেখক নাসিরুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আসসামারকান্দির (মৃ: ৫৫৬ হি:) বক্তব্য আ'যমি রহ. এভাবে উল্লেখ করেন-

وفي المنشور: أن دار الإسلام صارت دار الإسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها، فما بقي علقة من علائق الإسلام يترجح جانب الإسلام. (دار الاسلام اور دار الحرب، ص٢٥)۔

"মানশুর কিতাবে আছে, দারুল ইসলাম দারুল ইসলামে পরিণত হয়েছে তাতে ইসলামি আইন-কানুন জারি করার মাধ্যমে। সুতরাং ইসলামসম্পৃক্ত কোনো সম্বন্ধ অবশিষ্ট থাকলে ইসলামের দিকটিই প্রাধান্য পাবে।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃ: ২৫)

বক্তব্যের পর্যালোচনা

নাসিরুদ্দিন আসসামারকান্দির বক্তব্যটি 'ফুসুলে ইমাদি' ও 'খিযানাতুল মুফতিন' কিতাবেও উল্লেখ হয়েছে। (দেখুন: ফুসুলে ইমাদি -পাণ্ডুলিপি-, পৃ: ১০, খিযানাতুল মুফতিন -পাণ্ডুলিপি-, পৃ: ১২৯)।

এক্ষেত্রেও এটিই স্বাভাবিক যে, নাসিরুদ্দিন আসসামারকান্দি ইমাম আবু হানিফার রহ. শর্তের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে এ কথা বলেছেন। আর হুবহু এ শব্দ শাইখুল ইসলাম ইসবিজাবির শব্দেও পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। সুতরাং এখানে নতুন করে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই।

লামেশির বক্তব্য

'কাসেমুল উলুম', 'ফুসুলে উসরুশানি' ও 'জামেউল ফুসুলাইন'র সূত্রে হুসাইন ইবনে আলি আবুল কাসেম আললামেশির (মৃ: ৫২২ হি:) বক্তব্য আ'যমি রহ. এভাবে উল্লেখ করেন-

ذكر اللامشي في واقعاته: أنها صارت دار الإسلام بهذه الأعلام الثلاثة، فلا تصير دار حرب ما بقي شيء منها. (دار الاسلام اور دار الحرب، ص٢٦)

"লামেশি তাঁর 'ওয়াকিআত' নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন, দারুল ইসলাম দারুল ইসলামে পরিণত হয়েছে এ তিনটি নিদর্শনের মাধ্যমে। সুতরাং তিনটির কোনো একটি অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত তা দারুল হারবে পরিণত হবে না।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃ: ২৬)

বক্তব্যের পর্যালোচনা

আবুল কাসেম আললামেশির বক্তব্যটি 'ফুসুলে ইমাদি' ও 'তহতাবি'তেও উল্লেখ হয়েছে। (দেখুন: ফুসুলে ইমাদি -পাণ্ডুলিপি-, পৃ: ১০, তহতাবি, ২/৪৬১)

আবুল কাসেম আললামেশির বক্তব্যে স্পষ্ট যে, তিনি ইমাম আবু হানিফার রহ. শর্ত তিনটি উল্লেখ করে সেটির কারণ বর্ণনা করেছেন। আর পেছনে এ ব্যাপারে বারবার আলোচনা করা হয়েছে। তাই এখানে নতুন করে বলার কিছু নেই।

এ পর্যায়ে এসে একটি বিষয় সকলের নিকট স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আ'যমি রহ. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সহজলভ্য গ্রহণযোগ্য কিতাবগুলো বাদ দিয়ে তাঁর দাবির পক্ষে সিংহভাগ ওই সকল ফকিহের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যাঁদের বক্তব্যের মূল উদ্ধৃতিসূত্র এবং তাঁদের পুরো আলোচনা তাঁর সামনে নেই।

মূলত তিনি গভীর অধ্যয়ন করে ফিকহের গূঢ় থেকে মাসআলা সমাধান করার চেষ্টা করেননি। 'ফুসুলে উসরুশানি' ও 'ফাতাওয়া আব্দুল হাই'তে যেহেতু এই টুকরো টুকরো বক্তব্যগুলো একত্রে আছে, তাই তিনি এগুলোকেই 'মূল' বানিয়ে এদিক-সেদিক থেকে নিজের বুঝ অনুযায়ী আরো কিছু খণ্ডিত ফিকহি ইবারত সংযোজন করে দলিলের নামে কিছু একটা পেশ করার চেষ্টা করেছেন। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে, অর্থাৎ কঠিন পদস্খলনের শিকার হয়েছেন।

মাবসুতে সারখসির বক্তব্য

'মাবসুত' থেকে ইমাম শামসুদ্দিন সারাখসির (মৃ: ৪৯০ হি:) বক্তব্য উল্লেখ করতে গিয়ে আ'যমি রহ. বলেন-

اور مبسوط سرخسی میں ہے:

وأبو حنيفة رحمه الله يعتبر تمام القهر والقوة، وذلك باستجماع الشرائط كلها، (إلى قوله) ثم ما بقي شيء من آثار الأصل فالحكم له دون العارض. (دار الاسلام اور دار الحرب، ص۲۶-۲۷)

"এবং মাবসুতে সারাখসিতে আছে, আর ইমাম আবু হানিফা রহ. পূর্ণ ক্ষমতা ও পরাক্রমশালী হওয়া বিবেচনায় নিয়েছেন। আর তা শর্ত তিনটির উপস্থিতিতেই সাব্যস্ত হবে। .... এছাড়াও যতোক্ষণ পর্যন্ত মূলের কোনো

প্রভাব অবশিষ্ট থাকবে, তো হুকুম তারই হবে, পরে আসা বিষয়ের নয়।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃ: ২৬-২৭)

বক্তব্যের পর্যালোচনা

শামসুদ্দিন সারাখসির পূর্ণ বক্তব্য আমরা 'তাতবিক'র আলোচনায় উল্লেখ করেছি। সারাখসি রহ. প্রথমে সাহেবাইনের মতের কারণ উল্লেখ করে ইমাম আবু হানিফার রহ. শর্তের যৌক্তিকতা এমনভাবে দেখিয়েছেন; যার দ্বারা উভয় মতের মাঝে অনেকটা 'তাতবিক' হয়ে যায়। কিন্তু আ'যমি রহ. কর্তৃক ইবারত বর্ণনায় অসঙ্গতি স্পষ্ট। পাঠকের বুঝার সুবিধার্থে আমরা তাঁর বাদ দেয়া অংশটুকুসহ ইবারতটি উল্লেখ করছি-

ولكن أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعتبر تمام القهر والقوة، لأن هذه البلدة كانت من دار الإسلام محرزة للمسلمين، فلا يبطل ذلك الإحراز إلا بتمام القهر من المشركين، وذلك باستجماع الشرائط الثلاث، **لأنها إذا لم تكن متصلة بالشرك فأهلها مقهورون بإحاطة المسلمين بهم من كل جانب، فكذلك إن بقي فيها مسلم أو ذمي آمن، فذلك دليل عدم تمام القهر منهم.**

وهو نظير ما لو أخذوا مال المسلم في دار الإسلام، لا يملكونه قبل الإحراز بدارهم لعدم تمام القهر، ثم ما بقي شيء من آثار الأصل فالحكم له دون العارض. (كتاب المبسوط للسرخسي، كتاب السير، باب المرتدين، ١٠/١١٤)

"কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহ. পূর্ণ ক্ষমতা ও পরাক্রমশালী হওয়া বিবেচনায় নিয়েছেন। কেননা এই অঞ্চলটি মুসলমানদের সংরক্ষণে থেকে দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। সুতরাং মুশরিকদের ক্ষমতার পূর্ণতা ব্যতীত ওই সংরক্ষণ বাতিল হবে না। আর তা শর্ত তিনটির উপস্থিতিতেই সাব্যস্ত হবে। **কারণ, যখন তা দারুল হারব সংলগ্ন হবে না, তখন তার অধিবাসীরা চতুর্দিক থেকে মুসলমানদের বেষ্টনীতে পরাভূত হয়ে থাকবে। একই কথা যখন মুসলমান ও 'যিম্মি'রা তাতে নিরাপদে থাকবে। আর এটিই তাদের ক্ষমতার অপূর্ণতার দলিল।**

তার দৃষ্টান্ত হলো, কাফেররা যদি দারুল ইসলামে মুসলমানের মাল নিয়ে নেয়, তাহলে দারুল হারবে সংরক্ষণের আগ পর্যন্ত কর্তৃত্বের অপূর্ণতার কারণে

তাদের মালিকানা সাব্যস্ত হবে না। এছাড়াও যতোক্ষণ পর্যন্ত মূলের কোনো নিদর্শন অবশিষ্ট থাকবে, তো হুকুম তারই হবে, পরে আসা বিষয়ের নয়।" (কিতাবুল মাবসুত, ১০/১১৪)

সারাখসি রহ. স্পষ্টই বুঝাতে চাচ্ছেন যে, মূল ভিত্তি হলো ক্ষমতা ও দাপট নিঃশেষ হওয়া বা প্রতিষ্ঠা হওয়া। কোনো একটি শর্তের অনুপস্থিতিতে যেহেতু কাফেরদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অপূর্ণ থেকে যায় এবং এটি তাদের দখলে সাময়িক সময়ের জন্য হস্তগত হওয়া প্রমাণিত হয়, তাই এটিকে দারুল হারবের হুকুমে আনার প্রয়োজন নেই। এ জন্যই সারাখসি রহ. পরবর্তীতে স্পষ্টভাবে বলেছেন- "وإنما استولى المرتدون عليها ساعة من نهار" (বরং মুরতাদরা দিনের কিছু সময়ের জন্য তা দখল করেছে)। সুতরাং 'মূলের কোনো নিদর্শন' বলে সারখসি রহ. কর্তৃত্বের নিদর্শনই বুঝাতে চেয়েছেন; যা তার পুরো আলোচনার আলোকে স্পষ্ট। কিন্তু আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির সামনে পূর্ণ আলোচনা থাকা সত্ত্বেও ইবারতের আংশিক উল্লেখ করে তিনি যথারীতি তাঁর অসঙ্গত বুঝের উপর ফিকহের ইবারতকে সমঞ্জস করার চেষ্টা করেছেন। إنا لله وإنا إليه راجعون।

'আহকামুল ইসলাম জারি করা'র ব্যাখ্যায় আ'যমি রহ.

আমরা আমাদের রচনার শুরুতেই ফুকাহায়ে কেরামের ইবারতের আলোকে 'আহকামুল ইসলাম জারি করা'র অর্থ স্পষ্ট করেছি যে, তা দ্বারা মৌলিকভাবে ইসলামি আইন-কানুন জারি করা উদ্দেশ্য। শুধুই নিজেরা জুমআ-ঈদ আদায় করতে পারা বা ব্যক্তিগতভাবে সালাত-সাওম পালন করতে পারা উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমি রহ. শেষোক্ত বুঝটি ধারণ করে শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবির বক্তব্যেকে ভুল আখ্যা দিতে গিয়ে নিজেই ভুলের শিকার হয়েছেন।

তিনি তাঁর দাবির পক্ষে দু'টি কথা বলেছেন-

প্রথম বক্তব্য

পূর্বোল্লিখিত ইসবিজাবি, উসরুশানি প্রমুখগণের বক্তব্য উল্লেখ করার পর 'বাযযাযিয়া'র বক্তব্যটি বর্ণনা করে; যেমনটি আমরা পূর্বেই ইঙ্গিত করেছি, এক বিস্ময়কর দাবি করতে গিয়ে তিনি বলেন-

پس یہ خیال کرنا کہ جب حکمرانی، بندوبست رعایا، اور خراج وعشور اموال تجارت کی وصولی، اور چوروں یاڈاکوؤں کو سزادینے کا اختیار مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ ہو، اس وقت تک یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ حکم اسلام جاری ہے، اور اسی خیال کو مذہب احناف ظاہر کرنا، جیسا کہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، ان تصریحات کے بالکل خلاف ہے۔

صحیح بات یہ ہے کہ اگر مذکورہ بالا امور مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ ہوں، مگر اعلان کے ساتھ جمعہ وجماعت کی اقامت، شریعت کے احکام کے مطابق فیصلہ (پنچائتی سہی) اور افتاء وتدریس بلا نکیر شائع ہو، تو از روئے مذہب احناف یہ بھی دار الاسلام ہونے کے لئے کافی ہے، اور یہ کہنا صحیح ہے کہ احکام اسلام جاری ہے۔(دار الاسلام اور دار الحرب، ص۱۵)

"সুতরাং এ ধারণা করা যে, যখন শাসন, জনসাধারণের নিয়ম-নীতি, ব্যবসায়ী পণ্যের 'খারাজ' ও 'উশর' আদায় এবং চোর-ডাকাতের শাস্তির অধিকার মুসলমানদের হাতে থাকে না, ততোক্ষণ পর্যন্ত এ কথা বলা সহিহ নয় যে, ইসলামের হুকুম জারি আছে এবং এটিকে হানাফিদের মাযহাব হিসেবে প্রকাশ করা; যেমনটি শাহ আব্দুল আযিযের রহ. দিকে সম্বন্ধযুক্ত, তা এ সকল সুস্পষ্ট বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত।

সঠিক কথা হলো, যদি উপর্যুক্ত বিষয়গুলো মুসলমানদের হাতে না থাকে, কিন্তু প্রকাশ্যে জুমআ ও জামাআত আদায়, শরিআতের বিধান অনুযায়ী (পঞ্চায়েত বা গ্রাম্য সালিশ পদ্ধতিতে হলেও) ফয়সালা এবং ফাতওয়া প্রদান ও দরস-তাদরিস প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই জারি থাকে, তাহলে হানাফি মাযহাব অনুযায়ী তা দারুল ইসলাম হওয়ার জন্য যথেষ্ঠ এবং এটি বলা সহিহ যে, আহকামে ইসলাম জারি আছে।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃ: ১৫)

বক্তব্যের পর্যালোচনা

আ'যমি রহ. তাঁর উপরিউক্ত বক্তব্যে অনেকগুলো অবাস্তব কথা, অসার দাবি করেছেন। আমরা পর্যায়ক্রমে কয়েকটির দিকে ইঙ্গিত করছি-

ক) তিনি "ان تصریحات" এ সকল বক্তব্য' বলে যদি 'বাযযাযিয়া'তে উদ্ধৃত 'মুলতাকাত'র বক্তব্যের দিকে ইঙ্গিত করে থাকেন; তাহলে আমরা সে বক্তব্যের পর্যালোচনায় স্পষ্ট করেছি যে, নাসিরুদ্দিন আসসামারকান্দি 'মুলতাকাত'

কিতাবে মূলত জুমআ-ঈদ ইত্যাদি সহিহ হওয়ার ব্যাপারে দু'টি অবস্থা তুলে ধরেছেন। কাফেরদের পক্ষ থেকে কোনো অঞ্চলে মুসলমান গভর্নর থাকলেও তিনি জুমআ-ঈদ ইত্যাদি সহিহ হওয়ার ফাতওয়া দিয়েছেন এবং অমুসলিম গভর্নর হলেও যদি জুমআ-ঈদ আদায় করা যায়, তাহলেও তিনি জুমআ-ঈদ ইত্যাদি সহিহ হওয়ার ফাতওয়া দিয়েছেন। অঞ্চলদুটি দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নাকি দারুল হারবের; এমন কোনো কথা তিনি বলেননি। আর যদি মেনেও নেওয়া হয় যে তিনি দারুল ইসলাম হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, তাহলেও সেটি ইমাম আবু হানিফার রহ. 'আমান'র শর্তের ভিত্তিতে হতে পারে। কিন্তু এতোটুকুর কারণে 'আহকামুল ইসলাম জারি আছে' এমন বিষয়ের দিকে স্পষ্ট তো দূরের কথা অস্পষ্টভাবেও কোনো ইঙ্গিত তিনি করেননি।

আর যদি "ان تصریحات" এ সকল বক্তব্য' দ্বারা আ'যমি রহ. পেছনে উদ্ধৃত সকল বক্তব্য উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন, তাহলে এ দাবি একেবারেই অযৌক্তিক। কারণ, পেছনের বক্তব্যগুলোর সারাংশই হলো, যেহেতু 'আহকামুল কুফর জারি করা'র শর্তে ইমাম আবু হানিফা ও সাহেবাইন; সকলে একমত, তাই ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক অতিরিক্ত দুটি শর্তের যৌক্তিকতা বুঝাতে একেকজন একেকভাবে কারণ উল্লেখ করেছেন। তাঁদের সকলের বক্তব্যে স্পষ্ট তো দূরের কথা অস্পষ্টভাবেও এমন কথার দিকে ইঙ্গিত হয়নি যে, এতোটুকুর কারণে 'আহকামুল ইসলাম জারি আছে' বলা হবে। যদি তাই হতো, তাহলে ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহেবাইনের মতানৈক্য উল্লেখ করারও প্রয়োজন ছিলো না এবং উভয় মতামতের ভিন্ন ভিন্ন কারণ দেখানোরও প্রয়োজন ছিলো না।

নিজের অসঙ্গত বুঝকে ফুকাহায়ে কেরামের ইবারত থেকে বের করে সেটিকে হানাফিদের মাযহাব বানানো এবং শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবির বক্তব্যকে ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত আখ্যা দেয়া অনুচিত হয়েছে।

খ) তাঁর বক্তব্যের প্রথম অংশ দ্বারা বুঝা যায়, 'আহকামুল ইসলাম জারি আছে' বলার জন্য চোর-ডাকাতের শাস্তির অধিকার মুসলমানদের হাতে থাকা জরুরি নয়। পরবর্তী অংশে বুঝাতে চেয়েছেন, পঞ্চায়েত বা গ্রাম্য সালিশ পদ্ধতিতে শরিআতের বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করতে পারা 'আহকামুল ইসলাম জারি আছে' বলার জন্য যথেষ্ট।

কথা হলো, মুসলিম পঞ্চায়েত বা গ্রাম্য সালিশ কি শরিআতের বিধান অনুযায়ী উদাহরণস্বরূপ চোরের হাত কাটা বা ডাকাতের হাত-পা কাটার অধিকার রাখে? যদি অধিকার রাখে, তাহলে চোর-ডাকাতের শাস্তির অধিকার মুসলমানদের হাতে আছে। শাহ আব্দুল আযিয রহ. এটিকেই আহকামুল ইসলাম জারি থাকার অর্থে উল্লেখ করেছেন। আর যদি সে অধিকার না থাকে, তাহলে 'পঞ্চায়েত বা গ্রাম্য সালিশ বাধাহীন শরিআতের বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করতে পারে' বলাটা কি সঠিক হবে?

তাহলে শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবির কথায় ভুল কোথায়? আর আ'যমি রহ. কী সঠিক বিষয় দেখাতে চেয়েছেন? নাকি নিজের বক্তব্যে নিজের অজান্তেই বিপরীতমুখী কথা বলে দিয়েছেন!

আসল কথা হচ্ছে, যে সকল অঞ্চল কাফেরদের দখলে যাওয়ার পরও ঐক্যমত্যে দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত ছিলো, সে সকল অঞ্চলের ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের ইবারতে 'শরিআতের বিধান অনুযায়ী ফয়সালা চলছে' বা 'বিচারকরা মুসলমান'; এ জাতীয় কথাগুলো আছে। আ'যমি রহ. হিন্দুস্তানকে দারুল ইসলাম সাব্যস্ত করতে ফুকাহায়ে কেরামের যে সকল ইবারত উল্লেখ করেছেন তাতে এ ইবারতগুলোও রয়েছে। কিন্তু হিন্দুস্তানে তো 'শরিআতের বিধান অনুযায়ী ফয়সালা চলছে' বা 'বিচারকরা মুসলমান'; এটি অনুপস্থিত। তাই তিনি পঞ্চায়েতের বিষয়টি উল্লেখ করে ফুকাহায়ে কেরামের ইবারতের সঙ্গে সমঞ্জস করে কিছুটা সহনীয় করার চেষ্টা করেছেন। তবে তাতে তিনি সফল হতে পারেননি।

গ) বাস্তবেই কি হিন্দুস্তানের পঞ্চায়েত বা বাংলাদেশের গ্রাম্য সালিশ বাধাহীন শরিআত অনুযায়ী ফয়সালা করতে পারে? যেখানে বাংলাদেশেরই সংবিধানে রয়েছে 'অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।' আর ভারতের কথা তো বলারই প্রয়োজন নেই। আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির সমকালীন মুসলিম পঞ্চায়েত কি শরিআত অনুযায়ী ফয়সালা করতে পারতো? এমন অবান্তর ধারণার কথাও কি আলোচনা করতে হবে! তিনি ভালো করেই জানেন যে, পঞ্চায়েত বা গ্রাম্য সালিশ পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ পারস্পরিক কিছু ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা ছাড়া আর কিছুই হয় না। সেক্ষেত্রেও শরিআতের সামান্যতম তোয়াক্কা করা হয় না।

ঘ) বাংলাদেশ-ভারতের উলামায়ে কেরাম বা আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির সমকালীন উলামায়ে কেরাম কি যে কোনো বিষয়ে বাধাহীন ফাতওয়া দিতে পারেন বা পারতেন। যেখানে বাংলাদেশেরই ফাতওয়া বিষয়ক আইনে বলা আছে 'দেশের প্রচলিত আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় এমন কোনো ফতোয়া দেয়া যাবে না। কোনো ব্যক্তির অধিকার, মর্যাদা বা সম্মান বিনষ্ট করে ফতোয়া দেয়া যাবে না। তাহলে ভারতের ব্যাপারে আর কী বলা হবে!

ঙ) দারুল ইসলাম হওয়া ও আহকামুল ইসলাম জারি হওয়া কি একই বিষয়? ইমাম আবু হানিফার রহ. মতে তো আহকামুল ইসলাম জারি না হয়েও দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত থাকার সুযোগ আছে।

আর এটি কি ঐক্যমত্যে হানাফি মাযহাব? সাহেবাইনের যদি ভিন্ন মত না থাকে, তাহলে যেহেতু জুমহুর ও সাহেবাইনের মত একই; সুতরাং সকলেরই রায় এটিই। হানাফিদের মাযহাব বলার প্রয়োজন কী? আর যদি সাহেবাইনের মতানৈক্য থেকেই থাকে, তাহলে দারুল ইসলাম হওয়ার জন্য এতোটুকু যথেষ্ট বলা সর্বোচ্চ ইমাম আবু হানিফার মতানুযায়ী বলা যেতে পারে, হানাফিদের মাযহাব বলা কীভাবে সহিহ হয়েছে?

আর হানাফিদের মাযহাব অনুযায়ী আহকামুল ইসলাম জারি আছে বলার জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট; এই দাবির পক্ষে তিনি কি ফিকহের কোনো ইবারত পেশ করতে পারবেন?

দ্বিতীয় বক্তব্য

আ'যমি রহ. তাঁর দাবিকে আরো পাকাপোক্ত করতে গিয়ে বলেন-

اور مجمع الانہر میں اجراء احکام اسلام کی مثالوں میں صراحۃ اقامت جمعہ وعیدین کا ذکر ہے۔(دار الاسلام اور دار الحرب، ص ١٦)

"আর 'মাজমাউল আনহুর' কিতাবে আহকামে ইসলাম জারি করার উদাহরণে স্পষ্টভাবে জুমআ ও উভয় ঈদ আদায় করার উল্লেখ আছে।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃ: ১৬)

বক্তব্যের পর্যালোচনা

শাইখি যাদাহ দামাদ আফিন্দির (মৃঃ ১০৭৮হিঃ) 'মাজমাউল আনহুর' কিতাবে তা মোল্লা খসরুর (মৃঃ ৮৮৫ হিঃ) 'দুরারুল হুক্কাম' কিতাবের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। আলা আলহাসকাফিও 'আদদুররুল মুখতার' কিতাবে 'দুরারুল হুক্কাম'র উদ্ধৃতিতে তা উল্লেখ করেছেন। মূলত তা মোল্লা খসরুর 'গুরারুল আহকাম'র ইবারত, যা 'দুরারুল হুক্কাম'র মতন-মূলপাঠ। ইবারতটি হচ্ছে-

دار الحرب تصير دار الإسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها كإقامة الجمع والأعياد. (درر الحكام في شرح غرر الأحكام لملا خسرو، كتاب الجهاد، باب المستأمن، ٢٩٥/١، مجمع الأنهر لشيخي زاده، كتاب السير والجهاد، باب المستأمن، ٤٥٥/٢، الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الجهاد، الباب الثالث: باب المستأمن، فصل في استئمان الكافر، ٢١٦/٦)

"দারুল হারব দারুল ইসলামে পরিণত হয় তাতে আহকামুল ইসলাম জারি করার মাধ্যমে; যেমন, জুমআ ও ঈদ কায়েম করা।" (দুরারুল হুক্কাম ফি শারহে গুরারিল আহকাম, ১/২৯৫, মাজমাউল আনহুর, ২/৪৫৫, আদদুররুল মুখতার -রদ্দুল মুহতারের সাথে-, ৬/২১৬)।

আ'যমি রহ. তাঁর দাবির পক্ষে তাঁর ধারণা অনুযায়ী এক কিতাবের উদ্ধৃতি দেয়াই যথেষ্ট মনে করেছেন। অথচ একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝতে পারতেন যে, এতে তাঁর ধারণার পক্ষে কোনো দলিল নেই। কেননা, জুমআ-ঈদ কায়েম করাও দারুল ইসলামের একটি রাষ্ট্রীয় কানুন। বিশেষকরে হানাফিদের মূল মাযহাব অনুযায়ী জুমআ সহিহ হওয়ার জন্য খলিফা বা খলিফার প্রতিনিধি আবশ্যক। সুতরাং যে অঞ্চল এতোদিন দারুল হারবের অন্তর্ভুক্ত থাকায় জুমআ-ঈদ আদায় করা হয়নি, সে অঞ্চল মুসলমানদের দখলে আসার পর কানুন হিসেবেই শাসক বা তার প্রতিনিধির দায়িত্বে পড়ে তাতে জুমআ-ঈদ কায়েম করা।

আ'যমি রহ. নিজেরা মিলে জুমআ-ঈদ আদায় করতে পারা আর কোনো অঞ্চল মুসলমানদের দখলে আসার পর শাসক কর্তৃক ইসলামি রাষ্ট্রের কানুন হিসেবে জুমআ-ঈদ কায়েম করা; দুয়ের মাঝে পার্থক্য করতে পারেননি। বাক্যের ব্যবহাররীতির দিকে একটু গভীর দৃষ্টি করলেই অনুধাবন করতে পারতেন।

প্রথমটি ইসলামি বিধান পালন করতে পারা, আর দ্বিতীয়টি ইসলামি কানুন হিসেবে জারি করা।

আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, খিলাফত পতনের আগ পর্যন্ত ফুকাহায়ে কেরামের কল্পনার ত্রিসীমানায়ও এ ধারণা ছিলো না যে, কোনো ভূখণ্ড মুসলমানদের দখলে আসার পরও তাতে ইসলামি আইন-কানুন জারি করার পরিবর্তে কুফরি আইন-কানুন জারি থাকবে এবং মুসলমানরা শুধু নিজেরা নিজেরা জুমআ-ঈদ বা ব্যক্তিগত ইবাদত পালনকেই যথেষ্ট মনে করবে। সুতরাং জুমআ-ঈদকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করার অর্থই তাতে অন্যান্য ইসলামি আইন-কানুন জারি করা হয়েছে।

হাঁ! মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, 'হুদুদ-কিসাস'র কথা না বলে উদাহরণস্বরূপ জুমআ-ঈদের কথা কেনো বলেছেন? তার উত্তর একেবারেই স্পষ্ট। কোনো ভূখণ্ড মুসলমানদের দখলে আসার পর কয়েকদিনের মাথায় প্রথম জুমআবারে যখন শাসক বা তার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে জুমআ আদায় করা হবে, তখন সাধারণ থেকে সাধারণ জনগণও জানতে পারবে যে, এখানে এখন ইসলামি আইন-কানুন চলছে। আর বছরের মাথায় যখন ঈদ আদায় করা হবে তখন বিষয়টি আরো ব্যাপকভাবে জানাজানি হবে। কিন্তু এর বিপরীতে 'হুদুদ-কিসাস'র বিষয়টি এমন নয় যে, মুসলমানদের দখলে আসতে না আসতে অপরাধ সংঘটিত হয়ে যাবে এবং কয়েকদিনের মাথায় তা সাক্ষ্য-প্রমাণসহ সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর তা জুমআ-ঈদের মতো এতো ব্যাপকভাবে জানাজানি হওয়ার বিষয়ও নয়।

পূর্বের ফুকাহায়ে কেরামের সমকালীন প্রেক্ষাপট হিসেবে বিষয়টি স্পষ্ট। কারণ, তখন অবস্থা এমন ছিলো না যে, মুসলমান শাসক দখল করার পর মিডিয়ার মাধ্যমে ঘোষণা দেবেন- 'আজ থেকে এ ভূখণ্ড মুসলমানদের দখলে এবং তাতে ইসলামি আইন-কানুন চলবে।' বরং কাজে-কর্মে তা প্রকাশ হতো। বলা যায়, এ দৃষ্টিকোণ থেকেই মোল্লা খসরু ইসলামি আইন-কানুন জারি করার উদাহরণস্বরূপ জুমআ-ঈদ উল্লেখ করেছেন।

এছাড়াও জুমআ-ঈদ কায়েম থাকার অর্থ 'হুদুদ-কিসাস' কায়েম আছে; সাধারণত ফুকাহায়ে কেরামের ধারণায় এমনটিই ছিলো। এ জন্যই 'আমসারুল মুসলিমিন' মুসলমানদের শহরের পরিচয়ই দেয়া হয়েছে, যাতে জুমআ-ঈদ ও

'হুদুদ' কায়েম করা হয়। আলাউদ্দিন আলকাসানি 'বাদায়েউস সানায়ে' কিতাবে এভাবেই পরিচয় দিয়েছেন-

وإنما يكره ذلك في أمصار المسلمين، وهي التي يقام فيها الجمع والأعياد والحدود. (بدائع الصنائع، كتاب السير، مطلب وأما بيان ما يؤخذ به أهل الذمة، ١١٣/٧)

"এবং তা মুসলমানদের শহরে মাকরূহ। আর মুসলমানদের শহর হচ্ছে, যাতে জুমআ, ঈদ ও হুদুদ কায়েম করা হয়।" (বাদায়েউস সানায়ে', ৭/১১৩)

'রদ্দল মুহতার' কিতাবেও এভাবে উল্লেখ হয়েছে-

لأن المنع مختص بأمصار المسلمين التي تقام فيها الجمع والحدود. (رد المحتار، كتاب الجهاد، الباب الرابع: باب العشر والخراج والجزية، فصل في الجزية، مطلب في بيان أن الأمصار ثلاثة وبيان إحداث الكنائس فيها، ٢٤٨/٦)

"কেননা নিষেধাজ্ঞার সম্পর্ক মুসলমানদের শহরের সঙ্গে, যাতে জুমআ ও হুদুদ কায়েম করা হয়।" (রদ্দুল মুহতার, ৬/২৪৮)

সুতরাং স্পষ্ট যে, মোল্লা খসরুর বক্তব্যেও এ ধারণার পক্ষে কোনো দলিল নেই।

আ'যমির রহ. ব্যাখ্যা অনুযায়ী বর্তমান ইসলামের সোনালি যুগ

আ'যমির রহ. মতে যেহেতু আহকামুল ইসলাম জারি করা দ্বারা উদ্দেশ্য জুমআ-ঈদ আদায় করতে পারা। আর অপরদিকে সকল ফুকাহায়ে কেরামের ঐক্যমত্যে আহকামুল ইসলাম জারি করা হলে দারুল হারব দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যায়। তো বর্তমানে যেহেতু বলতে গেলে পুরো পৃথিবীর যেকোনো ভূখণ্ডে মুসলমানরা জুমআ-ঈদ বা মোটের উপর ইসলামি বিধি-বিধান পালন করতে পারে। এমনকি ইসরাইলেও মুসলমানরা জুমআ-ঈদ আদায় করতে পারে। সুতরাং বলা যায়, বর্তমানে ইসরাইলসহ পুরো পৃথিবী দারুল ইসলাম। কমপক্ষে আ'যমির রহ. ভাগ অনুযায়ী হুকমি দারুল ইসলাম তো বটেই।

অযথাই আমরা ইতিহাসের পাতায় ইসলামের সোনালি যুগ খুঁজে বেড়াই। বর্তমান যুগের মোকাবেলায় চার খলিফার যুগসহ কোনো যুগকেই সোনালি যুগ বলার কারণ নেই। কেননা কোনো যুগেই পুরো পৃথিবী দারুল ইসলাম ছিলো

না। কিন্তু গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার বদান্যতায় (?) বর্তমানে পুরো পৃথিবী দারুল ইসলাম। বিশেষকরে আ'যমির রহ. যুগের পর থেকে বলা যায়, মুসলমানরা ইতিহাসের সর্বোত্তম সোনালি যুগে বসবাস করছে।

এই গৌরবময় অর্জনের উপর শুধু চক্ষুযুগল হতে দু'ফোঁটা অশ্রুর বিসর্জন নয়, বরং চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করে। فلا حول ولا قوة إلا بالله।

আ'যমি রহ. তাঁর পুস্তিকায় আসলি দারুল হারবের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন সাউথ আফ্রিকাকে আর হুকমি দারুল হারবের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন স্পেনকে। (দেখুন: দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃ: ২২-২৩)। অথচ এটি তাঁর ব্যাখ্যার সঙ্গে পরিপূর্ণই সাংঘর্ষিক। কেননা উভয় ভূখণ্ডে জুমআ-ঈদ আদায় করা যায়। সুতরাং উভয়টি তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী কমপক্ষে হুকমি দারুল ইসলাম হতে কোনো বাধা নেই।

পূর্বের 'আমান' বহাল থাকার ব্যাখ্যায় আ'যমি রহ.

পেছনের পূর্ণ আলোচনা যাদের স্মরণে আছে তাদের জানা আছে, দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার জন্য 'পূর্বের আমান' বা 'ইমানের দাবিতে প্রাপ্য আমান' বিলুপ্ত হওয়ার শর্ত শুধু ইমাম আবু হানিফার রহ. রায়। সেক্ষেত্রেও ফুকাহায়ে কেরামের ব্যাখ্যার সারাংশ হচ্ছে, 'আমান' বিলুপ্ত হওয়া কাফেরদের পূর্ণ দাপট ও প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠার দলিল, আর নতুন করে 'আমান' গ্রহণের প্রয়োজন না হওয়া এবং পূর্বের 'আমান' সাধারণত বহাল থাকা কাফেরদের দাপট ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হওয়া এবং মুসলমানদের দাপট ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকার দলিল। শুধু 'আমান' বহাল থাকার বাহ্যত শব্দই উদ্দেশ্য নয়, বরং নতুন করে 'আমান' গ্রহণ করার প্রয়োজন কেনো হচ্ছে বা হচ্ছে না; সেটি দেখার বিষয়। ইমাম আবু হানিফার রহ. সমকালীন প্রেক্ষাপট হিসেবে এ শর্তের যৌক্তিকতাও ছিলো; যেমনটি আমরা পূর্বে আলোচনা করে এসেছি।

কিন্তু আ'যমি রহ. 'বাদায়েউস সানায়ে'র ইবারত "فما لم تقع الحاجة للمسلمين إلى الاستئمان بقي الأمن الثابت فيها على الإطلاق فلا تصير دار الكفر" (সুতরাং মুসলমানদের যদি 'আমান' গ্রহণের প্রয়োজন না হয়, তাহলে সে অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত 'আমান' সাধারণত বহাল থাকায় তা দারুল কুফরে পরিণত হবে না)

পেয়ে নিজের ধারণার উপর এতো অতিরঞ্জন করেছেন এবং বিপরীত মত পোষণকারীদের ব্যাপারে এমন বিদ্বেষমূলক কটূক্তি করেছেন; যা খুবই দুঃখজনক। (দেখুন: দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃ: ১৬-২২)

অথচ তিনি যদি শুধু তাঁর উল্লেখকৃত অংশটুকুও একটু গভীরভাবে চিন্তা করতেন, তাহলেও এতো ভয়ঙ্কর পদস্খলনের শিকার হতেন না। তিনি যদি বিষয়টিকে এভাবে চিন্তা করতেন যে, যেহেতু মুসলমানদের নতুন করে 'আমান' গ্রহণের প্রয়োজন না হওয়ায় বুঝা যাচ্ছে প্রতিষ্ঠিত 'আমান' সাধারণত বহাল আছে; সুতরাং যদি বাস্তবতায় দেখা যায় মুসলমানদের 'ইমানের দাবিতে প্রাপ্য আমান' বা 'পূর্বের আমান' সাধারণত বহাল নেই, তাহলে সেটিকেই আমলে আনা উচিত। নতুন করে 'আমান' গ্রহণের প্রয়োজন হয়েছে কি হয়নি; তা নিয়ে বসে থাকার কোনো কারণ নেই। কিন্তু তিনি তা নিয়ে বসে থাকতেই পছন্দ করেছেন এবং অন্যদের প্রতি শুধু আক্রোশই প্রকাশ করেছেন।

এছাড়াও শুধু 'বাদায়েউস সানায়ে' থেকেও যদি তিনি আলাউদ্দিন কাসানির পুরো বক্তব্য গভীর দৃষ্টিতে পড়তেন, তাহলেও বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার কথা ছিলো। কাসানি রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক অতিরিক্ত শর্তদুটির যৌক্তিকতা বুঝাতে গিয়ে শেষ পর্যায়ে বলেছেন-

على أن الإضافة إن كانت باعتبار ظهور الأحكام لكن لا تظهر أحكام الكفر إلا عند وجود هذين الشرطين، أعني المتاخمة وزوال الأمان الأول، **لأنها لا تظهر إلا بالمنعة ولا منعة إلا بهما**. والله سبحانه وتعالى أعلم. (بدائع الصنائع، كتاب السير، فصل وأما بيان الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين، ١٣١/٧)

আর যদি বলা হয়, সম্বন্ধযুক্ত হওয়া বিধি-বিধান প্রকাশ পাওয়ার বিবেচনায় হয়ে থাকে, (সেক্ষেত্রে আমরা বলবো,) এ দু'টি শর্ত তথা দারুল হারব সংলগ্ন হওয়া ও পূর্বের আমান বিলুপ্ত হওয়ার অনুপস্থিতিতে কুফরের বিধান প্রকাশ পাওয়া প্রমাণিত হয় না। **কেননা তাদের বিধি-বিধান প্রকাশ পাবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে, আর শর্তদু'টি ব্যতীত প্রতিরক্ষা সাব্যস্ত হয় না।"** (বাদায়েউস সানায়ে', ৭/১৩১)

আলাউদ্দিন কাসানির বক্তব্য থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, দারুল হারব সংলগ্ন না হওয়া বা পূর্বের 'আমান' বহাল থাকা দ্বারা তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা প্রমাণিত হয়, ফলে তাদের বিধি-বিধান প্রকাশের দাপটও প্রকাশ পায় না।

এই বিবরণ সামনে থাকা সত্ত্বেও যখন দেখা যাচ্ছে, কাফেরদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পূর্ণরূপে সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তাদের আইন-কানুন দাপটের সঙ্গে প্রকাশ পাচ্ছে এবং মুসলমানদের দাপট ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে গেছে; তারপরও যেহেতু কাফেররা কৌশল হিসেবে নতুন 'আমান' গ্রহণের জন্য বাধ্য করেনি, তাই এ দাবি করা যে, পূর্বের 'আমান' সাধারণত বহাল থাকায় তা দারুল হারবে পরিণত হবে না; এর চেয়ে দুঃখজনক দাবি আর কী হতে পারে!

এ তো গেলো আলাউদ্দিন কাসানির বক্তব্যের আলোকে, যার আংশিক ইবারতের অসম্পূর্ণ বুঝের ভিত্তিতে আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমি তাঁর ধারণার উপর অটল থাকার চেষ্টা করেছেন। আর যদি আবু বকর আলজাসসাস, সারাখসি, কাযি খান ও বুরহানুদ্দিন আলবুখারি প্রমুখের ব্যাখ্যাকে সামনে রাখা হয়, তাহলে তো তাঁর দাবির অসঙ্গতি প্রমাণে আর কোনো অস্পষ্টতাই থাকে না। যেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে; এখানে পুনরাবৃত্তি করে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করার প্রয়োজন নেই।

আ'যমির রহ. আরো এক অদ্ভুত কথা

আ'যমি রহ. বুঝেই নিয়েছেন যে, যেহেতু নতুন করে 'আমান' গ্রহণের প্রয়োজন হয়নি, তাই হিন্দুস্তানে ইংরেজদের আমলেও পূর্বের 'আমান' বহাল ছিলো এবং এখনো বহাল আছে; চাই মসজিদ ভেঙ্গে দেয়া হোক, মুসলমানরা শঙ্কার মধ্যে জীবন যাপন করুক, ব্যক্তিজীবনেও ইসলামের সব রীতি-নীতি নিরাপদে পালন করতে সক্ষম না হোক ইত্যাদি ইত্যাদি। এটি এমন এক শক্তিশালী 'আমান' যা বিলুপ্ত হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। ইসলাম ও মুসলমান নিঃশেষ হয়ে যাক; কিন্তু যেহেতু নতুন করে 'আমান' গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়নি, তাই পূর্বের 'আমান' বহাল থাকায় তা দারুল হারবে পরিণত হবে না।

আবু বকর আলজাসসাস রহ. তো বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা রহ. আমাদের সময় পেলে সাহেবাইনের মত পোষণ করতেন। আল্লামা হাবিবুর রহমান

আ'যমির ব্যাখ্যা দেখে আমাদেরও বলতে হয়, ইমাম আবু হানিফা রহ. যদি বুঝতে পারতেন যে, তাঁর আরোপ করা শর্ত এরূপ বিকৃতভাবে 'মাযলুম' হবে, তাহলে তিনি হাজারবার এই শর্ত থেকে 'রুজু' করে সাহেবাইনের মত পোষণ করতেন।

যা হোক, আ'যমি রহ. তাঁর ধারণাকে আপত্তিমুক্ত করার উদ্দেশ্যে বলেন-

امان وخوف سے ملک کے شہریوں کے باہمی لڑائی دنگے، اور فرقہ وارانہ فسادات میں اتلاف نفس وعرض ومال کا خوف اور بے خوفی مراد نہیں۔(دار الاسلام اور دار الحرب، ص۱۹)

“আমান' ও 'খাওফ' দ্বারা রাষ্ট্রের অধিবাসীদের পারস্পরিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও সাম্প্রদায়িক উস্কানিতে জান-মাল ও সম্মানহানীর শঙ্কা থাকা না থাকা উদ্দেশ্য নয়”। (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃ: ১৯)

আ'যমি রহ. এ কথা বলে কী বুঝাতে চাচ্ছেন? হিন্দুস্তানে ইসলাম ও মুসলমানদের উপর যে নির্যাতন চলেছে বা চলছে, তা কি শুধুই পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ! যেহেতু নতুনকরে 'আমান' গ্রহণের প্রয়োজন হয়নি, তাই পূর্বের 'আমান' সামান্যতমও বিঘ্নিত হয়নি?!?!?!?!?!

অন্যথায় কে না জানে; হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা শিরোনামে ভারতে যা কিছু ঘটেছে বা ঘটে চলছে, তা কি পারস্পরিক মারামারি নাকি হিন্দু কর্তৃক মুসলমান হত্যাযজ্ঞের মহড়া! এই মহড়া কি শুধু অধিবাসীদের নাকি নির্বাহী শক্তি ও প্রশাসনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদের নির্যাস! এটিই কি বাস্তবতা নয়? এর জন্য কি খুব বেশি তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করা জরুরি? এর সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ কি এটি নয় যে, এক সময়ের দাঙ্গার নাটের গুরু পরবর্তীতে নির্বাহী শক্তির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য! এক সময়ের গুজরাটের কসাই মোদি পরবর্তীতে 'অল ইন্ডিয়া'র ত্রাণকর্তা (?)! সে সময়ের দাঙ্গায় তারা সাধারণ অধিবাসী আর এ সময়ের দাঙ্গার পর তাদের মানবতার বাণী অমিয়-সুধা??????

এগুলো যুক্তি-তর্কের বিষয় নয়, এগুলো অনুভূতি ও 'দ্বীনি গাইরাত' আত্মমর্যাদাবোধের বিষয়। যদি বিশ্ব কুফরি শক্তির সাপ হয়ে দংশনের বিষয়টিকে অগোচরে রেখে ওঝা হয়ে ঝাড়তে আসার মানবতাকে (?) আমলে নেয়া হয়, তাহলে ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে যাবে।

শাহ আব্দুল আযিয ও গাঙ্গুহির বক্তব্য উপস্থাপনে অসঙ্গতি

হিন্দুস্তানে 'আমান'র শর্তও যে বিলুপ্ত হয়েছে, সেটির আলোচনায় আমরা শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবি ও রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহিসহ কয়েকজন আকাবিরে আসলাফের বক্তব্য উল্লেখ করেছি। আ'যমি রহ. শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবির বুঝকে প্রত্যাখ্যান করার উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য এভাবে উপস্থাপন করেছেন-

چنانچہ بعض اجلۂ علماء کے کلام سے (بشرطیکہ یہ نسبت صحیح ہو) ظاہر ہے کہ جس ملک میں کوئی مسلمان یا ذمی بلا استیمان کے داخل نہ ہو سکے وہاں امان سابق باقی نہیں رہا.......۔(دار الاسلام اور دار الحرب، ص۱۶-۱۷)

"যেমন কোনো কোনো সম্মানিত আলেমের বক্তব্য থেকে (নিসবত সহিহ হওয়ার শর্তে) প্রকাশ্য, যে রাষ্ট্রে কোনো মুসলমান বা 'যিম্মি' 'আমান' গ্রহণ করা ব্যতীত প্রবেশ করতে না পারে, তাতে 'পূর্বের আমান' বহাল থাকে না ....।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃ: ১৬-১৭)

এতোটুকু উল্লেখ করার পর আ'যমি রহ. দাবি করেছেন যে, ফুকাহায়ে কেরাম কর্তৃক 'আমান'র ব্যাখ্যার সঙ্গে এটি সমঞ্জস হয় না। কিন্তু শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. যে এর পূর্বেই "کیونکہ مسجدوں کو بے تکلف منہدم کرتے ہیں" (কেননা তারা মসজিদগুলোকে নির্দ্বিধায় ধ্বংস করে দিচ্ছে) বলেছেন; আ'যমি রহ. তা উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছেন। (দেখুন: ফাতাওয়া আযিযি -উর্দু-, পৃ: ৪৫৫)

আর শাহ সাহেবের ব্যাপারে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তা তো পর্যালোচনার শুরুর দিকেই উল্লেখ করা হয়েছে।

তেমনিভাবে গাঙ্গুহি রহ. কর্তৃক 'আমান'র ব্যাখ্যা তিনি হাকিমুল উম্মাহ থানবি রহ. কর্তৃক রচিত 'তাহযিরুল ইখওয়ান' থেকে উল্লেখ করে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু গাঙ্গুহি রহ. যে এ বিষয়ক তাঁর স্বতন্ত্র রচনা 'ফায়সালাতুল আ'লাম ফি দারিল হারবি ওয়াদারিল ইসলাম' রিসালায় হিন্দুস্তানের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে স্পষ্টভাবে বলেছেন "کہ اگر ادنی کلکٹر حکم کرد کہ در مساجد جماعت ادا نکنید ہیچ کس از امیر وغریب قدرت ندارد کہ ادائے آں نماید" (সাধারণ একজন ডেপুটি

কমিশনারও যদি আদেশ করে যে মসজিদে জামাআত করো না, তাহলে ধনী-গরিব কেউই তা আদায় করে দেখাতে সক্ষম নয়), তা এড়িয়ে গেছেন। (দেখুন: তালিফাতে রশিদিয়া, পৃ: ৬৬৭)

কেনো এই অসঙ্গতি?

শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. ও রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রহ. যে দুটি অবস্থা তুলে ধরেছেন, প্রত্যেকটি তাঁদের সমকালীন হিন্দুস্তানের বাস্তবতা। আ'যমি রহ. খুব সূক্ষ্মভাবে অবস্থাদুটি এড়িয়ে গেছেন। তিনি ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন; যদি এ দু'টি অবস্থা পাঠকের সামনে এসে যায়, তাহলে 'আমান'র যে ধারণা তিনি দিতে চাচ্ছেন তা সাব্যস্ত হবে না। সাধারণ পাঠকও বলে উঠবে, এটি কোন গ্রহের 'আমান' যা এতো কিছুর পরও বিলুপ্ত হয় না!

গাঙ্গুহির রহ. বক্তব্যের ব্যাপারে মন্তব্য করে আ'যমি রহ. বলেন-

اور ظاہر ہے کہ عبارت فقہاء کی مراد بیان کرنے میں حضرت گنگوہی اور صاحب بدائع میں اختلاف ہو تو صاحب بدائع کے قول کو ترجیح ہو گی۔(دار الاسلام اور دار الحرب، ص ۳۱)

"আর এটিই স্পষ্ট যে, ফুকাহায়ে কেরামের ইবারতের ব্যাখ্যায় যদি হযরত গাঙ্গুহি ও সাহেবে বাদায়ে'র মাঝে মতানৈক্য হয়ে যায়, তাহলে সাহেবে বাদায়ে'র কথাই প্রাধান্য পাবে।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃ: ৩১)

অথচ যে কোনো পাঠক গাঙ্গুহির রহ. পুরো 'রিসালাহ' বুঝে-শুনে অধ্যয়ন করলে সাহেবে বাদায়ে' কাসানিসহ যে সকল ফকিহের বক্তব্য আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি; সকলের আলোচনা ও গাঙ্গুহির আলোচনার সারাংশ একই পাবে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, আ'যমি রহ. কর্তৃক ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যের উদ্দেশ্য অনুধাবন যথাযথ হয়নি।

এখানে একটি প্রাসঙ্গিক কথা বলে দেয়া উচিত। গাঙ্গুহি রহ. দারুল হারব সংলগ্ন হওয়া না হওয়ার যে ব্যাখ্যা করেছেন এবং আ'যমি রহ. তা প্রত্যাখ্যান করেছেন; তা যথাযথ না হলেও কোনো জটিলতা নেই। কেননা পুরো হিন্দুস্তান যে দারুল ইসলাম কর্তৃক বেষ্টিত নয়, তা একটি প্রকাশ্য বিষয়। পূর্বেও যার আলোচনা হয়েছে।

বিপরীত মত পোষণকারীদের ব্যাপারে আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ

আ'যমি রহ. তাঁর বিপরীত মত পোষণকারীদের ব্যাপারে আক্রোশ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন-

یہاں پہونچ کر ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی نہایت ضروری ہے جو اس سلسلہ میں سب سے زیادہ غیر ذمہ دارانہ افتاء کا نتیجہ اور قطعاً غیر عالمانہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض حضرات نے فقہائے احناف کی ان تمام تصریحات کو جو دار الاسلام و دار الحرب کی تعیین و تشخیص کے باب میں ہیں نظر انداز کر کے صرف بدائع الصنائع کے ایک فقرہ کو بے سمجھے ہوئے یا مصنف کے منشا کے خلاف اپنے مزعومہ مفہوم کے ساتھ لے لیا اور اسی کو اپنی تحقیق کا مدار قرار دیدیا۔ (دار الاسلام اور دار الحرب، ص۱۸)

"এ পর্যায়ে এসে একটি ভুল ধারণার অবসান হওয়া খুবই জরুরি যা এ সংক্রান্ত সর্বাপেক্ষা দায়িত্বহীন ফাতওয়া প্রদানের ফলাফল এবং নিশ্চিত আলেমসুলভ আচরণ বহির্ভূত। আর তা হচ্ছে, কেউ কেউ দারুল ইসলাম ও দারুল হারব নির্ধারণের ক্ষেত্রে হানাফি ফুকাহায়ে কেরামের এই সকল স্পষ্ট বক্তব্যকে দৃষ্টির অগোচরে রেখে শুধু বাদায়েউস সানায়ে'র একটি বাক্য না বুঝেই বা মুসান্নিফের উদ্দেশ্যের বিপরীতে নিজের ধারণাকৃত বুঝের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে, আর এটিকেই নিজের 'তাহকিক'র মূলভিত্তি সাব্যস্ত করে দিয়েছে।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃ: ১৮)

আ'যমি রহ. এরপর যা বলেছেন, সেটির আলোচনা পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে। তাঁর এ মন্তব্যের ব্যাপারে আমাদের একেবারেই সংক্ষিপ্ত কথা হচ্ছে, আ'যমি রহ. এখানে তাঁর বিপরীত মত পোষণকারীদের ব্যাপারে যা বলেছেন, তা একমাত্র তাঁর নিজের ক্ষেত্রেই শতভাগ প্রযোজ্য।

সঠিক বলেও আ'যমির বাক্যবাণে মাযলুম সাইয়েদ মুহাম্মাদ মিয়া রহ.

'উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযি'সহ বহু কালজয়ী গ্রন্থ প্রণেতা মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ মিয়া রহ. (মৃ: ১৩৯৫ হি:)। তিনিও মুফতি মাহদি হাসান শাহজাহানপুরির কাছাকাছি শব্দে দারুল হারবের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, "اگر مسلم اسٹیٹ نہیں تو دار الاسلام نہیں ہے" মুসলিম স্টেট-রাজ্য না হলে তা দারুল ইসলাম নয়। (দেখুন: আলজামইয়্যাহ ২৭-৫-১৯৬৬ ইং কলাম ৪, সূত্রে দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃ: ২০)। মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ মিয়া রহ.

কর্তৃক সমকালীন প্রেক্ষাপট হিসেবে অমুসলিম স্টেটকে দারুল হারব আখ্যা দেয়া যথার্থই হয়েছে। এবং এটি প্রণিধানযোগ্য রায় তথা সাহেবাইন ও জুমহুরের মতের হুবহু বহিঃপ্রকাশ; যেমনটি আমরা শাহজাহানপুরির বক্তব্যের পর্যালোচনায় স্পষ্ট করেছি। কিন্তু আ'যমি রহ. এক্ষেত্রেও যথারীতি আচরণ করেছেন। সাইয়েদ মুহাম্মাদ মিয়ার ব্যাপারে হাবিবুর রহমান আ'যমির টুকরো টুকরো কিছু অংশ আমরা একটু লক্ষ্য করি-

حیرت ہے کہ اس تصریح کے ہوتے ہوئے مولانا محمد میاں صاحب ناظم جمعیت علماء کو یہ لکھنے کی جرأت کیوں کر ہوئی کہ غیر مسلم اسٹیٹ کو دار الحرب کہا جاتا ہے۔ "اگر مسلم اسٹیٹ نہیں تو دار الاسلام نہیں ہے"۔ (دار الاسلام اور دار الحرب، ص ۲۰)

"আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এতো স্পষ্ট বক্তব্য থাকা সত্ত্বেও নাযেমে জমিয়তে উলামা মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়া সাহেবের কীভাবে এটি লেখার সাহস হলো যে, অমুসলিম স্টেটকে দারুল হারব বলা হয়। 'মুসলিম স্টেট না হলে তা দারুল ইসলাম নয়।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃ: ২০)

بہر حال یہ طریقہ بالکل غلط اور ناجائز ہے کہ فقہاء کی غلط ترجمانی کی جائے اور ان کے کلام کو غلط محمل پر حمل کر کے یہ ظاہر کیا جائے کہ جو ہم کہتے ہیں وہی وہ بھی کہتے ہیں۔ اس سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ آپ فقہاء کی مخالفت کیجئے اور دلائل سے ان کے کلام کی تردید کیجئے۔ (دار الاسلام اور دار الحرب، ص ۲۱)

"যা হোক, এটি একেবারেই ভুল ও নাজায়েয পদ্ধতি যে, ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা এবং তাদের ভাষ্যকে ভুল ক্ষেত্রে আরোপ করে এটা প্রকাশ করা যে, আমরা যা বলছি তারাও তাই বলছে। এর চেয়ে হাজারগুণ উত্তম; আপনি ফুকাহায়ে কেরামের বিপক্ষ অবলম্বন করে দলিলের আলোকে তাদের বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে দিন।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃ: ২১)

افسوس ہے کہ یہ عبارت مولانا محمد میاں صاحب کے مدعا کے بالکل خلاف ہے، مگر وہ اس کو اپنی تائید میں نقل کر رہے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے قصداً ایسا کیا ہے یا بدائع کی عبارت کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کا یہ نتیجہ ہے۔ (دار الاسلام اور دار الحرب، ص ۲۲)

"আফসোস! এই ইবারত মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়া সাহেবের দাবির সম্পূর্ণ বিপরীত। অথচ তিনি সেটিকে নিজের সমর্থনে উল্লেখ করছেন। আমরা জানি

না, তিনি ইচ্ছাকৃতই এমনটি করেছেন নাকি বাদায়ে'র ইবারত সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে না পারার ফলাফল।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃ: ২২)

বাদায়েউস সানায়ে'র যে ইবারত নিয়ে আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির এতো অসার দাবি, সেটির ব্যাখ্যা পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে।

আ'যমির রহ. পুস্তিকার পুরো পর্যালোচনা যাদের স্মরণে আছে, তারা স্পষ্টই বুঝতে পারছেন; আ'যমি রহ. সাইয়েদ মুহাম্মাদ মিয়ার রহ. ব্যাপারে যে মন্তব্য করেছেন তা শতভাগ তাঁর নিজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। إنا لله وإنا إليه راجعون।

মূলত আ'যমি রহ. সাহেবাইন ও জুমহুরের রায়কে ধামাচাপা দিতে দিতে এক পর্যায়ে এসে ভুলেই গেছেন যে, এখানে আরেকটি মত আছে।

আ'যমি কর্তৃক নানুতবি ও গাঙ্গুহির রায়ে অসঙ্গতি দেখানোর চেষ্টা

আমরা পূর্বে শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবি, কাসেম নানুতবি ও রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহিসহ আকাবিরে হিন্দ থেকে বহু মনীষার উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছি যে, তারা সুস্পষ্ট ভাষায় হিন্দুস্তানকে দারুল হারব হিসেবে রায় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আ'যমি রহ. আলোচনাকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন; মনে হবে, প্রথম সারির আকাবিরে হিন্দ থেকে শাহ সাহেব, নানুতবি ও গাঙ্গুহি ব্যতীত আর কেউ হিন্দুস্তানকে দারুল হারব বলেননি।

এরপর আ'যমি রহ. শাহ সাহেবের ব্যাপারে যা মন্তব্য করেছেন, তা পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে। কাসেম নানুতবির রায় সংশয়পূর্ণ করার লক্ষ্যে 'কাসেমুল উলুম'র উদ্ধৃতিতে তাঁর বক্তব্য উল্লেখ করতে গিয়ে আ'যমি রহ. বলেন-

ان سب باتوں کو نگاہ میں رکھئے تو اس بات کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارۂ کار نظر نہیں آتا کہ فقہاء کے مذکورہ بالا ارشادات کے روسے ہندوستان کا دار الحرب ثابت ہونا ناممکن ہے، اور ان کی روسے وہ بلا شک وشبہ دار الاسلام ہے، چنانچہ حضرت مولانا نانوتوی قدس سرہ نے یہی کیا ہے، کہ باوجودیکہ ان کا میلان ہندوستان کے دار الحرب کی طرف ہے (جس کی مولانا نے کوئی وجہ نہیں بتائی) پھر بھی انہوں نے اس حق بات کے اعتراف میں کوئی پس وپیش نہیں کیا کہ: باعتبار روایت منقولہ ہندوستان دار الاسلام است۔ (دار الاسلام اور دار الحرب، ص۲۸)

"এ সকল বক্তব্যকে সামনে রাখলে এটি মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় দেখছি না যে, ফুকাহায়ে কেরামের উপর্যুক্ত বক্তব্যের আলোকে হিন্দুস্তান দারুল হারব

প্রমাণিত হওয়া অসম্ভব। সেগুলোর আলোকে তা নিঃসন্দেহে দারুল ইসলাম। যেমন হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবি রহ. এমনটিই করেছেন। হিন্দুস্তান দারুল হারব হওয়ার প্রতি তাঁর ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও (মাওলানা যার কোনো কারণ বলেননি) এই সত্য কথা স্বীকার করতে কোনো আগ-পিছ করেননি যে, উদ্ধৃত বর্ণনাগুলোর আলোকে হিন্দুস্তান দারুল ইসলাম।"[৪৮] (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃঃ ২৮)

'কাসেমুল উলুম' কিতাবটি আ'যমির রহ. সামনে থাকা সত্ত্বেও যথারীতি তিনি নানুতবির কথার মূল প্রেক্ষাপটকে আড়াল করে ইবারতের এই ভগ্নাংশটি উল্লেখ করেছেন। সচেতন পাঠক 'কাসেমুল উলুম' কিতাবের ৩৫৪ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে ৩৭১ নম্বর পৃষ্ঠা পর্যন্ত অধ্যয়ন করলে বিষয়টি সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন।

বাস্তবতা হচ্ছে, ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য ও সমকালীন জুমহুর উলামায়ে কেরামের রায়ের ভিত্তিতে যেহেতু হিন্দুস্তান দারুল হারব হওয়া প্রমাণিত, তাই নানুতবি রহ. দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করে সেটি নতুন করে সাব্যস্ত করার চেষ্টা না করে শুধু নিজের রায় প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, হিন্দুস্তান দারুল হারব হওয়াই তাঁর দৃষ্টিতে প্রণিধানযোগ্য রায়।

এর পূর্বে তিনি মূলত 'রিবা'-সুদের বিষয়ে আলোচনা করতে ছিলেন। ইমাম আবু হানিফার রহ. মতে যেহেতু মুসলমান ও হারবির মাঝে 'রিবা'র নিষেধাজ্ঞা বিবর্জিত; এর ভিত্তিতে হিন্দুস্তান দারুল হারব হওয়ার ঘোষণার পর থেকে অনেকের অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, হিজরত করতে বললে তাতে প্রস্তুত থাকে না, কিন্তু 'রিবা'র লেনদেনের সঙ্গে ঠিকই জড়িয়ে পড়েছে।

কাসেম নানুতবির রহ. দৃষ্টিতে এটি ছিলো একেবারেই একটি অন্যায় মানসিকতা। তাই তিনি প্রথমে ইমাম আবু হানিফার রহ. রায়ের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বুঝিয়েছেন যে, হিজরত না করে দারুল হারবে অবস্থান করে ইমাম আবু হানিফার রহ. মতেও 'রিবা'র লেনদেন করা জায়েয হবে না। এছাড়াও তিনি বলেছেন, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম

---

৪৮. আ'যমি রহ. এর আলোচ্য পুস্তিকার অনুবাদক কাসেম নানুতবির রহ. বাক্যটির অনুবাদ করেছেন, 'রেওয়ায়াত অনুযায়ী হিন্দুস্তান দারুল ইসলাম'। "منقول" শব্দের অনুবাদ বুঝে-শুনেই বাদ দিয়েছেন কি না; বলতে পারছি না।

আহমাদসহ অধিকাংশ ইমামের মতে যেহেতু দারুল হারবেও 'রিবা'র লেনদেন জায়েয নয়, সে বিবেচনায়ও তা বর্জনীয়।

এক পর্যায়ে এসে নানুতবি রহ. ইসবিজাবি, উসরুশানি প্রমুখগণের বক্তব্যগুলো উল্লেখ করে বুঝাতে চেয়েছেন, যেহেতু এই উদ্ধৃতিগুলোর আলোকে হিন্দুস্তান দারুল ইসলাম হওয়ারও একটি ধারণা তৈরি হয়,(৪৯) তাই হিন্দুস্তানে 'রিবা'র বিষয়টি পরিপূর্ণই বিবর্জিত হতে হবে। কেননা দারুল হারব হলেও যেখানে তা জায়েয হচ্ছে না, দারুল ইসলাম হলে তো তা অনুমোদিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

তো নানুতবি রহ. কথাটি বলেছেন একটি বিশেষ মানসিকতাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য। কিন্তু আ'যমি রহ. পুরো বিষয়টিকে আড়াল করে একটি বাক্য দেখিয়ে নানুতবির রহ. রায়ে সংশয় সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

আর 'মাওলানা যার কোনো কারণ বলেননি' বলে আ'যমি রহ. কী বুঝাতে চাচ্ছেন? নানুতবি রহ. কি তাঁর সামনে হিন্দুস্তান দারুল ইসলাম হওয়ার প্রমাণ বিদ্যমান থাকা এবং দারুল হারব হওয়ার কোনো প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও দারুল হারব হওয়ার ব্যাপারে রায় প্রদান করেছেন?

তেমনিভাবে যে গাঙ্গুহি রহ. ইংরেজদের শাসনকাল থেকে হিন্দুস্তান দারুল হারব হওয়া সংক্রান্ত 'ফায়সালাতুল আ'লাম ফি দারিল হারবি ওয়াদারিল ইসলাম' নামক স্বতন্ত্র 'রিসালাহ' রচনা করেছেন, ফাতাওয়া রশিদিয়াতে যাঁর সুস্পষ্ট ফাতওয়া উল্লেখ হয়েছে যে, 'আমার দৃষ্টিতে পুরো হিন্দুস্তান-ভারতবর্ষ দারুল হারব। এখানের কাফের মহিলারা হারবি, তাই মুসলমান মহিলাদের জন্য তাদের সঙ্গে পর্দা করা আবশ্যক।' (দেখুন: ফাতাওয়া রশিদিয়া, পৃ: ৫৯৩)। সে গাঙ্গুহির রহ. রায়েও আ'যমি রহ. সংশয় সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়েছেন।

এটা বাস্তব যে, গাঙ্গুহি রহ. মাসআলা 'তাহকিক' করার আগ পর্যন্ত 'আমার পরিপূর্ণ তাহকিক নেই', 'আমি মতামত ব্যক্ত করতে চাচ্ছি না' বা 'যারা দারুল হারব বলে তাদের বক্তব্যের কারণ জানতে হবে' এ জাতীয় কথা বলেছেন। পরবর্তীতে তিনি 'তাহকিক' করে স্বতন্ত্র 'রিসালাহ' রচনা করেছেন এবং দারুল

---

৪৯. তবে পূর্বে উল্লিখিত আমাদের পর্যালোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এই উদ্ধৃতিগুলোর আলোকেও হিন্দুস্তান দারুল ইসলাম হওয়া প্রমাণিত হয় না।

হারব হওয়ার ফাতওয়া দিয়েছেন। কিন্তু আ'যমি রহ. গাঙ্গুহির পূর্বের কথাগুলো উল্লেখ করে বলছেন-

۴-اور چوتھی تحریر یہ ہے جس میں کہنا چاہئے کہ بہت زور وقوت سے اس کا دار الحرب ہونا ثابت کیا ہے، ان تحریروں پر کوئی تاریخ بھی دی ہوئی نہیں ہے کہ مقدم ومؤخر کا فیصلہ ہو سکے۔(دار الاسلام اور دار الحرب، ص۳۳-۳۴)

"৪- আর চতুর্থ লেখা যার ব্যাপারে বলা উচিত যে, অনেকটা জোরপূর্বক[৫০] সেটিকে দারুল হাবর হিসেবে প্রমাণ করেছেন। এই লেখাগুলোতে কোনো তারিখও দেয়া নেই যে, কোনটা পূর্বের এবং কোনটা পরের তা নির্ধারণ করা হবে।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃ: ৩৩-৩৪)।

গাঙ্গুহির রহ. বক্তব্য কোনটা পূর্বের আর কোনটা পরের; এটি বুঝার জন্য কি তারিখ দেয়া লাগবে বা বিজ্ঞ আলেম হওয়া লাগবে? নাকি একজন সাধারণ পাঠকও বুঝতে পারবে যে, কোনটা পূর্বের আর কোনটা পরের। এটা কি সম্ভব যে, তিনি ফুকাহায়ে কেরামের ইবারতের আলোকে হিন্দুস্তান দারুল হারব হওয়া প্রমাণ করে এবং সুস্পষ্ট ভাষায় পুরো হিন্দুস্তানকে দারুল হারব ঘোষণা দিয়ে পরে বলবেন, 'আমার পরিপূর্ণ তাহকিক নেই', 'আমি মতামত ব্যক্ত করতে চাচ্ছি না' বা 'যারা দারুল হারব বলে তাদের বক্তব্যের কারণ জানতে হবে'?

এ সংক্রান্ত আ'যমির আরেকটি বিস্ময়কর বক্তব্য-

مگر ان سب کے باوجود حضرت گنگوہی کی ایک تحریر ایسی بھی ہے جس میں انہوں نے ہندوستان کو دار الحرب ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اگرچہ ہندوستان کا نام نہیں لیا ہے۔(دار الاسلام اور دار الحرب، ص۲۹)

"তবে এতো কিছু সত্ত্বেও হযরত গাঙ্গুহির একটি লেখা এমনও আছে, যাতে তিনি হিন্দুস্তানকে দারুল হারব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। যদিও হিন্দুস্তানের নাম উল্লেখ করেননি।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃ: ২৯)

---

৫০. এখানে এভাবেও অর্থ করা যায় যে, 'অনেক শক্তিশালী দলিলে সেটিকে দারুল হারব হিসেবে প্রমাণ করেছেন।' কিন্তু আ'যমি রহ. এই বিষয়টি স্বীকার করার কথা নয়। তাই আমি তাঁর মানসিকতা অনুযায়ী অর্থ করেছি।

আমাদের জানা মতে গাঙ্গুহির রহ. এমন 'রিসালাহ' একটিই, যাতে হিন্দুস্তানের কথা উল্লেখ আছে। প্রশ্নই তো করা হয়েছে হিন্দুস্তানের নাম উল্লেখ করে তা দারুল হারব কি দারুল ইসলাম; তা জানতে। (দেখুন: তালিফাতে রশিদিয়া, পৃ: ৬৫৫)। গাঙ্গুহি রহ. দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পুরো বিষয়টি আলোচনা করার পর 'এবার প্রত্যেকে হিন্দুস্তানের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখি' বলে ইমাম আবু হানিফার রহ. শর্তগুলো হিন্দুস্তানের সঙ্গে সমঞ্জস করে দেখিয়েছেন এবং কয়েকবার হিন্দুস্তানের নাম উল্লেখ করেছেন। (দেখুন: তালিফাতে রশিদিয়া, পৃ: ৬৬৭-৬৬৮)

কিন্তু আ'যমি রহ. 'যদিও হিন্দুস্তানের নাম উল্লেখ করেননি' বলে কী বুঝাতে চেয়েছেন; তা আমাদের অনুধাবনের বাইরে!

সে অধিকাংশ মুহাক্কিক কারা

আ'যমি রহ. কাসেম নানুতবির পূর্বোক্ত কথা উল্লেখ করার পর বলেন-

اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے اکثر محقق اہل افتاء حضرات نے ہندوستان کو دار الحرب قرار دینے سے گریز کیا ہے۔(دار الاسلام اور دار الحرب، ص۲۸)

"আর এ কারণেই হিন্দুস্তানের অধিকাংশ মুহাক্কিক আহলে ইফতা হযরতগণ হিন্দুস্তানকে দারুল হারব হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া থেকে দূরে থেকেছেন।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃ: ২৮)

প্রশ্ন হলো, হিন্দুস্তান দারুল হারব হওয়ার প্রবক্তাদের থেকে আকাবিরে হিন্দের যে বিশাল তালিকা আমরা উল্লেখ করেছি, তার বাইরে অধিকাংশ মুহাক্কিক আহলে ইফতা হযরত কারা? তারা কারা; সেটি অবশ্য তিনি উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

حضرت مولانا کرامت علی جونپوری (جو سید احمد صاحب کی تحریک جہاد میں شامل اور ان کے خلیفہ تھے) فرمایاہے کہ انگریزوں کے ماتحت ہندوستان دار الحرب نہیں ہے۔یہی تحقیق حضرت مولانا عبد الحی لکھنوی کی بھی تھی۔یہی رائے مولانا محمد حسین بٹالوی کی بھی ہے، اور ان کا دعوی ہے کہ لاہور سے پٹنہ تک کے اکابر علمائے مختلف فرقہائے اسلام نے ان کی موافقت کی ہے۔(دار الاسلام اور دار الحرب، ص۲۹)

“হযরত মাওলানা কারামত আলি জৈনপুরি (যিনি সাইয়েদ আহমাদ সাহেবের তাহরিকে জিহাদে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁর খলিফা ছিলেন) বলেন, ইংরেজদের অধীনস্ত হিন্দুস্তান দারুল হারব নয়। একই তাহকিক হযরত মাওলানা আব্দুল হাই লখনবিরও ছিলো এবং একই রায় মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন বটালবিরও। তাঁর দাবি হচ্ছে, লাহোর থেকে পাটনা পর্যন্ত ইসলামের বিভিন্ন মতাদর্শের আকাবিরে উলামা তাঁর সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন।” (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃঃ ২৯)[৫১]

ব্যক্তি পর্যালোচনা

কারামত আলি জৈনপুরি (মৃঃ ১২৯০ হিঃ)

মাওলানা কারামত আলি জৈনপুরি রহ. একজন স্বীকৃত বুযুর্গ ও আলেম হওয়া সত্ত্বেও এই গুরুত্বপূর্ণ মাসআলায় জুমহুর উলামায়ে কেরামের বিপরীতে উদ্ধৃত হওয়ার মতো কেউ নন। এছাড়াও হিন্দুস্তানকে দারুল হারব স্বীকার করা তো পরের বিষয়, তিনি তো হাজি শরিআতুল্লাহ কর্তৃক কুফর-শিরক ও বিদআত বিরোধী সংস্কারমূলক আন্দোলনকেই সহ্য করতে পারেননি। তাই তিনি তাঁর 'নাসিমুল হারামাইন' কিতাবে হাজি শরিআতুল্লাহকে এতো বিশ্রী ও ঘৃণিতভাবে উপস্থাপন করেছেন, যা মাওলানা আব্দুল হাই আলহাসানি রহ. (মৃঃ ১৩৪১ হিঃ) তাঁর 'নুযহাতুল খাওয়াতির' কিতাবে উল্লেখ করায় তাঁর সুযোগ্য সন্তান আবুল হাসান আলি আলহাসানি আননাদাবি রহ. (মৃঃ ১৪২০ হিঃ) টীকায় লিখেছেন-

---

৫১. পাঠকের সামনে মূল উর্দু ইবারতও রয়েছে এবং আমাদের অনুবাদও রয়েছে। এবার আমরা একটু দেখি আ'যমি রহ. এর আলোচ্য পুস্তিকার অনুবাদক কী অনুবাদ করেছেন-

'....... আব্দুল হাই লাখনবী রহ. এরও এই মত। (মাজমূআতুল ফাতাওয়া ২/১৯৬) তিনি দাবি করেন, লাহোর থেকে পাটনা পর্যন্ত সমস্ত আলেম তার সহমত পোষণ করেছেন। (আল-এক্তেসাদ ফী মাসাইলিল জিহাদ ১৯)।'

পাঠক! হয়তো বুঝতে পারছেন, তিনি অতি সন্তর্পণে মুহাম্মাদ হুসাইন বটালবির (যে চাটুকার আহলে হাদিস আলেমের আলোচনা আমাদের মূল রচনায় সামনে আসছে) নাম 'ডিলেট' করে বটালবির দাবিকে মাওলানা আব্দুল হাই লখনবির দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে দিয়েছেন। إنا لله وإنا إليه راجعون। হাঁ! বেখেয়ালে হয়ে থাকলে তা ভিন্ন কথা।

هذا ما قاله الشيخ كرامة علي الجونفوري في المترجم له، ولا يخلو من التحامل والمغالات.
(نزهة الخواطر لعبد الحي الحسني، ٣٨٠- مولانا شريعة الله البدوي، حاشية ١، ٩٨٧/٧)

"শাইখ কারামত আলি জৈনপুরি জীবনী উল্লিখিত ব্যক্তি (হাজি শরিআতুল্লাহ) সম্পর্কে যা বলেছেন, তা অন্যায় আচরণ ও অতিরঞ্জনমুক্ত নয়।" (নুযহাতুল খাওয়াতির, টীকা-১, ৭/৯৮৭)

অতঃপর নদবি রহ. হাজি শরিআতুল্লাহর ব্যাপারে ভারসাম্যপূর্ণ কথা বলেছেন।

আব্দুল হাই লখনবি (মৃঃ ১৩০৪ হিঃ)

এই একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব যিনি জুমহুরের বিপরীতে 'শায' রায় গ্রহণ করে হিন্দুস্তানকে দারুল ইসলাম হিসেবে ফাতওয়া দিয়েছেন। তাঁর ফাতওয়ার ব্যাপারে পর্যালোচনা সামনে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

মুহাম্মাদ হুসাইন বটালবি (মৃঃ ১৩৩৮ হিঃ)

আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির যদি নিজ ধারণার পক্ষে অনেক লোক দেখানোরই প্রয়োজন; তাহলে শুধু বটালবি কেনো? পুরো কাদিয়ানি, বেরেলবি ও তথাকথিত আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের "أكابر مجرميها" -দের নাম উল্লেখ করে দিলেই পারতেন। অযৌক্তিক ধারণা সাব্যস্ত করতে শেষ পর্যন্ত প্রখ্যাত এক চাটুকারের নাম উল্লেখ করা উচিত হয়নি। যে বটালবিদের জীবন কেটেছে ইংরেজদের তল্পিবাহক হিসেবে। চাটুকারিতাই ছিলো যাদের জন্য ইংরেজদের থেকে খড়কুটো-ভুষি ভাগ্যে জোটার মাধ্যম। ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদকে যারা শুধু হারামই ঘোষণা দেয়নি বরং জিহাদি আন্দোলনের অগ্রপথিকদের অজ্ঞ-মূর্খ ও পশুর ন্যায় আখ্যা দিয়েছে। সে অগ্রপথিকদের সন্তানের কলমে আজ তাঁদের ফাতওয়ার বিপরীতে বটালবিদের উদ্ধৃতি প্রকাশ পাচ্ছে!!!! "تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا"।

বটালবি জাতীয় তথাকথিত আহলে হাদিসদের বাস্তব অবস্থা জানতে সচেতন পাঠক সময়ের অন্যতম দা'য়ি আলেম মাওলানা যুবায়ের হোসাইন -হাফিযাহুল্লাহ- এর অনবদ্য গ্রন্থ 'আহলে হাদীস সে যুগে এ যুগে' পুরো গ্রন্থটি বা কমপক্ষে ৮৪ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে ৯৭ নম্বর পৃষ্ঠা বিশেষভাবে পড়ে নিতে পারেন।

তাতে বটালবির চাটুকারিতার নমুনা হিসেবে ইংরেজ সরকারকে লেখা তার বিভিন্ন চিঠি ও তার পুস্তিকা 'আলইকতিসাদ' থেকে অনেকগুলো উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে। পাঠকদের সাধারণ ধারণার জন্য আমি সেখান থেকে দু'য়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করছি।

বটালবি 'আলইকতিসাদ'র ১৯ নম্বর পৃষ্ঠায় বলেন-

برٹش گورنمنٹ سے مذہبی جہاد کرنا ہرگز جائز نہیں۔

"বৃটিশ গভর্নমেন্ট-সরকারের সঙ্গে ধর্মীয় জিহাদ করা কিছুতেই জায়েয নয়।"

'আলইকতিসাদ'র ৪৮ নম্বর পৃষ্ঠায় বলেন-

اہل حدیث یہ وہ لوگ ہیں جو تقریراً تحریراً حاضر وغائب خیر خواہی وفاداری گورنمنٹ کا دم بھرتے ہیں اور ان کی خدمت ومعاونت میں سرگرم ہیں۔

"আহলে হাদিস তো ওই সকল লোক, যারা বলায়-লেখায়, উপস্থিত-অনুপস্থিত সর্বাবস্থায় সরকারের কল্যাণ কামনা ও বিশ্বস্ততার শ্বাস গ্রহণ করে এবং তাদের সেবা ও সহযোগিতায় তৎপর।"

'আলইকতিসাদ'র ৪৯ নম্বর পৃষ্ঠায় বলেন-

ان سے لڑنا شرعی جہاد نہیں بلکہ عناد وفساد کہلاتا ہے۔ مفسدہ سنہ ۱۸۵۷ میں جو مسلمان شریک ہوئے تھے وہ سخت گنہگار اور بحکم قرآن وحدیث وہ مفسد وباغی وبدکار تھے، اکثر ان میں عوام کالانعام تھے، بعض جو خواص اور علماء کہلاتے تھے وہ بھی اصل علوم دین قرآن وحدیث سے بے بہرہ تھے۔

"তাদের (বৃটিশ) সঙ্গে যুদ্ধ করা শরয়ি জিহাদ নয় বরং হটকারিতা ও বিশৃঙ্খলা বলা হয়। ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের হাঙ্গামায়[৫২] যে সকল মুসলমান শরিক হয়েছে তারা জঘন্য গোনাহগার এবং কুরআন ও হাদিসের হুকুম অনুযায়ী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, রাষ্ট্রদ্রোহী ও বদকার ছিলো। যাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলো পশুর ন্যায় মূর্খ জনসাধারণ। কিছু সংখ্যক যাদেরকে বিশেষ ব্যক্তি ও উলামা বলা

---

৫২. ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের হাঙ্গামা বলে বটালবি ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের সিপাহী বিপ্লবের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যার নেতৃত্বে ছিলেন হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি রহ., কাসেম নানুতবি রহ. ও রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রহ. প্রমুখগণ।

হতো, তারাও মৌলিক দ্বীনি ইলম কুরআন-হাদিস থেকে বঞ্চিত ছিলো।” (দেখুন: আহলে হাদীস সে যুগে এ যুগে, পৃ: ৯২-৯৩)

বটালবির দাবি ও বর্তমানের দাজ্জালি ফতোয়া

আ'যমি রহ. বটালবির রায় উল্লেখ করার পর বটালবির 'আলইকতিসাদ'র সূত্রে তার যে দাবি উল্লেখ করেছেন, 'লাহোর থেকে পাটনা পর্যন্ত ইসলামের বিভিন্ন মতাদর্শের আকাবিরে উলামা তাঁর সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন'; তা দেখে আমার কেনো জানি বর্তমান সময়ের অন্যতম দাজ্জাল ফরিদ মাসউদের জিহাদ বিরোধী দাজ্জালি ফতোয়ার কথা মনে পড়ে গেলো। বটালবি যে আকাবিরে উলামার কথা বলেছেন তারা আবার দাজ্জালি ফতোয়ায় সাক্ষরকারী এক লক্ষ নাবালেগ ও বালেগ নির্বোধ[৫৩] মুফতির মতো নয় তো! কারণ আহলে হক আলেমদের কেউ অন্তরে 'শায' রায় পোষণ করলেও কমপক্ষে বটালবির সামনে তা প্রকাশ করে তার সঙ্গে সহমত পোষণ করার কথা নয়।

হাঁ! বটালবির দাবিকে সহিহ করার একটি পদ্ধতি আছে। তার বক্তব্যে "فرقہائے" এর পূর্বে "باطل" শব্দটি বাড়িয়ে দিলেই হবে।

আ'যমির বর্ণনায় কাশ্মিরির রায়

আ'যমি রহ. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরির রহ. রায় উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন-

حضرت شاہ انور صاحب اس کو دار امان قرار دیتے ہیں، چنانچہ وہ اجلاس جمعیۃ منعقدہ دسمبر سنہ ۲۷ء کے
خطبۂ صدارت میں فرماتے ہیں "ملک ما اگر ہست دار امان ہست۔ (دار الاسلام اور دار الحرب، ص۲۹)

“হযরত শাহ আনওয়ার সাহেব হিন্দুস্তানকে দারুল আমান সাব্যস্ত করেন। যেমনটি তিনি ১৯২৭ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জমিয়তের সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে বলেছেন, 'আমাদের রাষ্ট্র দারুল আমান।” (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃ: ২৯)।

---

৫৩. 'নির্বোধ' শব্দটি ব্যবহার করেছি মূলত সাক্ষরকারীদের একটি অংশকে বাঁচানোর জন্য। অন্যথায় বোধসম্পন্ন হয়ে সাক্ষর করে থাকলে তো ....

আমরা পূর্বেই 'আলআরফুশ শাযি'র উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছি। যেখানে কাশ্মিরি রহ. দারুল হারবের পরিচয় পেশ করেছেন এবং হিন্দুস্তান দারুল হারব হওয়ায় তাতে 'উশর' ওয়াজিব না হওয়ার ফাতওয়াও দিয়েছেন। এছাড়া পূর্বে এ আলোচনাও উল্লেখ হয়েছে যে, 'দারুল আমান' ভিন্ন কোনো 'দার'র নাম নয় বরং দারুল হারবেরই একটি সাময়িক বা আপেক্ষিক অবস্থা। সুতরাং কাশ্মিরি রহ. যদি 'দারুল আমান' বলেও থাকেন, তা দারুল হারবের একটি অবস্থা হিসেবেই বলেছেন। এতে আ'যমির রহ. দাবির পক্ষেও কোনো সমর্থন নেই এবং কাশ্মিরির রহ. রায়েও কোনো বৈপরীত্য নেই।

আর আ'যমি রহ. নিজেও তো তাঁর পুস্তিকায় দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের বাইরে তৃতীয় কোনো স্বতন্ত্র 'দার'কে স্বীকৃতি দেননি,[৫৪] বরং দারুল হারবের সঙ্গে দারুল আমানের যে কোনো বৈপরীত্য নেই; তা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন; যেমনটি পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। তো এখানে 'দারুল আমান'র রায়টি কেনো লুফে নিয়েছেন, তা বোধগম্য নয়।

আ'যমির বর্ণনায় থানবির রায়

আ'যমি রহ. হাকিমুল উম্মাহ আশরাফ আলি থানবির রহ. রায় উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন-

اور خاتم المحققین حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ تحذیر الاخوان میں فرماتے ہیں کہ "ہندوستان نہ تو صاحبین کے قول پر دار الحرب ہے........ اور نہ امام صاحب کے قول پر دار الحرب ہے۔(دار الاسلام اور دار الحرب، ص ۳۰)

"এবং খাতামুল মুহাক্কিকিন হযরত থানবি রহ. 'তাহযিরুল ইখওয়ান' কিতাবে বলছেন, 'হিন্দুস্তান সাহেবাইনের মতানুযায়ীও দারুল হারব নয় .... এবং ইমাম সাহেবের মতানুযায়ীও দারুল হারব নয়।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব, পৃ: ৩০)।

'তাহযিরুল ইখওয়ান' কিতাবটি হস্তগত হলে বাস্তবতা বুঝা যেতো। যা হোক, হাকিমুল উম্মাহ আশরাফ আলি থানবির রহ. রায়ও আমরা পূর্বে 'মালফুযাতে

---

৫৪. আ'যমি রহ. এর আলোচ্য পুস্তিকার অনুবাদক এক সময় মুখে 'দারুল আমান দারুল আমান' খুব উচ্চারণ করেছেন। এই পুস্তিকায় যখন স্বতন্ত্র 'দার' হিসেবে সেটিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, তখন অনুবাদক সে অংশের অনুবাদ করা থেকে বিরত থেকেছেন।

হাকিমুল উম্মত'র সূত্রে উল্লেখ করেছি। তিনি স্পষ্টভাবেই হিন্দুস্তানকে দারুল হারব বলেছেন। 'তাহযিরুল ইখওয়ান' কিতাবে যদি তিনি দারুল হারব নয় বলে মন্তব্য করেও থাকেন, তবুও যেহেতু এটি পরিপূর্ণই বাস্তবতা বিবর্জিত, আর 'মালফুযাতে হাকিমুল উম্মত' কিতাবে উদ্ধৃত তাঁর রায়টি ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য ও জুমহুর উলামায়ে কেরামের ফাতওয়া অনুযায়ী হয়েছে, তাই আমরা তাঁর সে রায়টিকেই গ্রহণ করেছি।

সর্বশেষ অভিব্যক্তি

হাফেয যাহাবি রহ. (মৃঃ ৭৪৮ হিঃ) 'আলমুসতাদরাক' সংক্রান্ত হাকেম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরির রহ. (মৃঃ ৪০৫ হিঃ) ব্যাপারে যে মন্তব্য করেছিলেন,[৫৫] আমরাও হাফেয যাহাবির শব্দে আ'যমির রহ. এ পুস্তিকা সংক্রান্ত তাঁর ব্যাপারে আমাদের সর্বশেষ অভিব্যক্তি হিসেবে বলছি-

ليته لم يصنف هذا الكُتَيِّب، فانه غض من فضائله بسوء تصرفه.

"যদি তিনি এই পুস্তিকাটি রচনা না করতেন! কেননা অন্যায় প্রয়োগের কারণে পুস্তিকাটি তাঁর ব্যক্তিত্বকে হেয় করে দিয়েছে।"

আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করছি; হে আল্লাহ! আপনি মুহাদ্দিসে কাবির আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির অন্যান্য ব্যাপক উপকারী অনবদ্য রচনাভাণ্ডারের উসিলায় তাঁর এই পদস্খলনকে ক্ষমা করে তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন। আমিন।

এই পুস্তিকার পক্ষে ইতিবাচক অবস্থান ও কিছু কথা

আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির আলোচ্য পুস্তিকার পক্ষে ইতিবাচক অবস্থান গ্রহণ করে কেউ কেউ বিপরীত মতামত পোষণকারীদের উদ্দেশ্য বলেছেন, 'শুধু উনারা বুঝেন, হাবিবুর রহমান আ'যমি বুঝেননি।'

এ ব্যাপারে আমার সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথা-

---

৫৫. হাফেয যাহাবি রহ. 'আলমুসতাদরাক' সংক্রান্ত হাকেম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরির রহ. ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন-

وليته لم يصنف المستدرك، فإنه غض من فضائله بسوء تصرفه. (تذكرة الحفاظ للذهبي، ١٦٦/٣).

ক) এ অবস্থানের প্রত্যুত্তর যে কেউ খুব সহজেই দিয়ে দিতে পারবে। রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রহ. কর্তৃক রচিত 'ফায়সালাতুল আ'লাম ফি দারিল হারবি ওয়াদারিল ইসলাম' নামক 'রিসালাহ'টি সামনে পেশ করে এ কথা বললেই হবে, 'শুধু হাবিবুর রহমান আ'যমি বুঝেছেন, রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি বুঝেননি।' বা শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবিসহ জুমহুর উলামায়ে কেরামের ফাতওয়া একত্রিত করে বললেই হবে, 'শুধু হাবিবুর রহমান আ'যমি বুঝেছেন, আর উনারা কেউই বুঝেননি।'

কিন্তু এটি কোনো ইলমি পদ্ধতি নয়। এক্ষেত্রে শাইখুল ইসলাম যাহেদ কাউসারি রহ. (মৃ: ১৩৭১ হি.) এর ঐতিহাসিক উক্তিটি পেশ করে দেয়া যথেষ্ট মনে করছি। তিনি বলেন,

ثم إن كل واحد من الأمة فيه ما يؤخذ أو يرد، فمحك الحق هو الحجاج في كل موقف، ومنزلة كل عالم إنما تتبين بقرع الحجة بالحجة، لا بذكر أسماء رجال غير معصومين من الزلل، ولا عصمة لغير الأنبياء عند أهل الحق. (تأنيب الخطيب، ص ٣٨٦)

'উম্মাহর প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু বিষয় গ্রহণ করার মতো থাকে আর কিছু বিষয় পরিহারযোগ্য হয়। সুতরাং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সত্যের মানদণ্ড হচ্ছে দলিল। এবং প্রত্যেক আলেমের অবস্থান স্পষ্ট হয় দলিল দিয়ে দলিলের মোকাবেলার মাধ্যমে; এমন কিছু ব্যক্তির নাম উল্লেখ করার মাধ্যমে নয় যারা স্খলনমুক্ত নয়। আহলে হকের দৃষ্টিতে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ব্যতীত আর কেউ 'মাসুম' নয়'। (তানিবুল খাতিব, পৃ: ৩৮৬)

খ) এই অবস্থানের প্রবক্তাগণ কখনো পুরো ভারতকে বলেছেন 'দারুল আমান'। পরবর্তীতে বলেছেন খিলাফত পতনের পূর্বের সংজ্ঞা দিয়ে বিবেচনা করলে হবে না। শেষ পর্যায়ে এমন একটি পুস্তিকাকে সমর্থন করলেন, যাতে পূর্বের সংজ্ঞা দিয়েই দাজ্জালি রাষ্ট্র ভারতকে পর্যন্ত দারুল ইসলাম সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

তো এ ক্ষেত্রে কী ধারণা করা হবে? রায় পরিবর্তন তথা 'নাসেখ-মানসুখ'র বিষয় নাকি প্রথম রায়ের ক্ষেত্রেও ইলমকে মাপকাঠি বানানো হয়নি এবং শেষ সমর্থনের ক্ষেত্রেও ইলমকে মাপকাঠি বানানো হয়নি বা পুস্তিকাটি যথাযথ অধ্যয়নেরও সময় হয়নি!

গ) যাঁদের কাছে জুমহুর ও শায নির্ণয়ের মাপকাঠি ছিলো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন মাধ্যম অর্থাৎ যে দিকে সংখ্যা বেশি তা জুমহুর আর যে দিকে সংখ্যা কম তা শায, তাঁরা এখানে এসে সে উসুলটিও কেনো বর্জন করলেন; তা বোধগম্য নয়।

ঘ) শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবির রহ. যে ফাতওয়াটি যুগ যুগ ধরে 'হিরো' হয়ে আসছিলো, আর বিপরীতে এই ফাতওয়াবিরোধী কাদিয়ানি, বেরেলবি ও তথাকথিত আহলে হাদিস চাটুকাররা ছিলো সকলের দৃষ্টিতে নর্দমার কীটতুল্য; সেই ফাতওয়া কেনো আজ 'জিরো' হয়ে গেলো, আর বিরোধীদের পক্ষে রচিত পুস্তিকা 'হিরো' হয়ে গেলো।

অন্যথায় এই ফাতওয়ার ব্যাপারে আমাদেরই একসময় বক্তব্য ছিলো এমন-

'১৭৫৭ সনের ২৩ জুন পলাশীর আমবাগানে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে বাংলার স্বাধীনতা লুণ্ঠিত হয়। এর পরের আধা শতকে একে একে ভারতবর্ষের সবকটি অঞ্চলই বৃটিশ শক্তির করায়ত্বে চলে যায়। পরাধীনতার এ নাগপাশ ছিন্ন করতে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহ. -এর শিষ্য ও সন্তান শাহ আব্দুল আযিয রাহ. প্রথম ভারতবর্ষকে 'দারুল হারব' ঘোষণা করে ফতোয়া দেন ১৮১৯ সনে। এরপরই প্রস্তুতি নিয়ে শুরু হয় আজাদির সংগ্রামের পথে দীর্ঘ পথযাত্রা। সেটিই ছিলো উনবিংশ শতকের বাংলা-ভারতব্যাপী এক ব্যাপক ও সুসংগঠিত স্বাধীনতা বা আজাদির আন্দোলন।' .... (মাসিক আলকাউসার, মার্চ ২০১৩, পৃঃ ১৯)।

বা আমরা এ ফাতওয়ার ব্যাপারে পড়েছি-

'দাবানল হয়ে ছড়িয়ে পড়ল এই ফতওয়ার ঘোষণা। ভ্রান্ত প্রচারণায় দ্বিধাগ্রস্থ উম্মতের অনেকেই পেয়ে গেল সঠিক সিদ্ধান্ত, কর্তব্য হলো সুনিশ্চিত। জ্বলে উঠল স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষের হৃদয়ের বহ্নিশিখা। স্বাধীনতার ইতিহাসে সূচনা হল নতুন এক অধ্যায়ের। ....।' (দেওবন্দ আন্দোলন: ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান, দ্বিতীয় অধ্যায়, ইমাম শাহ আব্দুল আযিয রাহ. এর জীবন ও সাধনা, ফতওয়ার প্রতিক্রিয়া পৃঃ ৯৭)।

আর তার বিপরীতে যারা এ ফাতওয়ার বিরোধী ছিলো এবং আহমাদ রেজা খান বেরেলবির (মৃঃ ১৩৪০ হিঃ) মতো যারা হিন্দুস্তানকে দারুল ইসলাম বলে গ্রন্থ রচনা করেছে, তাদের ব্যাপারে আমাদের মন্তব্য ছিলো এরূপ-

‘উলামায়ে হক যখন ইংরেজ বিতাড়নের সংগ্রামকে জিহাদ বলে ফতওয়া দিয়ে ভারতকে ‘দারুল হরব’ ঘোষণা দিয়েছেন তখন এই লোকটি (আহমাদ রেজা) ইংরেজদের নিমক হালালীর জন্য সর্ববাদী উলামায়ে কিরামের বিপরীতে এদেশকে “দারুল ইসলাম” বলে ফতওয়া দেয় এবং সে জোর গলায় প্রচার করতে থাকে যে, ইংরেজ শাসনাধীন অঞ্চলে মুসলমানদের ধর্মকর্ম পালনে যেহেতু কোন বাধা নেই, অতএব এই প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। উপরন্তু সে তার স্বরচিত ফতওয়ায় কুরআন হাদীসের কতিপয় উদ্ধৃতি (তার নিজস্ব ব্যাখ্যার আলোকে) পেশ করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে যে, ইংরেজ শাসনাধীন এলাকাকে যারা “দারুল হরব” বলে ঘোষণা করে জনগণকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে তাদের ফতওয়া শুদ্ধ নয়। তার এই ফতওয়া “এ'লামুল আনাম” নামে পুস্তিকাকারে ছাপিয়ে সারাদেশে বিতরণ করা হয়। কিন্তু দেশের স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী আলেম সমাজ ও মুক্তিপাগল জনসাধারণ তার এ ফতওয়ার প্রতি মোটেই কর্ণপাত করেনি। ....।’ (দেওবন্দ আন্দোলন: ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান, চতুর্থ অধ্যায়, বিদ‘আতীদের ফিতনা ও তার প্রতিরোধ, আহমদ রেজাখানের তৎপরতা পৃ: ২৮৫-২৮৬)।

কিন্তু আজ সেই আহমাদ রেজা বেরেলবির ফাতওয়াই সমাদৃত হচ্ছে। সেটির প্রতিই কারো কারো সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। পার্থক্য হচ্ছে, একটি পুস্তিকার নাম ‘ই'লামুল আনাম’, লেখক বিদআতি আলেম আহমাদ রেজা খান বেরেলবি, আর অপর পুস্তিকার নাম ‘দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব’, লেখক দেওবন্দের কৃতি সন্তান মুহাদ্দিসে কাবির আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমি। وإلى الله المشتكى।

নিম্নোক্ত আয়াতাংশটি আমাদের সকলের সর্বদা স্মরণে রাখা কাম্য-

"وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى".

২. আল্লামা আব্দুল হাই লখনবির রহ. ফাতওয়া

আল্লামা আব্দুল হাই লখনবি রহ. (মৃ: ১৩০৪ হি:) ভারতবর্ষের এক মহান মনীষা। যাঁর অগণিত ব্যাপক উপকারী রচনাভাণ্ডার দ্বারা আহলে ফিকর উলামায়ে কেরাম যুগ যুগ ধরে উপকৃত হয়ে আসছেন এবং এখনো আমরা উপকৃত হয়ে চলছি। তাঁর হাজারো সঠিক ফাতওয়ার মাঝে দুয়েকটি ফাতওয়ায় 'শায' রায় গ্রহণ করাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু অস্বাভাবিক হচ্ছে, পরবর্তীদের কেউ নিজের দুর্বলতাকে ঢাকতে কারো পদস্খলন বা 'শায' রায়কে গ্রহণ করা।

অথচ কোনো মনীষার 'শায' রায়কে 'শায' থাকতে দেয়াই তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্য নিরাপদ। কারো 'শায' রায়কে গুরুত্ব দেয়ার অর্থই হবে তাকে আপত্তির লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে দেয়া। এ জন্যই উলামায়ে কেরাম সবসময় আল্লামা আব্দুল হাই লখনবির এ ফাতওয়া এড়িয়ে চলেছেন। তেমনিভাবে আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির রচনাকেও ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। এটিই ছিলো মূলত তাঁদের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের নিদর্শন। কিন্তু যারা আজ বড়োদের 'শায' রায়কে গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করার চেষ্টা করেন; তারা কি আসলেই বড়োদের উপর 'ইনসাফ' করছেন বা খুব বেশি 'বড়োভক্তি'র প্রমাণ দিচ্ছেন নাকি তাঁদেরকে আপত্তির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করার মতো 'বে-ইনসাফি' করে চলছেন! আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সব ধরনের 'বে-ইনসাফি' থেকে রক্ষা করুন। আমিন।

যা হোক, আল্লামা আব্দুল হাই লখনবিকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো-

سوال(۷٦۰): ہندوستان میں جہاں تک عمل داری انگریزوں کی ہے دار الحرب ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو صرف مطابق مذہب صاحبین کے یا بر طبق مذہب ابو حنیفہ کے بھی؟ بینوا توجروا۔ (فتاوی عبد الحی، مسائل متفرقہ، ہندوستان دار الحرب نہیں ہے، ص۴۷۸)

“প্রশ্ন (৭৬০): হিন্দুস্তানের যে অংশে ইংরেজদের শাসন চলছে, তা কি দারুল হারব নাকি দারুল হারব নয়? আর যদি দারুল হারব হয়ে থাকে, তাহলে কি শুধু সাহেবাইনের মতানুযায়ী নাকি ইমাম আবু হানিফার মতানুযায়ীও? (ফাতাওয়া আব্দুল হাই, পৃ: ৪৭৮)

তিনি ফাতওয়া দিয়েছিলেন-

جواب:ہندوستان دار الحرب نہیں ہے بلکہ دار الاسلام ہے، چنانچہ ان عبارات فقہیہ سے واضح ہوتا ہے۔(فتاوی عبد الحی، مسائل متفرقہ،ہندوستان دار الحرب نہیں ہے، ص۴۷۹)

“উত্তর: হিন্দুস্তান দারুল হারব নয় বরং দারুল ইসলাম। যেমনটি এ সকল ফিকহি ইবারত দ্বারা স্পষ্ট।” (ফাতাওয়া আব্দুল হাই, পৃ: ৪৭৯)

এরপর আল্লামা আব্দুল হাই লখনবি রহ. ‘খিযানাতুল মুফতিন’র সূত্রে ‘শারহু সিয়ারিল আসল’, ‘সিয়ারুল আসল’ ও ‘মানশুর’ এবং ‘ফাতাওয়া বাযযাযিয়া’, আত্তাবির ‘শারহুয যিয়াদাত’ ও ‘তহতাবি’র উদ্ধৃতিতে যে বক্তব্যগুলো উল্লেখ করেছেন, সবগুলোর পর্যালোচনাই পেছনে উল্লেখ হয়েছে। মূলত আ’যমির রহ. পুস্তিকার মূল উৎসই ছিলো এই ফাতওয়া। তবে যেহেতু আ’যমির রহ. পুস্তিকায় একটু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, তাই আমরা সেটির পর্যালোচনা প্রথমে উল্লেখ করেছি।

লখনবির রহ. সাধারণ নীতি পরিপন্থী একটি আচরণ

আল্লামা আব্দুল হাই লখনবি রহ. ফিকহি ইবারতগুলো উল্লেখ করার পর বলেছেন-

ان عبارت سے اور ان کی امثال سے واضح ہے کہ دار الحرب ہونے میں دار الاسلام کی شرط یہ ہے کہ احکام کفر علی سبیل الاشتہار جاری ہوں، اور احکام اسلام بالکلیہ موقوف کردیئے جاویں، اور شعائر اسلام اور ضروریات دین میں کفار مداخلت کرنے لگیں، اور یہ شرط اتفاقی ہے، اور امام ابو حنیفہ نے اس کے سوا اور بھی دو شرطیں زائد کیں...............۔(فتاوی عبد الحی، مسائل متفرقہ،ہندوستان دار الحرب نہیں ہے، ص۴۸۰)

“এ সকল ইবারত ও ইবারতে পেশকৃত উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট যে, দারুল ইসলাম দারুল হারব হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, কুফরি আহকাম প্রকাশ্যে জারি হওয়া, আহকামে ইসলাম পরিপূর্ণ বন্ধ করে দেয়া ও ‘শাআয়েরে ইসলাম’ ও

'যরুরিয়াতে দ্বীন'র ক্ষেত্রে কাফেরদের হস্তক্ষেপ করতে থাকা। **আর এ শর্ত ঐক্যমত্যে**। ইমাম আবু হানিফা রহ. এছাড়া আরো দু'টি শর্ত বৃদ্ধি করেছেন ....।" (ফাতাওয়া আব্দুল হাই, পৃঃ ৪৮০)

আল্লামা লখনবি রহ. এই দাবির ক্ষেত্রে তাঁর 'তাহকিক'র সাধারণ নীতি পরিপন্থী আচরণ করেছেন। অন্যথায় দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার জন্য ঐক্যমত্যে আহকামে ইসলাম পরিপূর্ণ বন্ধ করে দেয়া ও 'শাআয়েরে ইসলাম' ও 'যরুরিয়াতে দ্বীন'র ক্ষেত্রে কাফেরদের হস্তক্ষেপ করার শর্তের কথা তিনি কোন ফিকহের কিতাবে পেয়েছেন? তিনি নিজেও তো আত্তাবির 'শারহুয যিয়াদাত' ও 'খিযানাতুল মুফতিন'র সূত্রে সাহেবাইনের মত উল্লেখ করেছেন; তাতে কি এ কথা আছে? এটিকে সর্বোচ্চ ইমাম আবু হানিফার রহ. 'আমান'র বাহ্যিক শর্তের ব্যাখ্যায় বলা যেতে পারে। কিন্তু ঐক্যমত্য বলে সাহেবাইন ও জুমহুরের রায়কেও এর সঙ্গে একাকার করে ফেলা কেমন হলো!

দ্বিতীয়ত: প্রথম শর্তের ক্ষেত্রেই যদি এ দুটি বিষয় (আহকামে ইসলাম পরিপূর্ণ বন্ধ করে দেয়া ও 'শাআয়েরে ইসলাম' ও 'যরুরিয়াতে দ্বীন'র ক্ষেত্রে কাফেরদের হস্তক্ষেপ করা) চলে আসে, তাহলে ইমাম আবু হানিফার রহ. বাড়তি শর্ত আরো দুটি থাকে কীভাবে? নাকি লখনবির রহ. দাবি, আহকামে ইসলাম পরিপূর্ণ বন্ধ করে দেয়া ও 'শাআয়েরে ইসলাম' ও 'যরুরিয়াতে দ্বীন'র ক্ষেত্রে কাফেরদের হস্তক্ষেপ করা সত্ত্বেও 'আমান' বিলুপ্ত হয় না; তাই 'আমান'র শর্ত বৃদ্ধি করতে হয়েছে।

অর্থাৎ লখনবির রহ. মতে কোনো অঞ্চল দারুল হারব সংলগ্ন হয়ে কাফেররা যদি তাতে তাদের আইন-কানুন জারি করে আহকামে ইসলাম পরিপূর্ণ বন্ধ করে দেয় এবং 'শাআয়েরে ইসলাম' ও 'যরুরিয়াতে দ্বীন'র ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে থাকে, তাহলে সেটি সাহেবাইন ও জুমহুরের দৃষ্টিতে দারুল হারব হবে, কিন্তু 'আমান' শর্ত বিলুপ্ত না হওয়ায় ইমাম আবু হানিফার রহ. মতে তা দারুল হারব হবে না।

তো আহকামে ইসলাম পরিপূর্ণ বন্ধ করে দেয়া ও 'শাআয়েরে ইসলাম' ও 'যরুরিয়াতে দ্বীন'র ক্ষেত্রে কাফেরদের হস্তক্ষেপ করা সত্ত্বেও 'আমান' বহাল থাকার কী পদ্ধতি? এটা মনে হয় একমাত্র আল্লামা আব্দুল হাই লখনবিই রহ. বলতে পারবেন বা যারা তাঁর ফাতওয়াকে লুফে নিয়েছেন তারা বলতে পারবেন। সেটির কোনো পদ্ধতি আমাদের মেধায় আসছে না।

৩. মুফতি তাকি উসমানির -হাফিযাহুল্লাহ- বক্তব্য

মুফতি তাকি উসমানি -হাফিযাহুল্লাহ- তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ইসলাম আওর সিয়াসি নযরিয়াত'র ৩২৪ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে ৩৩০ নম্বর পৃষ্ঠা পর্যন্ত দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পরিচয় ও ভাগ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনা বলতে ফিকহি কিতাবের দুয়েকটি ইবারত উল্লেখ করে সর্বাংশে ব্যক্তিগত ধারণাই প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব পরিপন্থী যে অবাস্তব কথা বলেছেন ও অযৌক্তিক দাবি করেছেন, তা ইতোমধ্যে একাধিক আহলে ফিকর আলেম তাদের রচনায় স্পষ্ট করেছেন, (আল্লাহ তাআলা তাদেরকে 'জাযায়ে খায়র' দান করুন)। তাই আমি দীর্ঘ আলোচনার দিকে না গিয়ে তাঁর পুরো বক্তব্যের ব্যাপারে কয়েকটি মৌলিক কথা বলেই রচনার ইতি টানবো, ইনশাআল্লাহ।

দারুল ইসলামের পরিচয়ে মুফতি তাকি উসমানি -হাফিযাহুল্লাহ-

মুফতি তাকি উসমানি -হাফিযাহুল্লাহ- মাবসুতে সারাখসি, কাযি খানের শারহুয যিয়াদাত, আত্তাবির শারহুয যিয়াদাত, বাদায়েউস সানায়ে'সহ আলোচ্য মাসআলার সকল মৌলিক উৎসগ্রন্থকে এড়িয়ে সারাখসির 'শারহুস সিয়ারিল কাবির' থেকে একটি আনুষঙ্গিক মাসআলার আলোচনায় প্রসঙ্গত দারুল ইসলামের বিশেষণে উল্লেখ করা একটি ইবারত ও 'জামেউর রুমুয' সূত্রে উদ্ধৃত 'কাফি'র বক্তব্যের আলোকে দারুল ইসলামের পরিচয় বুঝাতে গিয়ে বলেন-

چنانچہ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ دار الاسلام کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں:

"فإن دار الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين".

اور جامع الرموز میں "الکافی" کے حوالے سے اس کی تعریف اس طرح کی گئی ہے:

"دار الإسلام ما يجري فيه حكم إمام المسلمين، وكانوا فيه آمنين".[٥٦] (اسلام اور سیاسی نظریات، پانچواں باب: دفاع اور امور خارجہ، دار الاسلام اور دار الحرب، ص ۳۲۴)

"যেমনটি আল্লামা সারাখসি রহ. দারুল ইসলামের সংজ্ঞা এভাবে ব্যক্ত করেছেন- 'কেননা দারুল ইসলাম ওই স্থানকে বলা হয়, যা মুসলমানদের দখলে থাকে'।

আর 'জামেউর রুমুয' কিতাবে 'কাফি'র উদ্ধৃতিতে দারুল ইসলামের সংজ্ঞা এভাবে করা হয়েছে- 'দারুল ইসলাম বলা হয়, যাতে মুসলমানদের ইমামের হুকুম চলে এবং তারা নিরাপদে থাকে।" (ইসলাম আওর সিয়াসি নযরিয়াত, পৃ: ৩২৪)

উক্ত দুই ইবারতের আলোকে মুফতি তাকি উসমানি -হাফিযাহুল্লাহ- বুঝেছেন, কোনো অঞ্চলে মুসলমান শাসকের আইন-কানুন জারি হলেই তা দারুল ইসলাম; চাই সে আইন ইসলামি হোক বা না হোক।

মুফতি তাকি উসমানির বক্তব্যের ব্যাপারে আমাদের কয়েকটি কথা

মুফতি তাকি উসমানি -হাফিযাহুল্লাহ- উপর্যুক্ত দুটি ইবারত উল্লেখ করার পর ব্যক্তিগত কিছু ধারণা প্রকাশ করেছেন। পাঠক বুঝার সুবিধার্থে তাঁর মূল গ্রন্থ থেকে তাঁর বক্তব্য পড়ে নিতে পারেন। আমি তাঁর পুরো বক্তব্য উল্লেখ করে রচনার কলেবর বৃদ্ধির প্রয়োজন বোধ করছি না। কয়েকটি কথা বলে দেয়াই যথেষ্ট মনে করছি।

ক) আমরা ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পরিচয় প্রদানের পূর্বে বলেছিলাম-

'আহকামুল ইসলাম', 'আহকামুল মুসলিমিন', 'হুকমু ইমামিল মুসলিমিন' ও 'তাহতা আইদিল মুসলিমিন'; সবগুলোর উদ্দেশ্য একই। একেক ফকিহের বক্তব্যে একেকটি ব্যবহার হয়েছে। শব্দের বিভিন্নতায় প্রতারিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ-

---

৫৬. আমাদের সংরক্ষণে 'জামেউর রুমুয'র যে নুসখা রয়েছে তাতে 'কাফি'র বক্তব্যে দাগটানা অংশটি নেই। হাঁ! 'জামেউর রুমুযে 'যাহেদি'র সূত্রে উদ্ধৃত বক্তব্যে সেটির উল্লেখ রয়েছে।

কুফরি আইন মুসলমানের আইন হতে পারে না এবং মুসলমানরা কুফরি আইন করতে পারে না।

তেমনিভাবে মুসলমানদের খলিফা কুফরি আইন বিধিবদ্ধ করতে পারে না এবং যে শাসক কুফরি আইন বিধিবদ্ধ করে সে 'ইমামুল মুসলিমিন' হতে পারে না বা ওই কুফরি আইন 'হুকমু ইমামিল মুসলিমিন' হতে পারে না।

ঠিক তেমনিভাবে যে অঞ্চলে মুসলমানরা তাদের ইসলামি আইন-কানুন জারি করতে পারে না, বরং কুফরি আইন-কানুন সেখানে বাস্তবায়িত এবং ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়ন করার সকল দরজা বন্ধ; সেটিকে 'তাহতা আইদিল মুসলিমিন' মুসলমানদের হস্তগত দাবি করা যেতে পারে না। আর যে অঞ্চল 'তাহতা আইদিল মুসলিমিন' মুসলমানদের হস্তগত তাতে কুফরি আইন বিধিবদ্ধ হতে পারে না এবং ইসলামি আইনের দরজা বন্ধ হতে পারে না।"

বুঝা গেলো, মুফতি তাকি উসমানি -হাফিযাহুল্লাহ- তাঁর ধারণার পক্ষে যে দুটি ইবারত উল্লেখ করেছেন; তাতে তাঁর ধারণার পক্ষে কোনো দলিল নেই।

এছাড়াও 'ইমামুল মুসলিমিন' একটি ইসলামি পরিভাষা। যে ভূখণ্ডের সংবিধান কুফরি মতবাদে রচিত এবং যেখানের আদালত এখনো কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কুফরি আইনে পরিচালিত, সে ভূখণ্ডের শাসককে কি 'ইমামুল মুসলিমিন' বলা হয়? স্বীকৃত মুরতাদ পারভেজ মোশারফ ও নির্ভেজাল শিয়া মহিলা বেনজির ভুট্টো কি 'আমিরুল মুমিনিন, 'খলিফাতুল মুসলিমিন' বা 'ইমামুল মুসলিমিন' ছিলো!!!!!!!!!

খ) মুফতি তাকি উসমানি -হাফিযাহুল্লাহ- তাঁর আলোচনায় বুঝাতে চেয়েছেন, মুসলমানদের অধীনস্ত কোনো ভূখণ্ডে যদি শাসকদের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও 'গাফলত'র কারণে ইসলামি আইন-কানুন পরিপূর্ণ জারি করা না হয়, তা দারুল ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না।

অর্থাৎ মুফতি তাকি উসমানি -হাফিযাহুল্লাহ- পাকিস্তান ও এ জাতীয় রাষ্ট্রগুলোর ব্যাপারে এ দাবিই করতে চাচ্ছেন যে, এ সকল রাষ্ট্রের শাসকরা চাইলে ইসলামি আইন-কানুন জারি করতে পারে। বাকি করছে না শুধুই 'গাফলত'র কারণে। এ কারণে তারা গোনাহগার হবে, তবে রাষ্ট্রটি দারুল ইসলাম থেকে বের হবে না।

প্রশ্ন হচ্ছে, যে শাসক ইসলামি আইন-কানুন জারি করার ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও শুধু ইসলামি আইন-কানুন জারি করছে না এমন নয়; বরং গণতন্ত্রের মতো কুফরি মতবাদে সংবিধান তৈরি বা বাস্তবায়ন করে, কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কুফরি আইনে আদালত পরিচালনা করে এবং কুরআন-সুন্নাহর আইন বাস্তবায়নের কোনো সুযোগ না রাখে; এটি কি শুধু "شدید گناہ" কঠিন গোনাহ নাকি "کفر بواح" প্রকাশ্য কুফর?

দ্বিতীয়ত: প্রথম পর্ব যাদের অধ্যয়নে আছে, বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে যাদের ধারণা আছে, বিশেষকরে বাংলাদেশ, পাকিস্তানের সংবিধান যাদের পড়া আছে এবং এই গ্রন্থে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের যে অবস্থা আমরা উল্লেখ করেছি তা দেখা আছে, তারা ভালো করেই জানেন যে, এটি শুধুই 'গাফলত'র কারণে ইসলামি আইন ছেড়ে দেয়া নয়; যেমনটি খিলাফত পতনের পূর্বে কোনো কোনো গভর্নর বা বিচারক থেকে কখনো প্রকাশ পেতো। বরং বর্তমানের বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ তথাকথিত মুসলিম রাষ্ট্রের সংবিধান ও আদালত পরিচালনার আইনে ইসলামি আইন-কানুনের পরিবর্তে অন্যান্য কুফরি আইনকে স্থান দেয়া হয়েছে এবং ইসলামি আইন বাস্তবায়নের কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। যে সকল আইনকে বাহ্যত ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক মনে হয় না; সেটি ইসলামি আইন হিসেবে রাখা হয়নি, বরং তা গণতন্ত্র ধর্ম অনুযায়ী হওয়ায় রাখা হয়েছে।

মুফতি তাকি উসমানি -হাফিযাহুল্লাহ- 'গাফলত' ও 'শাদিদ গোনাহ' বলে যে বাস্তবতাকে আড়াল করার চেষ্টা করেছেন, তা তাঁর ব্যক্তিত্ব হিসেবে একেবারেই অনাকাঙ্খিত। তবে কেউ বাস্তবতাকে আড়াল করলে পৃথিবীর সকলের থেকে তা আড়াল হয়ে যাবে; বিষয়টি এমন নয়।

মুফতি তাকি উসমানির -হাফিযাহুল্লাহ- একটি অনাকাঙ্খিত দাবি

গ) মুফতি তাকি উসমানি -হাফিযাহুল্লাহ- তাঁর ধারণা প্রকাশের এক পর্যায়ে বলেন-

اوپر آپ نے دیکھا کہ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے دار الاسلام کی تعریف میں صرف یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہو، اور اسی بات کو جامع الرموز کی عبارت میں اس طرح تعبیر کیا گیا ہے کہ اس میں

مسلمانوں کے امام کا حکم چلتا ہو، یعنی اسکے احکام نافذ ہوتے ہوں، قطع نظر اس کے کہ وہ احکام شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں۔ (اسلام اور سیاسی نظریات، پانچواں باب: دفاع اور امور خارجہ، دار الاسلام اور دار الحرب، ص ۳۲۵)

"উপরে আপনারা দেখেছেন যে, আল্লামা সারাখসি রহ. দারুল ইসলামের সংজ্ঞায় **শুধু এই কথা বলেছেন যে তা মুসলমানদের দখলে থাকা।** আর এটিকেই 'জামেউর রুমুয'র ইবারতে এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, তাতে মুসলমানদের ইমামের হুকুম চলে। অর্থাৎ তার আইন-কানুন বাস্তবায়ন হয়। **সে আইন-কানুন শরিআত অনুযায়ী কি না; তা দেখার বিষয় নয়।**" (ইসলাম আওর সিয়াসি নযরিয়াত, পৃ: ৩২৫)

মুফতি তাকি উসমানি -হাফিযাহুল্লাহ- এর উপর্যুক্ত বক্তব্য খুবই অনাকাঙ্খিত ও দুঃখজনক। তিনি কি এই দাবিই করতে চান যে, একজন শাসক শরয়ি আইনের দরজায় তালা ঝুলিয়ে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কুফরি আইন-কানুন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করলেও তার মুসলমানিত্বে সামান্যও আঁচড় পড়বে না এবং তার 'ইমামুল মুসলিমিন' পদবিও যথারীতি বহাল থাকবে! আর সে ভূখণ্ড দারুল ইসলাম থেকে বের হওয়া তো 'বহুত দূর কি বাত হ্যায়'।

দ্বিতীয়ত: 'আল্লামা সারাখসি রহ. দারুল ইসলামের সংজ্ঞায় শুধু এই কথা বলেছেন যে তা মুসলমানদের দখলে থাকা।' এ কথা বলে মুফতি তাকি উসমানি -হাফিযাহুল্লাহ- কী বুঝাতে চাচ্ছেন? ফিকহের কিতাবাদিতে এ মাসআলার আলোচনায় পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বারবার "إجراء أحكام الإسلام" 'ইসলামি আইন-কানুন জারি করা'; কথাটি যে বলা হয়েছে সেটির কী অর্থ? বিশেষকরে যে সারাখসির ব্যাপারে এ দাবি করা হলো যে তিনি শুধু এ কথা বলেছেন, তাঁর 'মাবসুত' কিতাবের এ মাসআলার স্বতন্ত্র আলোচনা কি এটিকে সমর্থন করবে? বা 'মাবসুতে সারাখসি'র নিম্নোক্ত ইবারতের ব্যাপারে কী বলা হবে?-

وبمجرد الفتح قبل إجراء أحكام الإسلام لا تصير دار إسلام. (المبسوط للسرخسي، كتاب السير، ٢٣/١٠)

"ইসলামি আইন-কানুন জারি করার পূর্বে শুধু বিজয়ের মাধ্যমে কোনো অঞ্চল দারুল ইসলামে পরিণত হয় না।" (মাবসুতে সারাখসি, ১০/২৩)

মুফতি তাকি উসমানি -হাফিযাহুল্লাহ- এর আরেকটি অবাস্তব কথা

ঘ) এরপর তিনি যে আচরণ করেছেন তা আরো বেদনাদায়ক। এ বিষয়ের দিকে আমরাও ইঙ্গিত করেছি যে, ফুকাহায়ে কেরামের ধারণায়ও কখনো ছিলো না, কোনো ভূখণ্ডের শাসক মুসলমান হবে বা সে ভূখণ্ড মুসলমানদের আবাসভূমি হবে কিন্তু তাতে ইসলামি আইন-কানুন সংবিধিবদ্ধ না হয়ে কুফরি আইনকে সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করা হবে। তাই তাঁরা ইসলামি আইন-কানুন জারি থাকার বিষয়টিকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শব্দে প্রকাশ করেছেন। উদ্দেশ্য একটাই ইসলামি আইন-কানুন জারি থাকা।

মুফতি তাকি উসমানিও -হাফিযাহুল্লাহ- ফুকাহায়ে কেরামের ধারণায় না থাকার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। কিন্তু তিনি তা স্বীকার করে পরবর্তীতে যা বলেছেন তা খুবই আশ্চর্যকর। তিনি বলতে চাচ্ছেন, ফুকাহায়ে কেরামের ধারণায় না থাকায় তাঁরা এটি স্পষ্ট করেননি যে, মুসলমানদের দখলে থাকা সত্ত্বেও যদি তাতে ইসলামি আইন-কানুন জারি করা না হয়, তাহলে সেটিকে দারুল ইসলাম বলা হবে কি হবে না। বরং তাঁরা শুধু মুসলমানদের দখলে থাকা এবং তাদের হুকুম চলার বিষয়টি উল্লেখ করাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। পরবর্তীতে যখন এমন অবস্থা সামনে এসেছে, তখন ফুকাহায়ে কেরাম তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন (অর্থাৎ দারুল ইসলাম হওয়ার কথা বলেছেন); এ কথা বলে তিনি রদ্দুল মুহতার থেকে ইবনে আবেদিন শামি কর্তৃক 'জাবালে তাইমিল্লাহ'র উদাহরণ পেশ করেছেন, যা আমরা 'তাতবিক'র আলোচনায় উল্লেখ করেছি।

তো মুফতি তাকি উসমানি -হাফিযাহুল্লাহ- প্রথমে যে দাবি করেছেন, ফুকাহায়ে কেরাম শুধু মুসলমানদের দখলে থাকার কথা বলেছেন; তা পরিপূর্ণ অবাস্তব দাবি। বরং ফুকাহায়ে কেরাম বিভিন্ন শব্দে ইসলামি আইন-কানুন জারির কথাই বলেছেন।

আর দ্বিতীয়তে ইবনে আবেদিনের উদ্ধৃতিতে যে দাবি করেছেন তা যথাযথ হয়নি। সচেতন পাঠক একটু 'রদ্দুল মুহতার' খুলে দেখুন। ইবনে আবেদিন শামি রহ. মূলত ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলীর পর্যায়ক্রমে ব্যাখ্যা করেছেন। দ্বিতীয় শর্ত অর্থাৎ দারুল হারব সংলগ্ন না হওয়ার ব্যাখ্যায় তিনি 'জাবালে তাইমিল্লাহ'র উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, যেহেতু তা দারুল ইসলাম কর্তৃক পরিবেষ্টিত, তাই শাসক 'দুরুয' বা খৃস্টান হওয়া এবং

বিচারক তাদের হওয়া তথা তাদের আইন-কানুন চলা সত্ত্বেও তা ইমাম আবু হানিফার মতানুযায়ী দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে শর্তের যৌক্তিকতার দিকেও ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, মুসলমানদের কর্তৃত্ব বহাল আছে এবং মুসলিম শাসকরা চাইলেই তাতে আইন-কানুন জারি করে দিতে পারবে।

আর এটিকে তিনি রূপ দিয়েছেন যে, পরবর্তীতে এ অবস্থা সামনে আসায় ইবনে আবেদিন শামি এ কথা বলেছেন। অথচ 'জাবালে তাইমিল্লাহ' তখন মুসলমানদের দখলে নয় এবং শাসকও মুসলমান নয় বরং খৃস্টান বা 'দুরুয'। তাহলে মুফতি তাকি উসমানি -হাফিযাহুল্লাহ- এর দাবির সঙ্গে তা সমঞ্জস হলো কীভাবে? 'জাবালে তাইমিল্লাহ'কে কি 'গাফলত'র কারণে মুসলমানরা তাতে ইসলামি আইন-কানুন জারি না করলেও তাদের দখলে থাকায় দারুল ইসলাম আখ্যা দেয়া হয়েছে, নাকি সেটিকে দারুল ইসলাম আখ্যা দেয়া হয়েছে ইমাম আবু হানিফার রহ. একটি শর্ত দারুল ইসলাম কর্তৃক বেষ্টিত হওয়ার কারণে? অন্যথায় সেটির শাসকও অমুসলিম এবং তা তাদের দখলেই রয়েছে। এছাড়াও সাহেবাইন ও জুমহুরের মতে তো দারুল ইসলাম নয়, বরং কুফরি আইন জারি হওয়ায় তা দারুল হারব।

মুফতি তাকি উসমানি -হাফিযাহুল্লাহ- অতঃপর দারুল হারবের সংজ্ঞায় বলেছেন, 'যা অমুসলিম শাসকের অধীনে থাকে'। এখন এটি আমাদের কোনো আলোচ্য বিষয় নয়। তা উল্লেখ করেছি শুধু পাঠকদের একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর জন্য। যারা আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির পুস্তিকাকে সমর্থন করেছেন, তাঁরা এখানে কী বলবেন? মুফতি মাহদি হাসান শাহজাহানপুরি রহ. ও সাইয়েদ মুহাম্মাদ মিয়া রহ. দারুল হারবের এরূপ সংজ্ঞা প্রদানের কারণেই আ'যমি রহ. তাঁদের ব্যাপারে দুঃখজনক মন্তব্য করেছিলেন। এখন ....???????

মুফতি তাকি উসমানি কর্তৃক দারুল কুফরের ভাগ ও হুকুম

ফুকাহায়ে কেরাম অধিকাংশ দারুল কুফরের জন্য দারুল হারব ব্যবহার করায় কারো এই ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে যে, দারুল ইসলাম না হওয়ার অর্থই হচ্ছে তা সবসময় যুদ্ধাবস্থায় থাকে; যেহেতু 'হারব' অর্থ যুদ্ধ। মুফতি তাকি উসমানি -হাফিযাহুল্লাহ- এই ধারণা দূর করার উদ্দেশ্যে বলেন-

لیکن حقیقت یہ ہے کہ فقہاء کرام بکثرت "دار الحرب" کا لفظ دار الکفر کے معنی میں استعمال فرماتے ہیں، اور اس ملک پر بھی اسکا اطلاق کر دیا جاتا ہے جو دار الاسلام کے ساتھ حالت جنگ میں نہ ہو، بلکہ اسکے ساتھ صلح کا معاہدہ ہو، یا مسلمان وہاں امن وامان کے ساتھ رہتے ہوں۔ (اسلام اور سیاسی نظریات، پانچواں باب: دفاع اور امور خارجہ، دار الکفر کی دو قسمیں، ص ۳۲۸)

"কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, ফুকাহায়ে কেরাম ব্যাপকভাবে দারুল কুফরের অর্থে দারুল হারব ব্যবহার করেন এবং ওই রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও সেটি ব্যবহার করেন, যা দারুল ইসলামের সঙ্গে যুদ্ধাবস্থায় নয়। বরং তার সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ অথবা মুসলমানরা সেখানে নিরাপদে বসবাস করে।" (ইসলাম আওর সিয়াসি নযরিয়াত, পৃ: ৩২৮)

মুফতি তাকি উসমানি -হাফিযাহুল্লাহ- প্রথম যে কথা বলেছেন যে, সন্ধিবদ্ধ দারুল হারব যুদ্ধাবস্থায় নয় অর্থাৎ সন্ধির মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত এ দারুল হারবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে না; তা ঠিক আছে। কিন্তু দ্বিতীয় যে অবস্থার কথা বলেছেন যে, মুসলমানরা নিরাপদে বসবাস করতে পারলে তা যুদ্ধাবস্থায় নয় অর্থাৎ সে দারুল হারবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে না বা করা জায়েয হবে না; এ দাবির পক্ষে মনে হয় কোনো গ্রহণযোগ্য ফকিহ বা ফিকহি কিতাবের উদ্ধৃতি দেখাতে পারবেন না।

বরং এর বিপরীতে ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত শর্তদুটি হিসেবে যে অঞ্চল দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকে; সেটির ব্যাখ্যায় জাসসাস, সারাখসি ও কাযি খান প্রমুখগণ যা বলেছেন, তার আলোকে এটিই প্রমাণিত হয় যে, ওই অঞ্চলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা হবে। কেননা তারা তো এটিই বলেছেন যে, সেটি তাদের হাতে সাময়িক সময়ের জন্য। মুসলমানরা তাদের হাতে সেটি থাকতে দেবে না। এবং আবু বকর আলজাসসাস তো এ কারণেই জিহাদের ব্যাপারে উদাসীনতার প্রসঙ্গ এনে সাহেবাইনের মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

তো কাফেরদের হাত থেকে যে তা উদ্ধার করা হবে তা কীভাবে? অবশ্যই যুদ্ধের মাধ্যমে উদ্ধার করা হবে। তাহলে 'আমান' বহাল থাকা বা দারুল ইসলাম কর্তৃক বেষ্টিত হওয়ার কারণে ইমাম আবু হানিফার রহ. মতে যে ভূখণ্ড

দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত; সে ভূখণ্ড যদি যুদ্ধাবস্থায় হয়, তাহলে কোনো দারুল হারবে মুসলমানরা নিরাপদ থাকার কারণে তা যুদ্ধাবস্থায় নয় বলা অযৌক্তিক।

তাহলে কি মুফতি তাকি উসমানি -হাফিযাহুল্লাহ- বলতে চান, আমেরিকায় যেহেতু মুসলমানরা নিরাপদে বসবাস করে, সুতরাং তা দারুল হারব হলেও যুদ্ধাবস্থায় নয় এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না; যদিও মার্কিন সৈন্যরা কোনো ইসলামি ভূখণ্ডে যুদ্ধরত থাকে!

তাঁর রায় হয়তো এমনটিই। এজন্যই হয়তো তিনি একটি 'ইমারতে ইসলামিয়া'র আমিরুল মুমিনিনের নিকট সে 'ইমারতে ইসলামিয়া'র একজন বীর মুজাহিদকে আমেরিকার হাতে তুলে দেয়ার জন্য সুপারিশ করতে গিয়েছিলেন!

শাহ আব্দুল হক দেহলবির বক্তব্যের আলোকে দারুল কুফরের ভাগ

মুফতি তাকি উসমানি -হাফিযাহুল্লাহ- যুদ্ধাবস্থায় নয় বলে মূলত সেটিকে 'দারুল আমান' বলতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি শাহ আব্দুল হক দেহলবির (মৃ: ১০৫২ হি:) একটি বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যার সারাংশ হচ্ছে, ইসলামে দু'বার হিজরত হয়েছে; একটি হচ্ছে দারুল খাওফ তথা মক্কা থেকে দারুল আমান তথা হাবাশার দিকে হিজরত। আর অপরটি হচ্ছে, দারুল কুফর তথা মক্কা থেকে দারুল ইসলাম তথা মদিনার দিকে হিজরত।

এই বক্তব্যের আলোকে মুফতি তাকি উসমানি -হাফিযাহুল্লাহ- দারুল হারবকে দু'ভাগ করেছেন; একটি দারুল খাওফ অপরটি দারুল আমান। হাবাশার দিকে হিজরতের প্রসঙ্গ তোলে আরো কেউ এমন ভাগ করে থাকতে পারেন।

এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় আমাদের লক্ষ্য করা উচিত। আমরাও পূর্বে প্রমাণ করে এসেছি যে দারুল কুফর ও দারুল হারব সমার্থক শব্দ। কিন্তু দারুল কুফরের সঙ্গে দারুল হারব বিশেষণটি যুক্ত হবে 'হারব' তথা জিহাদের অনুমতি আসার পর এবং মদিনায় হিজরত করে ইসলামি আইন-কানুন জারি করে সেটিকে দারুল ইসলাম বানানোর পর। এর পূর্ব পর্যন্ত মক্কা দারুল কুফর ঠিক আছে কিন্তু দারুল হারব নয়। সে হিসেবে দারুল কুফরের যেখানে নিরাপত্তা নেই সেটিকে দারুল খাওফ বলা আর যেখানে নিরাপত্তা আছে সেটিকে দারুল আমান বলার মধ্যে তেমন একটা জটিলতা নেই।

কিন্তু 'হারব' তথা জিহাদের অনুমতির পর এবং মদিনায় হিজরত করে ইসলামি আইন-কানুন জারি করে সেটিকে দারুল ইসলাম বানানোর পর এখন দারুল কুফর দারুল হারবও, অর্থাৎ সবগুলোই যুদ্ধাবস্থায়। এখন দারুল হারব হয়েও যুদ্ধাবস্থায় না হওয়ার পদ্ধতি হলো দারুল ইসলামের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হওয়া। চাই এটিকে 'দারুল মুওয়াদাআ' বলা হোক বা 'দারুল আমান' বলা হোক। কিন্তু শুধু নিরাপদে বসবাস করতে পারার কারণে 'হারব'র মোকাবেলায় 'আমান' বলা; পূর্বের ফুকাহায়ে কেরামের ব্যবহারে এটি নেইও এবং তা যুদ্ধাবস্থায় নয় বলেও কেউ মন্তব্য করেননি। আমরা পূর্বেও এ বিষয় স্পষ্ট করেছি যে, এ অর্থে 'দারুল আমান' পরবর্তীদের কেউ কেউ ব্যবহার করেছেন এবং তা খুবই দুর্বল ও আপেক্ষিক ব্যবহার। তাই আনুষঙ্গিক কিছু মাসআলায় ব্যবধান থাকতে পারে, কিন্তু দারুল ইসলামের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ না হওয়ায় তা দারুল হারবের যুদ্ধাবস্থায় আছে এবং সেটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কোনো বাধা নেই।

মক্কা যে দারুল হারব হয়েছে জিহাদের বিধান আসার পর এবং মদিনায় হিজরত করে ইসলামি আইন-কানুন জারি করে সেটিকে দারুল ইসলাম বানানোর পর; তা ইমাম আবু হানিফার শব্দে ইমাম মুহাম্মাদের 'আলআসল' কিতাবে স্পষ্টই উল্লেখ হয়েছে-

قال أبو حنيفة: ولاؤهم لأبي بكر ﷺ، لأنه أعتقهم **قبل أن يؤمر النبي ﷺ بالقتال وقبل أن تكون مكة دار حرب.** .... **وإنما افترق أمر دار الحرب ودار الإسلام حيث هاجر رسول الله ﷺ وأمر بالقتال وجرى حكم الإسلام في دار الإسلام.**

(الأصل لمحمد الشيباني، كتاب الولاء، باب العتق في دار الحرب، ٤١٣/٦)

"আবু হানিফা বলেন, তাদের (সুহাইব, বেলাল প্রমুখগণ) 'ওয়ালা'র অধিকার আবু বকর রাযি. এর প্রাপ্য। কেননা তিনি তাদেরকে আযাদ করেছেন **রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'কিতাল'র ব্যাপারে আদিষ্ট হওয়া ও মক্কা দারুল হারব হওয়ার পূর্বে** ....। **আর দারুল হারব ও দারুল ইসলামের বিষয়টি পার্থক্য হয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরত করা, 'কিতাল'র ব্যাপারে আদিষ্ট হওয়া ও দারুল ইসলামে ইসলামি আইন-কানুন জারি হওয়ার পর।"** (কিতাবুল আসল, ৬/৪১৩)

সুতরাং নিরাপত্তা হিসেবে দারুল কুফরকে দারুল খাওফ ও দারুল আমানে ভাগ করে দারুল খাওফ থেকে দারুল আমানে হিজরতের বিষয়টি যথাযথ। কিন্তু দারুল কুফর দারুল হারবও হয়ে যাওয়ার পর শুধু নিরাপত্তা হিসেবে দারুল হারবকে দারুল খাওফ ও দারুল আমানে ভাগ করে দারুল আমানকে দারুল হারবের মৌলিক হুকুম থেকে পৃথক মনে করার কোনো সুযোগ নেই।

মুহাম্মাদ সাহুল উসমানির বর্ণনায় গাঙ্গুহির রায়

মুফতি তাকি উসমানি -হাফিযাহুল্লাহ- তাঁর দারুল আমানের ধারণা আরো শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে মাওলানা মুহাম্মাদ সাহুল উসমানির একটি 'অযাহাত' উল্লেখ করেছেন। তাতে মাওলানা মুহাম্মাদ সাহুল উসমানি শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবি প্রমুখগণ কর্তৃক হিন্দুস্তানকে দারুল হারব ঘোষণার বিষয়টি উল্লেখ করার পর বলেন-

مگر واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دار الامان ہے۔ یعنی جس طرح سے حبشہ قبل ہجرت شریف کے باوجود دار الحرب ہونے کے دار الامان تھا، اسی طرح سے ہندوستان بھی آجکل دار الامان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سے مسلمانوں کو ہجرت ضروری نہیں۔ کاتب الحروف کے استفسار کے بعد حضرت گنگوہی نے ایسا ہی مشافہۃ فرمایا تھا جو بندہ کو خوب اچھی طرح سے یاد ہے۔ (اسلام اور سیاسی نظریات، پانچواں باب: دفاع اور امور خارجہ، دار الکفر کی دو قسمیں، ص۳۲۹-۳۳۰)

"কিন্তু বাস্তবতায় মনে হয় যে, এটি দারুল আমান। অর্থাৎ যেমনিভাবে হাবাশায় হিজরতের পূর্বে তা দারুল হারব হওয়া সত্ত্বেও দারুল আমান ছিলো, তেমনিভাবে হিন্দুস্তানও বর্তমানে দারুল আমান। এই কারণেই এখান থেকে মুসলমানদের হিজরত করা আবশ্যক নয়। আমি লেখকের (মুহাম্মাদ সাহুল উসমানি) জিজ্ঞাসার পর হযরত গাঙ্গুহি আমাকে সরাসরি এমনটি বলেছেন, যা আমার খুব ভালোভাবে স্মরণে আছে।" (ইসলাম আওর সিয়াসি নযরিয়াত, পৃঃ ৩২৯-৩৩০)

মাওলানা সাহুল উসমানির প্রথম কথাটি যে যথাযথ হয়নি তা স্পষ্ট। কারণ, হাবাশা তখন দারুল হারব ছিলো না বরং শুধু দারুল কুফর ছিলো; যেমনটি আমরা ইতোপূর্বে স্পষ্ট করেছি।

দ্বিতীয়ত: মাওলানা সাহুল উসমানির এই বর্ণনা সহিহ হলেও তাতে মুফতি তাকি উসমানির -হাফিযাহুল্লাহ- দাবির পক্ষে কোনো দলিল নেই। কেননা তিনি দারুল আমান বলে যুদ্ধাবস্থায় নয় বুঝাতে চেয়েছেন, কিন্তু এখানে সে ধরনের কোনো ইঙ্গিতও করা হয়নি বরং শুধু হিজরতের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। সেটি আমরাও পূর্বে বলেছি যে, 'দারুল খাওফ'র মোকাবেলায় 'দারুল আমান'র ব্যবহারে যেহেতু কোনো সন্ধির বিষয় নেই। তাই মূলত তা দারুল হারব হওয়ায় এ 'দারুল আমান'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাসহ দারুল হারবের মৌলিক অকাট্য বিধানের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন আসবে না। তবে হিজরত করা ওয়াজিব হওয়ার মতো আনুষঙ্গিক ও মতবিরোধপূর্ণ মাসআলায় কারো নিকট যুক্তিযুক্ত মনে হলে ওয়াজিব না হওয়ার কথা বলতে পারে।

তৃতীয়ত: গাঙ্গুহির রহ. এ কথা যদি স্বতন্ত্র 'রিসালাহ' রচনা ও পুরো হিন্দুস্তানকে দারুল হারব বলে ফাতওয়া প্রদানের পূর্বে হয়ে থাকে, তাহলে এ বিষয়ে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। আর যদি পরে বলে থাকেন এবং দারুল আমান বলে ভিন্ন কিছু বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি তাঁর স্বতন্ত্র 'রিসালাহ' বা পুরো হিন্দুস্তানকে দারুল হারব বলে ফাতওয়া প্রদানের ব্যাপারে 'অযাহাত' করতেন। কিন্তু সে ধরণের কিছু বর্ণিত হয়নি। বুঝা গেলো, তাঁর দৃষ্টিতে মৌলিক হুকুম হিসেবে উভয় মন্তব্যের মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। অন্যথায় তিনি তা স্পষ্ট করে দিতেন।

আর মুফতি তাকি উসমানির -হাফিযাহুল্লাহ- ওয়ালিদে মুহতারাম মুফতি শফি রহ. গাঙ্গুহির রহ. 'রিসালাহ'র উর্দুতে অনুবাদ করেছেন এবং হিন্দুস্তান দারুল হারব হওয়ার ব্যাপারে তাঁর 'জাওয়াহিরুল ফিকহ' কিতাবে আলোচনা করেছেন; যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তিনি কি মাওলানা সাহুল উসমানির এই বর্ণনা পাওয়ার পর হিন্দুস্তানকে দারুল আমান বা যুদ্ধাবস্থায় নয় বলে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন? কিন্তু মুফতি তাকি উসমানি -হাফিযাহুল্লাহ- কেনো এই একটি কথা পেয়েই হিন্দুস্তানকে দারুল আমান এবং যুদ্ধাবস্থায় নয় প্রমাণ করার চেষ্টা শুরু করে দিলেন! لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة।

আলই'তিযার

ক) কারো মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে, মাসআলা দলিলের আলোকে প্রমাণ করা তো ঠিক আছে, কিন্তু কোনো ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে আলোচনা না করলে কী সমস্যা ছিলো?

আমরা পূর্বেও বলেছি, কোনো ব্যক্তিত্বের 'শায' কথা বা 'পদস্খলন'কে সে হিসেবে থাকতে দেয়াই তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্য নিরাপদ। কিন্তু সেটিকে যখন আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হবে বা প্রচার করা হবে, তখন যিনি দলিলের আলোকে তা প্রত্যাখ্যান করছেন; তিনি তো উম্মতের কল্যাণ কামনায় তার দায়িত্ব হিসেবেই যেভাবে প্রকাশ হয়েছে সেভাবেই সেটিকে প্রত্যাখ্যান করছেন। এর জন্য অপরাধী সেই যে এই 'শায' রায় বা 'পদস্খলন'কে দলিল হিসেবে প্রচার করে।

খ) প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে প্রকাশভঙ্গির ব্যাপারেও কারো দ্বিমত থাকতে পারে। সেটির ব্যাপারে ভিন্ন শিরোনামে আলোচনা হতে পারে। তবে ভুল আকিদা-বিশ্বাস ও 'শায' কথা প্রত্যাখ্যানে কঠিন 'উসলুব' পদ্ধতি গ্রহণ করাই যে 'সুন্নাতে সালাফ'; তা বুঝার জন্য এই পর্বে শুধু প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, সহিহ বুখারির প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা ইমাম আবু মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহিদ ইবনুত তিন রহ. (মৃ: ৬১১ হি:)[৫৭] এর একটি মৌলিক কথা উল্লেখ করে দেয়াই যথেষ্ট মনে করছি, যা তিনি সহিহ বুখারির একটি হাদিসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন। হাদিসের উদ্দিষ্ট অংশটি হচ্ছে-

عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفاً البِكَالِي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، فقال: كذب عدو الله......... (صحيح البخاري، كتاب العلم، باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله، صـ٢٢١، رقم الحديث: ١٢٢، صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر عليه السلام، صـ٩٩٥، رقم الحديث: ٦١٦٣)

"সায়িদ ইবনে জুবাইর বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে বললাম যে, নাওফ আলবিকালি মনে করেন (খাযির আলাহিস সালামের ঘটনায় উল্লিখিত) মুসা বনি ইসরাইলের (নবী) মুসা নয়, বরং তিনি অন্য মুসা। তখন ইবনে আব্বাস বললেন, আল্লাহর দুশমন মিথ্যা বলেছে।" (সহিহ বুখারি, পৃ: ২২১, হাদিস নং: ১২২, সহিহ মুসলিম, পৃ: ৯৯৫, হাদিস নং: ৬১৬৩)

---

৫৭. তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম হচ্ছে- "المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح"।

শামের তাবেয়ি আলেম নাওফ আলবিকালি রহ. (মৃ: ৯০ হিজরির পর) সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রাযি. (মৃ: ৬৮ হি:) এর মন্তব্যের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনুত তিন রহ. বলেন-

قال ابن التين: لم يرد ابن عباس إخراج نوف عن ولاية الله، **ولكن قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق، فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الزجر والتحذير منه** وحقيقته غير مرادة. (فتح الباري، ١/٤٥٨، عمدة القاري، ٢/٤٤٢)

“ইবনুত তিন বলেন, ইবনে আব্বাস কর্তৃক নাওফকে আল্লাহর অভিভাবকত্ব থেকে বের করে দেয়া উদ্দেশ্য নয়। **বরং উলামায়ে কেরামের অন্তর অসত্য কথা শুনলে তা অপছন্দ করে। তাই তারা তিরস্কার ও সতর্কীকরণের উদ্দেশ্যে এ ধরনের বাক্য ব্যবহার করে থাকেন** এবং সেটির বাস্তবতা উদ্দেশ্য হয় না।” (ফাতহুল বারি, ১/৪৫৮, উমদাতুল কারি, ২/৪৪২)

ইবনুত তিনের সুরেই আমরা বলতে চাচ্ছি, বাস্তবতা বিবর্জিত অবস্থানের বিপক্ষে কঠিন ‘উসলুব’ পদ্ধতি গ্রহণ করাই ‘সুন্নাতে সালাফ’। হাঁ! বাস্তবতা উদ্দেশ্য হয় না বলে ইবনুত তিন রহ. যে কথা বলেছেন, তা এখানে ব্যবহৃত বাক্যের ক্ষেত্রে ঠিক আছে। কিন্তু অনেক সময় বা অন্যান্য বাক্যের ক্ষেত্রে বাস্তবতাও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

هذا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين.

ثَبَت المصادر والمراجع

١- القرآن الكريم

٢- آپ کے مسائل اور ان کا حل- یوسف لدھیانوی- زکریا بکڈپو، دیوبند

٣- آثار الحرب في الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي، دار الفكر

٤- الآداب الشرعية لمحمد بن مفلح المقدسي، مؤسسة الرسالة

٥- أحكام أهل الذمة لابن القيم، رمادي للنشر، المملكة العربية السعودية

٦- أحكام القرآن للإمام الشافعي -جمع البيهقي- مكتبة الخانجي بالقاهرة

٧- اسلام اور سیاسی نظریات- مفتی تقی عثمانی- کتب خانہ نعیمیہ، دیوبند

٨- الأصل للإمام محمد الشيباني، تحقيق الدكتور محمد بوينوكالن، دار ابن حزم، بيروت، لبنان

٩- الإقناع لطالب الانتفاع لشرف الدين الحجاوي، دارة الملك عبد العزيز

١٠- الأم للإمام الشافعي، دار الوفاء، المنصورة

١١- الإنصاف للمرداوي، تعليق الفقي، طبعة الملك سعود بن عبد العزيز المعظم

١٢- بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني، دار الكتب العلمية، بيروت

١٣- بصائر و عبر- محمد یوسف بنوری- مکتبۂ بنوریہ، علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن، کراچی

١٤- البيان والتحصيل لابن رشد الجد، دار الغرب الإسلامي، بيروت

١٥- تاريخ الإسلام للذهبي، المكتبة التوفيقة

١٦- تاريخ دمشق لابن عساكر، دار الفكر، بيروت

١٧- تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي، دار ابن زيدون، بيروت - مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة

١٨- تالیفات رشیدیہ- رشید احمد گنگوہی- ادارۂ اسلامیات، لاہور

١٩- تأنيب الخطيب للكوثري، طبع مُحَمّد أمين

٢٠- تذكرة الحفاظ للذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت

٢١- تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، دار الكتب العلمية، بيروت

٢٢- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)، دار عالم الكتب، الرياض

٢٣- التفسير الكبير للرازي، دار الفكر، بيروت

٢٤- التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة لقاضي عياض، دار ابن حزم، بيروت، لبنان

٢٥- جامع الترمذي، مؤسسة الرسالة ناشرون

٢٦- جامع الرموز للقهستاني، مطبع مظهر العجائب، كلكته

٢٧- جامع الفصولين لابن قاضي سماونة، اسلامی کتب خانہ، علامہ بنوری ٹاؤن، کراچی

٢٨- جواہر الفقہ - مفتی محمد شفیع - مکتبہ سیرت النبی، جامع مسجد، دیوبند

٢٩- حاشية الطحطاوي على الدر المختار، المطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر المحمية

٣٠- الحاوي الكبير للماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت

٣١- خزانة المفتين لحسين بن مُحَمّد السمنقاني، مخطوطة المكتبة العربية الرقمية

٣٢- دار الاسلام اور دار الحرب - حبیب الرحمن اعظمی - المجمع العلمی، مرکز تحقیقات وخدمات علمیہ، مئو

٣٣- درر الحكام في شرح غرر الأحكام لملا خسرو، میر محمد، کتب خانہ آرام باغ، کراچی

٣٤- الدر المختار للعلاء الحصكفي مع رد المحتار، دار الكتاب، ديوبند، الهند

٣٥- الدر المنضود علی سنن ابی داود - محمد عاقل سہارنپوری - مکتبۂ خلیلیہ، سہارنپور، یوپی

٣٦- رد المحتار لابن عابدين الشامي، دار الكتاب، ديوبند، الهند

٣٧- سنن أبي داوُد، مؤسسة الرسالة ناشرون

٣٨- السنن الكبرى للبيهقي، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، بحيدرآباد الدكن، الهند

٣٩- سير أعلام النبلاء للذهبي، مؤسسة الرسالة

٤٠- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله اللالكائي، دار الفكر، بيروت

٤١- شرح الزيادات للعتابي، مخطوطة شيخ الإسلام فيض الله أفندي، التي أنشأها بالقسطنطينية سنة ١١١٢

٤٢- شرح الزيادات لقاضي خان، مکتبۂ عربیہ، کانسی روڈ، کوئٹہ

٤٣- الشرح الكبير على المقنع للشمس ابن قدامة المقدسي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع

٤٤- شرح كتاب السير الكبير للسرخسي، المكتبة التوفيقية، القاهرة

٤٥- شرح مختصر الطحاوي للجصاص، دار البشائر الإسلامية، بيروت - دار السراج، المدينة المنورة

٤٦- صحيح البخاري، مؤسسة الرسالة ناشرون

٤٧- صحيح مسلم، مؤسسة الرسالة ناشرون

٤٨- صراط مستقیم اردو - شاہ اسماعیل شہید - دار الکتاب، دیوبند، یوپی

٤٩- العرف الشذي لأنور شاه الكشميري، دار إحياء التراث العربي، بيروت

٥٠- عقائد الاسلام - ادریس کاندھلوی - ادارۃ المعارف، کراچی

٥١- عمدة التفسير لأحمد شاكر، دار الوفاء، المنصورة

٥٢- عمدة القاري للعيني، السحار للطباعة والنشر، القاهرة

٥٣- غرر الأذكار في شرح درر البحار لمحمد البخاري، مخطوطة الجمهورية العربية السورية، وزارة التربية والتعليم، المجمع العلمي العربي دمشق (المكتبة الظاهرية)

٥٤- الفتاوى البزازية (الجامع الوجيز) لابن البزاز الكردري، بهامش الفتاوى الهندية، زکریا بکڈپو، دیوبند

٥٥- الفتاوى التاتارخانية لابن العلاء الدهلوي، مكتبة زكريا بديوبند، الهند

٥٦- فتاوى رشيديه كامل- رشيد احمد گنگوہی- ایچ ایم سعید کمپنی، ادب منزل، پاکستان چوک، کراچی

٥٧- فتاوى السبكي لتقي الدين السبكي، دار المعرفة، بيروت

٥٨- فتاوى عبد الحی لکھنوی، مکتبۂ تھانوی، دیوبند

٥٩- فتاوى عزیزی اردو- شاہ عبد العزیز محدث دہلوی- ایچ ایم سعید کمپنی، ادب منزل، پاکستان چوک، کراچی

٦٠- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، -جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدرويش- دار العاصمة، المملكة العربية السعودية

٦١- فتاوى محموديه- محمود حسن گنگوہی- زکریا بکڈپو، دیوبند

٦٢- فتاوى ورسائل لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

٦٣- الفتاوى الهندية لعدة من علماء الهند، زکریا بکڈپو، دیوبند

٦٤- فتح الباري لابن حجر العسقلاني، الرسالة العالمية

٦٥- فتح القدير لابن الهمام، المطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر المحمية

٦٦- الفصول العمادية لعبد الرحيم بن عماد الدين المرغيناني، مخطوطة المكتبة الأزهرية

٦٧- فطری حکومت- قاری محمد طیب- دار الکتاب، دیوبند، یوپی

٦٨- الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي، دار الفكر، سورية، دمشق، الطبعة الرابعة (الشاملة)

٦٩- الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية

٧٠- في ظلال القرآن لسيد قطب، منبر التوحيد والجهاد

٧١- قاسم العلوم مع اردو ترجمه انوار النجوم- مکتوبات قاسم نانوتوی- ناشران قرآن لمیٹڈ، اردو بازار، لاہور

٧٢- الكافي للحاكم الشهيد، مخطوطة شيخ الإسلام فيض الله أفندي، التي أنشأها بالقسطنطينية سنة ١١١٢، المكتبة الأزهرية من كتب السيد فضل الله المغني في السلطنة العثمانية

٧٣- الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر المالكي، دار الكتب العلمية

٧٤- الكشاف للزمخشري، مكتبة العبيكان، الرياض

٧٥- كشاف القناع للبهوتي، وزارة العدل في المملكة العربية السعودية

٧٦- المبسوط للسرخسي، دار المعرفة، بيروت

٧٧- مجمع الأنهر لشيخي زاده داماد أفندي، دار الكتب العلمية، بيروت

٧٨- مجموع الفتاوى لابن تيمية، مجمع الملك فهد، المملكة العربية السعودية

٧٩- المجموع شرح المهذب للنووي، مكتبة الإرشاد، جدة

٨٠- المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت

٨١- مختصر الطحاوي، بتحقيق أبي الوفاء الأفغاني، لجنة إحياء المعارف النعمانية، بحيدرآباد الدكن بالهند

٨٢- المدونة الكبرى، رواية سحنون عن ابن القاسم عن الإمام مالك، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

٨٣- مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله، المكتب الإسلامي

٨٤- مسند الإمام أحمد، مؤسسة الرسالة

٨٥- المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ابن الفراء، دار المشرق، بيروت

٨٦- معراج الدراية شرح الهداية لقوام الدين الكاكي، مخطوطة المكتبة الوطنية في باريس - Twitter مُحَمَّد بن مُحَمَّد التركي - (الشبكة)

٨٧- المغني لابن قدامة، دار الكتب العلمية، بيروت

٨٨- مکتوبات شیخ الاسلام حسین احمد مدنی، مکتبۂ دینیہ، دیوبند

٨٩- الملتقط في الفتاوى الحنفية لناصر الدين السمرقندي، دار الكتب العلمية

٩٠- ملفوظات حکیم الامت- اشرف علی تھانوی- ادارۂ تالیفات اشرفیہ، چوک فوارہ، ملتان، پاکستان

٩١- المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، دار القلم - الدار الشامية

٩٢- الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت

٩٣- نزهة الخواطر (الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام) لعبد الحي الحسني، دار ابن حزم، بيروت

۹۴- نقش حیات (خودنوشتہ سوانح)- حسین احمد مدنی-دار الاشاعت، اردو بازار، کراچی

٩٥- نونية ابن القيم (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية)، دار عالم الفوائد

٩٦- النهر الفائق لسراج الدين ابن نجيم، دار الكتب العلمية، بيروت

৯৭- মাকালাতে চাটগামী, মুফতি আব্দুস সালাম চাটগামী, মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ

৯৮- দেওবন্দ আন্দোলন: ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান, মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া, আল-আমিন রিসার্চ একাডেমি বাংলাদেশ ১১৪/এ, সবুজবাগ, বাসাবো, ঢাকা-১২১৪

৯৯- প্রচলিত জাল হাদীসের (১) ভূমিকা, মাওলানা আব্দুল মালেক, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা, প্রথম প্রকাশ

১০০- আহলে হাদীস সে যুগে এ যুগে, মাওলানা যুবায়ের হোসাইন, মাকতাবাতুস সিদ্দীক, দ্বিতীয় প্রকাশ

১০১- মাসিক আলকাউসার, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

১০২- দৈনিক ইনকিলাব

আমার এই গ্রন্থে আলোচ্য কথাগুলো কোনো বিশেষ পক্ষের তরজুমানি নয় এবং আমিও কোনো বিশেষ পক্ষের তরজুমানি করতে তা রচনা করিনি। সুতরাং শুধু আমার আলোচনায় আসার কারণে এখানের কথাগুলো যেমনিভাবে বিশেষ কোনো পক্ষের দিকে নিসবত করা যথাযথ হবে না, তেমনিভাবে শুধু কোনো কোনো কথায় মিল থাকার কারণে আমাকেও বিশেষ কোনো পক্ষের দিকে নিসবত করা অনুচিত হবে।

আমার ছাত্র এবং যারা আমাকে মুহাব্বত করেন তাদের পক্ষ হতে যখন বারবার এ সকল বিষয়ের শরয়ি সমাধান জানতে চাওয়া হচ্ছিলো, তখন দীর্ঘ 'মুতালাআ' ও 'মুযাকারা'র পর আমার নিকট যা স্পষ্ট হয়েছে তা আমি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছি। আমার সঠিক-ভুল আমার দিকেই নিসবত হবে। আমার দোষে কাউকে দোষারোপ করা যাবে না এবং অন্যের দোষে আমাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না। আমি এই রচনায় কোনো ব্যক্তি, শ্রেণি বা পক্ষের মুখপাত্র নই। আমি ও আমার গ্রন্থের আলোচনাকে এভাবেই বিবেচনা করা সকলের নিকট কাম্য।

প্রকাশনায়

দারুল ফিকহিল আম